স্মৃতিচিহ্নিত

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ, ১৩৬৭

প্রকাশক
শিবব্রত গঙ্গোপাধ্যায়
চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড
১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা ৭০০০৭৩

মুদ্রাকর
এন. গোস্বামী
নিউ নারায়ণী প্রেস
১/২ রামকান্ত মিস্ত্রী লেন, কলকাতা ৭০০০১২

প্রচ্ছদ
লেখকের রচিত তিনটি ভাস্কর্যের আলোকচিত্র
বর্ণলিপি : প্রবীর সেন

প্রচ্ছদ মুদ্রণ : টাইপোগ্রাফিক্ আর্টস্, কলকাতা ৭০০০০৯

ভূমিকা

বাস্তব জীবন যেখান থেকে চলতে শুরু করেছে কালের চাকা সদা সামনে ঘুরে তাকে নিয়ে চলেছে আগে —শুধু আগে বিরামহীন এবং কালেরই এক নির্দিষ্ট সময়ের শেষে পৌঁছে দেবে নির্বাণের ঘাঁটিতে। বাস্তবে জীবনের এই আগে চলাকে থামিয়ে, ফেলে-আসা পথে প্রত্যাবর্তন করা যায় না। মনই কেবল স্মৃতিকে সাথী করে জীবনে ফেলে-আসা পিছন পথে যাওয়া আসা করতে পারে অবাধে।

মনে পড়ে ছোটবেলার দিনগুলোতে পাড়ায় আসত ফিরিওয়ালা, মাথায় ম্যাজিক বাক্স নিয়ে। ছেলেরা জড় হলে তেপায়ায় বাক্সটি রেখে, পয়সা নিয়ে, ছোটকে বড় করে দেখার কাঁচ-লাগানো তিনটি খোপ দিয়ে দেখাত ছবির পর ছবি আর সুর করে বলে যেত তাদের পরিচিতি— 'আগ্রাকা তাজমহাল দেখো, দিল্লীকা কেল্লা দেখো' ···ইত্যাদি। সেই ফিরিওয়ালার দেখানো ছবির সারির মতোই 'স্মৃতিচিহ্নিত'-এ জমা করা হয়েছে কিছু ছবি এবং এগুলি দেখতে পালা করে কেবল তিন খোপে নয় বহু দর্শনেচ্ছুকরা একযোগেই দেখতে পাবেন। ফিরিওয়ালার দেখানো সব ছবিই কিন্তু দেখে পছন্দ হতো না, কারণ ভালো-লাগা ছবির সঙ্গে আরও এমন ছবি থাকত যা দেখে মনে হতো যে, তাদের সংখ্যা ও সময়কে বাড়িয়ে মূল্যের মাপসই করার চালাকি। আমার স্মৃতির খতিয়ানে দাখিল-করা অতীতের ছবিগুলি দুঃখ, বিষাদ কিংবা আনন্দ ও তৃপ্তিতে চিহ্নিত। ছবিগুলির উপাদান চয়ন আমার ইচ্ছায় হয়নি, এদের সজ্জা যুগিয়েছেন কাল দেবতা। 'স্মৃতিচিহ্নিত' পড়ে দেখায় পাঠকের ভালো-লাগা বা না-লাগার কৈফিয়ৎ তিনিই দিতে পারবেন।

'স্মৃতিচিহ্নিত'-র কাহিনীগুলির অধিকাংশ বিভিন্ন সময়ে বিচ্ছিন্নভাবে লেখা ও ছাপা হয়েছিল, ১৯৪০ থেকে তিরিশ বছরে তিন দফায়। অতি নিকট সময়ের লিখিত ঘটনাবলী এখন সুদূর অতীতবর্তী হয়ে যাওয়ায় কালের বৈষম্যকে এড়ানো

যায়নি। চিরায়ত প্রকাশনের কর্তৃপক্ষ লেখাগুলিকে একত্র গ্রথিত করে ছাপাবার আগ্রহেই 'স্মৃতিচিহ্নিত'-এর প্রকাশ সম্ভবপর হলো। ১৯৩৮-৩৯ সালে পারীতে থাকাকালীন উচ্চশিক্ষারত সাতজন বাঙ্গালী যুবক সমেত আমাদের যে জমাট বন্ধু-গোষ্ঠী ছিল বিগত চুয়াল্লিশ বছরের মধ্যে তাঁরা একে একে ছয় জন বিগত হয়েছেন। লেখার সময়ে জীবিত তাঁরা কেউ কেউ নিজ পরিচয়ে চিহ্নিত হতে না চাওয়ায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিত কিংবা 'ন' কিংবা 'গন'-এর ওরফে রয়ে গেছেন। কুণ্ডু বাদে এঁরা ছিলেন, ডঃ. শিবসুন্দর দেব, ডঃ. জীবনকৃষ্ণ গন, ডঃ. যোগেন্দ্রকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় (বিনু), প্রমোদ সেনগুপ্ত ও ডঃ. তারাপদ বসু। ভবিষ্যৎ যদি সুযোগ দেয় তা হলে হয়ত এঁদের সঙ্গে জড়িত স্মৃতিকাহিনী দাখিল করা যাবে।

নিজে প্রুফ না দেখার নজির রয়ে গেলো ছাপানো নানা ভ্রমাত্মক বানানে—অনেকের নামে ও কথায়, যেমন অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গাঙ্গুলী, ভল্‌তেয়ার প্রভৃতি। পাঠক এগুলিকে উপেক্ষা করে নিলে বাধিত হব।

চিত্র-পরিচিতি

পৃষ্ঠা সংখ্যা / প্লেটের ক্রমিক

চিত্র-পরিচয়

১/ক

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট স্কুলে লেখকের প্রথম শিল্প-শিক্ষক ভাস্কর গিরিধারী মহাপাত্র রচিত একটি দারুমূর্তি।

২/খ

লেখক কর্তৃক অঙ্কিত (১৯৫৫) অবনীন্দ্রনাথের রেখাচিত্র।

২/গ

লেখক কর্তৃক অঙ্কিত (১৯৪০) লেখকের প্রথম চিত্র-শিক্ষক এবং ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট স্কুলের তদানীন্তন অধ্যক্ষ ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের রেখাচিত্র।

৩/ঘ

কলকাতার সরকারী চারুকলা বিদ্যালয়ে শ্রী অতুল বসু অধ্যক্ষ থাকাকালীন (১৯৪২) বিদায়ী অধ্যক্ষ পার্সি ব্রাউনকে প্রদত্ত সম্বর্ধনার আলোকচিত্র—শ্রী হরিধন দত্ত কর্তৃক গৃহীত।

৪/ঙ

রমঁ্যা রলঁ্যা —১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ভিয়েনায় গৃহীত আলোকচিত্র।

৪/চ

পিটার বোয়কি-র আলোকচিত্র (১৯৩৬)।

৫/ছ

ভার্জিন মেরী ও শিশুখৃষ্ট —ভাস্কর বুর্দেলের অন্যতম মহান্ রচনা প্রায় ২৪ ফুট উচ্চ প্রস্তরমূর্তি।

৬/জ

বুর্দেলের আত্মকৃত মুখাকৃতি (প্ল্যাস্টার) ; পারীর 'ম্যুজে. বুর্দেল'-এ সংরক্ষিত।

৬/ঝ

পারীতে লেখকের প্রথম ভাস্কর-শিক্ষক প্রফেসর রবেয়ার্ ভেল্‌রিক্-এর স্মারক (রৌপ্য ও ব্রোঞ্জ) পদকে ভেল্‌রিকের উৎকীর্ণ মুখাবয়ব।

৭/ঞ

নগ্না —রবেয়ার্ ভেল্‌রিক্-কৃত ব্রোঞ্জ মূর্তি ; পারীর 'ম্যুজে. দা-র মদার্ন'-এ সংরক্ষিত।

৮/ট

বুর্দেল-কৃত রোদ্যাঁর আবক্ষ ব্রোঞ্জ মূর্তি ; পারীর 'ম্যুজে. বুর্দেল'-এ সংরক্ষিত।

৯/ঠ

চুম্বন —রোদ্যাঁর বিশ্বনন্দিত একটি ভাস্কর্য মর্মর প্রস্তরে রূপায়িত , পারীর 'ম্যুজে. রোদ্যাঁ'য় সংরক্ষিত।

১০/ড

পারীতে লেখকের তক্ষণ-শিক্ষক সস্ত্রীক প্রফেসর জিওভানেল্লি —লেখক কর্তৃক গৃহীত (১৯৩৮) আলোকচিত্র।

১১/ঢ

দক্ষিণ ফ্রান্সে আপন আতলিয়েতে কর্মরত শিল্পী মাইয়ল।

১২/ণ

হুদোঁ-কৃত ভল্‌তেয়ারের মর্মরমূর্তি ; দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান বাহিনী কর্তৃক অধিকৃত পারীতে এই মূর্তিটি নাৎসীদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়।

১৩/ত

লা দাঁস —কারপো-কৃত পারীর অপেরা ভবনের অলঙ্করণ।

১৪/থ

প্রমোদ সেনগুপ্ত —পারীর লুক্‌সাম্‌বু-র উদ্যানে লেখক কর্তৃক গৃহীত (১৯৩৮) আলোকচিত্র।

১৫/দ

মাতৃস্নেহ নৃত্যে স্প্যানিশ রেফিউজি পাকিতা —রেফিউজি ক্যাম্প প্যাভিয়ঁ ব্লো-তে লেখক কর্তৃক গৃহীত (১৯৩৯) আলোকচিত্র।

১৬/ধ

মার্থের প্রেমিক গ্যাব্রিয়েলের স্মারক, প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের মুখাবয়ব ; পারীর লুভ্‌র মিউজিয়ামে গ্রীক গ্যালারীতে সংরক্ষিত।

তাঁদেরই বইটি উৎসর্গ করলাম
যাঁদের সান্নিধ্য-সৌভাগ্যে জমা হয়েছে
'স্মৃতিচিহ্নিত'-র সঞ্চয়

ক

৭।

৮।

১৬

জ

ঝ

ট

চুম্বন

ড

VOLTAIRE

ত

থ

দ

ধ
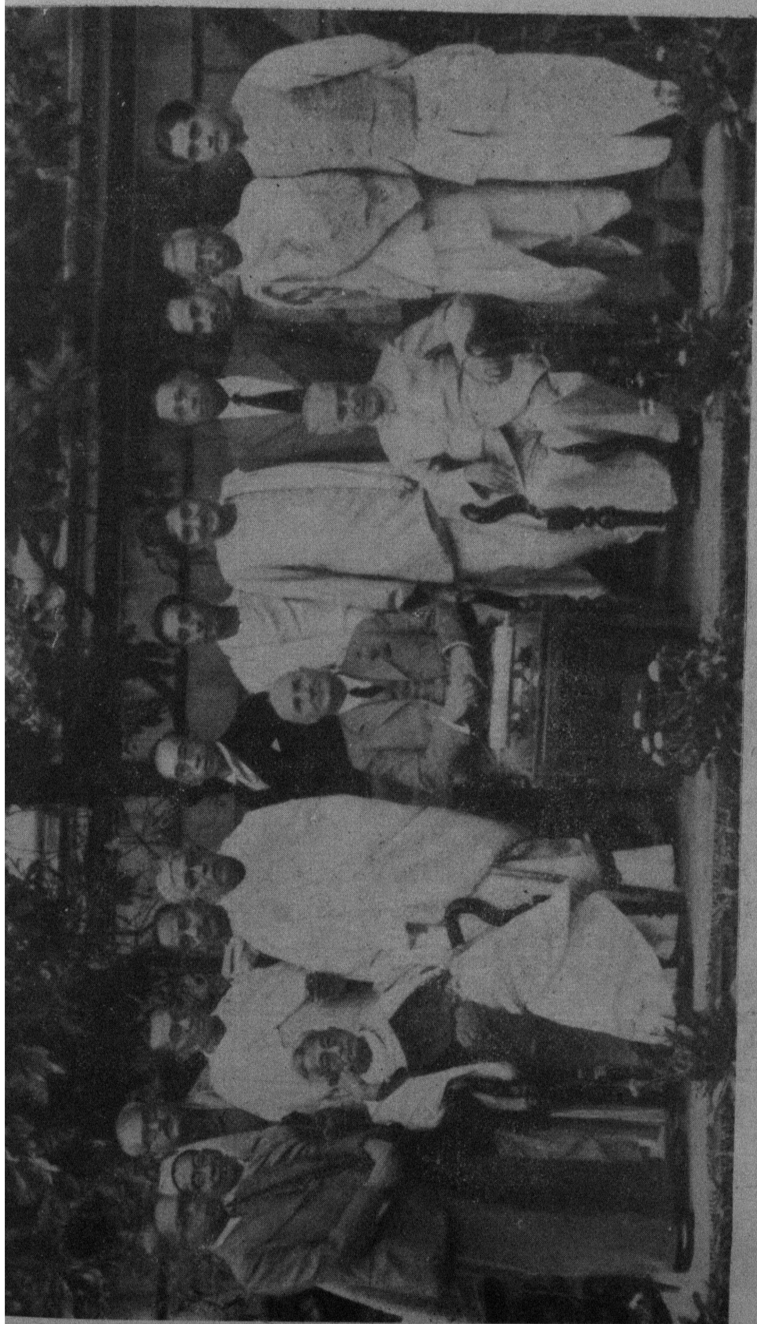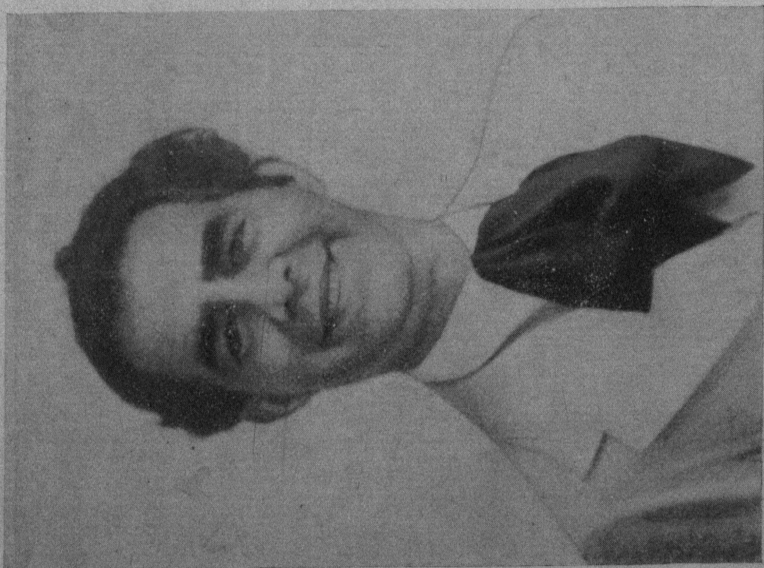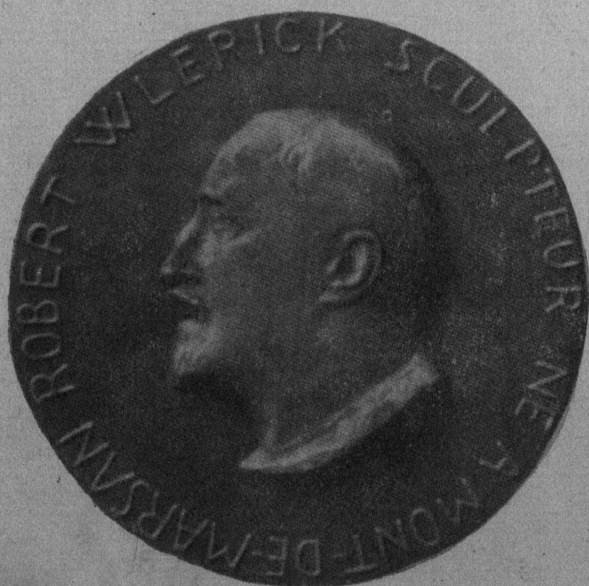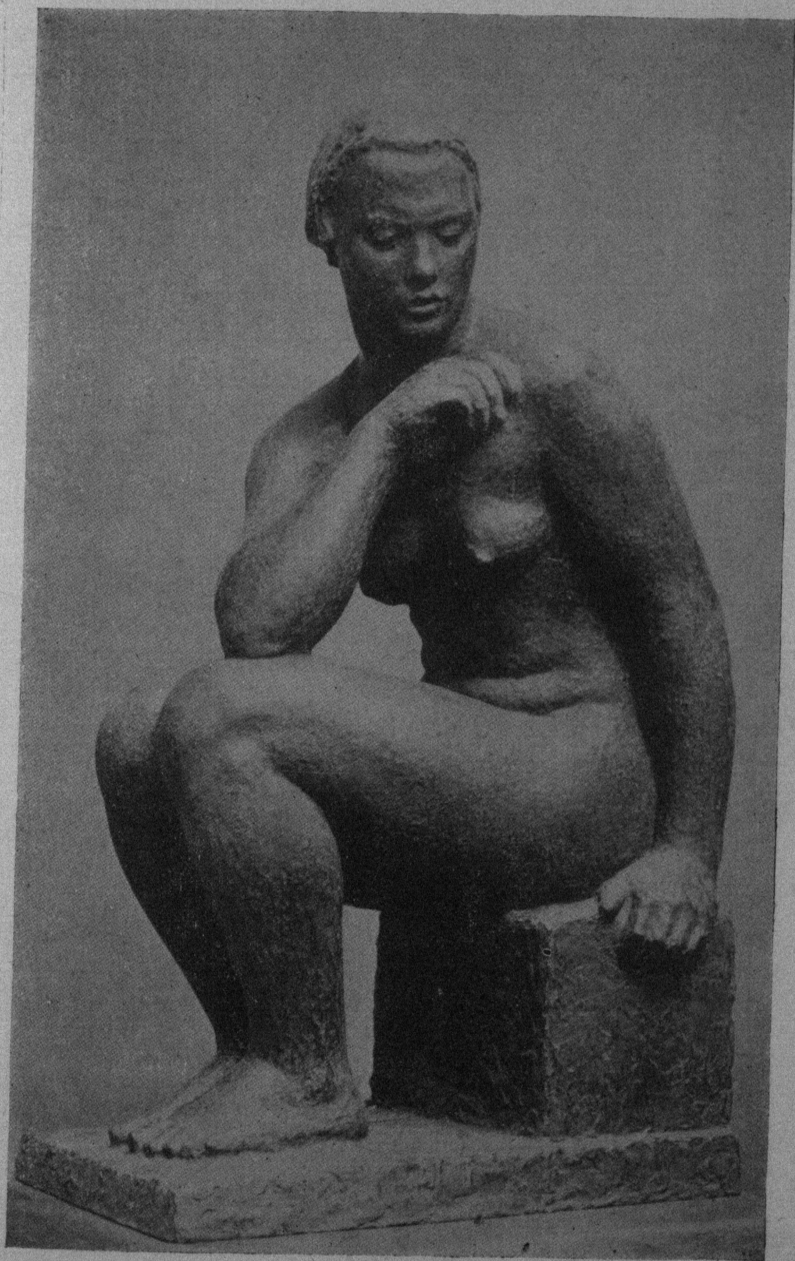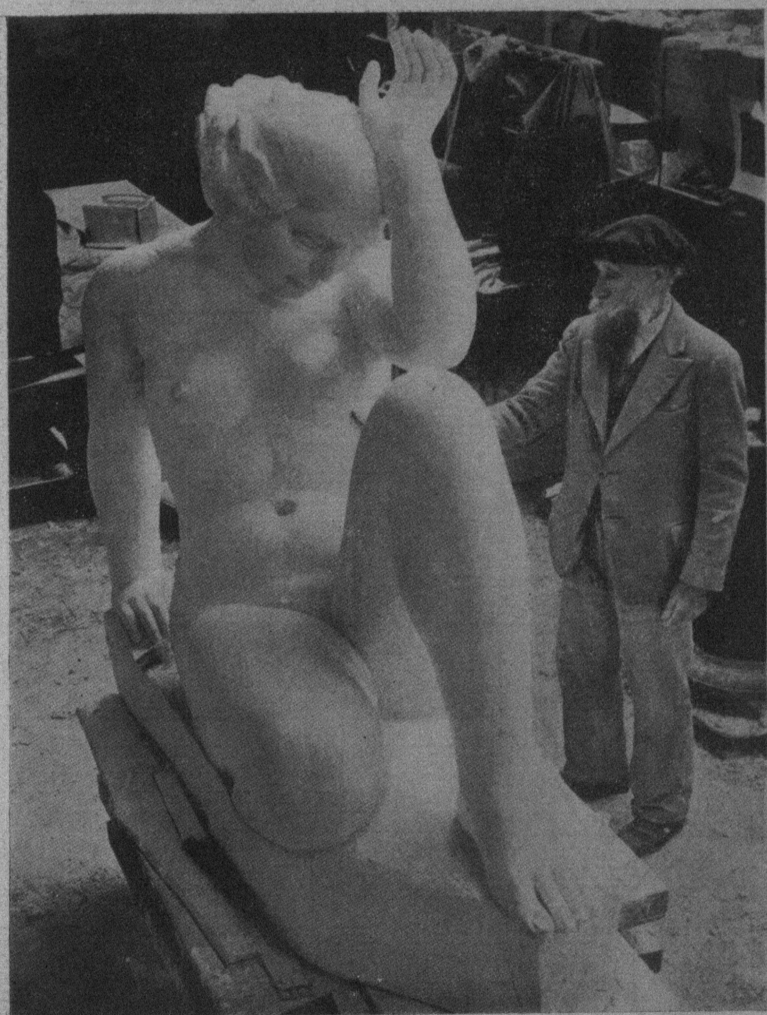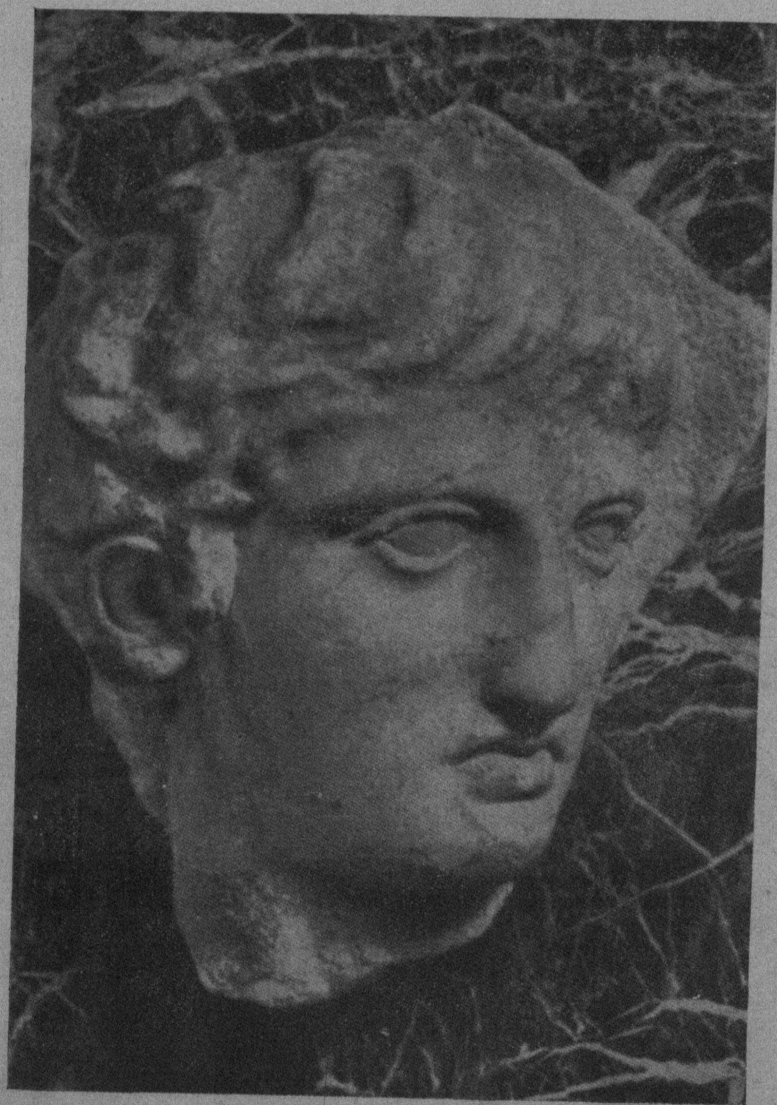
স্মৃতিচিহ্নিত

আমাদের বাড়ির সীমানা ঘেঁসে ছিল বেশ বিস্তৃত একটি বাঁশবন। তখনও শহরের ক্রমবিস্তার এ অঞ্চলের গ্রাম্য পরিবেশকে গ্রাস করে স্লাম-এ পরিণত করেনি। এই বাঁশবনটিকে রঙ্গমঞ্চ করে আমার শিশুমন কল্পনায় কত রোমাঞ্চকর অভিযানের অভিনয় করেছে।

ঝরাপাতার তামাটে সোনালী আবরণকে ভেদ করে উঁকি দিত কচি বাঁশের অঙ্কুরগুলি। হাল্‌কা তাজা সবুজ রঙের এই নরম নধর ফলাগুলি আঙুল দিয়ে প্রত্যহ মেপে তাদের দৈনিক বর্ধনের পরিমাপকে ধরবার চেষ্টা করতাম। কত রূপকথার রহস্য যেন লুকানো ছিল এই নির্জন বনের গভীরে। অন্যের চোখে এর বিস্তার চারিদিকে উন্মুক্ত হলেও আমি দেখতাম এরই মধ্যে লৌহপ্রাকারে ঘেরা রাজপুরী যার বিরাট সিংহদ্বারে পাহারা দিচ্ছে অতিকায় এক দৈত্য। সে নিস্তব্ধতার রূপ নিয়ে নিষ্পলক চোখে চেয়ে আছে দিবারাত্র। তার ভয়ে প্রজাপতি, ফড়িং আর গিরগিটিরাও তাদের ক্ষিপ্র ও সন্ত্রস্ত গতিবিধিতে আওয়াজ চেপে চলছে। ঝিল্লীরাও তাদের একটানা সুরে ফাঁক ফেলতে সাহস করে না, পাছে এই নিরবচ্ছিন্নতার পরিবেশে যদি কোথাও পড়ে যায় দাঁড়ি।

ঝুলনে মত্ত দোদুল্যমান বুনোলতার ডগাগুলি সামনে ও পাশের কঞ্চির সঙ্গে বেঁধে জাল বুনে দিতাম। আমার ধৈর্য ও অপেক্ষা ইনাম পেত সময়ে পাতায়-ভরা এক মনোরম চাঁদোয়ার। তারই নীচে শুক্‌নো পাতার স্তূপকে গদী বানিয়ে হতো আমার সিংহাসন। ভাবতাম যে, আশপাশের কীটপতঙ্গরা আসলে ছিল মানুষ, কোন এক মায়াবীর যাদু তাদের দিয়েছে এই রূপান্তর। একদিন না একদিন তার চেয়ে জোরালো যাদু শিখে ফেলে এদের ফের মানুষ করে মুক্তি দিয়ে দেবো। তাদের সহচর করে প্রহরী দৈত্যকে লড়াই-এ হারিয়ে দিয়ে করব তাকে বন্দী। সিংহদ্বার ভেঙে ঢুকব ঘুমন্ত পুরীতে ও রাজকন্যার মায়া ঘুম ভাঙিয়ে জানিয়ে দেবো যে আর ভয় নেই। মায়াবীর মায়াজাল উড়িয়ে দিয়ে এনেছি মুক্তি। কখনও শুকায় না এমন ফুলের বরমাল্যে সে রূপসী দেবে আমায় যোগ্য পুরস্কার।

সাপ, শেয়াল আর ভূতের ভয়ে এই বেনুবনের গভীরে আর কেউ যেতে সাহস করত না তাই ধরে নিয়েছিলাম যে আমার কল্পপুরী কায়েমীভাবে এখানে উপদ্রব-হীন ও নিরাপদ। কিন্তু মানুষের সান্নিধ্যে শান্তির মেয়াদ হয়ে যায় সংক্ষেপ। তাই একদিন দেখি অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে কোনো দুর্বৃত্ত আমার রাজতক্তের করেছে অমর্যাদা ও ছিন্নভিন্ন করে দিয়েছে লতায় বোনা সে অমূল্য চন্দ্রাতপ।

রাগ, দুঃখ ও ক্ষোভে খান্‌খান হৃদয়কে একত্রিত করে আবার লতার ছিন্নভিন্ন ডালগুলিকে সাজিয়ে দিলাম। ভাবলাম কালে আবার ফিরে পাব আমার হারানো চন্দ্রাতপ। কিন্তু এই দুষ্ক্রিয়ার পাষণ্ড যেন আমার প্রচেষ্টাকে বরাবরের জন্য নষ্ট করতে সকলের অলক্ষ্যে পরদিন লাগিয়ে দিলো শুক্‌নো পাতার স্তূপে আগুন। মুহূর্তে বনের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত লেলিহান আগুনের শিখায় পরিব্যাপ্ত হয়ে গেলো। সমবেত জনমণ্ডলী নিরুপায় ও সামর্থ্যহীনভাবে লক্‌লকে অগ্নিতরঙ্গের এই তাণ্ডবনৃত্য দাঁড়িয়ে কেবল দেখতে লাগল।

নীচের বঙ্কিমান পাতালতাগুল্ম ভস্মীভূত হতে হতে রসালো কাঁচা বাঁশ তাপে শুকিয়ে শিখাকে তুলতে লাগল আকাশের দিকে। ক্রমে যেন হাজারে হাজারে অতিকায় মশাল সহসা দাউদাউ করে জ্বলে উঠল। যা কিছু গ্রাস করার ছিল তাকে ভক্ষণ করে যখন এই দাবানল নিভে ঠাণ্ডা হলো তখন পড়ে রইল অঙ্গার ও ভস্মেভরা কালো পোড়া মাটির এক গাঠ যার বুকে পুড়ে যাওয়া বাঁশের অবশিষ্ট গোড়াগুলি ধূমায়িত কালো খোঁটার শত শত ঊর্ধ্ববাহু হয়ে যেন এই কলঙ্কের প্রতিবাদে উত্থিত ছিল।

বর্ষার পরে সেই কালো নির্জীব মাটির রঙকে বদলিয়ে এল লতাগুল্ম ও নব অঙ্কুরের আবরণ। এই বনে আবার লেগে গেলো জানোয়ার, পাখী ও পোকার ভিড়। প্রকৃতির এই পুনঃপ্রতিষ্ঠায় যেন হর্ষোৎফুল্ল হয়ে দ্রুত বর্ধমান সুপুষ্ট বাঁশ গাছগুলি মাথা তুলিয়ে সাদর আহ্বান জানাতে লাগল। সময় ও প্রকৃতি যোগাযোগ করে সবুজের একটা মোটা আবরণ টেনে মানুষের দুষ্ক্রিয়ার চিহ্নকে প্রায় অবলুপ্ত করে দিলো। কিন্তু মনে ছেপে যাওয়া অঙ্গারে-ভরা সে দগ্ধবনকে শত রঙের প্রলেপ চাপা দিতে গেলেও অতীতে ভস্মীভূত লতাগুল্ম ও গাছের কয়লা কঙ্কালগুলি সে লেপনকে দলিত করে স্মৃতির পর্দায় সুস্পষ্ট করে দিত কতবার এক দুষ্কৃতির কালিমাকে। মানব ইতিহাসের পাতায় এমনি জমা হয়ে আছে নশ্বর সবুজের আস্তরণের নীচে গুমরানো অঙ্গারের পুঞ্জীভূত কত স্তর।

* * *

ঘটনাকে স্মৃতিতে ধরে রাখবার মতো আমার বয়েস হতেই প্রথম মহাযুদ্ধ প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। কিন্তু এখনও আবছা মনে ভেসে ওঠে বাড়ির সামনের বড় রাস্তায় নতুন সেনাবাহিনীর কুচকাওয়াজ—ছন্দের পদক্ষেপ আর তাদের কাঁধে ফেলা বন্দুক ও সঙ্গিনের ওপর ঠিকরে-পড়া রোদ্দুরের চোখ ঝল্‌সানো বিকিরণ।

রেলওয়ের শহর খড়্গপুরের সে দিন থেকে আজ বোধহয় খুব পরিবর্তন হয়নি। কেবল বর্তমানের বিজলী বাতির বদলে তখন জ্বলত জোরালো আর্ক-ল্যাম্প যার আলোতে চারিদিক রাত্রেও প্রায় দিনের মতো দেখাত। আমাদের দেশের সাধারণ বিশ্বাসে প্রত্যেক মানুষ জন্মায় একটা পূর্ব নির্ধারিত সংস্কার নিয়ে। সে হিসাবে বোধহয় আমি ভ্রমণের একটা সংস্কার নিয়ে ভূমিষ্ঠ হয়েছি অথবা সে সময়ের গ্রহের চক্রে ফ্লাইংড্যাচম্যান-এর মতো আমাকে প্রচুর ঘুরে বেড়াতে হবে। দু'এক পা হাঁটবার শক্তি পেয়েই রাস্তায় বেরিয়ে-পড়া স্বভাব হওয়ায় আমাকে বন্দী রাখা হতো ডালা ভাঙা একটা কাঠের বাক্সের মধ্যে। সেটিকে ডিঙিয়ে বেরিয়ে পড়বার কৌশল আয়ত্ত করেও কোনো লাভ হয়নি কারণ বয়স্করা আমার ফন্দি ধরে ফেলে দরজার কড়ার সঙ্গে কোমরে দড়ি বেঁধে বাইরে যাবার মতলবকে শেষ করে দিলেন। কিন্তু যার প্রতি গ্রহের দৃষ্টি পড়েছে তাকে কি দড়ি বেঁধে নিশ্চল করে দেওয়া যায়! তাই একদিন হুডিনির মতো কৌশলে বন্ধনমুক্ত হয়ে সকলের অলক্ষ্যে 'হাঁটি পা পা' করে রাস্তায় নেমে সোজা অসীমের দিকে পাড়ি দিলাম। পথে কত অজানার সাক্ষাতে নিশ্চয়ই আনন্দে আত্মহারা হয়েছিল বেপরোয়া শিশুমন। যে রাস্তার মনে করেছিলাম শেষ নেই তা চলতে চলতে হঠাৎ রুদ্ধ হলো বিরাট এক গেটের সামনে। প্রবেশদ্বারের পাশের সাদা দেওয়ালের গায়ে লাগানো ছিল আধাউঁচু বিরাট এক হনুমান মূর্তি। প্রচুর তেল সিন্দুরের প্রলেপে উজ্জ্বল সেটি আমার চোখে লেগেছিল যেন প্রকাণ্ড একটা ললিপপ মিষ্টান্ন। প্রলুব্ধ মন চাচ্ছিল নাগাল পাওয়া এই বিরাট মিঠাই-এর খানিকটা কামড়ে খেয়ে ফেলি। কিন্তু সে অভিলাষ পূর্ণ করবার আগেই এক পুলিশ আমায় দেখে নানা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা আরম্ভ করে দিলো। প্রশ্ন বুঝবার বা জবাব দেবার মতো বয়েস তখনও হয়নি কাজেই নির্বাক দেখে আমায় সে গেটের মধ্যে পাঁচিল-ঘেরা ময়দানে এক বাংলোয় নিয়ে গেলো। সেখানে ইউনিফরম-পরা আর একজন ব্যক্তি, পুলিশের কাছে সব ব্যাপার শুনে সামনের প্রাঙ্গণে খেলায় রত বড় একটি ছেলে ও মেয়ের কাছে আমায় পৌঁছে দিলেন। আমার মনে হলো যে, বাড়ি পৌঁছে গেছি এবং এরা আমার দিদি ও দাদা। আসলে আমি পৌঁছেছিলাম থানায় এবং এরা ছিল দারোগার ছেলে ও মেয়ে। হারানো আমাকে বাড়িতে রাস্তায় কোথাও না পেয়ে খুঁজে হয়রান হয়ে বাড়ির সবাই থানায় এসেছিলেন পুলিশকে খবর দিতে এবং সেখানে দেখেন যে, তাঁদের বাড়ি-পালানো ছেলে খেলায় বেশ জুটে গিয়েছে। অতদূরে ছেলেমানুষ কি করে পৌঁছেছিল সে বিষয়ে তাঁরা প্রশ্ন করে ও ভেবে কোনো হদিস পাননি। ধরে বাড়িতে নিয়ে যাবার সময় আমি না-কি ঘোরতর আপত্তি করেছিলাম, আমার নতুন পাওয়া দাদা ও দিদির কাছ ছাড়ার জন্য।

আমাদের ছোট্ট পরিবারের ভিত্তি স্বরূপ ছিলেন ঠাকুরমা। তাঁর সঙ্গে আমার সবচেয়ে নিকট বন্ধন ছিল। তাঁকে খেলার সব রকমের সঙ্গী করে নিয়েছিলাম, এমন কি সার্কাস দেখে এসে বুকে চড়ে আমি রামমূর্তি সাজলেও তাঁর কোনো

আপত্তি হতো না। মাত্র কয়েক দিনের জ্বরে তিনি হঠাৎ ইহলোক ত্যাগ করলেন। শোকাভিভূত সবাই আমাকে জানালেন যে তিনি স্বর্গে গিয়েছেন। আমি ধরে নিলাম যে তিনি আমার মতো বাড়ি ছেড়ে কোথাও পালিয়েছেন, আবার তাঁকে খোঁজ করে ধরে নিয়ে আসা যাবে। ঠাকুরমার স্মৃতি-ভরা সে বাড়িতে তাঁকে বাদ দিয়ে বাস করা সকলের অসহনীয় হওয়ায় সেখানকার পাট উঠিয়ে আমরা এলাম কসবায়।

তখন কসবা আজকের মতো জনবহুল আবর্জনা-ভরা স্লাম কেন্দ্র ছিল না। প্রচুর বন প্রান্তরের সমাবেশে স্থানে স্থানে গৃহ সমষ্টির পরিবেশে শহরতলীর চেয়ে গ্রামের ভাবই এখানে প্রবল ছিল। কসবায় ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য ছিল কেবল এক পাঠশালা। স্কুলে পড়তে হলে ছাত্রদের যেতে হতো রেল লাইনের ওপারে শহরের এলাকায়। পাঠশালায় যেতে পথে পড়ত আম বা লিচু বাগান, ধানের ক্ষেত, কপি, গাজর ও মূলোর বাগান। রাতের অন্ধকার যে এত সুন্দর হতে পারে এ আমার জানা ছিল না। খড়্গপুরের বাড়িতে রাস্তার আর্ক-ল্যাম্পের আলো নানান পথ দিয়ে ঢুকে অন্ধকারকে জমতে দিত না। সেই ফ্যাকাসে অন্ধকারে সব কিছুরই আদল কিছুটা অস্পষ্ট হলেও বেশ দেখা যেত। এখানে সন্ধ্যের পরই অন্ধকার জমাট বাঁধতে শুরু হতো। আঁধার ক্রমে ঘনীভূত হলে তাকে যেন মুঠোর মধ্যে ধরা যেত এবং কিছু দেখবার চেষ্টা করলে মনে হতো কালো ভেলভেটের মতো হাতে কে যেন চোখকে টিপে বন্ধ করে দিচ্ছে। আবার চাঁদনী রাতে জ্যোৎস্না, আলোর বন্যায় সব কিছুকে রূপালী করে দিত। সেই রজত বন্যার পটভূমিতে রাস্তার ও বাড়ির কেরোসিন বাতিগুলিকে দেখাত যেন কমলা রঙের টিপ বসানো। প্রত্যেক পাড়ায় জোড়া শিবমন্দির, পঞ্চাননতলা, রথতলা ইত্যাদিতে বিশেষ উৎসবে সম্মিলিত হতো সারা এলাকার বাসিন্দারা। আজ সে সব ল্যাণ্ডমার্ক যেমন তেমন ভাবে গড়া বাড়ির নামে তৈরী কুৎসিত ইঁটের স্তূপের হট্টগোলে কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে।

শহরের ক্রম বিস্তারে কলকাতার ঝাঁটানো আবর্জনা এসে একটা পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গ্রাম ও বনপ্রান্তরকে ঢেকে গ্রাস করেছে। এখানে বর্ষার প্রথম অভিজ্ঞতা কখনো ভুলব না। দিন রাত্রির ধরণ বিহীন বৃষ্টি। অসংখ্য ভেকের ঐকতান আর রাস্তাঘাটের জলপ্লাবন আমার কাছে প্রকৃতির এ এক অভিনব পরিচয়। বর্ষায় যে কেবল রাস্তাঘাট ডুবে গেলো তা নয়, বাড়ির উঠানেও জমল এক হাঁটু জল। রাস্তায় মাছ ধরার রকমারি আয়ুধ নিয়ে কতজন ব্যস্ত হয়ে পড়ল। ঘরে সাপ ও বিছের উৎপাত হলো নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার। বর্ষার শেষে জমাজল কোথাও বেরিয়ে যাবার রাস্তা না পেয়ে রোদ্দুরের তাপে যতটুকু শুকোবার শুকোতে লাগল। কিন্তু সেই সঙ্গে দ্রবীভূত আবর্জনাও ঘন হতে লাগল জলের সঙ্গে। ক্রমে নানান রঙের ময়লার জমা স্তর ভাসতে লাগল দূষিত কালো জলের ওপর।

বৈচিত্র্যময় বর্ষার আগমনী যত সুন্দর তার বিদায়ের স্মৃতিকে রেখে গেলো সেই পরিমাণে ভয়াবহ করে। ঘরে ঘরে মড়কের ডাক এল, এল কলেরা ও টাইফায়েড। মৃত্যুর ব্যাপক বিভীষিকাকে জানলাম এই প্রথম !

যদুভট্ট

কসবায় কালোয়াতি গানের আসর, 'কীর্তনের মহাসভা' কথকের কথা আর পূজা-পার্বণে বারোয়ারী যাত্রা সকলের কাছে বিশেষ আকর্ষণের ব্যাপার। ছোটদের এ সব ব্যাপারে বেশী রাত পর্যন্ত উপস্থিত থাকা বয়স্কদের শাসনবিরুদ্ধ ছিল। কিন্তু এ সবের আকর্ষণের কাছে অভিভাবকের তর্জন ও প্রহার নিষ্ফল হয়ে যেত। ভূত প্রেতের ধারণার সঙ্গে শৈশবে সংস্রব না হওয়ায় এবং অন্ধকার রাতকে ভয়ের চেয়ে প্রিয়সঙ্গীর মতো পছন্দ হওয়ায় গানের আসরে আমার নৈশ অভিযানকে কিছুতেই ঠেকানো গেলো না। জোড়া শিবমন্দিরের পুরোহিত ছিলেন সুগায়ক কিন্তু তাঁর গান এক দুরূহ ব্যাপার ছিল। তিনি গাইতেন মন্দিরে কেবল শিব ঠাকুরের আজ্ঞায়! কাজেই শ্রোতাকে হত্যে দিয়ে বসে থাকতে হতো কখন ঠাকুরের সেই ইচ্ছে হবে তার অপেক্ষায়। এক রাতে দশটা পর্যন্ত তাঁর গান শোনার জন্য বসে আছি আর ভাবছি দেবতার ইচ্ছেটা যদি একটু তাড়াতাড়ি হয়! হঠাৎ তিনি বলে উঠলেন, "এই অসময়ে তোমার ভৈরব রাগ শুনবার আজ্ঞা কেন ঠাকুর, কানাড়া কি মালকোষ হলে ভালো হতো না?" ঠাকুর কি জবাব দিলেন জানি না তবে তিনি যে নিজ জিদ ছাড়েননি তার প্রমাণে ভৈরব রাগের নাদ মন্দিরের দেওয়াল কাঁপাতে লাগল। পুরুত ঠাকুরের সংগীতের সম্পর্ক বিখ্যাত যদুভট্টের ঘরোয়ানার সঙ্গে। তাঁর কাছে একদিন শুনলাম যদুভট্টের জীবনী। ভট্ট মহাশয়ের বাস্তব জীবনের সঙ্গে এ কাহিনীর কতখানি মিল আছে জানি না; কিন্তু গভীর রাতের নিঃস্তব্ধ অন্ধকারে মন্দিরের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত কক্ষের স্বল্প পরিসরের বাইরে তিনি মনকে টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন এক অজ্ঞাত জগতে যেখানে পৌঁছালে সেটা বাস্তব কি অবাস্তব এ প্রশ্ন অর্থহীন হয়ে যায়।

যদুভট্টের পিতা না-কি ছিলেন বিষ্ণুপুরের রাজার সভাগায়ক। কিন্তু অকালে তাঁর মৃত্যু হওয়ায় যদুভট্টের পিতৃব্য তাঁর পদে নিযুক্ত হন। বালক যদুর বিশেষ আকাঙ্ক্ষা যে সংগীত শিক্ষা পেয়ে, পিতা ও পিতৃব্যের মতো দক্ষ না হলেও অন্তত পিতৃব্য পুত্রদের মতো গাইয়ে সে হতে পারবে। কিন্তু পিতার মৃত্যুর পর থেকে তাকে যুক্ত পরিবারের গোশালার কাজে দিন কাটাতে হতো। আর তার মাকে জীবন চালাতে হয়েছিল সে সংসারে রন্ধনশালার পরিচারিকা হয়ে। যদু যখনই জিজ্ঞাসা করত পিতৃব্য পুত্রদের সঙ্গে সে সংগীত অভ্যাস করতে পারে কি-না, জবাব

আসত যে, তার মতো মূর্খের এ প্রশ্ন করাই অর্বাচীনতা, কারণ তার মগজে সংগীতকে ধরবার মতো বুদ্ধি ভগবান দিতে ভুলে গিয়েছিলেন। কাজেই কি হবে এই বৃথা চেষ্টায়। যাতে যদুর চঞ্চল মনকে আষ্টেপৃষ্টে সংসারের দৈনন্দিন কাজে বেঁধে দেওয়া যায়, তার জন্য কৈশোরেই তাঁর বিবাহ দেওয়া হলো। সংগীত শেখার তীব্র অনুসন্ধিৎসায় গুম্‌রে-ওঠা যদুর মন হলো আরও বিক্ষুব্ধ। দৃঢ় পণ করে একদিন রাত্রে তিনি বিষ্ণুপুর ত্যাগ করে চললেন গোয়ালিয়রের অভিমুখে। ভারতে সংগীত-চর্চার পীঠস্থান তখন গোয়ালিয়র এবং সে যুগে ভারতে সর্বত্র আতিথেয়তা প্রথার কল্যাণে কিশোর যদু কয়েক মাস পরে নির্বিঘ্নে সেখানে উপস্থিত হলেন। খোঁজ করে জানলেন যে, সেখানের সেরা ওস্তাদের সাকরেদ হতে গেলে চাই গণ্যমান্য সংগীতবিদ্‌দের সুপারিশ, না হলে তাঁর বাড়ির সীমানা পর্যন্ত পা দেবার কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তিনি এত সহজে নিরস্ত হওয়ার পাত্র ছিলেন না। খোঁজ করে জানলেন ওস্তাদের প্রিয়তমা প্রণয়িনীর বাড়ির কাছে দাঁড়ালে মাঝে মাঝে তাঁর দর্শন পাওয়া যায় এই পর্যন্ত। যদুভট্ট সোজা গেলেন ওস্তাদের পিয়ারীর বাড়ি এবং তাকে মাতৃ সম্বোধনে আনম্র অভিবাদনান্তে এক নিশ্বাসে বললেন তাঁর জীবন কাহিনী এবং জানালেন যে সংগীত শেখবার যে দৃঢ়পণ তিনি করেছেন, তা সফল না হলে আত্মহত্যা করবেন। কিশোর যদুর প্রতি মহিলার মায়া পড়ে গেলো এবং তিনি তাঁকে নিজ গৃহে সন্তানবৎ স্নেহে স্থান দিলেন। অভ্যাস মতো সন্ধ্যায় ওস্তাদ তাঁর প্রিয়তমার গৃহে উপস্থিত হলেন। উপযুক্ত আপ্যায়ন করে তাঁকে তিনি বললেন যে, তাঁদের এতদিনের প্রণয়ে ওস্তাদজীর কাছে তিনি কোনোদিন কিছু প্রার্থনা করেননি, আজ তিনি যদি একটা আর্জি করেন মিয়া সাহেব শুনবেন কি? ওস্তাদজী রঙিন শরাবে মসগুল ছিলেন, কাজেই দরাজ মনে আশমান থেকে সব তারা খুলে তাঁর পিয়ারীকে দিতে আপত্তি ছিল না। পিয়ারী বললেন, তাঁর নিজের সন্তান না থাকায় একটি অনাথ বালককে তাঁর পুত্র হিসাবে নিতে চান। ওস্তাদ বললেন, একটা কেন, তিনি তাঁকে দশটা পালিত বালকের মাতা করে দেবার ব্যবস্থা করবেন।

মহিলাটি তখন যদুকে ডেকে ওস্তাদজীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বললেন একেই আমার পুত্র করেছি, এখন তুমি আমার সন্তানের উপযুক্ত সম্মান দিতে চাও তো একে তোমার সাকরেদ করে নিয়ে আমাদের মান রক্ষে করতে পারে এমন ওস্তাদ একে বানাও। ওস্তাদজী রাজী হয়ে যদুকে বললেন, আমার সাকরেদ হতে গেলে তোমাকে কৌপীনধারী, মিতাহারী ও শুদ্ধাচারী থেকে স্বর অভ্যাস করতে হবে অহোরাত্র—এই বলে তিনি তাঁকে দিলেন তানপুরা ও স্বরগ্রাম অভ্যাসের নমুনা। দিন গেলো, মাস গেলো, বছরের পর বছর গেলো, যদুভট্ট স্বরগ্রাম অভ্যাস করেই চলেছেন। এরই মধ্যে কত ছাত্র ওস্তাদের কাছে শিক্ষা সমাপ্ত করে দিকে দিকে খ্যাতি ও প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেলেন। ওস্তাদের কাছে তাঁর প্রেয়সীর মারফৎ

অনুযোগ করলেই তিনি বলতেন, যদুকে মার্গ সংগীত দেবার সময় এখনও আসেনি। এমনিভাবে সাত বছর কাটলে যদুভট্টের ধৈর্যের বাঁধ ভাঙলো তিনি তাঁর পাতানো মায়ের কাছে জানালেন যে, ওস্তাদজী এত বছর তাঁকে স্বরগ্রাম অভ্যাসের ছলনায় সংগীত শিক্ষা দেবার একটা ভান করছেন, আসলে তাঁকে উপযুক্ত সাকরেদ করবার তাঁর কোনো স্পৃহাই নেই, না হলে অন্য ছাত্রদের মতো তাঁকে এতদিনে সংগীতে পারদর্শী করে দেওয়া হয়নি কেন ?

ওস্তাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ হলে তাঁর পিয়ারী পুত্রের অনুযোগকে তীব্র ভাষায় জানিয়ে বললেন যে, ওস্তাদজী ভালোবাসার নামে তাঁকে প্রতারণা করেছেন। তাঁর একমাত্র পুত্রকে উপযুক্ত শিষ্যত্ব দেবার প্রতিশ্রুতি রাখেননি। মর্মাহত ওস্তাদজী বললেন, মেরীজান, তোমার এই নিষ্ঠুর ভৎসনায় আমার প্রতি অন্যায় করলে। আমি যে প্রতারক নই, ও আমি যে প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছি তার প্রমাণ শীঘ্রই দিতে চাই। তিনি আমন্ত্রণ পাঠালেন সব সাকরেদদের তাঁর গৃহে সমবেত হতে।

এক রাতে ওস্তাদজীর আস্তানায় তাদের অধিবেশন বসল। সকলেই জানতে উৎসুক কেন ওস্তাদজীর এই আহ্বান। ওস্তাদ তাঁর পিয়ারী ও যদুকে নিয়ে ছাত্রমণ্ডলীতে উপস্থিত হয়ে বললেন, সংগীতের আরাধনায় লব্ধ আমার যা কিছু জ্ঞান ও বিদ্যা আমি তোমাদের সকলকে যথাসাধ্য দিয়েছি। আজ আমার অভিলাষ এই, তার কতখানি তোমরা কে কেমন, গ্রহণ করতে পেরেছ, তার একটু পরখ করি। এরপর তিনি গলা থেকে এক অদ্ভুত স্বর বের করে বললেন, বলোতো তোমাদের কেউ এর ওজন কত ? সবাই মুখ চাওয়াচায়ি করে বিস্মিত হলো— স্বরের আবার ওজন কি ! তাদের কেউ জবাব না দিতে পারায়, ওস্তাদজী যদুকে বললেন এই প্রশ্নের উত্তর দিতে। দীর্ঘ সাত বছরের স্বর সাধনায় যদুভট্ট স্বরের প্রত্যেক কণাটিকে বিশ্লেষ করে গাইবার ও শোনবার ক্ষমতা অর্জন করেছিলেন। ওস্তাদজীর স্বর কোন দুটি শ্রুতির মাঝখানের এক অতি শ্রুতির মান প্রকাশ করেছে সেইটেই হচ্ছে তার ওজন —তিনি বললেন। অন্যেরা মাথা হেঁট করল। ক্ষুব্ধ স্বরে ওস্তাদজী তাঁর পিয়ারী ও যদুকে বললেন, বেটা তুমি এখনও কি মনে কর তোমায় কিছু শেখানো হয়নি ? সেই রাত্রে তিনি যদুকে দিলেন প্রথম পূর্ণ রাগ গাইবার অধিকার এবং গাইলেন 'দরবারী তোড়ী'।

প্রত্যূষে যদুভট্ট মহানন্দে গাইছেন সেই সুর ও গীত। সাত বছরের সাধনায় মার্জিত ও বিশুদ্ধ কণ্ঠস্বরে ধ্বনিত সে সংগীত আকৃষ্ট করেছিল পথচারীদের। তাদের ভিড় লেগে গেলো ওস্তাদজীর আস্তানার চারিদিকে। সংগীতে আকৃষ্ট ওস্তাদজীর কানেও এই অদ্ভুত কণ্ঠস্বর বাজাচ্ছিল কোন এক পূর্ব-অশ্রুত মহান্ গীত। তিনি নিজেও এত কৃচ্ছ সাধনায় সংগীত বিদ্যা আয়ত্ত করেননি। উত্তেজিত হয়ে তিনি ভিড় কাটিয়ে যদুর সামনে উপস্থিত হয়ে রূঢ় ভাষায় তাকে বললেন চুপ করতে ও গোয়ালিয়র অবিলম্বে পরিত্যাগ করতে।

যদুভট্ট ওস্তাদের এই সহসা রুদ্রভাবের কারণ ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি। মিয়া সাহেবের চিৎকার শুনে তাঁর পিয়ারী বেরিয়ে এসে এত রোষের কি হেতু জিজ্ঞাসা করলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে জবাব পেলেন যে তিনি ও তাঁর আদরের পালিত পুত্র ওস্তাদের প্রতিষ্ঠা ও ইজ্জতকে জাহান্নামে পাঠাবার বেশ উত্তম ব্যবস্থা করেছেন। যদু যদি গোয়ালিয়রে আর কয়েকদিন অপেক্ষা করে তা হলে জনমুখে তার সংগীত দক্ষতার স্তুতিবাদ চারিদিকে প্রচণ্ডভাবে ছড়িয়ে যাবার সম্ভাবনা এবং তারপর ওস্তাদের মান ও নাম বাঁচানো শক্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়াবে। অতএব যদুকে এখুনি গোয়ালিয়র ছেড়ে চলে যেতে হবে —দূরে —বহুদূরে। বহু অনুনয় বিনয়ে পিয়ারী ওস্তাদকে রাজী করালেন যে, সে রাতটুকু থেকে যদুভট্ট পরদিন প্রত্যুষে গোয়ালিয়র পরিত্যাগ করবেন। এত কঠোর পরিশ্রমের পর কেবল একটি গীতকে পুঁজি করে চলে যেতে হবে এ চিন্তা যদুকে বিভ্রান্ত করে তুলল। তিনি ন্যায় অন্যায় বোধকে ঘুম পাড়িয়ে ওস্তাদের গৃহে সংগৃহীত সংগীতের যা কিছু পুথিপাঠা ছিল সেগুলি ঝুলিতে ভরে নিয়ে তানপুরাটি কাঁধে ফেলে গভীর রাত্রে সকলের অলক্ষ্যে গোয়ালিয়র পরিত্যাগ করলেন।

এখন তাঁর গন্তব্য স্থান হলো স্বদেশ —বিষ্ণুপুর এবং সেই পথ চলতে তিনি অতিক্রম করে চলেছেন বহু বন, প্রান্তর, নদী, গ্রাম ও শহর। এমনিভাবে যেতে যেতে একদিন সন্ধ্যায় তিনি পৌছালেন বনানীর অঞ্চলগত সবুজের আড়ালে ঢাকা এক সন্ন্যাসীর আশ্রমে। সেখানে রাতটুকু কাটাবার প্রার্থনা করায় সাধুজী তাঁকে স্বাগত জানিয়ে কুটিরে রাত্রিবাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। ভট্ট মহাশয়ের নজরে পড়ল দেওয়ালে টাঙানো একটি তানপুরার প্রতি। ভাবলেন, একাকী বনবাসী সন্ন্যাসী তানপুরার সহযোগে কি ধরনের গান গাইতে সক্ষম! আহারান্তে তাঁকে যদুভট্ট বললেন, দেওয়ালে তানপুরা সযত্নে টাঙানো দেখে মনে হচ্ছে সাধুজীর গান-টানের চর্চা আছে এখন একটু কৃপা হতে পারে কি? তিনি হেসে বললেন, ভেইয়া গান তো গাই না একটু ভজন করে থাকি। আর যাঁর নাম ভজন করি তাঁর কানে আমার কণ্ঠস্বরকে একটু রঙদার করে তুলবার জন্যে তানপুরার তারগুলিতে একটু টুং-টাং লাগাই। কিন্তু আপনি যখন তানপুরাকে বহন করে এত দেশ ঘুরে এসেছেন এবং যাবেন বহুদূর তাতে প্রমাণ হচ্ছে যে এক বিখ্যাত গায়কের পদধূলি এ দীনের আশ্রমে পড়েছে। আমার মতো উদাসীন সন্ন্যাসীর এমন সৌভাগ্য তো সহজে হয় না তাই অনুরোধ করছি আপনার একটু সংগীত সেবা হোক। যদুভট্ট ভাবলেন, এই সাধুর উচ্চাঙ্গ সংগীত সম্বন্ধে হয়ত কোনো জ্ঞান বা অভিজ্ঞতা নেই তবুও আতিথেয়তার প্রতিদানে অন্তত সুকণ্ঠ ধ্বনি দিয়ে একে একটু তাক লাগিয়ে দেওয়া যাক। তিনি শুরু করে দিলেন ওস্তাদজী-দত্ত দরবারী তোড়ী।

সংগীত শেষ হলে সাধুজী খুব তারিফ করে বললেন, সাবাস আপনার সমকক্ষ গায়ক যে ভারতের কোথাও নেই এ কথা আমি হলফ করে বলতে পারি। প্রশংসায়

প্রীত যদুভট্ট বললেন, সাধুজী আপনার এইবার একটু ভজন হোক। তিনি জানালেন যে, তাঁর গানের সময় নিয়মে বাঁধা। অষ্টপ্রহরে একবার মাত্র সূর্যোদয়ের পূর্বে শুরু হয় তাঁর ভজন। প্রত্যুষে ঘুম ভাঙলেই তিনি শুনতে পাবেন তাঁর গীত।

তখন রাত্রির চতুর্থ প্রহর প্রায় শেষ। কোন এক অপূর্ব অমৃতময় সুরধারা যদুভট্টের ঘুম ভাঙিয়ে সুপ্ত কানকে জাগ্রত করে দিলো। কৃচ্ছ্র সাধনায় অর্জিত আপন কণ্ঠস্বরকে যদুভট্ট ভেবেছিলেন স্বরপ্রকাশে অদ্বিতীয়, এখন সন্ন্যাসীর বিশুদ্ধ উদাত্ত স্বর শুনে তাঁর মনে হলো যে, তাঁর গলায় জমে আছে বহু খাদ ও আবর্জনা। বাইরে বেরিয়ে দেখলেন যে সাধুজী বীরাসনে বসে তানপুরা ধরে গাইছেন রাগ ভৈরব। ভোরের আলোয় কালো বনের ওপরে ফিকে বেগুনী রঙের আকাশের এক প্রান্তে রক্তিম আভা সূর্য উঠবার আগমনী জানাচ্ছিল। তন্ত্রীর ঝংকারে সম্মিলিত কণ্ঠের কল্লোলিত সুর আশপাশের ঘুমিয়ে থাকা গাছপালাদের যেন স্নেহময় হাতের স্পর্শে জাগিয়ে দিচ্ছিল। শিশিরে ভেজা পাতাগুলি নড়ে যেন উন্মীলিত হচ্ছিল প্রকৃতি দেবীর শতচক্ষু। বনানীর ফাঁকে দিগন্তের সীমাশেষে দেখা গেলো জ্বলন্ত ধাতবচক্রের মতো রাঙা উদিত সূর্যের অগ্নিময় একফালি। সেটি ধীরে ধীরে ওপরে উঠতে লাগল চারিদিক লাল ফাগুয়ার রশ্মিতে রাঙিয়ে। পূর্ণোদিত সূর্যের রক্তিম পিণ্ড যেন সাধুজীর সুরে আকৃষ্ট হয়ে এগিয়ে আসতে শুরু করল কুটিরের দিকে এবং তার পরিধি ক্রমে হতে লাগল বৃহৎ থেকে বৃহত্তর। শেষে যদুভট্টের সামনে থেকে আর সব রঙ ও রেখা বিলুপ্ত হয়ে গেলো এবং এল সর্বব্যাপী আগুন-রাঙা রক্তিমার একাকার। তিনি যেন দেখতে পেলেন সেই জ্যোতির্ময় উদিত সূর্যের চক্র থেকে বেরিয়ে এলেন নন্দীর বাহনে প্রসন্ন বদন শিব ও পার্বতী। তাঁদের দু'জনের হাত থেকে স্বর্গীয় আশীর্বাদ যেন ঝর্ণা হয়ে সাধুজীর সর্বাঙ্গকে সিঞ্চিত করতে লাগল।

হঠাৎ বিরাট এক নাড়া খাওয়ায় যদুভট্টের সামনে থেকে স্বপ্নের মতো সব উবে গিয়ে ফিরে এল আর এক বাস্তব দৃশ্য। তিনি দেখলেন, অস্তগামী সবিতার লাল আভা কিছুটা তাম্রাভ হয়ে দিগন্তে আঁধারের শত বাহু বিস্তারে লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। সাধুজী বললেন, ভেইয়া সকাল থেকে বেহুঁস বসে আছ ডাকলে সাড়া দাও না, ব্যাপার কি? ভাবলাম বুঝি ধ্যানে বসেছ। কিন্তু সন্ধ্যে হচ্ছে দেখে তোমার সমাধি ভেঙে দিলাম। যদুভট্ট তাঁর পা জড়িয়ে ধরে বললেন, আমার সংগীত পারদর্শিতার যে অহঙ্কার ছিল তাকে ভেঙে সাধুজী আপনি উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছেন। এখন ক্ষমা করে আমায় আপনার শিষ্যত্বের অধিকার দিন। জীবনের বাকিটা আপনার কাছে আপনার শিক্ষায় ও সেবায় কাটিয়ে দেবো। সাধুজী তাঁকে থামিয়ে বললেন, আমার ভজন আর তোমার গান গাওয়ার উদ্দেশ্যটা ভুলে যাচ্ছ ভেইয়া। আমি গাই উমাশঙ্করকে খুশী করতে আর তুমি গাইবে সমাজের সংগীতামোদীদের আনন্দ দিতে। এই হচ্ছে তোমার জীবনাদর্শ ও ব্রত, তাকে

সার্থক করতে তুমি দেশান্তরে গিয়ে কত সাধনা করেছ। তোমার জীবনের আদর্শ ও সংস্কার আমার থেকে ভিন্নতর। এক মুহূর্তের সাময়িক ভাবপ্রবণতায় তাকে তো বরাবরের মতো বদলিয়ে ফেলা যায় না। তাই তোমাকে তোমার যোগ্য পথ ছাড়িয়ে আমার রাস্তায় চলার অনুমতি আমি দিতে পারি না। সমাজে থেকেও তুমি আমার মতোই শঙ্করের সেবা করতে পারবে বহুজনকে তোমার সংগীতে তৃপ্ত করে, কারণ সর্বজীবের অন্তরে তিনি সর্বদা বিরাজমান। লোক সমাজের মধ্যে তুমি যে সংগীত পারদর্শিতা অর্জন করেছ তা অতুলনীয়। ফিরে যাও বন্ধু সমাজে, সংগীতের অমৃতধারা বিতরণ করো জনে জনে। শম্ভু তোমার কল্যাণ করুন। মনক্ষুণ্ণ হলেও যদুভট্ট মেনে নিলেন সাধুজীর আদেশ। আবার তাঁর যাত্রা শুরু হলো বিষ্ণুপুর অভিমুখে।

বিষ্ণুপুরের রাজবাড়িতে দোলপূর্ণিমায় প্রতি বছর আয়োজন হতো এক বিরাট সংগীত সম্মেলনের এবং এই সভায় আহুত হতেন দেশ দেশান্তর থেকে সংগীতের পুরোধাগণ। এই আসরে যিনি সেরা গায়ক প্রতিপন্ন হতেন তাঁকে রাজা দিতেন শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। যদুভট্টের পিতার মৃত্যুর পর প্রতি বছর সেরা গায়কের সম্মান পেতেন তাঁর পিতৃব্য।

যদুভট্ট হিসাব করে বিষ্ণুপুরে হাজির হলেন দোল পূর্ণিমার দিন। আগের মতো আবার আয়োজন হয়েছে সংগীতের এক বিরাট আসরের। প্রচুর লোক সমাগমের মধ্যে উদাসীন সাধুর বেশধারী তাঁকে কেউ চিনল না। নানান স্থান থেকে রাজার দেওয়া সেরা গায়কের সম্মান ও পুরস্কার প্রয়াসী গায়করা উপস্থিত শ্রোতাদের সামনে আপন আপন ঘরোয়ানা ওস্তাদীর ভাণ্ডার উজাড় করে এনে ফেলেছেন বাছাই সংগীতের এক হাট। সকলের মনে এক চিন্তা যে, এ গানের হাটে কোন জহুরী সংগীতের সব চেয়ে মনোহর জহরৎ দেখিয়ে পেয়ে যাবে সেরা ইনাম। প্রতিযোগী সকল গায়কদের কসরৎ দেখানো হয়ে গেলে সর্বশেষ অনুষ্ঠানের আসন নিলেন যদুভট্টের পিতৃব্য। সকলেই জানে যে, আগের বছরগুলির মতো এ বারেও সেরা গায়কের সম্মান ও পুরস্কার তিনিই পেয়ে যাবেন। নিজের কৃতিত্ব ও সাফল্যের নিশ্চিত বিশ্বাসে গর্বিত বিষ্ণুপুরের রাজার সভাগায়ক ধরলেন সুর। আলাপের পর গীতের বিলম্বিত বিস্তারে, স্বরগ্রামের ছন্দে, তানের বৈচিত্র্যে সুরকে রকমারি দৌড়-ঝাঁপ খাইয়ে যখন তিনি তাঁর কসরৎ শেষ করলেন সভায় সমস্বরে ধন্য ধন্য রব উঠল। যাঁরা তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বিতার চেষ্টা করেছিলেন পরাজিত হয়ে অধোবদনে নিজেদের যেন ধিক্কার দিচ্ছিলেন।

এমন সময়ে কার বজ্রনাদ সকলকে স্তম্ভিত করল। কে বলল —কুছ নেহি হুয়া, এ কেবল স্বরের মিথ্যে মেহনৎ, একে সংগীত বলা চলে না। সবাই চেষ্টা করছিল আবিষ্কার করতে কার এত বড় ধৃষ্টতা হয়েছে। যদুভট্ট আবার বললেন, মার্গ সংগীতের নামে এ সভায় হয়েছে কেবল বুজরুকি। উত্তেজিত শ্রোতার দল তাঁর

রূঢ়োক্তির জন্য মারমুখি হয়ে পাগল ভেবে তাঁকে বল প্রয়োগে সভা থেকে বের করে দিতে উদ্যত হলো।

রাজা তাঁর অনুচরদের আজ্ঞা দিলেন, এই অর্বাচীনকে তাঁর সামনে ধরে নিয়ে আসা হোক। যদুভট্টকে উদ্দেশ্য করে তিনি বললেন, সন্ন্যাসী তোমাকে প্রমাণ করে দিতে হবে যে এখানের সেরা সংগীতে কেবল মিথ্যে সুরের মেহনং করা হয়েছে। আমার সভাগায়কের এত বড় অসম্মানকারীকে আমি বিনা বিচারে ও বিনা শাস্তিতে ছেড়ে দিতে রাজী নই। নীরবে যদুভট্ট বীরাসনে তানপুরা হাতে নিতে সভায় হট্টগোল থেমে গেলো। একটা অতি নিকৃষ্ট, বেসুরো ও বেতালা গানের প্রহসন হবে তারই অপেক্ষমান শ্রোতারা হঠাৎ চমকে উঠল তাঁর কণ্ঠস্বরের প্রথম অবদানে। এতক্ষণ সুর যেন একটা পোষা পাখীর মতো গায়কের খেয়াল অনুযায়ী দাঁড়ের ওপরে ও নীচে নাচানাচি করছিল এখন যদুভট্ট তাকে বন্ধনমুক্ত করে উঠিয়ে নিয়ে চলেছেন উর্ধ্বে বহু উর্ধ্বে—সীমাহীন অনন্তে। তাঁর সংগীতের সম্মোহনে শ্রোতাদের দেহ মলয়হিল্লোলে নৃত্যমান পল্লব ও লতার মতো তালে ও ছন্দে দুলছিল। একটা তীব্র সুখময় উত্তেজনার অনুভূতি সংগীত সমাপ্তির সঙ্গে বিচ্ছিন্ন হয়ে সকলের শরীরে আনল অবসাদ আর মনে জাগল তাকে পুনরায় ফিরে পাবার অধীর আকাঙ্ক্ষা। শ্রোতাদের মধুময় সংগীত উপভোগে শ্লথ মন ও দেহ স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসার আগেই অলক্ষ্যে যদুভট্ট আসর পরিত্যাগ করে চলে গেলেন। রাজা তাঁকে শ্রেষ্ঠ গায়কের পুরস্কার দিতে গিয়ে দেখলেন গায়কের আসন শূন্য। একটা অপ্রত্যাশিত ও অস্বাভাবিক এই ঘটনা শুধু গীতামোদি রাজাকে নয় বিষ্ণুপুরের সুরপাগল নাগরিকদেরও বিস্ময় ও জিজ্ঞাসায় অভিভূত করে তুলল।

যদুভট্ট শহরের বাইরে গ্রামাঞ্চলে গিয়ে অনেক বছরের বর্দ্ধিত কেশ, শ্মশ্রু ও গুম্ফের জালকে কাটিয়ে ভব্য হয়ে সন্ন্যাসীর বেশ পরিত্যাগ করে সন্ধ্যায় পৈত্রিক ভবনে উপস্থিত হলেন। আপন পরিচয় দিতে মাতা ও পত্নীর হারানো রত্ন ফিরে পাওয়ার আনন্দোচ্ছ্বাস নিঃশেষ হলে পরে শুরু হলো তাঁর দায়িত্ব, কর্তব্য ও হৃদয়-হীনতার জন্য শত অনুযোগ, অভিযোগ ও ভৎর্সনা। তাঁদের কলরবে আকৃষ্ট পিতৃব্য ও তাঁর স্ত্রী এবং তাঁদের সন্তানগণ এসে যদুভট্টকে আরও তীব্র ভৎর্সনা ও ধিক্কারে অভ্যর্থনা করলেন। পূর্বেকার স্তূপীকৃত অপরাধ ও পাপস্খলনের জন্য যদুভট্টের এখন কি করা উচিত তার বোঝাপড়া করে সকলে ক্লান্ত হওয়ায় সে রাতের মতো তাঁকে রেহাই দেওয়া হলো। পরের দিন সকালে তাঁর পিতৃব্য তাঁকে ডেকে বুঝিয়ে দিলেন যে, সংসারে তাঁর শুধু বসে বসে অন্ন ধ্বংস করা চলবে না। যে কাজগুলি সাধারণত ভৃত্যের জন্য বরাদ্দ থাকে তাঁর ওপর সেগুলি ন্যস্ত করা হলো এবং উপসংহারে পিতৃব্যদেব তাঁর হৃষ্টপুষ্ট শরীরের প্রতি নির্দেশ করে বললেন যে, এমন স্বাস্থ্যবান বলদের পক্ষে এ কাজগুলি কোনো মতেই শ্রমদায়ক হতে পারে না। যদুভট্ট তাঁকে বললেন, এ সব কাজ করতে তাঁর কোনো আপত্তি নেই যদি তাঁকে

অবসরে সংগীতাভ্যাসের সুযোগ দেওয়া হয়। এই প্রস্তাবে পিতৃব্য এক বিশেষ ভ্রূ-ভঙ্গি করে বললেন যে, এমন মূর্খকে গান শিখিয়ে রাগিণীর সৃষ্টি করবার তাঁর কোনো স্পৃহা নেই —বড় হওয়ার সঙ্গে এই সত্যটি বুঝবার মতো যদুভট্টের বুদ্ধি বাড়েনি বলে তাঁর প্রচুর আফসোস হলো।

পিতৃব্য পুত্র গান গাইছিল। সকলের বিশ্বাস যে, সংগীতের পারদর্শিতায় সে শীঘ্রই পিতার উপযুক্ত উত্তরাধিকারী প্রতিপন্ন হবে। তার সান্নিধ্যে যদুভট্টকে দাঁড়িয়ে গান শুনতে দেখে পিতৃব্য অতি রূঢ়ভাবে সে স্থান ত্যাগ করে সংসারের অন্য কাজে রত হতে বললেন। যদুভট্ট বিচলিত না হয়ে বললেন, খুড়ো মশাই পুত্রকে গীত দেবার আগে তার কণ্ঠস্বরকে একটু মেজে-ঘসে সুরস্থ করবার ব্যবস্থা করলে ভালো হতো না-কি ? তাঁর এই স্পর্ধাজনক উক্তিতে ক্ষিপ্ত পিতৃব্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, কোন সাহসে তিনি এমন মন্তব্য করছেন যখন সংগীতশাস্ত্রে তাঁর লেশমাত্র অধিকার হয়নি। তিনি উত্তর দিলেন যে, এত বছরের দেশ পর্যটনে বহু বিখ্যাত ও প্রতিষ্ঠিত গায়কের সান্নিধ্য পেয়েছেন তো বটেই তাঁদের প্রসাদে অল্পবিস্তর সংগীতচর্চা করবারও সুযোগ তিনি পেয়েছিলেন।

ব্যঙ্গ করে খুড়ো মহাশয় বললেন যে, নিশ্চয় তাঁদের উপদেশ অনুযায়ী তিনি কোকিল ভক্ষণ করায় এখন কুহুতান ধরে তানসেনকেও পরাস্ত করে দেবেন। তিনি তাঁকে তাঁর সংগীতবিদ্যার নমুনা দেখাবার জন্য আদেশ দিলেন।

যদুভট্ট তানপুরা নিতে পিতৃব্য অবজ্ঞার সঙ্গে বসলেন, একটা অশ্রাব্য সুর শোনার পীড়নকে সহ্য করবার জন্যে। কিন্তু তানপুরার তন্ত্রীধ্বনিতে প্রথম স্বর সংযোগ তাঁকে যেন কশাঘাতে চমকিত করল। রাজসভায় যে সন্ন্যাসী তাঁকে সংগীতের পারদর্শিতায় অপদস্থ করেছিল সে এবং যদুভট্ট যে অভিন্ন তাতে তাঁর আর কোনো সন্দেহ রইল না। মর্মাহত ও আত্মগ্লানিতে পীড়িত খুড়ো মশাই যদুভট্টের হাত ধরে বললেন, আমার পুত্রের উপযুক্ত অধিকার না দেওয়ায় তুমি আজ সঠিক সাজা দিয়েছ। যে অন্যায় করেছি তাকে তো আর মুছে ফেলা যাবে না। এখন আমার শাস্তির মাত্রাকে পরিপূর্ণ করতে যেটুকু করা উচিত তা সম্পন্ন করে ফেলা যাক। চলো, আমার সঙ্গে রাজদরবারে। যদুভট্ট পিতৃব্যের মান এমনভাবে খর্ব হওয়ায় লজ্জিত হয়ে বললেন, তাঁর জীবনের একমাত্র আকাঙ্ক্ষা ছিল সংগীতের আরাধনা করে পারদর্শিতা লাভ করা। সে অভিলাষ যখন পূর্ণ হয়েছে তখন রাজদরবারের সমাদর তাঁর কাছে মূল্যহীন। কিন্তু তাঁর পিতৃব্য জোর করে তাঁকে নিয়ে গেলেন রাজসমীপে এবং সেখানে সব ঘটনা বিবৃত করে বললেন, মহারাজ আমি আজ পরাজিত বলে একটুও ক্ষুন্ন নই, কারণ রাজদরবারে সেরা গায়কের সম্মান ও প্রতিষ্ঠা আগেরই মতো বজায় রয়ে গেছে ভট্ট পরিবারে। গ্রহণ করুন আজ আপনার নতুন সভাগায়ককে —আমারই অগ্রজের পুত্র সে, ভারতের অদ্বিতীয় সুরবিদ্ ও সুকণ্ঠ যদুভট্ট।

জাতের জালিয়াতী

খড়্গপুরে আমাদের প্রতিবেশী ছিল, মারাঠি, গুজরাটি, মাদ্রাজী প্রভৃতি ভারতের নানা অঞ্চলের বাসিন্দারা কাজেই ছোটবেলায় বাঙালী সমাজের আচারবিচারের সঙ্গে পরিচয় ছিল না। ঠাকুরমাও এ সব সংস্কারের বিরোধী থাকায় নিজেদের বাড়িতেও তার প্রকোপ বাড়তে পারেনি। ভৈইয়া কি বাপুয়ার মা'র বাড়িতে এক বাটি মহিষের দুধ পান করে পথে মাদ্রাজী মাসীর ঘরে তাজা ভাজা আংটি পাঁপড় খেয়ে আর কিছু খাবার মতো ক্ষিদে না থাকার জন্য মৃদু ভৎর্সনা আদরের মতো লাগত। কসবায় একেবারে বিশুদ্ধ বাঙালী সমাজে এসে পড়ায় প্রথম জানলাম ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার ও মানুষের মধ্যে ছোটলোক (!) ভদ্রলোকের জাত হিসেবে শ্রেণীবিভাগ। জাত হিসেব করে ছেলেদের সঙ্গে মেলামেশায় আমার ভুলত্রুটি হতে লাগল প্রত্যহ।

আমাদের নতুন বাড়ির রান্নাঘরের ছাউনী বানাচ্ছিল যে ঘরামী তার ছেলের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেলো। আশপাশের পুকুর ও ডোবার পাড়ে থাকত অসংখ্য শামুক আর গুগ্‌লি। ছেলেটি তারই কয়েকটা আছড়ে ভেঙে ভিতরের মাংসপিণ্ড বের করে একটা শক্ত সুতোয় বেঁধে তার অপর প্রান্ত একটা কাঠিতে লাগিয়ে জলে নামিয়ে দিত। কিছুক্ষণ অপেক্ষার পর দেখতাম স্থির জলের স্বল্প স্বচ্ছ নীচে কাঁকড়ার দশপায়ে সন্তর্পণে সেই পিণ্ডের দিকে অগ্রসর হওয়া। তার সাঁড়াশীর মতো দাঁড়া দিয়ে মাংসপিণ্ড ধরলেই ছেলেটি ধীরে ধীরে সুতো টেনে কাঁকড়াটাকে ডাঙায় এনে ফেলত। তারপর তার পিঠে পা চাপিয়ে দাঁড়া দুটিতে দড়ি বেঁধে করত বন্দী। এ নতুন খেলা শিখে আমিও একদিন অনেকগুলি কাঁকড়া শিকার করে বাড়ি নিয়ে গেলাম। খুব উৎফুল্ল ছিলাম এই ভেবে যে, আমার কেরামতিতে সকলে অবাক হয়ে তারিফ করবে প্রচুর। কিন্তু প্রথমে ধমক খেলাম সেগুলি চুরি করেছি কি-না তার বোঝাপড়ায় এবং যখন জানালাম কার দৃষ্টান্তে কিভাবে কাঁকড়াগুলিকে ধরেছি তখন একেবারে কুরুক্ষেত্রের সংগ্রাম শুরু হয়ে গেলো।

যাকে ছুঁলে জাত যায় সেই ছেলের সঙ্গে মিশে না-কি আমি একেবারে জাহান্নামে গেছি। মাথায় এক বালতি জল ঢেলে প্রথমে আমাকে স্পর্শ করবার মতো শুদ্ধ করে শুরু হলো আমার নষ্ট স্বভাবকে উদ্ধার করবার জন্য প্রহার। কি কারণে ঘরামীপুত্র ছোটলোক এবং কেন তাকে স্পর্শ করলে স্নান করে শুদ্ধ হতে হয় এর যুক্তি চেয়ে পেলাম আরও উত্তমমধ্যম। কিন্তু বেশ একগুঁয়েমী থাকায় দিনের পর দিন একই প্রশ্ন করে চললাম এবং জবাব পেলাম যে, ছোটলোকেরা নোংরা বলে তাদের সঙ্গে মেশা উচিত নয়। কিন্তু ছেলেটি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বলায় উত্তর এল তারা সাধারণত বুদ্ধি বিকারহীন মূর্খ হয়ে থাকে। পাঠশালায় পণ্ডিত মশাই তাকে মেধাবী বলে তারিফ করেন, বলতে পেলাম বিরাট চপেটাঘাত ও উত্তরে

জানলাম, "ছোটমুখে বড় কথা ? বেশী চোপা করলে এ গালের মাংস অন্য গালে সরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করা হবে।"

সাধারণের ধারণায় শিশুমন জীবন সমস্যাকে তলিয়ে দেখতে অক্ষম বা মনে আঘাত পেলে সেটাকে তারা ভুলে যায় সহজে। কিন্তু আমরা প্রত্যেকে যদি বয়েসের সঙ্গে জমা অভিজ্ঞতার স্তরগুলিকে তুলতে তুলতে জীবনারম্ভের স্তরে দৃষ্টিপাত করি তা হলে দেখব যে জ্ঞানের পরিসর ছোট হলেও শিশুমনের সিদ্ধান্ত ও মীমাংসাগুলি অন্তরের খাঁজে-খাঁজে সজীবভাবে জমে আছে এবং সেগুলির অনুভূতি অতিশয় তীব্র। বাঙালী সমাজের জাতবিচারে আমার পূর্বেকার বন্ধু ভৈইয়া, বাপুয়া, আপ্পারা কোথায় স্থান পেত তা ভেবে কোনো হদিশ পাইনি। তবে তারা এ সমাজে এসে পড়লে একটা না একটা সামাজিক পঙক্তিতে যে পড়ে যেত সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না।

প্রাচীনকালে বংশজ শ্রেণীবিহীন বৌদ্ধপ্রধান বাঙালী সমাজে অতীতে লুপ্ত ঐতিহাসিক কোন প্রয়োজনে সম্রাট আদিশূর এনেছিলেন ব্রাহ্মণ্য ধর্ম তা অজ্ঞাত। রাজ্যে শ্রেষ্ঠ নাগরিকদের গণশক্তিকে প্রতিহত করে রাজতন্ত্রের একচ্ছত্র শাসনকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত করতে সম্রাট বল্লাল সেন হয়ত কৌলিন্য প্রথার এক চালে বাজীমাৎ করেছিলেন। কিন্তু তাঁর প্রচলিত সেই বাজীর শতরঞ্চ ক্ষেত্রে মানুষ এখন বহুরঙা হাজার ছকে বন্দী হয়ে না পারে এগুতে না পারে পেছুতে। পূজা-পার্বণে ও পারিবারিক অনুষ্ঠানের নিমন্ত্রণে আহারে জাত হিসাবে পঙক্তি বিভেদে বুঝতাম না খেলায় ও স্কুলে যাদের সঙ্গে মেলামেশায় জাতিগোত্রের কোনো বালাই থাকত না একত্র খেতে বসতে তাদের নিজেদের মধ্যে আড়াল তুলতে হতো কেন ? ভারতে সুদূর অতীতে বর্ণাশ্রমের শ্রেণীবিভাগ সৃষ্টি হওয়ার কারণকে বিশ্লেষ করে দেখা যায় যে, সে সময়ে সমাজে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী স্বীকৃত হতো একমাত্র যোগ্যতার দ্বারায়। কিন্তু এখানকার সমাজে মানুষের মুখ্য গৌণ গুণাগুণে নিরূপিত হয় না, কেবল বংশ পরিচয়েই তাদের বরাদ্দ-করা ধাপে বসিয়ে দেওয়া হয় অবাধে। সমাজের এই বাঁধা-ধরা শ্রেণীবিভাগের কাঠামোর গণ্ডি অতিক্রম করবার একমাত্র উপায় পীর কি সাধু বনে যাওয়া এবং নকল পীর বা সাধু হলেও এ দেশের সমাজ তাদের অন্য শ্রেণীর গণ্ডী দিয়ে বাঁধতে উদ্যত হবে না। সমাজে মানুষের বংশগত-ভাবে এত অসম্মান ও অবজ্ঞা পৃথিবীর আর কোনো দেশে দেখা যাবে কি-না সন্দেহ। এই অবিচারকে এড়াতে এ দেশের মানুষ অনেকে হয়েছে এবং আজও হচ্ছে মুসলমান ও খৃষ্টান। কত মহাপুরুষ ও সমাজ সংস্কারকদের এই অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান আজও নাড়াতে পারেনি এর ভিত্তিকে বা শিথিল করতে পারেনি এর দৃঢ়বন্ধনকে। শ্রীচৈতন্যকে অবতার মানলেও তাঁর ধর্মপন্থীদের এক সম্প্রদায়ের স্ট্যাম্প দিয়ে ঠেলে দেওয়া হয়েছে জাতির তালিকায়। রামমোহন রায়ের প্রচেষ্টার ফল দাঁড়িয়েছে আর এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠায় যার মধ্যে বংশজ শ্রেণী বর্ণভেদ একটু

প্রগতির চুণকামে অস্পষ্ট মাত্র। গান্ধিজী অস্পৃশ্যতা দূরীকরণে কেবল নতুন হরিজন খেতাবে তাদের নামশুদ্ধ করেছেন মাত্র। যুগে যুগে এ সম্বন্ধে নৈতিক বিচার ও যুক্তির তর্ক কোথায় তলিয়ে গিয়েছে স্তূপীকৃত সামাজিক অন্যায়ের আবর্জনায়। একে বিনাশ করতে বুলডোজার দিয়ে জঙ্গল ও ভাঙা-পড়ো ইমারত উঠিয়ে সাফ করার মতো এক সর্বগ্রাসী সামাজিক বিবর্তনের প্রয়োজন। প্রতিষ্ঠিত সামাজিক অনাচার মানুষের সাধারণ বুদ্ধিকে যে কতখানি ঘুলিয়ে দিতে পারে তার প্রমাণ পেয়েছিলাম স্কুলের বয়েসেই যখন একবার আমরা বাড়ির সকলে পুরীতে গিয়েছিলাম। সেখানে জাতিভেদ না থাকলেও পাণ্ডারা কিন্তু সব জাত-ব্রাহ্মণ। আমাদের পরিবারের পেশাদারী ও ঠিকাদারী পাণ্ডা অসুস্থ থাকায় তার বছর বারো বয়েসের ছেলে আমাদের ধর্মরক্ষা করতে এল। বিস্ময়ে দেখলাম বাবা মা ও অন্যান্য বড়রা পাদস্পর্শে তাকে প্রণাম করলেন। মন্দিরের এক পীঠস্থানে আমাদের অঞ্জলি দেবার ব্যবস্থা করে সে মন্ত্র ঘোষাতে বললে, "সরে নেত্র বকে গৌরী" বয়োজ্যেষ্ঠরা সকলেই তাই তোতাপাখীর মতো আউড়ে গেলেন যদিও তাঁরা সকলেই জানতেন যে, আসলে 'শরণ্যে ত্র্যম্বকে গৌরী'--কথাটা আহাম্মুক পাণ্ডাপুত্রের ভালোভাবে হজম হয়নি। শাস্ত্রে মেনে নেওয়া ব্রহ্মতেজের দাপটে অব্রাহ্মণকুলের বুদ্ধিবিচারশক্তি এতকাল যখন অঙ্গারে পরিণত আজও তার ব্যতিক্রম হওয়া উচিত নয়। এর ওপরে ভেলকি লাগাতে পারে এ সমাজে কৌপীন, চিম্‌টা, গেরুয়া, জটা ও ছাই মায় গঞ্জিকা পর্যন্ত। এগুলির সহযোগে অবতারের পর্যায়ে উঠতে পারলে বৈকুণ্ঠের মর্যাদা, আরাম ও সুখ এই মরজগতেই হাতের মুঠোর মধ্যে সহজে এসে যায়।

এমনি এক অবতার আমাদের পাড়ায় আবির্ভূত হওয়ায় সকলের ব্রহ্মতালুতে আধ্যাত্মিক সাড়ায় চুম্বকের টানে লৌহ আকর্ষণের মতো টান পড়ল। আমার অগ্রজ ও আমি স্কুলের এক বৈদান্তিক মাষ্টার মশায়ের শলা-পরামর্শে পল্লীবাসীর মতে ধর্মভ্রষ্ট হয়ে পড়েছিলাম। কাজেই সেখানে আমাদের উপস্থিতির অপবিত্রতাকে সকলে ক্রুদ্ধ দৃষ্টির দাহনে বিনাশ করতে উদ্যত হলেন। দেখলাম ঘৃতদুগ্ধ ও পরমান্নে সুপুষ্ট কলেবর ঘন কালো শ্মশ্রুজটাজালে ও গেরুয়া বসনে অলঙ্কৃত হয়ে বিরাজ করছেন এক যুবা সাধু, আর তাঁর চারপাশে গদগদ নেত্রে সেবায় রতা নানা বয়সের মহিলা, যুবতী ও তরুণীদের ভিড় লেগে গেছে। সাধুজীর অনুরূপ তাঁর এক চেলার নাগাল পেয়ে আমরা এই অবতারের পরিচিতি সম্বন্ধে অবহিত হবার চেষ্টা করলাম। জানা গেলো, তাঁর নাম বাহেরগুরু ও তিনি এক হাজার বছর আগে ধরায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। কিন্তু মানুষের গর্ভে তাঁর জন্ম হয়নি। তিনি স্বয়ম্ভূ হয়েছিলেন মানস সরোবরের এক পদ্মের জঠরে। জিজ্ঞাসা করলাম যে, এক হাজার বছরে ধীরে ধীরে বর্ধিত হয়ে তিনি যখন মাত্র যৌবনে পৌঁছেছেন তাঁর বার্ধক্যে উপনীত হতে নিশ্চয়ই আরও এক হাজার বছর লেগে যাবে। চেলা বললেন,

না তিনি বাড়বার শেষ লিমিটে এসে গেছেন। এখন এইভাবেই থেকে যাবেন অমর।

গল্পে শুনেছিলাম, এক রাজার রাজজ্যোতিষীর ভাগ্য গণনায় অকাট্য বিশ্বাস ছিল। একবার শত্রুর দ্বারা রাজ্য আক্রান্ত হলে তাঁকে রাজা যুদ্ধের ফলাফল কি হবে গণনা করতে বললেন। তিনি বললেন, এ যুদ্ধে রাজার হার অবশ্যম্ভাবী। রাজা তখন ঠিক করলেন শত্রুর কাছে বিনা যুদ্ধে হার স্বীকার করে আত্মসমর্পণ করবেন। বিচক্ষণ মন্ত্রী তাঁর সঙ্গে নানা তর্কবিতর্ক করে যখন দেখলেন রাজা জ্যোতিষীর গণনাকে ধ্রুবসত্য বলে ধরে নিয়েছেন তখন তিনি জ্যোতিষীকে বললেন, ঠাকুর রাজা যদি এ যুদ্ধে নাবেন তো আপনার গণনানুসারে তখনি মারা পড়বেন। এখন হাতের রেখানুসারে ও গ্রহের অবস্থানে আপনার জীবনের মেয়াদ আর কয়দিন জানতে পারি কি? জ্যোতিষী জানালেন যে, সুস্থ শরীরে বহু বছর জীবিত থেকে তিনি রাজার অদৃষ্টকে সঠিক জানিয়ে দেবার কাজে রত থাকবেন। মন্ত্রী মহাশয় তৎক্ষণাৎ তরবারি নিষ্কাসিত করে তার মুণ্ডটি কেটে ফেলে বললেন, 'মহারাজা এ জ্যোতিষীর অদৃষ্ট গণনায় বিশ্বাস করা উচিত হয়নি, কারণ এ জানত না এর মৃত্যুর ক্ষণ এখনই এসে গিয়েছে।' পৌরাণিক যুগে এ সব পরীক্ষা করা চলত। সাধুজী অমর কিনা পরীক্ষা করবার একটা অদম্য ইচ্ছা হচ্ছিল মনে মনে, কিন্তু তাকে কার্যে পরিণত করায় ভীষণ বিপদের আশঙ্কায় ইচ্ছাটিকে দমন করতে বাধ্য হলাম।

শুনলাম সাধুজী না-কি নির্বাক ও নিরাহারী। ঘরে আহার্যের বিরাট সমারোহ দেখে জানতে চাইলাম সেগুলির তা হলে কি প্রয়োজন। জবাব পেলাম যে, তিনি দৃষ্টির দ্বারায় সামনে রাখা খাদ্যের সার টেনে নিতে সক্ষম। নির্বাক গুরুদেব দীক্ষা কিভাবে শিষ্যকে দেন জিজ্ঞাসা করতেই অবতারের কৃপাপ্রাপ্ত এক বৃদ্ধ বললেন যে, "বাহেরগুরু আমার কানে কি একটা হাঁসের মতো প্যাঁক শব্দ করলেন। ইনি পরমহংস কি-না তাই সহজে তাঁর মন্ত্রকে বুঝতে পারা যায় না। তাঁর দয়া হলেই একদিন এর গূঢ় তত্ত্ব বুঝে ফেলব।" এই অবতার সম্বন্ধে আরও কিছু গবেষণা করতে যাওয়ায় উপস্থিত গুরুজনদের তাড়নায় আমাদের নিষ্ক্রান্ত হতে হলো।

আমাদের বাড়িতে যে মহিলা ঘর সাফাই-এর কাজ করত তার অকালে বিধবা যুবতী কন্যা ইহ ও পরজীবনের কিছু পুণ্য পুঁজি করতে সাধুবাবার সেবায় রতা ছিল। কিন্তু এক সন্ধ্যায় দারুণ বিপর্যয় ঘটায় সে আর অবতারটির কাছে যেতে ভরসা পাচ্ছিল না। সন্ধ্যাশেষে শয়নের পূর্বে সাধুজী ছাদে শৌচাদির কাজে গেলে জল সরবরাহ করবার জন্য মেয়েটি ওপরে যায়। এই অবতার তখন তাঁর পার্থিব পরিধেয়টি পরিত্যাগ করে তাকেও অনুরূপ করবার জন্য জড়িয়ে ধস্তাধস্তি আরম্ভ করে দেন। মেয়েটি কোনোমতে অক্ষত অবস্থায় পালিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছিল। আর কয়েকজন প্রৌঢ়া মহিলা যাঁরা বহু সাধুসঙ্গ করে পোক্তা ছিলেন তাঁরা এ সব

শুনে তাকে তো খুব বকুনি দিতে আরম্ভ করলেন। কারণ তাঁদের মতে সে পুণ্য-লাভের এক অমূল্য সুযোগ না-কি হারিয়েছে মিথ্যা ভয়ে। সাধু অবতারের এ হচ্ছে সাময়িক গোপীভাব এবং বহু ভাগ্যগুণে তাঁরা না-কি বহুবার এ অভিজ্ঞতা অর্জনের সুযোগ পেয়েছিলেন। এই ঘটনায় অন্তত আমাদের বাড়ির সকলের সাধুভক্তির আধিক্য খানিকটা প্রশমিত হয়েছিল, কারণ তাঁদের যতই উৎকট ধর্মপ্রবণতা থাকুক এই ভণ্ডতপস্বীর একটা অত্যন্ত অশ্লীল অভিব্যক্তিকে নিষ্কাম গোপীভাব বলে তাঁরা বরদাস্ত করতে পারেননি। এই অবতার পাড়া ছেড়ে চলে গেলে একদিন সংবাদ-পত্রে খবর বেরুল যে, কলকাতার কোনো এক অঞ্চলে এক ভক্তের বাড়িতে থাকাকালীন তাঁর স্ত্রীর অলঙ্কারাদি আত্মসাৎ করে তাঁকে ধর্ষণ করায় আদালতে অভিযুক্ত হয়ে বাহেরগুরু এখন দণ্ড পেয়ে জেলখানার বৈকুণ্ঠে বিরাজ করছেন। কিন্তু এ সব বুজরুক সাধু অবতারদের সত্য পরিচয় আবিষ্কার হলেও স্বল্পক্লেশে গোলক গমনের সুযোগ অন্বেষীদের আমাদের দেশে চৈতন্যোদয় হয় না। পরগাছা যখন বৃক্ষের সব শাখায় বিস্তৃত হয়ে শিকড়ের ত্বক ভেদ করে তার সারাংশ শোষণ করতে থাকে, তাকে বিনাশ করতে তখন সারা গাছটাকেই কেটে শেষ করে ফেলতে হয়। বাঙালী সমাজে জাতি ও শ্রেণীভেদের পরগাছা এর কাঠামোর অণুতে অণুতে শিকড় সেঁদিয়ে প্রাণশক্তিকে ক্ষয় করছে নিরন্তর আজও।

স্বাধীনতার আন্দোলন উপলক্ষে কসবায় আহূত এক জনসভায় এক যুবক উদ্বোধনী সংগীত গাইলেন কবি নজরুলের 'জাতের নামে বজ্জাতি সব জাত জালিয়াৎ খেলছে জুয়া।' উপস্থিত সমাজমুখ্যদের একজন অত্যন্ত বিচলিত ও উত্তেজিত হয়ে উঠে দাঁড়িয়ে তাঁকে প্রচুর ধিক্কার দিয়ে বললেন, "ব্রাহ্মণ সন্তান হয়ে তোমার এই অশ্রাব্য কথাগুলি উচ্চারণ করতে জিভ খসে পড়ল না।" কলিযুগ বলে এই গায়ক বেঁচে গেলেন, না হলে বোধহয় শাস্ত্রের বিধানে এ গানের উপযুক্ত শাস্তি হিসাবে তাঁর কণ্ঠে গলা সীসা ঢেলে স্তব্ধ করে দেওয়া হতো।

পাঠশালা

ছোটবেলায় পৌরাণিক এক গ্রন্থের কাহিনীতে পড়েছিলাম, কোনো দেবতুল্য পুরুষ ছদ্মবেশে তাঁর ভক্তের মগজের তীক্ষ্ণতা পরীক্ষা করতে এক উদ্ভট প্রশ্ন করেছিলেন। প্রশ্নটা সঠিক মনে নেই তবে এই ধরনের ছিল বললে বোধহয় খুব ভুল করা হবে না। 'এক ব্যক্তি দেশ ভ্রমণে বেড়িয়ে বিদেশে পত্নীগ্রহণ করে স্বল্পকাল তার সান্নিধ্যে থেকে তাকে পরিত্যাগ করে চলে যান। বহু বছর পরে আবার সে দেশে ফিরে এলে এক অতীব সুন্দরী যুবতীর সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয় এবং রূপে মুগ্ধ হয়ে তিনি তার পাণিগ্রহণ করেন। পূর্ব পরিচয় না জানায় কেউ জানতে পারেনি যে তিনি ভুলক্রমে

নিজের কন্যাকে বিবাহ করেছেন। পরে তাঁদের যখন সন্তান হলো তখন সামাজিক নিয়মানুসারে এই ব্যক্তিকে তাঁর সন্তানের পিতা অথবা পিতামহ বলা হবে কি-না ?' এ যেন ইডিপাস্-এর গল্প উল্টে বলা। বুদ্ধিমান ভক্তের নিশ্চয় এই জটিল প্রশ্নের উপযুক্ত সমাধান করায় প্রসন্ন দেবতার কাছ থেকে বর লাভ হয়েছিল। কিন্তু তাঁকে যদি প্রশ্ন করা হতো যে, হিন্দু স্বামী ও তাঁর মুসলমান কি খৃষ্টান স্ত্রী —যাকে স্বামীর ধর্মে ধর্মান্তরিত করা হয়নি, এমন দম্পতির সন্তানকে আমাদের সমাজে জাতের কোন পর্যায়ে ফেলা উচিত, তা হলে উত্তর দিতে এই ভক্তপ্রবরের মগজ ফাঁকা হয়ে যেত। এই রকম পরিস্থিতিতে পড়লে কি রকম প্রতিক্রিয়া হতে পারে তার উদাহরণ দেখেছিলাম এক দত্ত মশায়ের জীবনে। প্রায় পঁচিশ বছর আগে জব্বলপুরে তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। বৃদ্ধ দত্ত মশাই বহু বছর বিপত্নীক ও সংসারে তাঁর আপন জন ছিল প্রায় পঁচিশটি কুকুর। তাদের এই বাড়িতে সর্বত্র অবারিত গতিবিধি এমন কি প্রভুর খাবার টেবিলে কিংবা শয্যায়ও তাদের ছিল সমান অধিকার। কুকুরগুলির এই আধিপত্য দেখে আমি ইতস্তত করায় তিনি বললেন, সমাজে মানুষের থেকে এদের সাহচর্য অনেক পবিত্র কারণ মানুষের বাইরেটা পরিষ্কার দেখালেও তার অপরিচ্ছন্ন অন্তরের সান্নিধ্য সহ্য করবার মতো ক্ষমতা সকলের হয় না। কুকুরের বাইরেটা অপরিষ্কার হলেও এরা অন্তর থেকে যেটুকু দেয় তা শুদ্ধ ও পবিত্র এবং সেটুকুকে গ্রহণ করা যায় নিঃসন্দেহে এবং অটল বিশ্বাসে। মানুষের সমাজের প্রতি তাঁর এই তীব্র বিতৃষ্ণার কারণ কি জিজ্ঞাসা করতে তিনি সংক্ষেপে জানালেন তাঁর জীবনের কয়েকটি অভিজ্ঞতাকে। ধনীর সন্তান দত্ত যৌবনে উচ্চ বিদ্যালাভের জন্য ইংলণ্ডে গিয়েছিলেন এবং সেখানে একটি ইংরাজ মহিলার প্রেমে পড়ে তাঁকে বিবাহ করেন। এই পাপ কর্মের দণ্ড হিসাবে তাঁকে ত্যাজ্যপুত্র করে দেওয়া হয় এবং দেশে ফিরলে হিন্দু সমাজে তাঁকে আর গ্রহণ করা হয়নি। আইনত বিবাহ করায় তাঁরা স্বামী স্ত্রী পরস্পরে নিজ ধর্ম বজায় রেখেছিলেন এবং তাঁদের প্রথম সন্তান কন্যার জন্ম হলে তাকেও কোনো ধর্মের বিধি অনুসারে চিহ্নিত করা হয়নি। দুর্ভাগ্যক্রমে এই কন্যা নয় বছর বয়সে মারা যায়। দত্ত মশাই তার দেহকে অগ্নি সংকারের জন্য শ্মশানে নিয়ে গেলে সেখানে লোকেরা খৃষ্টান ও বিধর্মী বলে তাঁকে বাধা দেয়। তখন তিনি গেলেন খৃষ্টানদের কবরস্থানে। কিন্তু সেখানেও তিনি খৃষ্টান নন ও তাঁর কন্যাকে ব্যাপ্‌টাইসড করা হয়নি বলে তারা কবর দিতে গররাজী হলো। মুসলমানদের কবরখানায়ও ঘোরতর আপত্তি পেলেন যেহেতু তাঁরা মুসলমান নন। মৃত দেহটিকে সংকারের জন্য নানাস্থানে টানাটানি করে ক্লান্ত এবং বিষাদ ও ক্রোধে ক্ষিপ্ত দত্ত মশাই এই ভীষণ সমস্যাকে মেটাবার হদিস পেলেন এক পাদ্রীর কাছে। তাঁর উপদেশে প্রথমে দত্ত মশাইকে খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত করে পরে তাঁর মৃত কন্যার ব্যাপ্‌টিসম সম্পাদনে খৃষ্টানদের কবরে তার দেহ স্থানলাভ করল। এর পর সর্বধর্মে বীতশ্রদ্ধ দত্ত মশায়ের পত্নী বিয়োগ

হলে মানুষের সংসর্গ ত্যাগ করে তিনি কুকুরগুলির সান্নিধ্যে দিন কাটাচ্ছিলেন কারণ এদের সমাজে জাতধর্ম বিচারের অত্যাচার নেই।

ভারতের সমাজ-ধর্মের জন্য মনু যে বিধি দিয়েছিলেন তার আজকের স্বরূপে কতখানি তাঁর নিজস্ব বিধান বহন করছে বলা শক্ত। স্মৃতির দ্বারা মনুর বিধিকে বাঁচিয়ে রাখতে প্রত্যেক বিধায়ক নিজের রুচিগত নীতি এর সঙ্গে জুড়ে মূলনীতিকে যে বিকৃত করেননি তার কি প্রমাণ আছে? এ দেশের হিন্দু সমাজে স্ত্রী জাতিকে তথাকথিত মনুর বিধানে বন্দী রেখে সমাজপতিরা নিজেদের সুবিধা মতো ধর্মের আইন বাঁচিয়ে এমন কোনো নিষিদ্ধ কর্ম নেই যা তাঁরা করেননি বা করছেন না।

আমার পিতামহ প্রৌঢ়ত্বে পা দেবার আগেই গতায়ু হন। তিনি সমাজ ও পৃথিবী থেকে এত শিগ্‌গির নিষ্ক্রান্ত হবার জন্য তাঁর আশপাশের ধর্মভীরু আত্মীয়স্বজনরা নিশ্চয়ই বিশেষ স্বস্তি লাভ করেছিলেন। সেকালে যাঁরা ইংরাজী শিক্ষালাভ করেছিলেন তাঁদের অনেকে আহারান্তে পোর্ট মদিরা সেবনের অভ্যাসটাকে সে শিক্ষার আনুষঙ্গিক হিসাবে গ্রহণ করেছিলেন। পিতামহও এই নিয়মের ব্যতিক্রম করেননি। সব সময়ে যে তিনি মদিরা সেবন করতেন তা সত্য নয় এবং এটাও মিথ্যা যে মাত্রাতিরিক্ত পানের জন্য তাঁর মত্ত অবস্থা হতো। তাঁর সামান্য জমি-জমায় যে প্রজারা কাজ করত তাদের তিনি আপন স্বত্ব দান করে দেন কারণ তাঁর মতে যারা রোদ্দুরে পুড়ে জলে ভিজে ফসল তৈরী করে—জমির সম্পূর্ণ অধিকার কেবল তাদেরই হওয়া উচিত। কিন্তু সমাজের লোকদের ধারণায় তিনি সন্তানকে সম্পত্তির অধিকারচ্যুত করে আপন পরিবারকে উচ্ছন্নের পথে ঠেলে দিলেন। পিতামহের সবচেয়ে বড় ভুল হয়েছিল যে, ঐ রকম মনোবৃত্তি নিয়ে তদানীন্তন সমাজে জন্ম নেওয়া। বর্তমান যুগে জন্মালে কে জানে তাঁর ঐ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসাবে হয়ত কম্‌সেকম একটা মন্ত্রিত্ব লাভ ঘটে যেতে পারত।

পিতামহ একদিন সন্ধ্যায় পাল্কিতে কাছারি থেকে আপন গ্রামে ফিরছিলেন। পথে রোরুদ্যমানা এক মহিলা তাঁর শরণাপন্ন হলো। কোনো ধর্মনীতি লঙ্ঘনে তার স্বামীকে সমাজচ্যুত করা হয়েছিল। এখন সে মারা যাওয়ায় সামাজিক নিয়ম ভাঙতে ভীত লোকেরা তার সৎকারে সাহায্য করতে রাজী নয়। বেচারীর বছর দশেকের এক কন্যা ছাড়া সংসারে আর কোনো সহায় ছিল না। পিতামহের অনুরোধে তাঁর বেয়ারারাও মৃতের সৎকারে অগ্রগামী হলো না। তখন তিনি নিজে মহিলাটি ও তার কন্যার সাহায্যে মৃতের শেষকৃত্য করবার আয়োজন আরম্ভ করলেন। বেয়ারারাও শেষে তাঁর দৃষ্টান্ত অনুসরণ করল। তাদের আপত্তির প্রধান কারণ ছিল জাতিভ্রষ্ট হবার ভয়। এখন সেটা গেলে মনিবেরও জাত সেই সঙ্গে যাবে কিন্তু চাকুরীটা বজায় থাকবে এই আশ্বাসে তারা এই অসমসাহসিক কাজ করতে রাজী হয়। সমাজে যখন পিতামহের এই দুষ্কৃতির কথা রটে গেলো—শিখাধারী মন্থবিদ্‌ পণ্ডিতদের বৈঠক বসল যে, এঁকে শাস্ত্রের

বিধানুযায়ী কি দণ্ড দেওয়া উচিত তার নির্ধারণার্থে। উপযুক্ত শাস্তির ব্যবস্থা না করলে এই অধর্মের প্রশ্রয়ের জন্য জনসাধারণ অভিযোগ করবে যে, ধর্মবিরুদ্ধ গর্হিত কর্মের জন্য শাস্তি কেবল গরীব অসহায়দের প্রতি প্রযোজ্য, সম্পদে বলীয়ানদের বেলায় সাতখুন মাপ হয়ে যায়। কিন্তু পিতামহকে সাজা দেওয়ার প্রধান অন্তরায় ছিল যে, সেই পণ্ডিতদের অনেকে তাঁর কাছ থেকে যে মাসিক সাহায্য পেতেন সেটি বন্ধ হয়ে যাওয়ার খুব সম্ভাবনা ছিল। এই নিদারুণ সমস্যার সম্মুখীন হওয়ায় তাঁরা শাস্ত্রগ্রন্থের সব পাতা চষে সর্বদিক বজায় রাখার মতো উপায় খুঁজতে আরম্ভ করলেন এবং অচিরে আবিষ্কৃত হলো যে, শাস্ত্রের বিধানে উন্মাদের ধর্মবিগর্হিত কর্মের জন্য শাস্তির ব্যবস্থা নেই। সেই সঙ্গে এও লেখা আছে যে মদিরা পানে মানুষের সাময়িক উন্মত্ততা আসে। অতএব পিতামহ নিশ্চয়ই মত্ত অবস্থায় এই দুষ্কর্ম করেছিলেন কাজেই ধর্মের আইন মতো তাঁর অপরাধ মকুব করে দেওয়া হলো।

বর্তমান হিন্দুর সমাজে পূর্বেকার বিধির প্রকোপ কিছুটা হয়ত প্রশমিত কিন্তু অনুষ্ঠানের দিক থেকে আজও তার আড়ম্বর পূর্ণমাত্রায় বলবৎ আছে। অর্থবলের জোর থাকলে এ সমাজে ধর্মগ্রন্থির বন্ধনকে ঢিলে করে মুক্ত হওয়া, ছেলেখেলার মতো সহজ। কিন্তু তা সত্ত্বেও আজকের হিন্দু সমাজধর্মের কাঠামোতে ঘুণ ধরে অন্তঃসারশূন্য হলেও তার পূর্বেকার রূপকে বাহ্যিকভাবে বাঁচিয়ে রাখার প্রচেষ্টায় কোনো ত্রুটি দেখা যায় না। কয়েক বছর আগে কলকাতায় এক বিশিষ্ট ধনী ও উচ্চবর্ণ হিন্দু পরিবারের কন্যার সঙ্গে ইংরাজ ও ভারতীয়সম্ভূত মিশ্রবর্ণের খৃষ্টান পাত্রের বিবাহ হয়ে গেলো। এই শুভকর্মে আহূত হয়েছিলেন শহরের মহোপাধ্যায় ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকুল এবং তাঁদের যাজকত্বে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণে পরিণয় সম্পন্ন হয়েছিল। বর্তমান যুগের প্রগতির দিক দিয়ে এ ঘটনাকে সামাজিক পরিবর্তনের একটা বিরাট পদক্ষেপ বলা যেতে পারে। কিন্তু সত্য বিচারে বোঝা যাবে যে, অর্থের প্রতাপে বেদ ব্রাহ্মণকে কিনে হিন্দু সমাজধর্মের একটা চটকদার প্রহসন হলো। সাধারণ গরীব পরিবারে এই ধরনের বিবাহের যোগাযোগে পৌরোহিত্য করতে পারত একমাত্র বিবাহ রেজিষ্টির দপ্তর।

পুরনো দিনে কসবায় গ্রাম্যভাবের একটি বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল সেকালের পাঠশালা। এই ধরনের বিদ্যায়তনে বঙ্গসন্তানদের পিটিয়ে মানুষ করা হয়েছিল কত শতাব্দী ধরে। বিদ্যাশিক্ষার স্মৃতি যাতে অন্তরে কেটে বসে যায় তার জন্য এই পাঠশালাগুলিতে পড়ুয়াদের ভুলত্রুটির জন্য শাস্তির রকমারি ব্যবস্থা ছিল। কসবার ছোট ছেলেমেয়েদের পড়াশুনার জন্য একমাত্র পাঠশালাটিতে পূর্বেকার ঐতিহ্যগত ঠাটকে পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখা হতো। ছেলেদের পড়ার চিৎকারে সরগরম এই বিদ্যায়তনে নৈমিত্তিক যে দৃশ্য দেখা যেত তাতে একে পাঠশালা না ভেবে যোগসাধনার ক্ষেত্র মনে করাটা খুব অসঙ্গত ছিল না। প্রায়ই দেখা যেত কান ধরে দেওয়ালে নাক ঠেকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে কোনো ছাত্র, কেউ বা ঐ অবস্থায় হাঁটুতে

এক পা উঠিয়ে অপর পা খানিতে ভর রেখে টলমল করছে। পণ্ডিত মশায়ের অধ্যাপনায় কোনো দিন একটু বেশী রকমের চাড় হলে কারুর ভাগ্যে হামাগুড়ি দেবার ভঙ্গিমায় দু' হাঁটু ও এক হাতে সারা শরীরের ভার রেখে অন্য হাতখানিতে ধরে রাখতে হতো একটি ইট। ভারে অবশ হয়ে হাত নেমে গেলে আবার সেই হাতে চাপিয়ে দেওয়া হতো দু'খানা ইট। সকল শাস্তির চেয়ে এরিস্টোক্রেটিক ঐ সাজার নাম ছিল 'নাড়ু গোপাল'। সাজা দেওয়ার মৌলিকত্বে সেকালের পণ্ডিত মশাইরা নিরো কি ক্যালিগুলাকে অনেক কিছু শিখিয়ে দিতে পারতেন। নামতা কি কবিতা ঘোষাবার একটানা সুরের সঙ্গে মাঝে মাঝে মারের চোটে পরিত্রাহি চিৎকারে চড়া ও খাদে মেশানো এক বিচিত্র ঐকতানের সূত্রপাত হতো। পাড়ার নিষ্কর্মা, প্রৌঢ় ও বৃদ্ধগণ যাঁরা জমিদারিচালে বাইরের বারান্দা বা পুলের ওপর বসে তাম্রকূট দেবীর আরাধনায় সময় কাটাতেন তাঁদের কানে এই কাতর রব পৌঁছালে মুখে একটা পরিতৃপ্তির ভাব ফুটে উঠত। বোধহয় তাঁরা এই ভেবে খুশী হতেন যে, 'ছেলেরা গড়ে-পিটে মানুষ হচ্ছে ভালোভাবে'। অথবা হতে পারে যে, তাঁরা তাঁদের বাল্যের অভিজ্ঞতা এখন অন্যেরা পাচ্ছে বলে একটা মজা উপভোগের আনন্দে হেসে নিতেন। পড়ুয়ারা এই রক্তমাংসের অনুভূতি দিয়ে মগজে প্রায় কোদাল ফেলে বিদ্যাচষার জন্য পণ্ডিতকে দক্ষিণা দিত মাসে আট আনা। গরীব অভিভাবক পণ্ডিত মশায়ের দৃঢ় মনকে অনুনয়ে বা অন্য কায়দায় নরম করতে পারলে দক্ষিণায় কিছু ডিস্‌কাউণ্ট হয়ে যেত কিংবা অর্থের বদলে তার মূল্যাধিক চাল শাকসব্জির সিধা গ্রহণে আপত্তি থাকত না।

জ্ঞান হওয়ার ও বুঝবার পর থেকেই জেনেছিলাম জগতে সবচেয়ে ভয়াবহ ও ভীষণাকৃতি হচ্ছেন শমন, কিন্তু তাঁকে দেখার পর অন্যকে তাঁর রূপ বর্ণনা দেবার সুযোগ এখনও কোনো মানুষ পায়নি। পাঠশালায় ভর্তি হবার পর মনে হলো যে, মরজগতে শমনের সমকক্ষ ভয়ঙ্কর হচ্ছেন পণ্ডিত মশাই। তাঁর এক একটা সিংহনাদে ছাত্রদের বুক ধ্বসে জঠরের তলায় গড়াগড়ি দিত। তাঁর সাদা তৈল সিঞ্চিত গ্রন্থিবদ্ধ শিখাটি ছিল যেন তাঁর মেজাজের আবহাওয়ার ব্যারোমিটার। তার স্পন্দন ও নর্তনের রকমফের প্রত্যেক পড়ুয়ার মনে আনত প্রত্যহ আশা, আশঙ্কা ও হতাশা। পণ্ডিত মশায়ের শিখার সঙ্গে তালিম দিতে তাঁর বেতগাছা প্রত্যহ ছাত্রদের স্কন্ধের প্রগাঢ় স্পর্শ পেয়ে শক্ত স্প্রিং-এর মতো সক্রিয় ও মসৃণ থাকত।

একদিন একটি ছাত্রকে নিয়ে তার অভিভাবক এসে পণ্ডিত মশাইকে জানালেন যে, বাড়িতে সে না-কি বেয়াদবী করেছে এবং শাসনের ভয়ে পাঠশালায় সে আসতে চাচ্ছিল না। এই অভিযোগের ফল যে কি ভয়াবহ তা শুধু দোষী ছাত্রটি নয় উপস্থিত সকলেই বেশ ভালোভাবে জানত। ছেলেটি পাঠশালায় পৌঁছানোর পর পণ্ডিত মশাইকে ক্রমাগত কাকুতিমিনতি করে যাচ্ছিল। তার এই অনুনয়কে উপেক্ষা করে তিনি তাকে শায়েস্তা করবার ব্যবস্থাকে বেশ একটা বিলম্বিত খেয়ালে

প্রস্তুত করছিলেন। একজনকে তিনি পাঠালেন পাঠশালার অপর প্রান্তে অন্দরমহলে একটু সরষের তেল আনবার জন্যে এবং সেটা এসে না পৌছানো পর্যন্ত লকলকে বেতখানার ডগাটা ধরে বেঁকিয়ে হঠাৎ ছেড়ে দিয়ে তার আছড়ে পড়ার তেজ পরীক্ষা করছিলেন। সমস্ত পাঠশালা হয়ে গেছে স্তব্ধ, ঝড় আসবার ঠিক পূর্ব মুহূর্তে যেমন সারা প্রকৃতি নীরব হয়ে পড়ে। ছেলেটি নিস্তার পাবার আশায় ক্রন্দন নিষ্ফল বুঝে চুপ করে দাঁড়িয়েছিল। এরপর পণ্ডিত মশাই তার কোঁচাটি ধরে একটান দিয়ে ধুতি খুলে লম্বালম্বিভাবে সেটাকে পাকিয়ে পাকিয়ে দড়ি করে নিলেন। ছেলেটিকে হাত পিছনে করবার হুকুম দিলে সে শেষবারের মতো করুণভাবে ক্ষমা চাইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে প্রচণ্ড ধমক আসায় তার হাত দুটি যেন আওয়াজের ধাক্কায় পিছনে একজোট হয়ে গেলো। ধুতির দড়িতে কব্জি দুটি বেঁধে ঘোড়ার লাগামের মতো তার দুই বাহুসন্ধি ও কাঁধ গ্রন্থিবদ্ধ করে অপর প্রান্তটি ছুঁড়ে কড়িকাঠে টপকিয়ে নেওয়া হলো। তারপর ধীরে ধীরে সেই প্রান্তটি টেনে ছেলেটিকে উঁচুতে ঝোলানো হলো। বাজীকর যেমন নানা কায়দায় সাজ-সরঞ্জাম সাজিয়ে আসল খেলা শুরু করার আগে দর্শকের কৌতূহলের মাত্রাটা কতখানি তীব্র হয়েছে তার আন্দাজ করার চেষ্টা করে, পণ্ডিত মশাই ঠিক তেমনিভাবে তাঁর এই আয়োজন পড়ুয়াদের সকলকে কতখানি ভয়াভিভূত করেছে তা জানতে জ্বলন্ত চাউনি দিয়ে চারিদিকে একবার দেখে নিলেন। তারপর শূন্যে বার দুয়েক বেতটি আস্ফালন করে আঘাত করলেন ছেলেটির শরীরে সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়-বিদারক তার আর্তনাদ উপস্থিত সকলের স্নায়ুকে যেন ছিন্নভিন্ন করতে লাগল। এরপর চলল সেই দোদুল্যমান মাংসপিণ্ডবৎ দেহে ছন্দে তালে আঘাতের পর আঘাত এবং তার প্রতি আক্ষেপ উত্থিত অসহ্য কাতরোক্তির উচ্চরব। কিছুক্ষণ পরে বেয়াদবীর মাত্রানুযায়ী সাজার পরিমাপ মতো বেত্রাঘাত করে ক্লান্ত পণ্ডিত মশাই ক্ষান্ত হলেন। পেণ্ডুলামের মতো দোল-খাওয়া দেহটি স্থির হলে ধুতির বাঁধন খুলে ছেলেটিকে মাটিতে নামিয়ে দাঁড় করানো হলো। সে পড়ে যাচ্ছিল কিন্তু পণ্ডিত মশাই বেত ফের উঁচু করতেই তার অবশিষ্ট শক্তিটুকুকে প্রাণপণে একত্রিত করে কোনোমতে সে দাঁড়াল। তার হাতে ধুতিখানা দিয়ে পরতে বলা হলো। সাময়িকভাবে নির্বুদ্ধি ও ক্রিয়াহীন শুধু কাপড়খানা হাতে করে তখনও কোনো অদৃশ্যযষ্টির ছন্দে বাঁধা বিরামহীন আঘাতের আক্ষেপে সে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁপছিল। তখনকার দিনে বয়োজ্যেষ্ঠরা বেদম প্রহারকে ছেলেদের চরিত্র সংশোধনের ও জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ করবার একমাত্র উপায় ধরে নিলেও ছাত্রকে এমন মারাত্মক সাজা দেওয়ার অনুষ্ঠানকে চাক্ষুষ দেখলে তাঁরা অনেকেই হয়ত অনুমোদন করতেন না। কিন্তু 'যষ্ঠি পরিত্যাগে ছেলেদের নষ্ট স্বভাবকে প্রশ্রয় দেওয়া' নীতির প্রভাব তখন এত প্রবল ছিল যে, এমন নিষ্ঠুরতায় মনে আঘাত পেলেও এই অভিভাবক প্রকাশ্যে পণ্ডিতকে বাধা দিতে সাহস পাননি। ধুতিখানা ছেলেটির গায়ে জড়িয়ে দিয়ে পণ্ডিত মশায়ের অনুমতি নিয়ে তিনি তাকে বাড়ি

নিয়ে গেলেন। এরপর তাকে এ পাঠশালায় আর আসতে দেখা যায়নি। এই ঘটনার পর ঐ ভয়াবহ পরিবেশে যাতে আর না যেতে হয় তার জন্য বাড়িতে অনেক অনুনয় করলাম। কিন্তু রেললাইনের ওপারে দূরে বড় স্কুলে হেঁটে যাবার মতো বয়েস না হওয়া পর্যন্ত এই পাঠশালা ছাড়া ছোটদের অন্য গতি ছিল না।

বয়েসের একটি গণ্ডি পার হলে বাড়িতে ছোটদের সর্বক্ষণ উপস্থিতি বড়দের কাছে অসহ্য ছিল কাজেই সাময়িকভাবে তাদের বন্দী করে দেওয়া হতো ঐ শাসনের কারাগারে। বড়দের বদ্ধ ধারণা ছিল যে, ছেলেদের এর বাইরে থাকতে দেওয়া হচ্ছে তাদের উচ্ছন্নে যাবার সোজা রাস্তা। কাজেই পাঠশালায় নির্মম প্রহারের কাহিনী সবিস্তারে বর্ণনা করে যে কোনো সহানুভূতি অর্জনে রেহাই পেয়ে যাব তা ছিল দুরাশা। কিন্তু পরিত্রাণ এল কয়েকটি ঘটনার দ্রুত বিবর্তনে।

রাধাশ্যাম সিংহ

স্বদেশী আন্দোলন দেশে শুরু হলে কসবা কলকাতার প্রান্তে থেকেও প্রথমে এর ধাক্কা যেন অনুভব করেনি। ঘূর্ণিবাতাস যেমন উড়তে উড়তে খড়কুটো এক স্থান থেকে উড়িয়ে নানা স্থানে ছড়াতে থাকে ঘটনার দ্রুত বিবর্তন এই সংগ্রামের আন্দোলনে অনুপ্রাণিত ও উত্তেজিত কর্মীদের পৌঁছে দিচ্ছিল দিকে দিকে। এমনি এক প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ রাধাশ্যাম সিংহ মশায় এসে পড়েছিলেন কসবায় একটি জাতীয় বিদ্যালয় স্থাপন করবার উদ্দেশ্য নিয়ে। জাতীয়তাবাদের অভ্যুদয়ে দেশের লোকেদের জীবনে স্বদেশীয়ানার প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সর্বাঙ্গীনভাবে তীব্র ও গভীর। তাই ব্রিটেনের ছোঁয়াচ-লাগা সব কিছু ভারতীয়দের জীবন থেকে আবশ্যক বর্জনীয় বলে গণ্য করা হয়েছিল। ব্রিটিশ শিক্ষা পদ্ধতির কাঠামোয় গড়া সরকার পরিচালিত ও সরকারী সাহায্যে পুষ্ট স্কুলগুলিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশাধিকারী পাঠের অনুশীলন সে কারণে বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদের আদর্শের বাইরে বলে বাতিলের অঙ্কে পড়ে যায়। দেশের জ্ঞানীগুণীরা মিলে নতুন শিক্ষা প্রণালীর পরিকল্পনায় স্থাপন করেছিলেন 'ন্যাশ্‌ন্যাল কাউন্‌সেল অব এডুকেশান' এবং তারই অনুমোদনে যাদবপুরে বিজ্ঞান ও যন্ত্রবিদ্যার মহাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এই মহাবিদ্যালয়কে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মতো কেন্দ্র করে অনেক জাতীয় বিদ্যালয় গড়ে উঠেছিল।

দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন স্বাস্থ্যবান ও গৌরকান্তি সিংহ মশাই হাতকয়েক মাত্র লম্বা খদ্দরের ঝাড়নের অধোবাসে এবং অনুরূপ আর একটি কাপড়ের খণ্ডকে চাদরের মতো কাঁধে ফেলে হঠাৎ একদিন উপস্থিত হলেন কসবায় এবং অধিবাসীদের সঙ্গে দেখা করে জানালেন তাঁর সঙ্কল্প। কিন্তু উত্তরে শুনলেন যে, স্কুল গড়বার

জন্য যে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন তার সংস্থান তিনি করবেন কি উপায়ে! তিনি বললেন যে, সে অর্থ সংগ্রহের জন্যেই তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে তাঁদের কাছে উপস্থিত হয়েছেন। অনেকে তখন ভেবেছিলেন, এভাবে ভিক্ষালব্ধ অর্থে বিদ্যালয় গড়বার চেষ্টায় তিনি সারা জীবন শেষ করলেও এর ভিত্তিটুকু স্থাপন করা সম্ভব হবে কি-না সন্দেহ।

কসবার দিকে দিকে এমন কি প্রধান জনপথের দু'ধারে সে সময়ে কাঁটা ও জঙ্গলে ভরা পোড়ো জমি ছিল অপর্যাপ্ত। তারই খানিক মালিকদের কাছে সিংহ মশাই চাইলেন একেবারে দান হিসাবে নয় স্কুলের প্রথম আস্তানার জন্য কেবল কয়েক বছরের জন্য স্থানাধিকার। প্রধান জনপথের প্রান্তে এক সহৃদয় কসবাবাসীর কাছ থেকে একখণ্ড জমির সাময়িক অধিকার পেয়ে সিংহ মশাই আরম্ভ করলেন বিদ্যালয় গঠনের অভিযান। ঐ রাস্তা দিয়ে তখন প্রতিদিন ইঁট, বালি, চুন ও শুরকি ভরা গরুর গাড়ীর ক্যারাভান চলত অবিরাম। জমিতে দাঁড়িয়ে সিংহ মশাই চেঁচাতেন, "গান্ধী মহারাজ কি জয়। এ গাড়োয়ান ভেইয়া স্বরাজকে লিয়ে চার ইঁটা দেও" বা "থোড়া চুনা দেও বালু দেও, শুরকি দেও" ইত্যাদি। কিছুদিন পরে এই গাড়োয়ানদের কেউ কেউ কিছু ইঁট, চুন, বালি, শুরকি ইত্যাদি ফেলে যেত। ঘর তুলবার মতো উপাদানের সংস্থান হলে দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশকে আমন্ত্রণ করে এনে সিংহ মশাই জাতীয় বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করে কসবাবাসীদের হতভম্ব করে দিলেন। 'চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়' লেখা ও ভিতরে পয়সা ফেলবার ছিদ্র সমেত কয়েকটি টিনের বাক্স হাতে করে প্রতিদিন সিংহ মশাই অর্থসংগ্রহে যেতেন বালিগঞ্জ স্টেশনে আগত প্রত্যেক ট্রেনের কামরা থেকে কামরায়। কিছুদিন পরে তাঁকে আর ঘুরবার প্রয়োজন হতো না কিংবা কি আদর্শের জন্য এই ভিক্ষা তা ঘোষণা করা অপ্রয়োজনীয় হয়েছিল। বালিগঞ্জ অথবা শিয়ালদহ স্টেশনের গেটে তিনি দু'হাতে দুটি বাক্স নিয়ে দাঁড়াতেন আর আগত বা বিদায়ী যাত্রীরা প্রত্যেকে আপন-আপন সামর্থ্য মতো অর্থ দিয়ে যেত সেই বাক্সে। বিরামহীন সেই মুদ্রা ও বাক্সের ধাতব সংঘাতধ্বনি প্রচণ্ড বৃষ্টির আওয়াজের মতো শোনাত। সন্ধ্যায় পরিশ্রান্ত সিংহ মশাই ফিরতেন অর্থভারে পূর্ণ বেশ কয়েকটি টিনের বাক্স নিয়ে। পরে বাক্সের সংখ্যাবৃদ্ধি হলে সেগুলি পৌছাত একটি কুলির বাহনে। অল্প দিনের মধ্যে এরপর এক বিরাট স্কুলঘর তৈরী হলো আটচালায় টালির আচ্ছাদন পেয়ে। দেশসেবায় অনুপ্রাণিত শিক্ষকের অভাব হয়নি এই বিদ্যায়তনে —যাঁরা নামমাত্র বেতন নিয়ে এর পরিচালনার ভার নিয়েছিলেন। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের অনুশীলন ছাড়া সুতাকাটা ও তাঁত বোনা ছাত্রদের শিক্ষার একটি অবশ্য করণীয় ছিল। প্রত্যেক দিন সকালে পড়াশুনা আরম্ভ হওয়ার আগে ছাত্ররা এক সারিতে দাঁড়িয়ে করত স্তোত্রপাঠ ও গাইত জাতীয়সঙ্গীত। একটি গানের প্রথম ও শেষ দু'লাইন আমরা গাইতাম—

একবার তোরা মা বলিয়া ডাক
জগৎজনের শ্রবণ জুড়াক……
ও……সে পূজার পূজারী মহাত্মা ভিখারী
ভিখারীর দল দাঁড়ায়ে দুয়ারে।

আমরা মহাত্মা গান্ধীকে না ভেবে আমাদের সামনে উপস্থিত ভিখারীর বেশে সজ্জিত সিংহ মশাইকেই দেখতাম দেশসেবার সেরা পূজারী হিসাবে।

স্থানাতিরিক্ত ছাত্রসংখ্যা দিন দিন বৃদ্ধি পাওয়ায় বিদ্যালয়ের অঙ্গ বর্ধনের প্রয়োজন হয়েছিল অচিরে। আমরা ছাত্রের দল পালা করে টিফিনের সময় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে "গান্ধী মহারাজকি জয় গাড়োয়ানজী ইঁটা দেও, শুরকি দেও" ইত্যাদি বলে সে উপাদানের সংগ্রহকে একটা উপভোগ্য খেলা হিসাবে নিয়েছিলাম।

বিদ্যালয়ে শিক্ষকদের সংসর্গ যে কতখানি মানুষের জীবনকে প্রভাবান্বিত করে তা পরিণত জীবনে, অতিবাহিত সময়ের দীর্ঘ বিস্তারে, দৃষ্টিপাত করলেই সহজে প্রতিভাত হয়ে থাকে। ছাত্রজীবনের সকল শিক্ষকদের স্মৃতি সজীব থেকে যায় না, কিন্তু প্রত্যেকের মনে জাগ্রত থাকে দু'একজন শিক্ষকের কাহিনী ও বৈশিষ্ট্য। কিন্তু এই জাতীয় বিদ্যালয়ে যে সকল শিক্ষকদের সান্নিধ্য পেয়েছিলাম তাঁদের সকলকেই আজও মনে পড়ে। তাঁরা যে সকলে অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন তা বলব না, কিন্তু দেশের নবজাগরণ যেন—তাঁদের যা কিছু গুণ ছিল, সেগুলিকে এই বিদ্যায়তনের কাজে সম্পূর্ণভাবে অভিব্যক্ত করেছিল। তাঁরা প্রায় সকলেই শিক্ষকতাকে অর্থোপার্জনের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেননি এটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল তাঁদের জীবনের আদর্শ ব্রত। সব বিষয় ঠিকমতো পড়াবার সরঞ্জামাদি না থাকলেও বিশেষ করে বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় পাঠ বোঝাতেন আমাদের প্রধান শিক্ষক মশাই। তাঁর হাতের ভঙ্গিমায় ও বলবার বৈশিষ্ট্যে দুর্বোধ্য বিষয়ও যেন অতি সহজে বোধগম্য হতো। লেখাপড়া জানা লোকের অনুপাতে উপযুক্ত শিক্ষক হবার মতো গুণীর সংখ্যা চিরকালই কম। সেই সংখ্যালঘিষ্ঠ গুণীদের মধ্যেও আমাদের এই প্রধান শিক্ষক মশাইকে এক অসাধারণ ব্যক্তি বলে প্রচার করলে আমি মনে করি না যে অত্যুক্তি করছি। চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয়ের দুর্ভাগ্য যে, তিনি মাত্র কয়েক বছর শিক্ষকতা করার পর ল পাশ করে আদালতে ওকালতি করতে চলে গেলেন। কেবল মাত্র শিক্ষাদানের নৈপুণ্যের জন্যই যে কোনো শিক্ষকের স্মৃতি ছাত্রদের মনে সজীব থাকে এমন বলছি না। আরও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যও তাঁদের অস্তিত্বকে স্মরণ করিয়ে দেয় অতি সহজে। একবার এক অসুস্থ শিক্ষকের স্থানে অস্থায়ীভাবে এলেন এক নতুন শিক্ষক। পাঠ্যবিষয়ের বাইরে নানা রকমের গল্প করে তিনি ছাত্রদের মনোরঞ্জন করতেন। খুব জানা কাহিনীও তাঁর ব্যাখ্যায় নতুন বিষয়ে পরিণত হতো। সবচেয়ে বিস্ময়ের ব্যাপার ছিল তাঁর পূর্ববঙ্গীয় পাঁচমেশালী ভাষা। তাঁর এই প্রান্তীয় নানা ঢং-এর বাংলা কথা বলার খিচুড়ী ভাষাকে চেষ্টাকৃত কৃত্রিমতা

বলে মনে হয়নি কোনোদিন। অথচ কিভাবে তিনি বলার এই বৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিলেন তা আজও আমার কাছে দুর্জ্ঞেয় রয়ে গিয়েছে। আমাদের পাঠে অমনোযোগিতার জন্যে তিনি বলতেন, "এইবার পাণিতুয়া খাবা" অর্থাৎ প্রচণ্ড চিম্‌টি। কিন্তু এটাকে অদ্ভুত ভাষা হিসাবে না গ্রহণ করলেও তাঁর রামায়ণী কথাকে অতি সাধারণ ব্যাপার বলে উপেক্ষা করা যায় না। তিনি বলতেন, "বুঝ্‌ছনি রামায়ণ হইতেছে ইতিহাস। রাম বনে গিয়া বানরের সাথে মিত্রতা করল কেন? —ইতিহাস। কারণ, বনে ব্যাঘ্র আছিল, সর্প আছিল অতএব বৃক্ষারোহণ উচিত কর্ম। কিন্তু কৌশল না জানিযা রাম গাছে চডব ক্যাম্বায়। ঐ বানর আছিল সেই রামচন্দ্ররে শিখাইয়াছিল বৃক্ষারোহণ" ···ইত্যাদি।

চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালযের আয়তন বৃদ্ধি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা সংগ্রামের প্লাবন কসবায় পৌঁছে গেলো। বহির্জগতের ঘটনা-নিরপেক্ষ গ্রামবাসীদের মধ্যে এল কংগ্রেস, এল সন্ত্রাসবাদ। যে ব্যায়ামের আখডায় কেবল শরীরচর্চা ছাডা অন্য উদ্দেশ্য ছিল না, সেখানে দেখা গেলো নতুন অভিপ্রায়। সেবাসমিতি, হরি-কীর্তন সভা, সাধাবণ পাঠাগার ও গ্রাম্য বৈঠকে প্রত্যহ আলাপ-আলোচনার বিষয় বস্তু হয়ে গেলো জাতীয় অভিযানের ঘটনাবলী ও তার হিসাবনিকাশ। বিদ্যালয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ ছাত্রদের মধ্যে আলাপ ও জিজ্ঞাসা হঠাৎ গোপনীয় রূপ ধারণ করল। একদিন ভারতবর্ষেব ইতিহাস বইটিব পাতা উল্টোতে হঠাৎ আবিষ্কার করলাম, হলদিঘাটের যুদ্ধ-বিবরণীয় পৃষ্ঠার মধ্যে কে রেখে দিয়েছে লাল হরফে ছাপা রাষ্ট্রদ্রোহী ইস্তাহার। তাতে লেখা ছিল, ইংরাজশক্তির নিধন করতে বোমা তৈরীর বিস্তারিত নির্দেশ এবং তার ব্যবহারের নানা উপদেশ। বিদ্রোহী বাহিনী পুষ্ট করতে অগ্রণী যাঁরা —দাদার আখ্যায় তরুণ যুবাদের অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা দেবার ভার নিচ্ছিলেন, কসবার বেশ কয়েকজন যুবক তাঁদের তালিকাভুক্ত হয়ে গেলেন। তাঁদের আস্তানায় তরুণদের ডেকে তাদের দেওয়া হতো সরকার থেকে বাজেয়াপ্ত করা ইয়োরোপ ও রাশিয়ার বিদ্রোহ ও বিপ্লব সংক্রান্ত পুস্তকাবলী এবং দেশ-বিদেশের বিপ্লবী শহীদদের কাহিনী। বিদেশী বস্ত্র-বর্জন, সরাবখানায় পিকেটিং ও লবণ আইনভঙ্গ আন্দোলনে আহুত স্বেচ্ছাসেবকদের অভিনন্দিত করার জন্য গ্রামবাসীরা সম্মিলিত হতেন জাতীয় বিদ্যায়তনের প্রাঙ্গণে। এত অভিযান ও উত্তেজনার পরিবেশে থেকে তরুণ ছাত্রদের মনে হতো না যে, চিত্তরঞ্জন জাতীয় বিদ্যালয় শুধু একমাত্র বিদ্যাশিক্ষার ক্ষেত্র। দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে আগামী দিনের উপযুক্ত কর্মী হবার একটা আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা তাদের মনকে তোলপাড় করত অহরহ।

জাতীয় বিদ্যালয়ের ক্রমে ক্রমে শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় উদ্বৃত্ত অর্থে পরে নতুন জমি কেনা এবং পাকা ইমারত গড়া সম্ভব হলো এবং দেশ স্বাধীন হবার পর শিক্ষাদপ্তরের আওতায় আসায় এর ব্যয় সঙ্কুলানে ভিক্ষালব্ধ অর্থের আর প্রয়োজন হয়নি। বিদ্যালয়ের পরিচালনায় নির্বাচিত সদস্যবর্গ সিংহ মশাইকে জানালেন যে, তাঁর

বিদ্যালয়ের জন্য ভিক্ষা করার ব্রতকে এখন ছুটি দিতে হবে এবং তিনি এই বিদ্যালয়ের সর্বাধ্যক্ষ হয়ে বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারেন। সিংহ মশাই এই প্রস্তাবে মর্মাহত হলেন। যে বিদ্যায়তনের তিনি জনক আজ তার প্রতিষ্ঠা সম্পূর্ণ হওয়ায় সেখানে কোনো পদ গ্রহণ করে অবসর নেওয়ার চিন্তা তাঁর কাছে অতিশয় গ্লানিকর হয়ে উঠল। তিনি ঠিক করলেন আর এক অনুরূপ বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের জন্য আরম্ভ করবেন নতুন করে ভিক্ষা। কিন্তু যে মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি ভিক্ষাপাত্র হাতে জনতার কাছে দাঁড়িয়েছিলেন এখন সে উদ্দেশ্যের পরিপূর্ণতায় তাঁর নতুন এই অভিযানে জনগণের কাছ থেকে আগের মতো সাড়া ও সহানুভূতি তিনি পাননি। বিরাট কর্মবহুল জীবনে হঠাৎ অবসর এসে যাওয়ায় মানসিক ও দৈহিক অবসাদে পীড়িত সিংহ মশায়ের অল্প কয়েক বছর পরে মৃত্যু হয়। দেশ স্বাধীন হবার পর থেকে কসবার চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের নাম থেকে জাতীয় শব্দটি তুলে দেওয়া হয়েছে। যে আদর্শে হয়েছিল এই বিদ্যায়তনের গঠন ও প্রতিষ্ঠা আজ তার কণামাত্র খুঁজে পাওয়া যাবে না এর বর্তমান পরিচালনায় ও উদ্দেশ্যে। এর কলেবর বৃদ্ধি হয়েছে প্রচুর এবং ছাত্রসংখ্যাও বর্তমানে অনেক শতের অঙ্কে অসংখ্য। কিন্তু যে মহাত্মনের কৃচ্ছ্র সাধনায় ও দৃঢ় সঙ্কল্পের ব্রতে চিত্তরঞ্জন বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও গঠন সম্ভব হয়েছে তাঁকে স্মরণে রাখবার মতো উপযুক্ত কোনো প্রতীক এই বিদ্যায়তনে বা কসবায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। অন্য দেশ হলে এমন ব্যক্তির স্মরণার্থে শহরের কোনো রাজপথ তাঁর নাম বহন করত কিংবা কোনো চত্বরে স্থাপিত হতো তাঁর প্রতিমূর্তি এবং কমপক্ষে অন্তত যে বিদ্যালয়ের তিনি স্রষ্টা তার প্রধান সভাগৃহ তাঁর নামে খ্যাত হতো। হতভাগ্য বাংলাদেশে কৃতজ্ঞতা শব্দটা কেবল অভিধানে লেখা আছে, বাস্তবে তার অভিব্যক্তি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়।

বাঙালী প্রতিভাবান ও কল্পনাপ্রবণ জাতি। কিন্তু কোনো কারণে বলা যায় না তার চরিত্রে যেন যুগপৎ স্যাডিসম্ ও ম্যাসোকিসম্ ওতপ্রোতভাবে জড়িত হয়ে গিয়েছে বহু শতাব্দী যাবৎ। বাঙালীর বীরত্বের উচ্ছ্বাস ইতিহাসে লিখিত আছে বারো ভুঁইঞার কাহিনীতে। কিন্তু সে বারো ভুঁইঞার অনেকে সমসাময়িক হলেও একই আদর্শ ও উদ্দেশ্যের সিদ্ধিকল্পে একটি একজোট শক্তি হতে পারেননি এবং সেটা হলে হয়ত আজ বাংলার ইতিহাস ভিন্নতর হতো। লোকে কথায় বলে একই হাতের পাঁচটা আঙুল এক রকমের হয় না। কথাটা খুবই সত্য। কিন্তু বাংলা মায়ের হাতে বাঙালীজাত যে পাঁচটা আঙুল হয়ে আছে তাতে দেখা যায় যে, একটি অন্যের উৎপাটনকল্পে ডগা বাঁকিয়ে ভয় দেখাচ্ছে অবিরত। প্রাতঃস্মরণীয় বিদ্যাসাগর দয়ারসাগর হলেও বাঙালীর বিচিত্র স্বভাবের পীড়নকে এড়াতে পারেননি। বিশ্ববরেণ্য কবি রবীন্দ্রনাথ জীবনে আপন মনীষার পরিপূর্ণতার প্রতিষ্ঠা ও পূজা পেলেও শেষ জীবনে নিদারুণ খেদোক্তি করে গিয়েছেন যে, "আমার বাঙালী জন্ম প্রায় শেষ করে এনেছি, আজ আমার ক্লান্ত আতুর নিবেদন এই যে, যদি জন্মান্তর

থাকে তবে যেন বাংলাদেশে আমার জন্ম না হয় —এই পুণ্যভূমিতে পুণ্যবানেরাই জন্মে জন্মে লীলা করতে থাকুন —আমি ব্রাত্য আমার গতি হোক সেই দেশে যেখানে আচার শাস্ত্র সম্মত নয় কিন্তু বিচার ধর্মসঙ্গত।" যদি পুনর্জন্ম সত্যি হয় তা হলে আমার বিশ্বাস যে, গুরুদেবের দেওয়া এমন পরিস্ফুট ইঙ্গিত পেয়ে ভবিষ্যতে মনীষী ও মহাত্মন আত্মাগুলি বাঙালীর ঘরে জন্ম যাতে না নিতে হয় তার জন্য সৃষ্টিকর্তার কাছে আবেদন পেশ করবে তো বটেই এতে কাজ না হলে তাঁকে 'ঘেরাও'-এর দণ্ড দিতে হয়ত দ্বিধা করবে না।

সাবেকি কসবা

জনতায় মানুষের একক ব্যক্তিত্ব সমষ্টিতে লুপ্ত হয়ে যাওয়া হয়ত স্বাভাবিক। কিন্তু জাতিগতভাবে জনতার পরিচয়ও যে বিভিন্ন হতে পারে তা দেশের বাইরে না যাওয়া পর্যন্ত উপলব্ধি করতে পারিনি। ইয়োরোপে নানা অনুষ্ঠানে সমাগত বিরাট জনসমাগম দেখেছি এবং সেই জনসমুদ্রকে দেখলে তার প্রত্যেকটি মানুষের জাতিগত পরিচয় ও তার ব্যক্তিত্ব নজরের বাইরে হারিয়ে যেত না। সেই মানুষগুলির স্বকীয় বৈশিষ্ট্য যেন বহুজন হয়ে জমাট বেঁধে জনতায় অভিব্যক্ত করত প্রত্যেকটি মানুষের দুঃখ, শোক বা জয়োল্লাস, গর্ব অথবা প্রতিবাদ কিংবা বিদ্রোহকে। জনতার আয়তনে প্রত্যেক জনের ব্যক্তিত্বই খর্ব হয়ে যাওয়া দূরে যাক তাকে যেন আরও পরিস্ফুট করে ব্যক্ত করত তাদের আত্মনির্ভরশীলতা, সাহস, বিচারবুদ্ধি ও ডিসিপ্লিনকে। কিন্তু আমাদের দেশের জনতাকে দেখলে মানুষের সেই ধরনের পরিচয় পাওয়া যায় না। এ দেশী জনতায় মানুষের ব্যক্তিগত সত্তা বিলুপ্ত হয়ে জমাট বাঁধা অতিকায় এক অন্য কিছু অদ্ভুতের সৃষ্টি করে থাকে। এই অতিকায় অদ্ভুতের আয়তনে কি চেতনা, উন্মাদনা বা প্রেরণা বা ইচ্ছা নিহিত আছে এবং তা সুপ্ত কি জাগ্রত, তা নির্ণয় করা কঠিন।

বহুকাল ইয়োরোপে প্রবাসী এক বন্ধু কয়েক বছর আগে হঠাৎ দেশের প্রতি ভালোবাসা জেগে তীব্র হয়ে ওঠায় কয়েক সপ্তাহ ভারত সফর করে লণ্ডনে ফিরলেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হতে জিজ্ঞাসা করলাম, তাঁর স্বদেশ এতকাল ব্যবধানের পর কেমন লাগল? তিনি বললেন, "এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া দুষ্কর। বহুকালের অনুপস্থিতি দেশের সত্তার পরিত্যাজ্য উপসজ্জাকে ক্রমে অস্পষ্ট করে তার সঠিক রূপের একটা নির্দিষ্ট পরিচয়কে পরিস্ফুটভাবে চোখের সামনে এনেছিল। দেশের সাক্ষাৎ ও সংস্পর্শে সে স্বরূপ আজ আবার অস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। শুকনো কাঁচা রাস্তায় দ্রুতগামী যান যেমন পিছনে ধুলার কুয়াসা উড়িয়ে অপরদিকের দৃশ্যকে অস্পষ্ট করে দেয়, সময়ের পথে বিবর্তিত ঘটনাচক্র তেমনি তুলেছে প্রতিক্রিয়ার কুজ্ঝটিকা।

অল্পদিনের অতিথিবাসে, দেশের ওপরে বিছানো সেই ঘটনার ঘোলা বিস্তারে খুঁজে পাওয়া দু'একটা ফাঁক দিয়ে তার আকৃতিকে সুস্পষ্ট দেখা যায়নি বরং সে চেষ্টা করে কিছুটা বিভ্রান্তই হয়েছি। এইভাবে চোখে-পড়া দু'একটা বিভীষিকাময় দৃশ্যের ছাপকে স্মৃতির পাতা থেকে মুছে ফেলতে পারলে সুখী হতাম। যে দৃশ্যের স্মৃতি আজও আমার মনকে দারুণভাবে নাড়া দেয় —সে হচ্ছে হাওড়া স্টেশন থেকে বেরুতেই চারিদিকে অসংখ্য মানুষের ভিড়ের আচমকা সাক্ষাৎ। জনতার মানুষগুলিকে মনে হলো তারা যেন অতি ক্ষুদ্র কোনো কীটপতঙ্গের সমষ্টি নবরূপ পরিগ্রহ করে জমাট বেঁধে গেছে। উচ্ছিষ্টে বসা মাছির রাশিকে যেমন সয়াট-এর এক আকস্মিক আঘাতে মুহূর্তে পিষে একাকার করে দেওয়া যায় তেমনি সামনের ঐ নরকীটের পঙ্গপালকে যেন এক বিরাট সয়াট-এর ঘায়ে অনায়াসে চেপ্টে দেওয়া যেতে পারে, এমনি তাদের অক্ষম ও তুচ্ছ মনে হলো। জনতায় পড়ে মানুষকে এত ছোট ও নগণ্য দেখায় তারই বাস্তব পরিচয়ে ও নিজেকে তাদেরই একজন জেনে দুঃখে ও ক্ষোভে আমার মনটা উদ্বেলিত হলো এবং বেদনায় বুকটা ভেঙে গেলো।"

বালিগঞ্জ স্টেশনের লেবেল ক্রশিং-এর গেট পার হয়ে কসবার এলাকায় ঢুকতে যে অগণিত মানুষের ভিড়ের সম্মুখীন হতে হয় তা দেখে প্রতিবার মনে পড়ে সেই বন্ধুটির অভিজ্ঞতার কথা। কবিগুরুর কথায় এর খানিকটা বর্ণনা দেওয়া যেতে পারে—

এই কি নগর! এই মহারাজধানী!
চারিদিকে ছোট ছোট গৃহগুহাগুলি,
আনাগোনা করিতেছে নরপিপীলিকা
পথ দিয়ে চলিতেছে এরা সব কারা।
এদের চিনিনে আমি, বুঝিতে পারিনে
কেন এরা করিতেছে এত কোলাহল।
কী চায়! কিসের লাগি এত ব্যস্ত এরা!
এককালে বিশ্ব যেন ছিলরে বৃহৎ
তখন মানুষ ছিল মানুষের মতো
আজ যেন এরা সব ছোটো হয়ে গেছে!

এখন থেকে চল্লিশ বছর আগে কসবার বাসিন্দাদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব চোখে ধরা যেত এবং তাঁরা কোনো উৎসব বা মিছিলে একজোট হলেও তাঁদের প্রত্যেকের স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্ব জনতায় বিলীন হয়ে যেত না। সে সময়ের ভিক্ষুকদের পর্যন্ত বেশ যেন একটা আভিজাত্য ছিল। তারা কেউ ভিক্ষায় বঞ্চিত হতো কদাচিৎ এবং দাতার কাছ থেকে দান আসত অসঙ্কোচে বিনা দ্বিধায়। একতারা বাজিয়ে এক বৃদ্ধ বাউল প্রতি সপ্তাহে একটি নির্দিষ্ট দিনে পাড়ায় প্রত্যেকের বাড়িতে গিয়ে গাইত—

হরিনাম মহামন্ত্র হৃদয়ে জপ রসনা।
পেয়েছ মানব জনম এমন জন্ম আর হবে না।
ঐ হরিনামের ধ্বনি শুনে নারদ ঋষি বাজায় বীণে
ও শিব ত্যেজে কাশী শ্মশানবাসী
ঘরের ভাবনা তাও ভাবে না।

সেই একটানা একই সুরের নৈমিত্তিক পুনরাবৃত্তিতে কোনো গৃহস্বামী বা গৃহিণীর বিরক্তি কিংবা আপত্তি হতো না বরং অপরিহার্য অভ্যাসের মতো সেই বাউলের উপস্থিতি যেন একটা প্রয়োজনের তালিকাভুক্ত ব্যাপার ছিল। অসুস্থতা নিবন্ধনে কখনো বরাদ্দ দিনে তার অনুপস্থিতিতে অনেক বাড়িতেই সে দিনটার উপভোগে কিছুটা খালি পড়ে যাওরার মতো মনে হতো।

যে এক বৈষ্ণবী নাসিকার উপত্যকায় পরিপাটিভাবে অঙ্কিত তিলক ভূষিতা হয়ে 'জয় রাধেগোবিন্দ'র আওয়াজে উদারা মুদারা তারা মন্দ্রিত করে দরজায় উপস্থিত হতো প্রতি সপ্তায় একটি নির্দিষ্ট দিনে, তার হৃষ্টপুষ্ট নধর কান্তি দেখে মনে হওয়া অস্বাভাবিক ছিল না যে, সে ভিক্ষুণীর ভিক্ষা করাটা অবান্তর। কিন্তু সদর দরজার চৌকাটটি জুড়ে প্রতিমা প্রায় কায়েমী প্রতিষ্ঠিত হয়ে সে যখন প্রত্যেক বাড়ির অন্তেবাসীদের সঙ্গে ঘরোয়া সংবাদের খোস-গল্পে মেতে সকলকে মুগ্ধ শ্রোতায় পরিণত করত, তারপর সে ভিক্ষুণী কি পরমাত্মীয় তা প্রশ্নের বহির্ভূত বিষয় হয়ে দাঁড়াত। এরপর চালের সঙ্গে দু'একটা আনাজও তার ঝুলিতে নিক্ষেপ না করলে গৃহলক্ষ্মীদের চক্ষুলজ্জায় সঙ্কুচিত হওয়ার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। পরদেশী নতুন এক পরিবার আমাদের পাড়ায় আবাসী হলে যখন এই বৈষ্ণবীর আয়তন ও সজ্জা নিয়ে মন্তব্য করে ভিক্ষা দেওয়া উচিত হবে কি-না বলায়, তাকে সে হাত ঘুরিয়ে সতিলক নাসিকার ঝম্‌কানিতে শূন্যে যেন বিস্ময়ের একটা বিরাট রেখা টেনে বলল, "আমরণ! সাত সকালে কি অলুক্ষুণে প্রস্তাব, ভিক্ষা না হয় নাই দিলে, তাই বলে কি আমার জাতব্যবসা, ধর্ম, তোমার কথায় ছেড়ে দেবো?" বৈষ্ণবী সে বাড়িতে আর ভিক্ষে না চেয়ে বয়কট করাটা পাড়ার বহু লোকে সমর্থন করেছিল।

অজস্র তালির আলখাল্লা পরিহিত ফকির সাহেব লতানো কোনো গাছ থেকে বানানো ফণা-ধরা সাপের মতো অদ্ভুত আকৃতির লাঠি হাতে মোটা পুঁথির মালা জপ্‌তে জপ্‌তে হাঁকতেন 'মুস্‌কিল আসান।' তখন মনে হতো মোগল ছবিতে আঁকা দরবেশের ডেরা ছেড়ে তিনি বুঝি ভুল করে এই পল্লীতে এসে পড়েছেন। বাদশাজাদা যখন জোড়হস্তে তাঁর দোয়া মাঙতে প্রস্তুত, তখন সাধারণ গেরস্থরা ফকির সাহেবের শিন্নীর ব্যবস্থার কিছুটা দায়িত্ব নিয়ে ধন্য হবার চেষ্টা করবেন কি-না সে প্রশ্ন উঠতেই পারে না। এ ছাড়া বিশেষ পর্ব ও পূজার সময় আসত মরসুমী ভিক্ষুক। তারা খঞ্জনী বাজিয়ে এক এক বাড়িতে চণ্ডী, কি মনসার গান কিংবা আগমনী গেয়ে ধামাভরা চাল ও সব্জির সিধে উঠিয়ে নিত।

বিরাট এক শিঙে ফুঁকে ওলাবিবির নামে কেবল একটি পদ গেয়ে গেয়ে দুটি লোক আসত প্রতি বছর দিন কয়েকের জন্যে। তারা কোন দেশী লোক তা জানবার কারও আগ্রহ ছিল না। শিঙে ফুঁ দেবার মাঝে মাঝে তাদের একজন গেয়ে উঠত, "ছেলেপিলে রাখবি ঠাণ্ডা ওলাবিবি মা—" আর বাকি পদটা মিলিয়ে তার সঙ্গী নাকিসুরে যা গাইত তা বোধকরি এক মা ওলাবিবি ছাড়া আর কারও বোঝা সম্ভব ছিল না।

পরে আভিজাত্যহীন দীনহীন অসংখ্য অসভ্য রবাহূতের গড্ডালিকার আবির্ভাবে সেকালের সেই বনেদী ভিক্ষুকরা ঘৃণা ও লজ্জায় বোধহয় সমাধি কি মাটি নেবার উদ্দেশে কোথায় অন্তর্হিত হয়েছে। আগত এই রবাহূতের মধ্যে কে আসল আর কে নকল, তা নির্ণয় করতে গিয়ে ঠকে, জনসাধারণের মনে দয়া ও করুণার ধারা শুকিয়ে নিরেট পাথর হয়ে গিয়েছে। তাই ক্ষুধায় শীর্ণ কাতর দেহ, ভগ্নাংশ, দুরারোগ্য ব্যাধি আক্রান্ত ভিখারীর দুর্দশা ও আর্তরব মানুষের চোখ ও কানের নির্মম ও কঠিন পর্দায় প্রতিহত হয়ে হতাশার চোরাবালিতে ডুবে নিখোঁজ হয়ে যায় প্রায়ই। কিন্তু এর জন্যে কোন পক্ষকে দোষী সাব্যস্ত করবে কে? বর্তমান সভ্যতার ঘোড়দৌড়ের বাজিতে এগুলিকে স্বাভাবিক হার্ডল্‌স হিসাবে অনাসক্ত হৃদয়ে লঙ্ঘন করবার জন্য আমাদের অনেককেই এক ছল দার্শনিকতার অজুহাতের আড়ালে আত্মগোপন করতে দেখা যায়।

আজকের কসবায় খোয়া-পেটানো রাশি রাশি ফাটা, চাক্‌লা ওঠা, পিচে-মোড়া রাস্তাগুলি খোলা ড্রেনের দাঁড়ি টেনে দু'পাশে "হিগল্‌ডি-পিগল্‌ডি" একহারা দোহারা, বেঁটে খাটো, কিংবা সরু ও লম্বা, আধতলা থেকে আড়াইতলা বাড়ির স্তূপের জমজমাট ষ্ট্রীট বা রোডের নামে ব্যাপ্‌টাইসড হয়ে এখন বেশ বাড়ন্ত গড়নে উপনীত হয়েছে। উন্নতি যে হয়নি তা ক'জন কসবাবাসী হলপ করে বলবেন, বলা শক্ত। রাস্তার দু'পাশের সাবেকী চওড়া ও গভীর কাঁচা নর্দমাগুলিকে সিমেন্ট ইট দিয়ে মুড়ে বেশ ছিমছাম রূপ দিয়ে সভ্য করা হয়েছে। বর্ষায় যতটুকু ময়লা জল আগেকার গভীর খানায় স্থানলাভ করত, তা এখন শহুরে ড্রেন-এ কূল না পেয়ে রাস্তার ওপরে উঠে হাঁটু থেকে কোমর জলের বান ছুটিয়ে দেয়। কসবায় সভ্যতার বর্ধন গতির রেট দেখে বলা চলতে পারে যে, এর ভরা যৌবনের প্রাচুর্যে বার্দ্ধক্যের ভাঙন আসতে খুব অসুবিধে হবে না। তবে বলা যায় না, বৃত্রাসুর কি ভস্মলোচনের মতো বর পেয়ে থাকলে, দধিচীর হাড়ের ঘায়ে চূর্ণ কিংবা মুকুরে আপন মুখ দর্শনে ভস্মীভূত না হওয়া পর্যন্ত আধুনিক যুগের এই শহুরে কীর্তি বোধহয় অবিনশ্বর থাকবে।

যে কালের কথা লিখছি সে সময় আজকের পাকা রাস্তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারে এমন কেবল একটি সদর রাস্তাই কসবায় মাঝখানে শিরদাঁড়ার মতো বজায় ছিল। পায়ে-চলা কাঁচা পথগুলি এ পাড়া ও পাড়াকে সংযুক্ত করে স্নায়ুমণ্ডলীর

মতো মিলত এসে ঐ সদর রাস্তায়। বাদশাহী কি সুলতানী আমলের কিছু একটা ছিটেফোঁটা পড়ায় বোধহয় জায়গাটির কসবা নামকরণ হয়েছিল। সিরিয়া, ইজিপ্ট কি আলজেরিয়া প্রভৃতি আরব-প্রধান দেশের কসবা বলতে যে রোমান্টিক দৃশ্য ও ঘটনাবলী কল্পনালোকে উদ্ভাসিত হতে থাকে তার কণামাত্রও এই কসবায় কোথাও নেই। আদি বাসিন্দাদের বেশীর ভাগ ছিল কৈবর্ত, বাগ্দী ও পদ্মরাজ গোত্রীয় এবং চাষবাসই ছিল তাদের প্রধান পেশা। পরে হয়ত উচ্চবর্ণের হিন্দুদের হাতে এদের এলাকাগুলি চলে যায়। তখন কসবার বিভিন্ন অঞ্চলগুলির নাম ছিল একই শ্রেণীর বাসিন্দাদের দলাদলি হিসাবে এবং সেই কারণে প্রধান প্রধান পাড়ার নাম ছিল—মুখুজ্জে পাড়া, ঘোষাল পাড়া, কায়স্থ ও বিশ্বাস পাড়া ইত্যাদি। এগুলি আজকের পাড়াগুলির মতো সাড়ে বত্রিশ ভাজার নানান লোকের পাঁচমিশেলী জনতা ছিল না। কাঁচা রাস্তার আশপাশে ধানের ক্ষেত, কপির ক্ষেত, গাজর মটর ও অন্যান্য শাকসব্জির ক্ষেত তো ছিলই আর বাকি জায়গায় নানা আগাছার মধ্যে রাজারাণী হয়ে জন্মাত আস্‌শেওড়া ও ঘেঁটুর ঝোপগুলি। পাড়ার পোদ, কৈবর্তদের ছেলের ঘেঁটু পুজোর সময় রাত্রে বাড়ি বাড়ি গিয়ে সিধে যোগাড় করত গান গেয়ে। সে গানের দু'একটা পদ এখনো মনে পড়ে—

আমার ঘেঁটু যায় রে
ধুলো ওড়ে পায় রে
যে দেবে থালা থালা
তার হবে সোনার বালা
যে দেবে বাটা বাটা
তার হবে সাত বেটা
যে দেবে বাটি বাটি
তার হবে সাত বেটি
যে দেবে পাথর পাথর
তার হবে ধুমসো গতর

আর মাঝে মাঝে সমস্বরে চেঁচাত, 'ঘেঁটু যায় খোস পালায়' বলে।

বিশ্বাস পাড়ার বটতলায় গরমের দিনে হতো কথকথার উৎসব। প্রাঙ্গণে বড় সামিয়ানা খাটিয়ে ওপরে বাঁশের আড়া থেকে ঝুলিয়ে দেওয়া হতো আনারস, কলার কাঁদি, জামরুলের ঝাড়, বাতাবী লেবু এবং আরও নানা রকমের ফল আনাজের ভার। কথকঠাকুর পুথিপাটা নানা অনুষ্ঠানে বেদীর ওপর খুলে সাজিয়ে বেশ আড়ম্বরে তিলকাদির প্রসাধন করতেন। তারপর তেত্রিশ কোটি দেবদেবীদের উদ্দেশে তাঁর স্তব ও প্রার্থনা যেন আর শেষ হতেই চাইত না। অধৈর্য হয়ে ভাবতাম, আর কতক্ষণে তিনি আসল গল্প বলতে শুরু করবেন। ধ্রুবের উপাখ্যান বালক ধ্রুবের গৃহত্যাগ বর্ণনায় কথকঠাকুর ক্রন্দনের সুরে গেয়ে উঠতেন—

বিদায় হলাম ও জননী
রইলে কি মা নিদ্রাগত
আজকে তোমার প্রাণের ধ্রুব
চলে যায় মা জন্মের মতো

সঙ্গে সঙ্গে সভায় সকলের চোখের অশ্রুধারায় বন্যা আসবার উপক্রম হতো। একা কথকঠাকুর যেন মায়াজালের বিস্তারে সভাস্থলকে এক বিরাট নাট্যমঞ্চে পরিণত করে চোখের সামনে উপস্থিত করাতেন কত রম্য বা ভয়ঙ্কর দৃশ্য এবং সেই দৃশ্যপটে যেন শত শত অভিনেতা ও অভিনেত্রীরা মর্মস্পর্শী অভিনয় দেখাতে আবির্ভূত হতেন তাঁর ইচ্ছায় ও ইঙ্গিতে। তাঁর কুব্জাদলনের অঙ্গভঙ্গি আজও স্মৃতির চোখে ভেসে উঠলে হাসিতে দমবন্ধ হবার উপক্রম হয়।

উত্তর পাড়ায় কালীপুজোর সময় খুব ধুমধাম করে যাত্রার আয়োজন হতো। গালভরা নামের পর অপেরা আখ্যা দিয়ে যাত্রা কোম্পানীর দল আসত প্রতি বছর। বড় সামিয়ানার এক প্রান্ত থেকে কিছু দূরে কানাত-ঘেরা সাজঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে আসত দেবতা, দানব, বনদেবী, অপ্সরা, ঋষি, যোগিনীরা এবং আসরের মাঝখানের ফাঁকা স্থানটি তাদের উপস্থিতিতে পর্যায়ক্রমে হয় রাজসভা, কি বনস্থলী কিংবা ইন্দ্রপুরী, বৈকুণ্ঠধাম বা বলীরাজার পাতালপুরী অথবা শিবা শকুন পরিবৃত যোদ্ধার শবাকীর্ণ ভয়ঙ্কর রণক্ষেত্র হয়ে যেত নাটকের দৃশ্যের প্রয়োজনানুসারে। এক এক দৃশ্যের অন্তে জুড়িরা উঠে কালোয়াতি গান ধরত। এক কানে হাত চাপা রেখে মুখব্যাদানের রকমারি মোচড়ানি সহকারে ধামার, চৈতাল কি ঝাপতালে—

সম্বর সম্বর ক্রোধ
ওহে মহাঋষিবর
করজোড় করি, ক্ষমা
দীনে করুণা বিতর। ...এই ধরনের গীত

হৈহৈ রৈরৈ রবে প্রকট হয়ে যেত। বিষ্ণু, দেবরাজ ইন্দ্র থেকে আরম্ভ করে দুর্বাসা মুনি কি দশভুজা বলুন বা লক্ষ্মী অথবা বনবালাই বলুন এই বিরতির সুযোগে সাজঘরে সকলেই দেদার বিড়ি ও চায়ের সদ্ব্যবহারে ব্যস্ত হয়ে পড়ত। মুখুজ্জে পাড়ায় হরিসভার আটচালায় হতো কীর্তনের আসর। চন্দন-চর্চিত কলেবর প্রবীণ কীর্তনীয়ার আলখাল্লায় লটকানো অসংখ্য সোনা-রূপোর মেডেলের ব্যবহার দেখলে স্বয়ং গোয়েরিং সাহেবেরও হিংসে হয়ে যেত। তখনকার দিনে কোনো বর্দ্ধিষ্ণু গৃহস্থের বাড়িতে দুর্গাপূজা হওয়াটা স্বাভাবিক গর্বের ব্যাপার ছিল। কোনো পাড়ায় সে রকম সামর্থ্যবান গৃহস্থ না থাকলেই বারোয়ারী পূজার ব্যবস্থা হতো এবং সে ধরনের আয়োজন সম্মানে খাটো ছিল। আজকালকার অলিতে-গলিতে সর্বজনীন দুর্গাপূজার সঙ্গে আড়ম্বরে তালিম দেবার মতো ক্ষমতা সেকালে কারুর

ছিল না বললে অত্যুক্তি করা হবে না কিন্তু সেকালের পুজোয় খাদের চেয়ে আসল অর্চনার ব্যঞ্জনা ফুটে উঠত বেশী। আমাদের পাড়ায় চারুঠাকুরের আরতি দেখতে অনেক দূর থেকে আগত দর্শকদের ভিড় লেগে যেত। ধূপ ধুনায় ধূমায়িত সেই পূজা কক্ষে পুরোহিতকে অস্পষ্ট দেখাত, যেন ধূম ঘনীভূত হয়ে মানুষের আকার নিয়েছে আর তাঁর লাস্যে সঞ্চালিত ডান হাত সেই জমাট রঙীন ধোঁয়ারই একটা অঙ্কুরিত রেখা হয়ে ঢাক, ঢোল, কাঁসর ও ঘণ্টার নিনাদে কম্পিত ছন্দে নেচে দিকে দিকে উড়ে যাবার চেষ্টা করছে। এত কলরোলেও ঢাকঢোলের আওয়াজেও তন্ময়তা যে গভীর হতে পারে তা চারুঠাকুরের দেহকে প্রস্তরীভূতপ্রায় নিশ্চল রেখে বাঁ হাতে নিরবচ্ছিন্ন ছন্দে ঘণ্টাবাদন ও ডান হাতে উপকরণের পর উপকরণ বদল করে ঘণ্টার পর ঘণ্টা লীলায়িত ভঙ্গিমায় দেবতার আরাধনা দেখে যে কোনো দর্শকে অনুমান করতে পারত। মাঝে মাঝে কেউ গিয়ে চারুঠাকুরকে সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে না দিলে তিনি বোধহয় দিনের পর দিন মাসের পর মাস এমন কি বছরের পর বছর দেহ সচল থাকার শেষ মুহূর্তটুকু পর্যন্ত বিরামহীন আরতি করেই যেতেন। বর্তমানে ও ধরনের আরতি করে দেবতাকে তুষ্ট করার চেয়ে মণ্ডপে লাউড স্পীকার লাগিয়ে ফিল্মের রম্যগীতির রেকর্ড বাজিয়ে দেবতাকে গান শুনিয়ে সস্তায় বড় রকমের বরলাভের চেষ্টার রেওয়াজটাই এখন যত্রতত্র দেখতে পাওয়া যায়। কে জানে, এ সব সংগীত শুনে শুনে মা দুর্গার এখন হয়ত রুচি বদল হয়েছে। তাই গ্রামোফোন ও রেকর্ডের বোঝা কৈলাশ পর্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে যদি তাঁর বাহন ভয়ঙ্কর রকমের আপত্তি করে বসে তা হলে মায়ের দশটা হাতের একটা তো অভয় দিতে খালি আছে। সেই হাতখানায় একটা ট্রান্সিষ্টর সেট তো সহজেই নিয়ে যেতে পারবেন। নব্‌টা ঘুরোলেই শুনতে পাবেন দেশী ফিল্মের নায়ক-নায়িকাদের রুম্বা স্যাম্বা, ট্যাঙ্গো কি মাম্বোর অথবা চাচাচার মসলা ফোড়নে মজানো শ্রুতিরোচক বাছা বাছা গান। মা শুনে খুশী হয়ে মুখে আরও দুটো বেনারসি পানের খিলি পুরে মুচ্‌কি হাসবেন আর ব্যোম্ ভোলানাথ নন্দীর পিঠে সম্-এর ঘা দিতে দু'দশটা চাপড়ের তেহাই দিয়ে হেঁকে উঠবেন, 'সাবাস'। কার্তিক ও গণেশ কোনো গানের পছন্দ হওয়া ধুয়াটুকু চরম করে হজম করার জন্য শিস দিতে শুরু করবেন। আর বাক্‌দেবী ও শ্রীদেবী হাতের বীণা পুস্তক ও ধান্যাধার এবং কমল সেকেলে ঢঙ বলে ফেলে দিয়ে বোধহয় ইলেকট্রিক গীটার, ভ্যানিটি ব্যাগ ও ড্রেসিং কেসের অর্ডার পাঠাবেন।

সেকালের পূজায় ভক্তিভরে 'ধনং দেহি, পুত্রং দেহি, বলং দেহি' বলে অঞ্জলি দিয়েও বাস্তবে আজকের তুলনায় বিশেষ কিছু ভক্তরা পেতেন কি-না সন্দেহ। কিন্তু মায়ের আজকালকার বরপুত্রেরা পূজায় যে ধরনের সাড়ম্বর আয়োজন করে থাকেন এবং তাতে ন্যায্য বা নিষিদ্ধ সব কিছুরই আমদানীর আতিশয্য সত্যযুগের লোকদের পক্ষেও দেখানো সম্ভব ছিল না। এত মনোরম আলো ও সাজসজ্জা, এত রাজোচিত

উদরপূর্তিতে যাতে কোনো অপরিষ্কার কলঙ্কের ছাপ না এসে পড়ে তার জন্য মাতৃ-পূজার এই মহান্ আয়োজনে নাছোড়বান্দা ভিখিরীগুলিও পূজাঙ্গনকে নিখুঁত রাখতে এর ত্রিসীমা এড়িয়ে চলে। যে কয় কোটি বঙ্গ সন্তান আজ বেঁচে আছেন তাঁরা যে সুজলাং সুফলাং ও শস্য শ্যামলাং দেশের আনন্দময় পূজামণ্ডপে দাঁড়িয়ে 'বাহুতে তুমি মা শক্তি হৃদয়ে তুমি মা ভক্তি'র ভাবে গদগদ হয়ে 'এমন দেশটি কোথাও খুঁজে পাবে নাকো তুমি'-র কোরাস গেয়ে দশদিক মাত করে দিতে পারেন তা বাঙালীর পরম শত্রুও স্বীকার করে নেবেন।

সংস্কৃতি, বিদ্যা ও বুদ্ধির অহঙ্কারে গর্বিত বাঙালীর বর্তমানে দেবদেবী পূজার অপরিসীম ঘটা ও জাঁকজমক দেখাতে বিপুল অর্থনাশের পরিমাপ দেখে বিদেশীরা এ জাতির নৈতিক জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধি আদৌ আছে কি-না নিশ্চয়ই সন্দেহ করে থাকেন। যে দেশে, অন্ন, বস্ত্র, চিকিৎসা, শিক্ষা ও বাসগৃহের অভাবে সদাক্লিষ্ট ও অর্ধমৃত জনসমাজ জগতে অন্যের কাছে আবেদন ও ভিক্ষা প্রার্থনায় ক্রন্দন করছে সে জাতির এইভাবে পূজার্চনার অছিলায় জনসমাজের কাছ থেকে ছলে, বলে, পীড়ন ও কৌশলে ছিনিয়ে নেওয়া চাঁদায় সংগৃহীত বিপুল অর্থরাশিকে পানাহারে, বর্তিকা-সজ্জায় এবং প্রায়ই নিকৃষ্ট রুচির নৃত্যগীতবাদ্যাদিতে উড়িয়ে দেওয়ার কোনো সার্থকতা থাকতে পারে না। এই অর্থের বিনিময়ে প্রতি বছর কতগুলি শিক্ষাভবন, আরোগ্যনিকেতন ও অন্যান্য জনহিতকর পরিকল্পনাকে বাস্তবে পরিণত করা যেতে পারত এবং এখনও তা করা সম্ভব। আজকাল এ দেশে দিকে দিকে ক্ষণে ক্ষণে দিকপাল জননায়কদের অভ্যুদয় ঘটছে—বিশিষ্ট রাজনীতির সোপ্‌বক্সে চড়ে। আশ্চর্য হতে হয় যে, এই বিরাট নেতৃবর্গের কাউকে আজও এই বুদ্ধিহীন অপব্যয় ও অপচয়কে বন্ধ করতে এগিয়ে আসতে দেখা যায়নি। কে জানে! যে সোপ্‌বক্সে দাঁড়াবার ফলে এই জননায়কদের মাথাটা জনতার একটু ওপরে দেখতে পাওয়া যায়, ভগবান বেচার ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে লিপ্ত হলে সেটি হয়ত হাতছাড়া হতে পারে এবং আবার মাপে খাটো হওয়ায় নেতার পেশাটাও হয়ত মাঠে মারা যেতে পারে! কাজেই রাজনীতি যে বর্ণেরই হোক দেবদেবী পূজার ব্যবসাকে ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে এ দেশে কাজে লাগানো হচ্ছে বছরের পর বছর আর জনসাধারণ এর থেকে কোনো বিত্ত বৈকুণ্ঠলাভে বিভবময় হচ্ছেন তা তাঁরাই জানেন।

ফণী পাগল

বিখ্যাত কবি ও নাট্যকার ইব্‌সেন কল্পনা ও খেয়ালের নক্‌শা কেটে কত বিচিত্র মানব চরিত্রের অন্তরতম স্তরকে পর্যন্ত উন্মুক্ত করে দেখিয়েছেন তাঁর রচনায়—যার স্বরূপকে সমাজের কৃত্রিমতার ভিনিয়ারে চাপা দিয়ে ঢেকে রাখা হয়। মানব চরিত্রের

এই সত্তাকে বিবসন করে একেবারে নগ্ন করায় তাঁকে জীবদ্দশায় কত রকমের তীব্র নিন্দা ও বাদ-প্রতিবাদ শুনতে হয়েছিল। পীরপয়গম্বর প্রায় আখ্যা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অশ্লীল ও সস্তা চটকদার লেখক, পিশাচপন্থী, প্রলাপবাদী, নাস্তিক প্রভৃতি অপবাদও পেয়েছিলেন প্রচুর। আজকে সে সব মূঢ়জনের অতি প্রশংসা বা মিথ্যা অপবাদের জঞ্জালমুক্ত তাঁর রচনাবলী বিশ্বসাহিত্যের দরবারে যোগ্য সম্মানে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

তথাকথিত বাস্তব বুদ্ধির বিচার ও কল্পনার খেয়ালের টানাপোড়েনে কেউ যদি টাল খেয়ে সমাজ-সাধারণ-সম্মত আচার, ব্যবহার ও ভাবাভিব্যক্তিকে বজায় না রাখতে পারে, তা হলে তাকে ভব্যতার নীতি ও বিধান রক্ষার কাঠগড়ায় আসামী হয়ে সাজা পেতে হয়। এই সমাজপীড়িত খাপছাড়াদের পক্ষ নিয়ে মসী ও লেখনীর আয়ুধ দিয়ে লড়াই করতে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ইব্‌সেন। ব্যক্তিগত ভাবালুতা ও চিন্তার স্বাধীন ও অবাধ স্ফূরণকে বহুজন সম্মত নীতি বা আচার দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করার বিরুদ্ধে তাঁর অভিযোগ ছিল অতিশয় তীব্র। কল্পনা-বিলাসী সাহিত্যিক ও নাট্যকার ইব্‌সেন ব্যক্তি জীবনে ছিলেন অতিশয় একাকী ও সঙ্গীহীন। সমাজের সকল বিচার ও আচার বন্ধনমুক্ত তাঁর নিজ সত্তাই তাঁর রচনায় রূপ ধারণ করেছে পিয়ের গিণ্ট-এর চরিত্রে। সমাজ নিরূপিত নীতি বিচারের সংজ্ঞা ও বিধানকে পিয়ের স্বচ্ছন্দভাবে উপেক্ষা করে গিয়েছেন। কিন্তু বারে বারে তাঁর সর্বাঙ্গীন অনুভূতি দিয়ে প্রেম ও ভালোবাসার চেতনা ও বিলাসকে খুঁজে খুঁজে বেড়িয়েছেন দেশে বিদেশে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত। ইব্‌সেন-এর রচনার ছত্রে ছত্রে প্রায়ই এই মর্মকথা উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে যে, জগতে সবচেয়ে বড় অবিচার, শাস্তি ও বেদনা আসে প্রেম-বর্জিত ও বঞ্চিত জীবনে। দরদী মনের বিনিময়ে, মিলন ও স্পর্শের চেয়ে আনন্দময় ও মধুর জগতে আর কিছু নেই আর সেই ভালোবাসার চাওয়া-পাওয়াকে বিচারবুদ্ধির পথে লাভ করা যায় না। তাই তিনি সর্বজনগ্রাহ্য বিচারবুদ্ধির সত্তাকে উপহাস করেছেন কায়রোর উন্মাদালয়ের তত্ত্বাবধায়ক বেগ্রিন্‌ফেলট-এর ভাষণে। বেগ্রিন্‌ফেলট পিয়েরকে 'King Exegesis' আখ্যা দিয়ে উন্মাদালয়ের অন্তেবাসীদের কাছে উপস্থিত করালেন এবং উপলব্ধ এক নিদারুণ সত্যের ভারে পীড়িত চিত্ত তিনি তাকে ব্যক্ত করে হাল্‌কা হবার জন্যে ঘোষণা করলেন যে, জাগতিকভাবে বিচার-বুদ্ধি, বিগত রাত্রিতে এগারো ঘটিকায় লুপ্ত হয়েছে। ফলে সেই সময়ে যাঁরা ছিলেন উন্মাদ তাঁরা পেয়েছেন স্বাভাবিকচিত্ততা ও যাঁরা ছিলেন স্থিরমস্তিষ্ক তাঁরা হয়েছেন উন্মাদ। এই প্রসঙ্গে নানা কথার পর পিয়ের মন্তব্য করলেন যে, স্থিরমস্তিষ্ক ও মতিচ্ছন্নতার কোনটা ঠিক তা নির্ণয় করতে ছাপার ভুল হওয়ার মতো প্রমাদ ঘটা স্বাভাবিক। পিয়ের-এর এই উক্তির মর্ম উপলব্ধি করেছিলাম ফণী পাগলের সান্নিধ্যে।

যতদিন পর্যন্ত কসবার গ্রাম্য পরিবেশ অক্ষুণ্ন ছিল ততকাল ফণী পাগলের চিহ্ন

সম্পূর্ণ অবলুপ্ত হয়ে যায়নি। ইট-পাটকেলে তৈরী গ্রাম শহরতলী হয়ে আজ কসবা তাঁর ভিটে ও আস্তানাকে দৃষ্ট জগৎ ও অধিবাসীদের মনের স্মৃতি থেকে বিলুপ্ত করে দিয়েছে।

ফণী পাগলের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ ও পরিচয় হয় এক আকস্মিক ও ভয়ঙ্কর পরিস্থিতিতে। কসবার এক রাস্তার বেড়খাওয়া বেশ বিস্তৃত খানিকটা জমিতে ছিল তাঁর আস্তানা। এক পাশে একটি বড় বকুল গাছ এবং গুটিকয়েক বেল ও নারিকেল গাছ ছাড়া প্রচুর ঝোপঝাড়ের মধ্যে দেখা যেত একটা চালাঘরের খানিকটা। সেই কাঁটা-ভরা জঙ্গলময় সবুজের স্তূপের মাঝে চালাঘরটির পটভূমিতে কখনো দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যেত জটাজুটধারী ঘন কালো শ্মশ্রু ও গুম্ফবিশিষ্ট মুখে বিস্ফারিত নেত্রের উজ্জ্বল চাউনী ফেলে মধ্যবয়সী গৌরকান্তি এক অতীব শক্তিসামর্থ্যশালী পুরুষকে। আশপাশের পরিষ্কার জমি ও লোকালয়ের ব্যবধান খুব বড় না হলেও ঐ জঙ্গল-ভরা স্থানটুকু ও তার অধিস্বামীকে মনে হতো আমাদের জীবনের বাহিরের বহু তফাতের আর এক জগৎ ও তার উদ্ভট বাসিন্দা স্বরূপ। ঐ পরিবেষ্টনী থেকে মাঝে মাঝে ক্রুদ্ধ ভৈরবের মতো বজ্রনাদ ও আস্ফালন করতে করতে ফণী পাগল নেমে পড়তেন লোকালয়ের মাঝে এবং সঙ্গে সঙ্গে রাস্তা থেকে ছোট বড় সকলেই উধাও হয়ে পাশের বাড়ি বা দোকানে আত্মগোপন করতেন। তাঁর সেই সংহার-মূর্তিকে আরও ক্ষিপ্ত করত কোনো শয়তান দর্শকের আড়াল থেকে 'ফণী পাগল' সম্বোধন। এক মাস কি দু'মাস অন্তর তাঁর স্ত্রী বছর দশেকের ছেলেকে সঙ্গে করে আসতেন পাগলের ডেরায় এবং কয়েক ঘণ্টা থেকে তাঁর বাসগৃহকে যতদূর সম্ভব সুষ্ঠু করা যায় তার ব্যবস্থা করে আবার চলে যেতেন। তাঁর স্ত্রী-পুত্রের উপস্থিতিকালে ফণী পাগলকে বেশ স্বাভাবিকচিত্ত ভালোমানুষ রূপে দেখা যেত। তৎকালীন কসবার অধিবাসীদের মধ্যে প্রচলিত কিংবদন্তী অনুসারে আমরা জেনেছিলাম যে, স্বামীকে সম্পূর্ণভাবে আপন আয়ত্তে রাখবার চেষ্টায় ফণীবাবুকে তাঁর স্ত্রী তুকতাক্ গুণবিশিষ্ট কি একটা পানীয় পান করিয়ে দেবার পরই তাঁর মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটে। ঐ ঘটনার পূর্বে স্বাভাবিক অবস্থায় ফণী পাগল ছিলেন পেশাদারী উকিল এবং তাঁর না-কি বেশ পশারও ছিল। তাঁর স্ত্রীর প্রতি এই নিদারুণ অভিযোগের কতখানি সত্য ও প্রমাণযোগ্য তা কেউ খোঁজ করেননি বা তা করবার প্রয়োজন বোধও করেননি। কারণ এ দেশে কোনো কুৎসা, প্রচারে মুখরোচক ও শ্রুতি বিনোদনের উপযুক্ত হলে তা সত্য কি মিথ্যা সে অনুসন্ধান বা বিচারের প্রয়োজন হয় না। আমাদের 'অধিকন্তু ন দোষায়' প্রথার প্রতি প্রগাঢ় ভক্তি আছে সেইহেতু সমাজে দোষী ও নির্দোষের তফাৎটা অতিশয় সংক্ষিপ্ত—প্রায় একটি অতি ক্ষীণ রেখার ব্যবধান বলা যেতে পারে। তাই অপরাধ না থাকলেও পছন্দমতো আরোপিত অপরাধে সাধ্বী বিদুষী রমণীর দুশ্চরিত্রা ও মুরুজনের অপবাদ পেয়ে সাজা পাওয়া এবং সহস্র পাপে কলঙ্কিনী ও বুদ্ধিহীনার সমাজের নেকনজরে আলায় এবং

সাবিত্রীসমা পবিত্রা ও বিদ্যায় বাগ্‌দেবীর পর্যায়ে উন্নীত হওয়াটা কিছুই আশ্চর্যের ব্যাপার নয় —বিশেষ করে যদি এ হেন দেবীর সামাজিক প্রতিপত্তি ও অর্থের জোর থাকে। যাইহোক ফণীবাবুর পাগল হয়ে যাওয়ার মূলে যে সত্য কারণই থাকুক, এ চলতি কিংবদন্তী নিয়ে কেউ বাদ-প্রতিবাদ করতে আসেনি।

ফণী পাগলের ধাতব যে কোনো জিনিসের প্রতি একটা বিশেষ আকর্ষণ ছিল। পথে পড়ে-থাকা লোহা, তামা বা পিতলের পাত, তার বা শলাকা কিংবা রকমারী পেরেক, স্ক্রু, বোল্টস, নাট থেকে আরম্ভ করে ভাঙা এনামেল মগ বা গামলা তাঁর দৃষ্টিতে পড়লেই তাদের সেই অনাদৃত ও ধূলাবলুণ্ঠিত দশার উদ্ধার হয়ে যেত। একদিন কোনো গ্রহ প্রসন্ন থাকায় ফণী পাগল রেল লাইনের দু'পাশে সীমানা জ্ঞাপনকারী লোহার খোঁটায় বাঁধা যে তারের বেড়া থাকে তারই একটি খোঁটা কোনো উপায়ে হস্তগত করেছিলেন। প্রায় ছ'ফুট দীর্ঘ এই লৌহদণ্ডের যে অংশটি মাটিতে পোঁতা থাকত সে অংশের গড়ন ছিল বল্লমের চারশিরা ফলকের মতো। এমনি একটি আয়ুধের অধিকারী হওয়ায় এবং লোকে উত্যক্ত করার ফলে তিনি নিজেকে অর্জুন বা ভীম সেন ধারণা করে প্রায় মহাকালের সংহার মূর্তিতে কসবার রাস্তায় রাস্তায় রুদ্রতাণ্ডবলীলা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন। এক সহপাঠীর বাড়িতে লুকোচুরি খেলতে মত্ত আমি খেলার উত্তেজনায় দৌড়ে রাস্তায় বেরিয়ে আসতেই আচমকা একেবারে ঐ কালভৈরবের সামনে পড়ে গেলাম। মুহূর্তে, সকলের বিনাশে উত্থিত সেই লৌহদণ্ডটি ঠিক আমার মাথার ওপরে আঘাতের জন্য প্রস্তুত দেখলাম। অতীতের স্মৃতি আজ কিছুটা ফিকে হয়ে এলেও এখনও পরিষ্কার মনে পড়ে যে, সে অবস্থায় পড়ে ভীত হলেও কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে যাইনি। বিপদের আকস্মিক প্রকোপে ছোটদের বিবেচনা শক্তি বড়দের চেয়ে বেশী বিভ্রান্ত হয় না, বরং সে পরিস্থিতিতে কি করা সমীচীন তা বোধহয় বড়দের চেয়ে তারা ত্বরিৎ নির্ণয় করতে সক্ষম। যে সকল বর্বরেরা পাগলকে উত্যক্ত করে তার প্রতিক্রিয়াকে একটা মজা দেখা হিসাবে নিত তার বাইরে ছিলেন বহুসংখ্যক অধিবাসী যাঁরা এই উন্মাদকে 'ফণীবাবু' বা 'ফণীদা' সম্বোধনে তাঁকে যথাযোগ্য সম্মান দেখাতেন এবং আমরা জানতাম যে তাঁদের সান্নিধ্যে ফণী পাগলের পাগলামীব মাত্রা প্রশমিত হতো এবং তিনি প্রায় স্বাভাবিক শান্ত অবস্থা ফিরে পেতেন। তাই ভরসা করে পরিত্রাণের শেষ সম্বল হিসাবে ডাক দিলাম —'ফণীদা'। চারপাশে যাঁরা এই দৃশ্য দেখছিলেন তাঁরা হয়ত ভেবেছিলেন, যেমন হাড়িকাঠে চেপে-ধরা ছাগশিশুর কণ্ঠ থেকে নির্গত ভয়কাতর শব্দ পূর্ণ উচ্চারিত হবার আগেই খাঁড়ার ঘা তাকে স্তব্ধ করে দেয় আমারও তেমনি দশা হবে। কিন্তু উত্থিত দণ্ডটি আর নামল না। সেটা উঁচিয়ে ধরে 'আমার সামনে থেকে ভাগ' বলে বজ্রনাদে ফণী পাগল আমাকে তাঁর সামনে থেকে হাঁকিয়ে দিলেন।

পরদিন বাড়ির দৈনন্দিন আহারের সামগ্রী সওদা করতে বাজারে যেতে ফণী

পাগলের ভিটের পাশ দিয়ে যাবার সময় দেখি তিনি তাঁর চালাঘরের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন জটাজুটধারী শান্ত শিবের মতো। আমাকে দেখেই তিনি হাতছানি দিয়ে ডাকলেন। সেই কাঁটা জঙ্গলের প্রাকার দেওয়া পাগলের ভিটেয় প্রবেশ করে তাঁর সম্মুখীন হওয়ার মতো আমার সাহস ছিল না। কিন্তু এও ভাবলাম যে, ঐ একটি মাত্র রাস্তা দিয়ে আমাকে প্রত্যহ বাজার ও স্কুলে যাতায়াত করতেই হবে এবং কোনো না কোনো দিন ঐ পাগলের নাগালে পড়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই স্বাভাবিক। এই আহ্বানকে উপেক্ষা করে গেলে তাঁর মনে যে প্রতিক্রিয়া হবে তার ফল যে খুব শুভ না হতে পারে এবং সে পরিস্থিতি বর্তমানের চেয়ে আরও হয়ত ভয়ঙ্কর হবে ভেবে, বুকে সব সাহসকে জড় করে ডেকে উঠলাম, 'ফণীদা'। তাঁর কাছে উপস্থিত হতে তিনি 'আয়' বলে পিঠে হাত রাখলেন। সে হাতের স্পর্শ যে যথেষ্ট স্নেহভরা ছিল তা সহজেই অনুভব করেছিলাম। কিন্তু তাঁর ঘর দেখাবেন প্রস্তাব করায় আবার ভয়ের কাঁপন এসে গেলো আমার মনে ও সর্বাঙ্গে। কিন্তু ঐ পরিস্থিতি থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার আর কোনো উপায় না থাকায় একেবারে শেষ-যাত্রার জন্য প্রস্তুত হয়ে ঢুকলাম তাঁর চালাঘরের ভিতর। সেখানে যে দৃশ্য দেখলাম তাতে মনে হলো যেন রূপকথার এক যাদুকরের ভোজবাজি বানাবার কারখানায় ঢুকেছি। যত রকমের ফেলে দেওয়া ধাতব জিনিস কল্পনা করা যেতে পারে তার একত্র সমাবেশ ছিল ঐ ঘরটির সারা দেওয়াল থেকে আরম্ভ করে ছাদ পর্যন্ত ভরা। এক দেওয়ালের মাঝখানে একটি খাঁড়া অটুট অবস্থায় বিরাজ করছে দেখলাম। সেটির প্রতি তাঁর যে বিশেষ অনুরাগ ছিল তার প্রমাণ দিচ্ছিল খাঁড়াটির সদা ঘষা মাজায় অত্যুজ্জ্বল ধারালো রূপ। অনিচ্ছা সত্ত্বেও সেই হনন অস্ত্রটির ভয়াবহ ধারালো রূপ বারেবারে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করায় সাহসের পুঁজি শেষ হয়ে এসেছিল এবং পলায়নের পথ খুঁজতে বললাম, 'ফণীদা বাজার থেকে তাড়াতাড়ি বাড়িতে না ফিরলে মা'র কাছে মার খাব।' নিষ্কৃতি যে সহজে পাব আশা করিনি। কিন্তু 'আবার আসিস' —বলে তিনি আমায় ছেড়ে দিলেন।

বাড়ির দৈনিক বাজার করার ভার আমার ওপর ছিল। একদিন ফণী পাগলকে তাঁর ভিটের কিনারায় রাস্তার ধারে দাঁড়িয়ে আছেন দেখে তাঁকে বাজার থেকে কেনা শাকসব্জি থেকে কিছুটা দিতে খুব ইচ্ছে হলো এবং তিনি সেই যৎসামান্য উপহার সুন্দরভাবে গ্রহণ করলেন। এরপর প্রায়ই আমাদের বাড়ির দৈনিক বাজারের সামান্য অংশ ফণী পাগলের রসনাগত হবার সম্মান পেত। বাড়িতে কেনা জিনিসের পরিমাণ কম হওয়ার উচিত কৈফিয়ৎ আবিষ্কার করা এক মহাসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এ সম্বন্ধে সত্য কারণকে স্বীকার করা ঘোর উন্মাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতানোর চেয়ে কঠিন মনে করেছিলাম। বেশ কিছুকাল আলাপের পর প্রাথমিক ভয় ও সংশয় প্রশমিত হলে ফণী পাগলের মত্ত ও স্বাভাবিক অবস্থায় নানা স্তরের ক্রমাভিব্যক্তিকে —ছোট বলেই বোধহয় বিশেষ করে বুঝবার একটা

কৌতূহল মনে জেগেছিল। এটা লক্ষ্য করেছিলাম যে, মত্ততার পূর্ণ প্রবণতায় তাঁর বিবেকবুদ্ধি একেবারে লোপ পেত:না, যার ফলে সেই দুর্দান্ত পাগলামীর অবস্থাতেও কে প্রিয় বা অপ্রিয়, তাঁর ব্যবহারে তার ভেদাভেদ ধরা পড়ত। কিন্তু প্রিয়জন হলেও তিনি যেন চাইতেন না যে তাদের সান্নিধ্যে আসায় সকলের চক্ষে তাঁর মত্ততার ভয়ঙ্কর গুরুত্ব ও তার জন্য ভীতি, খর্ব হয়ে যায়। তাঁর পরিপূর্ণ মস্তিষ্ক বিকৃতি অবস্থার প্রাধান্য ছিল প্রায় যোগীর সমাধিস্থ হওয়ার মতো। সেই অবস্থায় দু'একবার সাহস করে তাঁর সঙ্গে আলাপ করতে গিয়ে মারের হাত থেকে বেঁচে গেলেও যে প্রচণ্ড গালাগাল ও হাঁকডাক পেয়েছিলাম তাতে হৃদয় প্রায় পাকস্থলীগত হবার উপক্রম হয়েছিল। তাই তিনি রুদ্র রূপ ধারণ করলে তাঁর সান্নিধ্যে না আসাই মঙ্গল জেনেছিলাম। ফণী পাগলের সঙ্গে মেলামেশায় সবচেয়ে উপভোগ্য সময় হতো যখন তিনি শান্তভাবের উন্মাদনায় মত্ত থাকতেন। সে সময় তিনি একাধারে দার্শনিক, কবি, নাট্যকার, অভিনেতা কি বিশ্বকর্মা শিল্পী হয়ে পড়তেন এবং তাঁর কল্পনা জগতের ক্রম-বিস্তার জমিতে ফলানো ফসল পাগলামীর গোলায় পূর্ণ হয়ে উপচে, আমাদের ধারণায় ঠিক চেতনার জগতে পড়ে, নানান রঙে ও ঢঙে এদিক ওদিক ছড়িয়ে পড়ত।

তাঁর জমির একপাশে ছিল পুকুর। একদিন দেখি তিনি তার পাড়ে বসে জলে হাত ডুবিয়ে কি যেন টেনে তোলার চেষ্টা করছেন। জিজ্ঞাসা করতে বললেন, তিনি পুকুরের পাশে যে নারিকেল গাছ ছিল জলে তারই প্রতিবিম্বের গাছ থেকে ফল পাড়বার ব্যবস্থায় রত। যখন বললাম যে ফল তো রয়েছে গাছের ওপর বহু উঁচুতে। তিনি বললেন, "মূর্খ, আমি কি সে গাছের ফল পাড়তে যাচ্ছি? একটু নামলেই এই যে জলের নীচে গাছের নাগাল পাওয়া যাবে।" ফল, জলের গাছ থেকে তিনি চয়ন না করলেও সেটা যে সম্ভব তারই আবিষ্কার আনন্দে বেশ মশগুল হয়ে উঠলেন।

লরীর ধাক্কায় এক বাড়ির গেটের সামনে বসবার ইঁট-সিমেন্টে গাঁথা বেঞ্চ ভেঙে গিয়েছিল। ফণীদার নজরে পড়ায় তিনি তৎক্ষণাৎ নিজেকে বিশ্বকর্মা বানিয়ে তার মেরামত করতে ব্যস্ত হয়ে গেলেন। বেঞ্চিটির মাঝখান ভেঙে যে ফাটল হয়েছিল সেখানে প্রচুর লালা ফেলে মুঠো মুঠো ধুলো বর্ষণ করে হাত দিয়ে ঘষতে শুরু করে দিলেন। এ সব দেখে 'কি হচ্ছে' প্রশ্ন করতে তাঁর মন্তব্য হলো যে, যে হতভাগারা এটিকে ভেঙেছে তারা এর মেরামতের ব্যবস্থা করবে না তাই তিনি সকলের উপকারার্থে ভাঙাটা জুড়ে আবার আস্ত করে দিলেন। তাঁর খেয়ালী মন দেখছিল যে, ফাটলটি তাঁর কারিগরীতে জুড়ে গিয়েছে আর আমি—বাস্তবের সীমানায় ঠেকে ঠুঁটো-হওয়া দৃষ্টি নিয়ে দেখছিলাম বেঞ্চের অপরিবর্তনীয় ভাঙন, লালা ও ধুলির জঞ্জাল ও পাগলের পাগলামি। এ যেন চিরন্তন শিল্পের শিল্পী ফণী পাগলের ছদ্মবেশে বাস্তব ও কল্পনাকে এক সঙ্গে তরল নির্যাসে পরিণত করে তারই মদিরা

বানিয়ে পান করে নেশায় রঙিন দৃষ্টিতে জগৎকে আপন হাতে ভেঙে-গড়ে সাজাবার রঙ্গে মেতে গেছে। কেবল ফণী পাগলকে বুঝবার মতো নেই সল্‌ভিগ, ট্রল্‌এরা, বেগ্রিনফেল্‌ট্‌ এবং আরও অনেকে। পিয়ের-এর মতো তিনি যদি শ্যামবসনা পর্বত-বাসিনীর দেখা পেতেন তা হলে হয়ত নিজের পরিচয় দিতেন ফণীন্দ্র মহারাজকুমার বলে এবং সে যুবতী হয়ে পড়তেন কোনো রাজকুমারী। তাঁরা পরস্পরকে জানাতেন যে, তাঁদের বাস্তবে দৃষ্ট জীর্ণ ও দীন বসন আসলে সোনা রূপোর সুতায় বোনা কিংখাব। রাজকন্যা বলতেন যে, পর্বতবাসীদের রীতি অনুযায়ী তাঁদের দেশে সব কিছুরই দুই প্রকারের রূপ হয়ে থাকে। তাই আসলে যেটা তাঁর পিতার রাজ-প্রাসাদ, দৃষ্টির বিকৃতিতে তাকে অপরের মনে হওয়া স্বাভাবিক যে সেটা নুড়ি ও পাথরের স্তূপ মাত্র। পিয়ের-এর মতো তিনি জবাব দিতেন যে, তাঁর রাজ্যেও ঐ একই দশা, তাই তাঁর চালাঘরে রাখা আসল সোনা মানিককে লোকের চোখে মনে হবে ছাতাপড়া, পচা ছাই-পাঁশের সামিল। প্রাসাদের যে জানালা স্ফটিকে মোড়া তাকে দেখাবে চীর বসনের পর্দা কি ছেঁড়া মোজার আচ্ছাদন। যুবতীর যদি উত্তর হতো —যেমন কালোকে দেখায় সাদা অথবা কুরূপা হয় সুরূপা। তা হলে তিনি বলতেন, যেমন বড়কে দেখায় ছোট অথবা অপরিচ্ছন্নকে দেখবে ফিটফাট পরিষ্কার। তাঁদের দু'জনের মতে দ্বিমত হতো না যে, তাঁরা দু'জনে, পাজামার সঙ্গে পায়ের মতো, পরস্পরের আদর্শ সঙ্গী ও সঙ্গিনী। কিন্তু পিয়ের গিণ্ট-এর স্রষ্টার মতো ফণী পাগল একমাত্র নিজ সঙ্গ ছাড়া 'রয়ে গেলেন চিরকাল একা ও নিঃসঙ্গ।'

ফণী পাগল সুকণ্ঠ ছিলেন। একদিন অতি ভোরবেলায় দূর থেকে ভেসে আসছিল তাঁর কণ্ঠনিঃসৃত সংগীতের, প্রবাহ—

অয়ি ভুবন মন মোহিনী।
অয়ি নির্মল সূর্য করোজ্জ্বল ধরণী
জনক জননী।

পাগলের প্রাণ-খোলা আহ্বানে মন্দ্রিত হচ্ছিল নব দিবসের সূচনায় জাগরণের আগমনী। সেই সুরতরঙ্গের কল্লোল প্রবাহিত হয়ে আমাদের বাড়ির দরজায় পৌঁছে স্তব্ধ হয়ে গেলো। যেন এক পসলা জোর বৃষ্টির অন্তে প্লাবনে-ভাসা জমির জল সরে হঠাৎ শুকনো হয়ে উঠল। আমার নাম ধরে তিনি ডাকতে বড়রা শঙ্কিত হয়ে পড়লেন এবং কি সূত্রে ফণী পাগল নাম ঠিকানা ঠিক জেনে আমার খোঁজে আসতে পারেন তার রহস্য ভেদ করবার আগেই আগত উন্মাদের অধৈর্য আহ্বানকে স্থগিত করবার জন্য তাঁদের দরজা খুলে পাগলের সম্মুখীন হতে হলো। তাঁর আগমনের হেতু জিজ্ঞাসা করবার আগেই ফণী পাগল তাঁর জমির গাছ থেকে পাড়া দুটি বড় পাকা বেল আমাকে দিতে এসেছেন বলে সে দুটি বড়দের জিম্মায় রেখে চলে গেলেন। পরে জবাবদিহি করতে আমাকে বলতে হলো ফণী পাগলের সঙ্গে আমার চেনা পরিচয়ের বিবরণ এবং দৈনিক বাজারের সওদা, ওজনে ও সংখ্যায়

কম হয়ে যাওয়ার কারণও স্বীকার করতে বাধ্য হলাম। আমাদের বাড়ির কড়া নীতি ও নিয়মবিরুদ্ধ যে সব ক্রিয়াকলাপের জন্য বহু সাজা পেয়েছি তার মধ্যে ফণী পাগলের সঙ্গে মিত্রতা অন্যায়ের পর্যায়ে গণ্য হলো না এবং এই দোষের প্রতিষেধক তর্জন বা দণ্ড না পেয়ে রীতিমতো আশ্চর্য হয়েছিলাম।

প্রতি বছর বর্ষারম্ভে কসবায় কলেরার মড়ক লাগত এবং এখনও বোধহয় সেই বাৎসরিক মহামারীর প্রকোপের কিছু পরিবর্তন হয়নি। উন্মাদ বলে ফণী পাগলকে সব আইন ও সমাজনীতি লঙ্ঘনে কোনো প্রতিফল পেতে হয়নি কিন্তু এই মহামারীর অলিখিত বিধানে তিনি ধরা পড়ে মরণাপন্ন হলেন। কলেরায় আক্রান্ত ফণী-পাগলকে বাঁচাতে পাড়ার অনেকে উপস্থিত হলেন তাঁর ডেরায় এবং ডাক্তার এসে তাঁকে আশ্বাস দিয়ে বললেন, "ভয় নেই ফণীবাবু, আমরা এ্যাম্বুলেন্স ডেকে আপনাকে এখুনি হাসপাতালে পাঠাবার ব্যবস্থা করছি।" চালাঘরের সামনে লতাগুল্মহীন ছোট খোলা উঠানে কার দেওয়া একটি মাদুরের ওপর লম্বমান ফণী পাগলের চোখ দুটি তখন আর উন্মাদনার উত্তেজনায় স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল ছিল না। নিষ্প্রভ সে চোখ উপস্থিত আমাদের সকলকে ডিঙিয়ে যেন দেখছিল বাস্তবের সীমানার ওপারে বিস্তৃত —আমাদের দৃষ্টির নাগালের বাইরে অন্য কোনো জগৎকে। ক্ষীণকণ্ঠে তিনি ডাক্তারকে অনুনয় করে বললেন, "এ্যাম্বুলেন্স আর ডাকবেন না। আমি সেরে উঠলে জানেনই তো বিকৃত চৈতন্যের জগতে আমায় ফিরে যেতে হবে। আর সেখানে যেতে চাই না ; কাজেই এই শেষবার আমার বোধশক্তি ও ধারণাকে বিলুপ্ত না করে জীবন থেকে চাই মহাবিদায়।"

এ্যাম্বুলেন্স আর ডাকা হয়নি। মতিচ্ছন্নতা ও স্থির মস্তিষ্কের কোনটা ইহজগতে মূল্যবান তা জীবনের শেষ মুহূর্তে ফণী পাগল উপলব্ধি করেছিলেন কিনা কে জানে। ইহজীবনের অন্তে আমাদের কোনো সত্তা এই জগতে কিংবা আর কোনো জগতে যদি বজায় থেকে যায় তা হলে অশরীরী ফণী পাগলকে বোধহয় স্বাভাবিক বিচার-বুদ্ধি-বিশিষ্ট বা মতিচ্ছন্নতার হিসাবনিকাশ দিয়ে আর নিগৃহীত হতে হয়নি।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্ট ও শিল্পশিক্ষা

বাল্যে স্কুলের পাঠতৈরীর নিত্যকার রেওয়াজে ঢিলে হওয়ার লক্ষণ দেখলেই পিতৃদেব খাতা-পেন্সিল এগিয়ে দিয়ে বলতেন, "এখন পড়তে যদি ভালো না লাগে তো ছবি আঁক।" এভাবে পড়ুয়াকে পাঠে ব্যাপৃত করার প্রক্রিয়ায় ভবিষ্যৎ পরিণাম কি হতে পারে আগে জানতে পারলে হয়ত বাবা আমার পড়ায় অবসাদ-গ্রস্ত মনকে আগ্রহী করাতেন অঙ্ক বিষয়ে কিংবা এর বিকল্প-ব্যবস্থা হতো যষ্টি

প্রহার! সে আমলে পুত্রদের মানুষ করার অমোঘ বিধানে পিতার ইচ্ছাই ছিল চরম শেষকথা এবং এ ব্যাপারে পিতৃনির্দেশের ব্যতিক্রম ঘটাতে চাইলে তার প্রতিফল হতো প্রায়শই অতি নির্মম। ভদ্রঘরের সন্তানদের মানরক্ষার বরাদ্দ পেশার ফর্দে আমার জন্য নির্দিষ্ট ছিল ডাক্তার হওয়া এবং ১৯২৯-এ ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষার প্রস্তুতি প্রায় শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে শুরু হয়ে গেলো ডাক্তারি পড়াবার নানা তোড়জোড়। যখন সাহস করে জানালাম —ডাক্তার নয়, হতে চাই শিল্পী এবং যেতে চাই আর্ট স্কুলে, পিতার শাশ্বত অধিকারের ভিতে ঘা-দেবার এই স্পর্ধায় সত্বর নির্দেশ পেলাম এই মর্মে যে, আপন স্বাধীন চিন্তা যদি এতই প্রখর হয়ে থাকে তা হলে তার সিদ্ধি মেটানো হোক পিতৃগৃহ হতে দূর হয়ে আপন চেষ্টায় স্বাবলম্বীভাবে।

এই সময় স্বাধীনতা-সংগ্রামে ব্রতী অগ্রজেরা বিপ্লবী দীক্ষায় ব্রতী করতে শহরে গ্রামে রন্ধ্রে রন্ধ্রে তরুণ ও কিশোরদের বেপরোয়া হবার মতো মানসিকতার আগুন ছড়িয়ে দিয়েছেন। কসবায় তখন কিশোর সংঘের কার্যক্রম জোরদার চলছে। ব্যায়াম ক্রীড়াদির আকর্ষণে জমায়েত যুবক-তরুণদের মধ্যে থেকে বাছাই হয়ে গোপনে দানা বাঁধছিল বিপ্লবী কর্মীর সংখ্যা। সেই সঙ্গে গুপ্তসন্ধানী চরদের তৎপরতায় বেশ কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়ে কারাগারের দীর্ঘমেয়াদে অকালে জীবন শেষ করলেন। এ সব অসংখ্য —প্রায় অজ্ঞাতদের মধ্যে যাঁরা একটা আদর্শকে বাস্তবায়িত করতে জীবন উৎসর্গ করে আজও স্বাধীন ভারতে বেঁচে আছেন এবং যাঁরা কেউ কেউ তাবিজ দেওয়ার মতো তাম্রপত্র পেয়ে চিহ্নিত হয়েছেন তাঁরা কতজন আকাঙ্ক্ষিত অভিলাষ পূর্ণ হওয়ার তৃপ্তিলাভে নিজেদের ধন্য মনে করেছেন বলা শক্ত।

কিশোর সংঘের সঙ্গে আমার যোগাযোগ প্রথম প্রতিষ্ঠা থেকেই ঘনিষ্ঠ ছিল। শিল্প-শিক্ষার প্রসঙ্গে পিতৃনির্দেশের ব্যতিক্রমের কোনো সম্ভাবনা নেই দেখে ঝাঁপিয়ে পড়লাম বিদেশী বস্ত্র-বর্জন আন্দোলনে ব্রতী স্বেচ্ছাসেবকদের ভিড়ে।

বেঙ্গল প্রভিন্সিয়াল কংগ্রেস কমিটির দপ্তর ছিল তখন কলকাতার বৌবাজার স্ট্রীটে, বৈঠকখানা বাজারের কাছে। এই দপ্তরে নানাবিধ কাজের মধ্যে একটি ছিল, বিদেশী কাপড়ের লেনদেনের প্রধান প্রধান আড়তে হামলা করা ও ধৃত বিদেশী কাপড়ের গাঁটরীতে আগুন লাগিয়ে পোড়ানো। প্রায় প্রতিদিন বি. পি. সি. সি.-র দপ্তর থেকে বিকালে সাইক্লোস্টাইলে ছাপা একটি বুলেটিন রাস্তায় বিলি করা হতো এবং যাঁর নাম সম্পাদক হিসাবে থাকত তাকে পুলিশে বেশ ঘটা করে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যেত। কিন্তু বহু চেষ্টা করেও পুলিশ ঐ সব বুলেটিন কোথায় ছাপা হতো তার কিনারা করতে পারেনি। নিকটবর্তী এলাকায় এক সঙ্কীর্ণ গলির গর্ভে প্রায়-লুপ্ত একটি বাসায়, যার বাসিন্দা ছিলেন অত্যন্ত নিরীহদর্শন এক প্রৌঢ় অধ্যাপক, সেইখানেই ঐ সব বুলেটিন ছাপা হতো। কোনো পুলিশের চর এর

হদিস পেলেও হয়ত এটি বন্ধ করায় সরকারকে সাহায্য করেনি, কারণ পুলিশের মধ্যে এমন লোকও ছিলেন যাঁরা মারাত্মক বিপত্তির সম্ভাবনা হতে পারে জেনেও স্বাধীনতা-সংগ্রামী ও বিপ্লবীদের সম্ভব মতো সতর্ক করে দিতে পরাঙ্মুখ হননি। মনে পড়ে, এক গোয়েন্দা বি.পি.সি.সি.-র কাছে এক রাস্তার মোড়ে দাঁড়িয়ে এই কেন্দ্রের প্রতি নজর রাখতেন। তিনি বিশ্বাসভাজন কর্মীদের জানিয়ে রেখেছিলেন —যখন তাঁকে একটি সিগারেট ধরাতে দেখা যাবে তার সঙ্কেত হবে পুলিশের আশু হামলা অনিবার্য।

বিদেশী বস্ত্র-বর্জন যজ্ঞে লিপ্ত বিপথগামী ও বিমূঢ়মতি ছেলেদের চিত্তশুদ্ধির জন্য তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের যে সব মোক্ষম ব্যবস্থা ছিল মাস কয়েকের মধ্যে ধর-পাকড়, বেত্রাঘাত, কয়েদ প্রভৃতির নানা অভিজ্ঞতা অর্জন করলেও বারম্বার ফিরে গিয়েছিলাম ঐ একই জায়গায়। একদিন আকস্মিকভাবে দেখা হয়ে যাওয়ায় বাড়ি ফিরে যাবার আদেশের সঙ্গে পেলাম, আর্ট স্কুলে ভর্তি হবার জন্য পিতৃসম্মতি। সেই সময় ছাত্র ধর্মঘটের জন্য গভরমেণ্ট আর্ট স্কুল বন্ধ না থাকলে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্ট স্কুলে হয়ত শিক্ষার্থী হতাম না এবং তা হলে অনেক মনীষী শিল্পী ও শিক্ষক যাঁদের তত্ত্বাবধান, উপদেশ ও শিক্ষার অমূল্য সম্পদে ধনী হয়েছি তার থেকে বঞ্চিত হওয়ায় জীবনে বেশ একটা বড় ফাঁক থেকে যেত।

কলকাতা পৌরসভা দপ্তরের দক্ষিণ-পূর্বে রাস্তার অপর দিকের মোড়ের বাড়িটির সামনের দিকটার ১৯৩০ সাল নাগাদ নাম ছিল 'হিন্দুস্থান বিল্ডিং' এবং এরই তিনতলায় ছিল ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের দপ্তর ও স্কুল। ১৯৩১ সালে এটি স্থানান্তরিত হয় এরই সংলগ্ন অংশের সমবায় ম্যানসনে। অবনীন্দ্রনাথের প্রধান ও খ্যাতনামা ছাত্রেরা, বিখ্যাত 'পঞ্চ পাণ্ডব' সহ প্রায় সকলেই শিল্পশিক্ষা পেয়েছিলেন শিল্পাচার্যের গভরমেণ্ট আর্ট স্কুলে শিক্ষকতা কালে। ওরিয়েণ্টাল আর্ট সোসাইটির প্রতিষ্ঠার কয়েক বছরের মধ্যেই অবনীন্দ্রনাথ প্রিয় শিষ্য নন্দলাল বসু মহাশয়কে স্কুল পরিচালনার ভার অর্পণ করেন। পরে নন্দবাবুকে কবি শান্তিনিকেতন কলাভবনে নিয়ে যাওয়ায় অবনীন্দ্র-শিষ্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার মহাশয়কে সোসাইটির স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। উড়িষ্যার বংশ-পরম্পরাগত ঐতিহ্যবাহী মন্দির-ভাস্কর্য শিল্পে দক্ষ শিল্পী গিরিধারী মহাপাত্র মহাশয়ও ছিলেন এই স্কুলের শিক্ষক। কিন্তু তাঁর শিল্প শিখতে আগ্রহী কোনো ছাত্র ছিল না। ভাস্কর্য শেখার মুখ্য উদ্দেশ্য থাকায় তাঁর কাছে শিক্ষানবিসি শুরু করলাম। তিনি আমাকে একখণ্ড কাঠ দিয়ে বললেন, "ইহারে কাটঅ।" কেটে কি তৈরী করব প্রশ্ন করায় জবাব পেলাম, "কিছু না শুধু ইহারে কাটিয়া শেষ করঅ।" কাষ্ঠখণ্ডটি ক্রম ছেদনে এমন ছোট আকারে দাঁড়াল যে, সেটিকে পায়ে চেপে ধরে কাটা আর সম্ভব হচ্ছিল না। নিরুপায় হয়ে যখন আবার শিক্ষকের উপদেশ চাইলাম, তিনি বেশ গম্ভীরভাবে বললেন, "তুমি তো মোর বপ অছি তুম্হারে কি

দেখাইব।" তাঁর এই উক্তিতে স্তম্ভিত হয়ে ক্ষিতীন্দ্রনাথ মহাশয়কে এমন কথা বলার রহস্য কি জিজ্ঞাসা করতে তিনি খুব হাসতে লাগলেন। আমাকে রীতিমতো ক্ষুব্ধ দেখে বললেন, "তুমি বোধহয় জানো না, গিরিধারীর বাবাকে গগণেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ পুরী থেকে প্রথম মূর্তি বানাবার জন্যে ঠাকুরবাড়িতে নিয়ে আসেন আর তাঁর নাম ছিল চিন্তামণি মহাপাত্র।" শিক্ষক মহাশয়ের হেঁয়ালিটি বোঝা গেলো কিন্তু তার তাৎপর্যে ভাস্কর্য শিক্ষালাভের সুগম প্রণালীর কোনো ইঙ্গিত পেলাম না। বেশ কিছুকাল তাঁর শিক্ষাধীনে থাকার পর বুঝলাম যে, বংশপরম্পরাগত মূর্তি তৈরীর প্রথম পর্যায় কেটেছে এঁদের হাতিয়ার ও উপাদান নিয়ে খেলায়। পরে বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে হাতিয়ারের ব্যবহারে, উপাদানের প্রকৃতির পরিচয়ে, প্রথমে কারু নকসা এবং হাত ও পায়ের গঠন অভ্যাস আয়ত্তাধীন করতে করতে দশ-পনেরো বছরে হয়ত সম্পূর্ণ একটি মূর্তির রূপায়ণ দক্ষতা অর্জন করেছেন। এঁদের কাছে শিল্প শেখার অধিকার আসে বংশধর হয়ে জন্মের ক্রমবিবর্তনে যা অন্য গোষ্ঠী থেকে আসা বিদ্যার্থী রূপে সম্পূর্ণভাবে অর্জন করা প্রায় অসম্ভব। অতএব ভাস্কর্য-শিক্ষা স্থগিত রেখে চিত্রবিদ্যায় পারদর্শী হওয়ার পথ সুগম বিবেচনায় ক্ষিতীন্দ্রনাথ মহাশয়ের কাছে আবেদন করলাম, যদি তিনি আমায় তাঁর ছাত্র হবার অধিকার দেন।

সময়ের পরিবর্তনে আজ শিক্ষকের কাছে শিখবার অনুমোদন প্রার্থনা মনে হবে অবান্তর নতি-স্বীকার। কারণ বর্তমানে ছাত্ররা করে দাবি —শিখিয়ে দিতে হবে নতুবা ··· !! ভীমনাদে উচ্চারিত হয় স্লোগান, চোখে ভেসে ওঠে ক্রুদ্ধোদ্যত মুষ্টিরাশি যার নিষ্পেষণে শিক্ষক ও ছাত্রের মধুর সম্পর্কে সৃষ্ট ভক্তি, বিনয়, নিষ্ঠা ও ভালোবাসা নিঃশেষিত।

ক্ষিতীন্দ্রনাথের কাছে শুনতাম, তাঁর গুরু অবনীন্দ্রনাথের অপরিমিত স্নেহসিঞ্চিত নির্দেশনায় শিল্পদৃষ্টি ও শিল্পসৃষ্টির তোষাখানায় প্রবেশের অবাধ অধিকারলাভ। সে তোষাখানার দরজা খুলতে লাগত শিষ্যের গুরুর প্রতি শ্রদ্ধার চাবিটি ও তার ভিতরে দেখার সুযোগ ঘটত গুরুর স্নেহসৃষ্ট বাতিতে। আমার অসীম সৌভাগ্য যে, ক্ষিতীন্দ্রনাথ নিজ গুরুকে অনুসরণ করে আমাকে দিয়েছিলেন অন্তরঙ্গ স্নেহ।

অনেকে অবনীন্দ্র-প্রবর্তিত শিল্পকলার অভ্যুদয়কে বঙ্গের 'রেনেসাঁস' নামে অভিহিত করেছিলেন। যে সকল ঘটনাবলী ও কারণের যোগাযোগে ইতালিয় রেনেসাঁসের উদ্ভব ঘটেছিল সেই রকম সম্ভাবনার সঙ্গে নব্যবঙ্গীয় শিল্পকলার তুলনা-মূলক মূল্যায়ন হয়ত অনেকের কাছে অতিশয়োক্তি বলে মনে হবে। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, এই শিল্পের স্ফুরণ শীঘ্রই সারা ভারতকে প্রভাবান্বিত করেছিল এবং স্বাধীন জাতীয় সত্তার অভিজ্ঞান শিল্পরূপের আদর্শ হিসাবে ব্যাপক-ভাবে সম্মানিত হয়েছিল। ইতালিয় রেনেসাঁস শিল্পীদের সঙ্গে বঙ্গীয় শিল্পীদের জীবনাদর্শ ও চরিত্রের তুলনা করা যায় না কিন্তু এঁদের মধ্যে একমাত্র ক্ষিতীন্দ্র-

নাথকে এ দেশের ফ্রা আঞ্জেলিকো বলে চিহ্নিত করলে বোধহয় অত্যুক্তি হবে না। ফ্রা আঞ্জেলিকোর জীবনে যেমন চিত্রকরণ ছিল তাঁর ধর্মচিন্তা ও প্রার্থনার একাঙ্গীভূত রূপপ্রকাশ, ক্ষিতীন্দ্রনাথের চিত্ররচনার মূল প্রেরণা ও বিকাশের উৎসে ছিল তাঁর বৈষ্ণবীয় ধর্মবিশ্বাস ও ভক্তির রূপায়ণে উৎসর্গীকৃত চিত্রভাবনা। তাঁর অতি স্বকীয় চিত্রশৈলীতে লীলায়িত রেখার ছন্দ, পেলব রঙের মধুর সঙ্গতি সদাই যেন প্রেম ও ভক্তির সিঞ্চনধারায় সিক্ত। বাল্যেই তিনি বৈষ্ণব ধর্মে অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন এবং দীক্ষা নেবার পর পরম নিষ্ঠায় কীর্তন গান শিখেছিলেন তখনকার বনেদী কীর্তনীয়াদের কাছে। রবীন্দ্রনাথ, গগণেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ সমীপে তাঁর ডাক পড়ত এবং তাঁদের কার্পণ্যহীন সাধুবাদ জানাত তাঁরা কতটা মুগ্ধ হতেন। আঁকার সময় ছবির সফল পরিণতির আনন্দ ধ্বনিত হতো তাঁর সুকণ্ঠের কীর্তন দোহার গুঞ্জনে।

একদিন দেখি যে, তিনি ছবির কাগজে চিত্ররূপের বিন্যাসকরণে একটি পায়ের খসড়া এঁকে মুছে আবার এঁকে তার পুনরাবৃত্তি করে চলেছেন বারম্বার। পরে হঠাৎ প্রায় হতাশায় বলে উঠলেন, "তোমার পায়ে মাথা রেখে স্বয়ং কৃষ্ণই হিম্‌সিম খেয়েছেন আর আমার মতো অধমকে কি সে পা তুমি সহজে বানাতে দেবে!" দেখলাম তিনি রাধার মানভঞ্জন ছবির রূপায়ণ করছেন, রাধার পদাশ্রিত কৃষ্ণের নত মস্তক তাঁর চিত্রপ্রত্যাশাকে তুষ্ট করলেও রাধিকার পদপল্লবের ঈপ্সিত গঠন রূপকারের চোখে ঠিক ধরা দিচ্ছিল না। শেষে পেন্সিলটি ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে শিক্ষক বললেন, "চল হে, আমরা গঙ্গার ধারে একটু বেড়িয়ে আসি।" সারাদিন কাজের পর নদীর ধারে সান্ধ্যভ্রমণ ছাত্র ও শিক্ষকের প্রায় নৈমিত্তিক অভ্যাসে দাঁড়িয়েছিল। পথ চলতে চলতে তিনি, সমবয়সীকে বলা যায় এমন ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ব্যাপার ও সমস্যার কথা আমাকে অবাধে বলে যেতেন যা অনেক সময় শুনতে আমার দ্বিধাবোধ হতো। তাঁকে একবার এ বিষয়ে একটু সলজ্জ উল্লেখে তিনি বললেন, "দেখ, এ সব তোমায় বলে পার্থিবচিন্তায় ভারাক্রান্ত মনকে একটু ফাঁকা না করলে সেখানে আমার চিত্রচিন্তার আশ্রয় হবে কি করে? আর তোমায় এ সব বলা সবচেয়ে নিরাপদ বলেই এমন অনায়াসে ব্যক্ত করে হাল্‌কা হয়ে যাই।"

গুরু অবনীন্দ্রনাথ ও তাঁর প্রিয় শিষ্যদের নানা কাহিনী শুনতাম ঐ সান্ধ্য পরিক্রমার দৌলতে। সে সব লিপিবদ্ধ করলে আয়তনে হয়ত একটি পুস্তকের কলেবর প্রাপ্তি ঘটতে পারে।......অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলে উপাধ্যক্ষ থাকাকালীন একজন একটি প্লাষ্টারের ভেনাস মূর্তির মাথা ভেঙে নিয়ে যায়। যে নিয়েছে সে যদি স্বীকার করে মাথাটি ফেরৎ দিয়ে যায় তা হলে কোনো সাজা দেওয়া হবে না ঘোষণা করায় অপকর্মকারী ছাত্রটি এসে অবনীন্দ্রনাথের কাছে মাথাটি ফেরৎ দিলে তিনি তাকে স্কুল ছেড়ে চলে যেতে বললেন। সে বললে, 'স্যার আপনি সাজা দেবেন না প্রতিশ্রুতি পাওয়ায় দোষ স্বীকার করে মাথা ফেরৎ দিলাম, আর এখন

আপনি কথা খেলাপ করে আমাকে সাজা দিচ্ছেন!' তিনি বললেন, 'তোমায় তো সাজা দিচ্ছি না বরং তোমার উপকার করছি। কারণ যে সুন্দরকে নষ্ট করতে পারে ও শিল্পকে ভাঙতে পারে তার চিন্তায় ও হাতে শিল্প কোনোদিন সৃষ্ট হবে না। কাজেই পণ্ডশ্রমে অনেকগুলি বছর নষ্ট না করে তুমি অন্য কোনো পেশার অনুশীলনে নিজেকে নিযুক্ত করার চেষ্টা করো। তুমি যদি মাথা না ভেঙে পুরো মূর্তিটা চুরি করতে তা হলে তোমাকে সাদরে স্কুলে রাখতাম তো নিশ্চয়ই উপরন্তু তোমায় একটা মেডেল ও মাসিক বৃত্তি দেবার ব্যবস্থা করতাম।'

অবনীন্দ্রনাথের জীবিতকালে যাঁরা তাঁর প্রকৃত শিষ্যত্বের খ্যাতিতে চিহ্নিত ছিলেন, শিল্পাচার্যের তিরোধানের পর আরও অনেককে সেই সম্মানের অধিকারী জ্ঞাপনে তৎপর হতে দেখা গিয়েছে। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথের শিষ্যত্ব-প্রাধান্যের অধিকার একমাত্র তাঁদেরই যাঁরা শুরু থেকে গুরু সঙ্গলাভে তাঁরই নির্দেশিত শিল্পপথ থেকে কখনও বিচ্যুত না হয়ে আজীবন সেই ধারায় শিল্পরচনা করে গেছেন। এঁদের সংখ্যা সীমিত —নন্দলাল বসু, সুরেন গাঙ্গুলা, দুর্গেশ সিংহ, অসিত হালদার, মুহম্মদ হাকিম, ভেঙ্কটআপ্পা, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, সুরেন কর, শৈলেন দে, ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদার ও পুলিনবিহারী দত্ত এই গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। আরও কয়েকজন তাঁর শিষ্যত্বের সুযোগ লাভ করেন যদিও পরবর্তী সময়ে শিল্পাচার্য-নির্দেশিত শিল্পধারা থেকে সরে গিয়ে অন্য ধারায় বা শৈলীতে নিজেদের নিয়োজিত করে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। এঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য রূপকৃষ্ণ, মুকুল দে, দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী প্রমুখ। আবার অন্য ধারায় শিক্ষান্তে অবনীন্দ্র-ধারায় অনুরক্ত প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়কেও শিল্পাচার্যের শিষ্যমণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত করা যায়। আমার পরম সৌভাগ্য যে সুরেন গাঙ্গুলী, দুর্গেশ সিংহ, মুহম্মদ হাকিম ও ভেঙ্কটআপ্পা ছাড়া বাকি অবনীন্দ্র-শিষ্যদের সকলের সঙ্গে পরিচিত হবার ও সান্নিধ্য লাভের সুযোগ পেয়েছিলাম এবং তা ঘটেছিল শিল্পগুরু ক্ষিতীন্দ্রনাথের আনুকূল্যে।

অবনীন্দ্র-শিষ্যকুলের শিক্ষাধীন ছাত্রদের ভাগ্যেও মাঝে মাঝে শিল্পাচার্যের দর্শন ও উপদেশ লাভ খুব বিরল ছিল না এবং সেই মূল্যবান সাক্ষাৎগুলির স্মৃতিচারণ আনন্দের খনি-স্বরূপ।

১৯৩০ সালের সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের বাৎসরিক প্রদর্শনীতে ছবি দাখিল করার সময় আমার সহপাঠী সুধাংশু রায় কৃত ছবির কোনো নাম না থাকায় তাকে নাম দিতে বলা হলে সে উপযুক্ত কোনো শব্দ খুঁজে পাচ্ছে না জানাতে সমবেত শিক্ষক ও ছাত্রদের নানা মন্তব্যের অবতারণায় যোগ্যনাম সাব্যস্ত করা গেলো না। এমন সময় অবনীন্দ্রনাথ উপস্থিত হওয়ায় তাঁকে এই সমস্যা সমাধানের আবেদন জানানো হলে তিনি বলে উঠলেন, "আরে এ তো Night before Wedding!" ছবিটিতে দেখানো ছিল মাটির বাড়ির বারান্দায় নিদ্রাগত এক যুবতী। ছবির নামকরণ শুনে সুধাংশু ক্ষুব্ধস্বরে বলে উঠল, "তা কি করে হয় স্যার!

এ তো দুপুরবেলায় সব কাজ সেরে ঘুমচ্ছে।" শিল্পাচার্য বললেন, "যে মেয়ে আসন্ন বিয়ের দিনে ঘুমোয় দুপুরেও বিয়ের রাতের স্বপ্ন এসে তাকে রাতদুপুরই করে ফেলে।" বলা বাহুল্য যে, ঐ নামেই ছবিটি প্রদর্শিত হয়েছিল।

প্রায় শেষ-করা আমার একটি ছবি একদিন তিনি হাতে তুলে নিয়ে কিছুক্ষণ নিরীক্ষণ করে প্রায় আনন্দ-শিহরণ জাগানো প্রশংসা করে ফেললেন। আমাকে প্রতিক্রিয়াহীন নির্বাক দেখে বললেন, "কি হে, তোমার কি মনে হচ্ছে যে প্রাপ্যের উপযুক্ত প্রশংসা পাওনি?" বললাম, "না, আশার অতিরিক্ত প্রশংসাই পেয়ে গেছি।" শুনে বললেন, "তুমি তাতে যে খুশী হয়েছ তা তো মনে হচ্ছে না।" "ঠিক তাই" —বলায় তিনি বলে উঠলেন, "ও ক্ষিতীন শোনো, তোমার ছাত্রের কথা, প্রশংসা করলে ও না-কি খুশী হয় না!" এর কারণ জানিয়ে বললাম যে, "আমার শিক্ষক ক্ষিতীন্দ্রনাথের ছবি দূর থেকে দেখলেই চেনা যায় যে সেটি তাঁর রচনা, কিংবা শিল্পাচার্যের ছবিও নজরে পড়লে চিনিয়ে দেয় এর রচয়িতাকে, ছবিতে লিখিত নাম না পড়েই তা উপলব্ধ হয়। কিন্তু আপনার এত প্রশংসা-পাওয়া আমার ছবিটির স্রষ্টা যে কে সেটা দর্শক জানতে পারবে না যতক্ষণ না আমার লেখা নামটি পড়বে। জানি, সেই পর্যায়ে আমি পৌঁছাতে পারিনি, তাই আপনার প্রশংসা মনে জমা রইল কিন্তু আনন্দ জাগাল না।" শুনে তিনি প্রায় ভর্ৎসনার স্বরে বলে উঠলেন, "ক্ষিতীন তোমার এই ছাত্র মনে হচ্ছে বড্ড বই পড়তে শুরু করেছে। একে নিষেধ করে দাও যেন আর বইটই না পড়ে —না হলে এর মাথা খারাপ হতে আর বেশী দেরি হবে না।" তাঁর এই কঠিন নির্দেশ শুনে বললাম, "স্যার, আপনি এ যুগের এক বিরাট চিত্রকর তো বটেই, তার ওপর আপনি অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী, মৌলিক সাহিত্যেরও জনক কিন্তু কোনো বইটই না পড়েই কি আপনার এই বিশাল অধিকার এসেছে?" আমার কথা শেষ হতেই তিনি নাটকীয়ভাবে হাত ওপরে তুলে, "ক্ষিতীন সর্বনাশ একে গ্রাস করে ফেলেছে ওকে আর সামলানো যাবে না" —বলতে বলতে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

সোসাইটির বাৎসরিক প্রদর্শনীতে তৎকালীন কলকাতার বহু বিদগ্ধজনদের সমাগম হতো এবং সেখানে শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, গগণেন্দ্রনাথের উপস্থিতিতে এমন একটি বিশিষ্ট পরিবেশের সৃষ্টি ঘটত যা উপস্থিত সকলে সাদরে উপভোগ করে যেন ধন্য হতেন।

গগণেন্দ্রনাথকে প্রথম চাক্ষুষ দেখার সুযোগ হয় ১৯৩০ সালে। তখন তিনি পক্ষাঘাতের প্রকোপে বাক্‌শক্তি রহিত। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় এই, বাক্যালাপ না করেও তাঁর সঙ্গে ভাব বিনিময়ে আমাদের কোনো অসুবিধা হতো না! তাঁর অপূর্ব সুন্দর চোখদুটির ভাব ব্যঞ্জনায় যেন পরিষ্কার শোনা যেত তাঁর অনুচ্চারিত কথাগুলি। আমরা প্রণাম করে দাঁড়ালে তাঁর চোখ আশীর্বাদ করে বলল, 'কেমন আছ, কাজ কেমন হচ্ছে?' আর আমরা তা যেন পরিষ্কার শুনতে পেয়ে জবাব

দিতাম, 'ভালো আছি, কাজ আমাদের বেশ চলছে।' এই চোখের চাউনিতে অনায়াস আলাপের অবিশ্বাস্য অভিজ্ঞতা আজও স্মরণে সজীব হয়ে আছে।

সেই সময় সোসাইটিতে যে ক'টি স্মরণীয় প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়েছিল তার একটি ছিল যামিনী রায়ের প্রথম পর্বের পটচিত্রাবলম্বী রচনার প্রথম প্রদর্শনী। আর একটি ছিল গগণেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথের মোগল ও রাজপুত ছবির অপূর্ব সংগ্রহের বিরাট প্রদর্শনী। আমাদের দুর্ভাগ্য যে, বিশেষ প্রয়োজনে যখন তাঁরা এই অমূল্য সংগ্রহকে বিক্রি করবার বিজ্ঞপ্তি দিলেন তখন এই অভাগা দেশে কোনো বিত্তশালী ব্যক্তি বা শিক্ষা-সংস্কৃতির বাহক কোনো প্রতিষ্ঠান এই শিল্প-সম্পদকে কিনবার জন্য কোনো আগ্রহ প্রকাশ না করায় অবশেষে আমেদাবাদের ধনী বণিক আম্বালাল সারাভাই ঐগুলি করায়ত্ত করে নেন। এই সংগ্রহটিকে হারানো শুধু পশ্চিমবঙ্গের নিদারুণ ক্ষতি নয় সমগ্র বাঙালী জাতির অমার্জনীয় অপরাধ। আর একটি প্রদর্শনী হয় লক্ষ্ণৌ আর্ট স্কুলের তৎকালীন অধ্যক্ষ ও অবনীন্দ্র-শিষ্য অসিতকুমার হালদার মহাশয়ের কাঠের তক্তাভিত্তিক, গালা রঙ দিয়ে তৈরী, কাল্পনিক রূপ নকসায় রচিত চিত্রাবলীর। ঐ ছবিগুলির তিনি একটি সাধারণ নাম দিয়েছিলেন 'ল্যাকৃসিট'। ইয়োরোপে প্রচলিত Abstract Art-এর প্রচলন তখন চারিদিকে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে এবং বিদেশী পত্রিকায় তার বিবরণ ও ছাপানো প্রতিলিপি নিশ্চয়ই হালদার মহাশয়কে অনুপ্রাণিত করেছিল নতুন চিত্ররূপ ও শৈলীর মোহে। এর আগেই গগণেন্দ্রনাথের অতীব মৌলিক চিত্রাবলীতে সে প্রভাব পরোক্ষে সার্থকভাবে প্রতিবিম্বিত হয়েছিল। হালদার মহাশয়ের ঐ ছবিগুলিতে কেবল গালা রঙের ব্যবহার ছাড়া এমন কোনো মৌলিক অবদান ছিল না যা হৃদয়জাত বা মস্তিষ্কজাত রূপসংস্কারকে আকর্ষণ করতে পারে। এই প্রদর্শনীতে আগত অবনীন্দ্রনাথকে ছবিগুলিকে 'ল্যাকৃসিট' নাম দেওয়ার তাৎপর্য কি জিজ্ঞাসা করায় তিনি বললেন, 'আরে এও বুঝলে না! ল্যাকারের 'ল্যাক্' আর অসিতের 'সীট' এ দুই মিলে জন্মেছে ল্যাকৃসিট।' এই কটুশ্রাব্য মন্তব্য থেকে অনেকেরই উপলব্ধ হলো যে, আচার্যদেব হয়ত তাঁর শিষ্যের এই নতুন শিল্পদিশাভিমুখে অভিগমন প্রচেষ্টাকে একেবারেই সমর্থন করেননি।

অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিল্পধারার প্রচার ও সমাদর অতি অল্প সময়ের মধ্যেই প্রায় সারা ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল এবং এর দ্রুত পরিচিতি হওয়ার মূলে, আজকালকার মতো বিজ্ঞাপন-পারদর্শী লেখক বা তথাকথিত শিল্প-সমালোচকের কোনো প্রাধান্যময় ভূমিকা দেখা যায়নি। তৎকালীন দেশজ বহু মাসিক পত্রিকায় শিল্পীদের ছবির রঙিন প্রতিলিপি প্রকাশ করা হতো যার ফলে জনসাধারণ শিল্প ও শিল্পীকে জানবার ও চেনবার সহজ সুযোগ পেতেন। মরশুমী সব্জির মতো যেমন আজকাল তথাকথিত শিল্প-সমালোচকদের পত্রিকায় আমদানী দেখা যাচ্ছে চল্লিশ পঞ্চাশ বছর আগে এই ধরনের, কিছু শিল্পপুস্তক পড়ুয়া কিন্তু বুদ্ধি ও বিচারে

শিল্পকে দেখা ও বোঝার গুণহীন সমালোচকদের যত্রতত্র আত্মবিকাশ করতে দেখা যেত না। শিল্প-সমালোচকদের শিল্প সম্বন্ধে লেখার যে মন্তব্য করেছিলেন এক ইংরেজ শিল্পী তা অনায়াসে আজকের এ দেশীয় শিল্প-সমালোচকদের চেনাবার জন্য প্রয়োগ করা যেতে পারে। তিনি বলেছিলেন, "If a painter is asked his opinion of an exhibition he will mention the picture that pleased him; the critic on the other hand, will only have noticed the pictures that did not please him, and of these he will speak at length." যাঁরা সে সময়ে শিল্প সম্বন্ধে লিখে আলোচনা করতেন তাঁদের বিদ্যার ভিতটা বেশ গভীরে দৃঢ় ছিল। এমন কি সুরেশ সমাজপতি মহাশয়ের অতিনির্দিষ্ট ও সঙ্কীর্ণ মতাবলম্বী সমালোচনায় পরিস্ফুট হতো তাঁর এ বিষয়ে অকৃত্রিম আত্মপ্রত্যয় ও সমাজের একটি শ্রেণীর শিল্পরুচি এবং তার মধ্যে কোনো বুজরুকির স্থান ছিল না। সমাজপতি মহাশয়ের সাহিত্য ও ভাষার পাণ্ডিত্যে যে অধিকার ও প্রতিষ্ঠা ছিল তারই সম্মানে তাঁর পদস্খলনকে সহ্য করা অসম্ভব ছিল না। কিন্তু বর্তমানে বেশীরভাগ শিল্প-সমালোচকদের বিদ্যার অধিকারে এমন কোনো বিশ্বাস-যোগ্য ও প্রামাণ্য নজির মেলে না যার ভিত্তিতে তাঁদের লেখনীপ্রসূত সদম্ভোচ্চারিত শিল্প-ফতেয়ার স্পর্দ্ধাকে কোনোমতে বরদাস্ত করা যেতে পারে। সে কালে শিল্প বিষয়ের লেখক হিসাবে যাঁরা পরিচিত ছিলেন যেমন অর্দ্ধেন্দুকুমার গাঙ্গুলী, বিনয়-কুমার সরকার, অজিত ঘোষ, অবনী বন্দ্যোপাধ্যায়, ডঃ. সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিদের শিল্প সম্বন্ধে লেখাই একমাত্র পেশা ছিল না, শিল্পের প্রতি নিবিড় ভালোবাসা ও আসক্তিতে প্রণোদিত হয়ে এঁরা ব্যক্ত করতেন শিল্পের কথা —লিখে পয়সা পাওয়ার লোভে নয়। তাঁরা আজকের শিল্প-সমালোচকদের মতো বিচারকের ভূমিকা নিয়ে শিল্প ও শিল্পীকে কাঠগড়ায় তুলে কাউকে ইচ্ছানুরূপ ছাড়পত্র দেবেন কিংবা ফাঁসিতে ঝুলিয়ে শ্বাসরুদ্ধ করবেন এই রকম সঙ্কল্প নিয়ে লিখতেন না। কোনো কঠিন বা বিরূপ সমালোচনা তাঁদের লেখনী-প্রসূত হলেও সেটা প্রকৃতপক্ষে ব্যক্ত করত ব্যক্তিগত নয় —একটি সমষ্টিগত শিল্প-ধারণার রক্ষণশীল মতবাদ। জগতের প্রগতিশীল যে কোনো দেশের বিশদ শিল্পজ্ঞানের অধিকারী সুলেখক ও সমালোচকদের সঙ্গে পংক্তিভুক্ত করে দেখবার মতো সে সময়ের একজনকেই চিহ্নিত করা যায় তিনি ছিলেন অধ্যাপক সাহেদ সুরাবর্দী।[১]

যে কারণেই হোক, সে সময়ে বঙ্গীয় সাহিত্যিকদের চারুশিল্পের প্রতি অনুরাগ ও অনুসন্ধিৎসায় তাঁদের সঙ্গে শিল্পীদের একটা অন্তরঙ্গতা গড়ে উঠেছিল। কোনো ছবি বা মূর্তি সম্বন্ধে তাঁদের বিদ্রূপবাণীও ব্যক্ত করত শিল্পের প্রতি অশ্রদ্ধা বা অনীহা নয়, প্রত্যাশিত শিল্পানন্দে ঘাটতি হওয়ায় হৃদয়ের অনুযোগ।

১। ইনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাগেশ্বরী শিল্প অধ্যাপক ছিলেন।

তৎকালীন উদীয়মান লেখকদের পত্রিকা 'শনিবারের চিঠি'তে সুরেশ সমাজপতির 'সাহিত্য' পত্রিকার অনুরূপ কশাঘাতি শিল্প-সমালোচনা হতো। একটি পত্রিকায় রবীন্দ্রনাথের ছবির প্রতিলিপি ছাপা হলে 'শনিবারের চিঠি'তে মন্তব্য করা হয় —এ রূপ শিল্পসৃষ্টিতে ইচ্ছুক যে-কোনো ব্যক্তি হাঁটুতে কালি লাগিয়ে কাগজে ছাপ তুলে নিলে অনুরূপ ছবি পেয়ে যাবেন। 'শনিবারের চিঠি'র চিত্র সমালোচনার কদাচিৎ উদ্দেশ্য ছিল ছবির গুণাগুণের ব্যাখ্যা, মূল উদ্দেশ্য ছিল কেবল এই অজুহাতে রঙ্গরস পরিবেষণ। 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় অবনীন্দ্রনাথ-প্রবর্তিত শিল্পধারায় আঁকা রঘুবংশের ইন্দুমতির মৃত্যু বিষয়ক আমার একটি ছবির রঙিন প্রতিলিপি ছাপা হয় 'অজ বিলাপ' নামে। 'শনিবারের চিঠি'তে লেখা হলো, "ছবিটির নাম 'অজবিলাপ' না হইয়া 'ছাগবিলাপ' হইলে ঠিক হইত।" এই পত্রিকার দপ্তরে গতায়াত সূত্রে সজনীকান্ত দাস ও অন্যান্য খ্যাতনামা সাহিত্যিক ও কবিদের সঙ্গে আমার বেশ ঘনিষ্ঠতা হয়েছিল। ঐ রকম মন্তব্য প্রকাশে ক্ষুব্ধ হয়ে 'শনিবারের চিঠি'র দপ্তরে গিয়ে কৈফিয়ৎ চাইলাম, ছবিটির নাম 'ছাগবিলাপ' কেন করা হবে। তিনি বললেন, "এর আবার কৈফিয়ৎ হয় না-কি! আমাদের ভালো লেগেছে, এ ছবি ভালো —এ সব লিখলে কি কোনো পাঠকের ছবিটি দেখবার ইচ্ছে জাগত? দেখুন না, ঐ ছাগবিলাপ কেন হবে সেই রহস্য বুঝতে এখন কত লোক আপনার অজবিলাপ, ভারতবর্ষ পত্রিকা কেনার পয়সা না থাকলেও পরের কাছে ধার করে দেখছে। আরে মশাই আপনাকে 'ফেমাস' শিল্পী করে ছাড়লুম আর আপনি কি-না রেগে টং! এখন বসে গরম চা খেয়ে মাথা ঠাণ্ডা করে ফেলুন।"

সে সময়ে প্রায় সকল পেশার বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে শিল্পের প্রতি বিশেষ অনুরাগ লক্ষ্য করা যেত এবং একটু বাড়তি অপব্যয় করার মতো ক্ষমতাবানরা কেউ কেউ মাঝে মাঝে শিল্পীদের মূল ছবি কিনে গৃহসজ্জার মান বাড়িয়ে ফেলতেন। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যেত যে, কেনার সিদ্ধান্ত পরের বিচার-বুদ্ধিতে নির্ভর না করে তাঁরা ছবি সংগ্রহ করতেন নিজেদের রুচি ও বিচার-সঙ্গতি অনুসারে।

ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের বিদ্যায়তনে ছাত্র থাকাকালীন গিরিধারী মহাশয়ের নির্দেশে যে কয়েকটি কাঠের মূর্তি তৈরী করেছিলাম তার একটি ছিল চন্দন কাঠের কৃষ্ণমূর্তি।[১] এটিকে ভালো লাগায় বিখ্যাত প্রত্নতত্ত্ব বিশারদ রমাপ্রসাদ চন্দ মূর্তিটির একটি ফটোগ্রাফ চেয়ে নিয়েছিলেন এবং বোধহয় ১৯৩২ সালে কলকাতা মিউজিয়ামে সচিত্র বক্তৃতা দিতে গিয়ে বলেছিলেন, ভারতীয় ভাস্কর্যের ঐতিহ্য যে একেবারে শেষ হয়ে যায়নি তার প্রমাণ এই তরুণ ভাস্করের

১॥ মূর্তিগুলি ১৯৪৬ সালে আমার দিল্লীর স্টুডিয়ো থেকে অপহৃত হয়। সেগুলি হয়ত এখন কারুর ড্রয়িং রুমে পুরাতন ভাস্কর্যের গৌরব নিয়ে গৃহস্বামীর সংস্কৃতি সচেতনতার ওজন বাড়াতে শোভাবর্ধন করছে।

এই রচনাটি। এই অপ্রত্যাশিত প্রশস্তিতে গর্ব ও আনন্দ বোধের সঙ্গে বিশেষভাবে উপলব্ধি করেছিলাম যে, সেই ঐতিহ্যের ধারা জীবিত ও বহমান থাকতে পারে একমাত্র গিরিধারী মহাপাত্রদের মতো শিল্পীদের বংশজাত মূর্তিকারদের মধ্যেই যদি সে ধারা উপযুক্ত আনুকূল্যের অভাবে শুকিয়ে না যায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয়, আমাদের দেশের চারু ও কারুশিল্পের ধারাকে অব্যাহত রাখার জন্য হ্যাভেল ও পার্সি ব্রাউন মহোদয়দের সকল প্রয়াসই আজ ব্যর্থতায় পরিণত। তাঁদের এ বিষয়ে লিখিত ও প্রকাশিত পুস্তক, নথিপত্রাদি এখন বিশ্ববিদ্যালয়ের ডিগ্রী সংগ্রহের তথ্য যোগাবার সঞ্চিত ভাণ্ডার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে এবং হবে। কিন্তু তাতে কার্যক্রমের যে উপদেশ ও নির্দেশ দেওয়া আছে তাকে উপেক্ষা করে, ঐতিহ্যগত চারু ও বিশেষ করে কারুশিল্পকে বাঁচিয়ে রাখবার যে সকল পরিকল্পনা ও ব্যবস্থা করা হয়েছে তাতে আমাদের ঐতিহ্যবাহী শিল্পের শুধু প্রাণ নয়, অস্থি মাংস পর্যন্ত ক্ষয় করে কেবল ত্বকটুকুর সম্বলে কত বাহার বানিয়ে তাক লাগানো যায় তারই মহড়া বলবৎ হয়েছে এ দেশে।

আমাদের দেশের পুরাতনী শিল্পের ক্ষীয়মাণ সত্তাকে সঞ্জীবিত করার চেষ্টায় হ্যাভেলের অবদান দেশে বিদেশে বিশেষ পরিচিত ও শ্রদ্ধার্ঘ পেয়েছে কিন্তু এ বিষয়ে নীরব কর্মী পার্সি ব্রাউনের অমূল্য দানের যথাযথ স্বীকৃতি দেওয়া দূরে থাক, অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুলের উপাধ্যক্ষের পদ ত্যাগ করে চলে আসার সম্ভবত কারণ ছিল পার্সি ব্রাউনের ভারতীয় নতুন শিল্পধারার প্রতি বিমুখতা —এই ধরনের পরোক্ষ অপবাদের ইঙ্গিত ব্যক্ত হয়েছে বহুবার বহুজনের লিখিত সংবাদে।

শিল্প-বিষয়ক বহু পুস্তক ও প্রবন্ধাদি লিখে ভারতীয় শিল্পকে দেশে বিদেশে পরিচিত ও সম্মানিত করতে অগ্রনায়কদের প্রধান ছিলেন অতিভাবপ্রবণ ভারত-শিল্প-পূজারী হ্যাভেল। কিন্তু তাঁর লিখিত এ দেশের শিল্পের ইতিহাস সর্বক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য ঐতিহাসিক তথ্য হতে পারেনি। তার একটি কারণ হলো, হ্যাভেল সংস্কৃত কিংবা কোনো ভারতীয় ভাষাকে অনুশীলন করে আয়ত্ত করার সুযোগ পাননি। ভারতীয় ভাষায় লিখিত পুথি-পুস্তকের তথ্য সংগ্রহে তাঁকে সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়েছিল সে সবের অন্যের তর্জমাকৃত ইংরেজী অনুবাদের ওপর। সেই কারণেই F. W. Bain লিখিত গ্রন্থ *A Digit of the Moon* মূল সংস্কৃতে লেখা পুরাতন পুথির অনুবাদের দাবি যে অসত্য ও প্রতারণা সেটা তাঁর গোচরীভূত হয়নি এবং এই বইটিকে ভারতীয় সাহিত্যের প্রথম স্তরের একটি প্রামাণ্য গ্রন্থের শ্রদ্ধা জানাতে ও ভারতশিল্পের ব্যাখ্যায় তিনি ভ্রমক্রমে এর থেকে উদ্ধৃতাংশের সন্নিবেশ করেছেন তাঁর নিজের বইতে।

পার্সি ব্রাউনের ভারতের সঙ্গে সংযোগ হ্যাভেলের মতো মাত্র কয়েক বছরের নয়, প্রায় অর্ধ শতাব্দীর। স্বদেশে আর্ট স্কুলে ছাত্রাবস্থায় পার্সি ব্রাউন মিশরে প্রত্নতাত্ত্বিক অন্বেষণ ও খননের কাজে লিপ্ত হওয়ায় আবিষ্কৃত শিল্প-ভাস্কর্যের বহু

দলিলী ছবি নিপুণভাবে প্রস্তুত করার জন্য বিশেষভাবে প্রশংসিত হয়েছিলেন। বিশ্ববিখ্যাত প্রত্নতাত্ত্বিক স্যার ডবলিউ. এম. ফ্লিণ্ডারস পেট্রির মতো মনীষীর সঙ্গে মিশরে কাজ করার অভিজ্ঞতাই হয়ত তাঁকে কর্মজীবনের প্রথম থেকে নিয়মনিষ্ঠ করেছিল। তিনি লণ্ডনে রয়াল কলেজ অব আর্টের স্নাতক হবার পর ১৮৯৯ থেকে লাহোরে একই সঙ্গে মেয়ো স্কুল অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল আর্টের অধ্যক্ষ ও সেন্ট্রাল মিউজিয়ামের কিউরেটার রূপে সক্রিয় ছিলেন। ১৯০২ সালে দিল্লী দরবার প্রদর্শনীর আয়োজনে সহকারী পরিচালক নিযুক্ত হয়েছিলেন। লাহোরে থাকা-কালীন পার্সি ব্রাউন ফার্সী ও উর্দু ভাষায় ব্যুৎপত্তির পরীক্ষা দিয়ে প্রশংসাপত্র লাভ করেছিলেন। বলা বাহুল্য যে, ফার্সী ভাষায় মূল পুস্তক দলিলপত্রের সাক্ষাৎ অনুশীলনে ইসলামিক সংস্কৃতি সম্পর্কে তাঁর জ্ঞানোপলব্ধির সার্থক ফসল হিসাবে আমরা পেয়েছি তাঁর লেখা মুঘল চিত্রকলার ও ভারতশিল্পের দু'খানি মূল্যবান বই এবং ভারতীয় স্থাপত্যের বিশদ ব্যাখ্যা ও বিবরণ সম্বলিত বইটির দুটি বৃহৎ খণ্ড। এই বইগুলি আজও উৎসাহী ও শিল্প-গবেষকদের কাছে অত্যাবশ্যক পাঠ্যের সম্পদ হিসাবে চিহ্নিত রয়ে গেছে। ১৯০৯ সালে তিনি কলকাতার গভরমেণ্ট আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষ-পদ গ্রহণ করেন এবং এই স্কুলের কর্মজীবনে বহু আয়াস ও অন্বেষণে প্রায় সকল প্রকার দেশজ কারুশিল্পের উৎকৃষ্ট নিদর্শনের দলিলী ছবি তৈরী করে তার প্রতিলিপির 'ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্যাটার্ন বুক' নামে অ্যালবামগুলি প্রকাশ করেছিলেন।

হ্যাভেলের সহযোগিতায় উপাধ্যক্ষ হিসাবে শিল্পশিক্ষার আয়োজনে অবনীন্দ্রনাথ যে স্বাধীন সুবিধা ও সুযোগ পেয়েছিলেন পার্সি ব্রাউন তাঁর সে অধিকারকে সম্পূর্ণ রূপে অব্যাহত রেখেছিলেন। স্কুলের নিয়মশৃঙ্খলার ব্যবস্থাপনায় তাঁদের তীব্র মতভেদের দরুণ অবনীন্দ্রনাথের উপাধ্যক্ষ পদত্যাগের কিংবদন্তিতে এ সম্বন্ধে বাস্তব প্রমাণের কোনো অস্তিত্ব দেখা যায় না। বিশেষ করে অবনীন্দ্রনাথ যে স্বাধীন মেজাজের ব্যক্তি ছিলেন তাঁর পক্ষে পার্সি ব্রাউনের নিয়মতান্ত্রিকতার অসহ্য প্রতিক্রিয়ায় পদত্যাগের সিদ্ধান্ত নিতে ১৯০৯ থেকে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ছয় বছর অপেক্ষা করা বা ধৈর্য ধরাটা একেবারেই অসম্ভব ছিল। ১৯০৭ সালে ইণ্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েণ্টাল আর্টের প্রতিষ্ঠার পর এর পরিচালনা ও সংগঠনে নিবদ্ধ হওয়ায় অবনীন্দ্রনাথের মনে সরকারী স্কুলের নিয়মাবদ্ধ পরিবেশ থেকে মুক্ত হওয়ার বাসনা হয়ত অঙ্কুরিত হয়ে-ছিল অনেক আগেই এবং স্কুলের শিক্ষা-সমাপ্তিতে একে একে তাঁর প্রিয় শিষ্যকুলের অনুপস্থিতিতে কেবল চাকুরি বজায়ের জন্যই সেখানে থাকবার মেয়াদের ছেদ সাধন করাটাই স্বাভাবিক কারণ মনে হয়। অবনীন্দ্রনাথ আর্ট স্কুল ছেড়ে আসার পরও পার্সি ব্রাউনের সঙ্গে তাঁর ও ঠাকুরবাড়ির হৃদ্যতা সমানভাবে বজায় ছিল এবং সোসাইটির সঙ্গে ব্রাউনের ঘনিষ্ঠতার কোনো পরিবর্তন দেখা যায়নি। ভারত ও ভারতীয় সংস্কৃতির গভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধাবন্ধনে আবদ্ধ পার্সি ব্রাউন চাকুরি থেকে

অবসর গ্রহণের পরও স্বদেশে ফিরে যাননি —এ দেশেই কাশ্মীরে তাঁর জীবনান্ত ঘটেছিল।

এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই যে, হ্যাভেল ও অবনীন্দ্রনাথ দু'জনেই ছিলেন অতিভাবপ্রবণ মানুষ এবং তাঁরা একে অন্যের প্রতি সহজেই গভীরভাবে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। পার্সি ব্রাউন স্বভাবে অতি নিয়মনিষ্ঠ থাকায় অবনীন্দ্রনাথের ছাত্রদের স্কুলে হাজির হতে বিলম্ব করা ও অন্যান্য অনুরূপ নিয়মভঙ্গের ব্যাপারে হয়ত তাঁদের দু'জনের প্রথমে কিছুটা বোঝাপড়া করতে হয়েছিল কিন্তু কোনো অপ্রীতিকর কিছু যে ঘটেনি তা একটি ঘটনা থেকেই পরিষ্কার হয়ে যায়।

দুর্গেশ সিংহ, নন্দলাল প্রমুখ অবনীন্দ্র-ছাত্ররা স্কুল আরম্ভ হওয়ার বেশ কিছুটা দেরিতে আসতেন এবং একদিন তাঁরা পৌঁছে দেখেন স্কুলের বিশাল প্রবেশদ্বারটি অন্য দিনের মতো খোলা নেই। দুর্গেশ সিংহ ও নন্দলাল অন্যান্য ছাত্রদের তুলনায় বলশালী ছিলেন। তাঁরা অন্য ছাত্রদের রাজী করালেন যে, তাঁরা সকলে একযোগে ধাক্কা দিয়ে দরজার অর্গলটি ভেঙে ভিতরে প্রবেশ করবেন। আসলে কিন্তু দরজার কপাট দুটি ভেজানো ছিল। তাঁরা সকলে একসঙ্গে হেঁইয়ো চিৎকার সহকারে সজোরে দরজায় ধাক্কা দিতেই কপাট দুটি ছিটকে খুলে গেলো আর তাঁরা দেখলেন, সামনেই স্বয়ং পার্সি ব্রাউন দাঁড়িয়ে। কোনোমতে তাঁরা অধ্যক্ষের পাশ এড়িয়ে ছুটে ক্লাস-ঘরে পালিয়ে আশু বিড়ম্বনা এড়াবার চেষ্টা করলেন। অনতিবিলম্বে অধ্যক্ষের অফিস থেকে অবনীন্দ্রনাথকে আহ্বান করা হলো। তিনি ফিরে এসে কি হয়েছিল প্রশ্ন করায় ছাত্রেরা অধোবদনে ঘটনাটি বিবৃত করলেন। শিল্পাচার্য বললেন, 'তোমরা সাহেবকে যা চটিয়েছ তাতে তার লালমুখ আরও আরক্ত হয়ে রক্ত ফেটে বেরুবার মতো অবস্থা হয়েছিল।' ছাত্রেরা ভয়ে ভাবলেন, এই বিদ্যায়তনে তাঁদের পরদিন থেকে আসার নিশ্চয়ই পরিসমাপ্তি ঘটল। কিন্তু অবনীন্দ্রনাথ বললেন, 'তোমরা এ যাত্রা বেঁচে গেলে। আমি যখন তাঁকে বুঝিয়ে বললাম যে, তোমরা কাজে ফাঁকি দেবার উদ্দেশ্যে ইচ্ছাকৃত দেরি করে আসনি। বাড়িতে তোমাদের ছবিতে 'ওয়াস' দিয়ে কাগজ শুকিয়ে আনতে বিলম্ব হওয়ার কারণেই তোমাদের আসতে দেরি হয়। এই কৈফিয়ৎ শুনে উনি একটা বিশেষ নোটিশ লিখে দিয়েছেন যে, আমার ক্লাসের ছাত্রদের দেরিতে আসা মঞ্জুর হয়ে রইল।'

গুরুসদয় দত্ত

১৯৩১ সালের প্রথম দিকে ডাক এল গুরুসদয় দত্ত মহাশয়ের কাছ থেকে— সিউড়ি যেতে হবে। তিনি তখন বীরভূম জেলার ম্যাজিস্ট্রেট, তাঁর প্রয়োজন হয়েছে একজন তরুণ শিল্পীকে যে গ্রামে গিয়ে পল্লীবাড়ির অন্দরের দেওয়ালে আঁকা পুরনো

ছবির নকল করে দেবে এবং এই শিল্পীর বয়েসের পরিমাপ এমন ছোট হতে হবে যাতে অন্দরমহলের মহিলাদের কাছে তার উপস্থিতি আপত্তিজনক হবে না।

সিউড়ি শহরে পৌঁছে সন্ধ্যাবেলায় দেখা হলো দত্ত মহাশয়ের সঙ্গে সরকারি কর্মচারি ও আইনজীবীদের ক্লাবের প্রাঙ্গণে যেখানে তিনি টেনিস খেলা শেষ করে এক দঙ্গল বাচ্চা ছেলেমেয়েদের সঙ্গে শুরু করেছেন আর এক খেলা। তাঁকে ঘিরে তারা নাচছে আর গাইছে তাঁরই রচিত ছড়া—

ডুলুরি রে ডুলুরি
আয় তোরে ডাঙ্গায় তুলি,
ভাঙ্গর মাথার ঘেরাটোপ
পোড়াবো তোর দাড়ি গোঁফ।

গানে ও নাচের দাপটে ডুলুরি পালার নিধনপর্ব শেষ হলে ছেলেমেয়েরা দত্ত মহাশয়ের কাছ থেকেই ইনাম পেল লেমোনেডের সরবৎ এবং পরে শুরু হলো শেষ পর্বের গান (যার কথাগুলো এখন সঠিক মনে নেই)—

নমস্কার হে স্যিয্যি মামা
ঘুম হল কাল কেমনটি
তোমার ভয়ে চাঁদ আর তারা
পালায় কেন এমনটি—
দেখেছিলাম সন্ধ্যাবেলায়
কালকে তুমি শুতে গেলে
ঘুম ভালো হয়েছে কি ?
খাট বিছানা কোথায় পেলে ? ...ইত্যাদি।

ছেলেমেয়েরা চলে গেলে দত্ত মহাশয় প্রাথমিক সম্ভাষণাদির পর হঠাৎ বললেন, "কাঁকর মাটিতে পদ্ম ফুটতে দেখেছ ?" পাঁকে পদ্ম ফোটে জানি বলায় তিনি দুই হাতের আঙুল বিস্তারে পদ্মের মুদ্রা করে বললেন, "যে পদ্মের কথা বলছি ফুটতে তার পাঁক আর জলের প্রয়োজন হয় না।" বিস্ময়ের অবকাশ না দিয়েই বললেন, "কাল দুপুরে তোমায় কাঁকর মাটিতে ফোটা পদ্ম দেখিয়ে দেব।" পরদিন দুপুরে তাঁর গাড়িতে চললাম সেই অদ্ভুত পদ্মের সঙ্গে চাক্ষুষ পরিচয় করতে। বিটপীবিহীন প্রায় বহু প্রান্তর অতিক্রম করে পৌঁছালাম একটি বাগ্‌দি বা সাঁওতালদের পল্লীতে। সেখানে একটি কুঁড়েঘরের সামনে গিয়ে তিনি বললেন, "এই দেখ কাঁকর মাটিতে ফোটা পদ্ম ফুল। সেই কুঁড়েঘরের দরজার দু'পাশে মাটির দেওয়ালে আঁকা ছিল দুটি জ্যামিতিক বহু বৃত্তের সংযোজনে বানানো পদ্মের নক্সা যা জোরালো হলদে লাল নীল সাদা রঙে রাঙানো। চোখে দেখা স্বাভাবিক পদ্মফুলের সঙ্গে এই নক্সা কাটা ছবির কোনো সাক্ষাৎ সাদৃশ্য না থাকলেও সদ্য ফোটা পদ্ম দেখে যে আনন্দ ও পরিতৃপ্তির অভিজ্ঞতা হয়ে থাকে এই নক্সা সেই অভিজ্ঞতাকে মনে স্মরণ

করাচ্ছিল। ঘুরে ঘুরে আরও অনেক ঘরের দেওয়ালে আরও পদ্ম ও নানা রকম অন্য নক্সার বাহার উপভোগ করলাম। তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, "তিনি কি এই সব নক্সার প্রতিলিপি তৈরী করার জন্য আমাকে ডেকে এনেছেন।" তিনি বললেন, "কাঁকর মাটির জমিতে ফোটানো এই পদ্মের রূপকে কি কাগজে রাঙিয়ে দেখানো সম্ভব! না হে; এখান থেকে বহু দূরের গ্রামে মাটির দেওয়ালে আঁকা বহু পুরাতন পটচিত্র আছে। সেগুলির প্রতিলিপি করে না রাখলে ঐ অপূর্ব ছবিগুলি সময়ে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে যাবে তাই তোমাকে আনা হয়েছে সেগুলির নকল বানিয়ে যাতে তাদের স্মৃতি রক্ষা করা যায়।"

কয়েক বার বাস গাড়ি বদল করে গরুর গাড়ি চেপে শহর সংক্রামিত বহু বসবাসের এলাকা অতিক্রম করে নদী পার হয়ে হাঁটা পথে চলে পৌঁছে গেলাম রামনগর। এর নাম নগর কেন হলো কে বলবে। ইটের তৈরী বড় কোঠাবাড়ি দেখলাম কেবল একটিই। সেটি জমিদারের ঘরের সারির চৌবন্দিতে আঁটা একটি জরাজীর্ণ ইমারৎ যার এক দিকটার দোতলার বট অশ্বত্থ কবলিত থামওয়ালা মস্ত লম্বা দালান অতীতে সম্ভোগ করা ধন-দৌলতের দুর্বল স্মৃতির কিছুটা পরিচ্ছদ বজায় রেখেছে। বালি-ধ্বসা দেওয়ালে ঝুলনো কয়েকটি ঢাল ও তরোয়াল এবং ওপরের তাকে তোলা শালুতে বাঁধা হিসাবের খাতার রাশিকে সঙ্গী করে একটি কামরায় থাকার ঠাঁই জুটল। পরের দিন সকালে স্থানীয় লোকেদের সঙ্গে একটি গ্রামে গেলাম যার নাম ছিল, যতদূর মনে পড়ে —বোধহয় স্যাহোরা বা শ্যাহোরা। গ্রামটি অবিশ্বাস্য রকম সুশ্রী ও সমৃদ্ধ যার আজ সঠিক বর্ণনা করলে লোকে বলবে রূপকথা বানাচ্ছি।

সোজা পরিষ্কার চওড়া মাটির কাঁচা রাস্তার দু'পাশে প্রত্যেকটি গৃহস্থের চালা বাড়ির অতি ছিমছাম চেহারা যা দেখে মনে হলো যেন বসত চালা বাড়িগুলির সংস্থান বিন্যাস করা হয়েছে এক রুচিবান দক্ষ টাউন প্ল্যানারকে দিয়ে। প্রত্যেক বাড়ির থাকার ঘর, রন্ধনশালা, ধান-ভরা গোলা, গোশালা ও পরিচ্ছন্ন উঠানের অবস্থা ইংরাজী 'এল' আকারের মতো। চালাকে ধরে রাখার জন্য কাঠের সুঠাম খুঁটির গায়ে ও আড়ের মোটা-মোটা কাঠের শেষাগ্রে নানা নক্সা খোদাই করা। এমনি একটি বাড়ির অন্দরতম ঘরে সাদা ধবধবে দেওয়ালে একটি অপূর্ব পট আঁকা ছিল —পুত্র কন্যা পরিবৃত দুর্গা দেবীর। ছবিটির বয়েস একশো না হলেও পঞ্চাশ কি ষাট হবে। ছবিটির চিত্রগুলি ছিল অপরূপ এবং এর ঐতিহাসিক গুরুত্ব প্রাচীন না হলেও উপেক্ষণীয় বলা যেত না। ছবিটির নকল করতে গিয়ে দেখি যে, গ্রামের প্রায় সব মহিলা সে বাড়িতে এসে জড় হয়েছেন এবং তাঁদের অনেকের হাতে সোনার মতো ঝকঝকে কাঁসার বাটি ক্ষীরে ভরা। শহর থেকে আগত তরুণ শিল্পীর আপ্যায়ন করতে তাঁরা এনেছেন এই ক্ষীরের সিধে তাঁদের অনুরোধ যে, ছবি আঁকার বোধন শুরু করতে হবে ক্ষীর খাবার পরে। কয়েক ডজন বাটিতে ভরা ক্ষীর উদরস্থ করার নিদারুণ পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেলাম গৃহকর্ত্রীর মধ্যস্থতায়।

তিনি নির্দেশ দিলেন যে, শিল্পীকে ক্ষীরের প্রথম দক্ষিণা দানের অধিকার তাঁরই হওয়া উচিত সে বাড়ির অতিথি হিসাবে। অন্যেরা আপ্যায়নের সুযোগ নেবেন পরে, প্রতিদিন পালা করে এক এক বাড়ি থেকে ক্ষীরের সিধে পাঠিয়ে। ছবি নকল করা শেষ হলে সে গ্রামের বাসিন্দাদের স্নেহসিঞ্চিত আতিথ্যের জন্য ধন্যবাদ দেবার ভাষা খুঁজে পাইনি এবং বিদায় নিতে হৃদয়ে বেদনার মোচড়ানি ভোলা সহজ হয়নি।

১৯৩১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে গুরুসদয় দত্ত 'পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতি' নামে একটি সংস্থা গঠন করেছিলেন যার সদস্য ছিলেন ডঃ. দীনেশ সেন, লাভপুর জমিদার পরিবারের নির্মলশিব বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেক গুণী ব্যক্তি। দত্ত মহাশয়ের ঐকান্তিক চেষ্টায় পুরাতন ও নতুন গ্রাম্যশিল্পের বহুবিধ নিদর্শন সংগৃহীত হয়েছিল। সেই শিল্পসম্পদকে নিয়ে যাওয়া হয় কলকাতায় এবং দত্ত মহাশয়ের তিরোধানের পর তাঁর নামে উৎসর্গীকৃত সংগ্রহশালায় তার কিছুটা এখনও সংরক্ষিত। এই সংগ্রহে কিন্তু আমার নকল-করা স্যাহোরা গ্রামের ছবিগুলিকে খুঁজে পাইনি। বীরভূমের পল্লীসম্পদ রক্ষা সমিতির শেষ পর্যন্ত কি পরিণতি হয়েছিল জানি না।

পুরনো স্মৃতি বহুবার তাগিদ দিয়েছে স্যাহোরা গ্রামে আবার যাবার জন্য। সম্প্রতি এক বীরভূমবাসীর সাক্ষাৎ হলে তাঁকে ঐ গ্রামটিকে খুঁজে পাবার হদিস জানতে চেয়েছিলাম। তিনি বললেন, ও গ্রাম আজও যদি বেঁচে থাকে তা হলে আমার দেখা চেহারার সঙ্গে বর্তমানের পরিবর্তন দেখার জন্য যেন প্রস্তুত থাকি। এখন হয়ত দেখবেন সেই সুঠাম খড়ের চালের বাড়িগুলি বদলে টিন বা এস্‌বেস্‌টসের চালে মণ্ডিত এবং দেওয়ালগুলি হয়ত মসৃণ মাটির গঠন হারিয়ে এখন ইঁটবালিতে ঠাসা। আর দেওয়ালে হাতে আঁকা মনোরম পটের বদলে দেখা যাবে দেবতা সাজা সিনেমা স্টারের ছবি-মারা ক্যালেণ্ডার ঝুলছে —এবং কেউ যদি ভুল করে আপনাকে আপ্যায়ন করতে চায় তা হলে কাঁসার বাটি-ভরা ক্ষীরের বদলে পাবেন প্লাস্টিক কাপে পাউডার দুধ ভাসানো এ্যানিমিক চা। বর্তমানে আমরা অনেকেই সময়ের পরিবর্তনে সিনিক হয়ে গেছি —ভদ্রলোক তাদেরই একজন হবেন কি-না জানি না। স্যাহোরা গ্রামের সেই পুরাতন অপূর্ব ছবিকে আজও সাদরে বাঁচিয়ে রেখেছি স্মৃতির ভাণ্ডারে। ভদ্রলোকের মন্তব্য কতখানি সত্য বা মিথ্যে তা যাচাই করার মতো সাহস আজও করে উঠতে পারিনি।

রমঁ্যা রলঁ্যা ও লিলি হাভেল

স্কুলের শিক্ষানবিসির আর প্রয়োজন হবে না উপলব্ধিতে, ১৯৩২ সালে শিল্পীপেশায় অর্থোপার্জনের প্রচেষ্টায় জানলাম যে, বই-পত্রিকায় সচিত্রকরণের ও বিজ্ঞাপনী ছবি

এঁকেই কিছু অর্থাগম হতে পারে। একটি পূর্ণ পৃষ্ঠাব্যাপী ছবির জন্য এক টাকা ও অর্ধ পৃষ্ঠার জন্য আট আনা হারে উপার্জন পরিতাপ-কাতর হলেও বাঁচার প্রয়োজনে এই লাঞ্ছনাকে সহ্য করা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। এর থেকেও শাণিত আঘাত লাগত যখন অতি নিকট স্বজনদের কাছ থেকে পরোক্ষে শোনা যেত, শিল্পী হলো বটে কিন্তু এই পরিবারে রয়ে গেলো অশিক্ষিত। বাঙালী ভদ্রসমাজে ছেলে নিরক্ষরতার অপবাদ মুক্ত হয় ম্যাট্রিক পাস করলে আর গ্র্যাজুয়েট হলে সে পায় শিক্ষিত হওয়ার প্রাথমিক পরিচিতি। অতএব তাঁদের মনোকষ্টের লাঘব ও গ্লানি-মুক্ত করতে প্রাইভেট পরীক্ষার্থী হয়ে ম্যাট্রিক পাস করে ভর্তি হলাম রিপন কলেজে।

হাজার দুয়েক ছাত্রের এই বিদ্যায়তনকে বলা হতো বাজারে কলেজ যদিও এর অধ্যক্ষ ও অধ্যাপকেরা ছিলেন স্বনামধন্য শিক্ষাবিদ্ হিসাবে কৃতী। সেই সময় বড় বড় প্রদর্শনীতে নির্বাচনের কঠিন বিচার উত্তীর্ণ হয়ে আমার ছবি স্থান পেতে শুরু করেছে এবং মাসিক পত্রিকায় রঙিন প্রতিলিপিও প্রকাশিত হচ্ছিল সাময়িকভাবে। স্বামী বিবেকানন্দের কবিতা Kali the Mother পড়ে বেশ অভিভূত হয়ে একটি কালীর ছবি আঁকলাম ঐ কবিতার ধারণা অবলম্বনে—

The stars are blotted out,
    The clouds are covering clouds,
It is darkness vi ›rant, sonant.
    In the roaring, whirling wind
Are the souls of a million lunatics—
    Just loose from prison-house—
Wrenching trees by the roots,
    Sweeping all from path.

The sea has joined the fray,
    And swirls up mountain-waves,
To reach the pitchy sky,
    The flash of lurid light
Reveals on every side
    A thousand, thousand shades
Of Death begrimmed and black—
    Scattering plagues and sorrows.
Dancing mad with joy.
    Come, Mother, come !

কিন্তু প্রথাগত প্রতিমা চিত্রিত না হওয়ায় ছবিটি কোনো প্রদর্শনীতে দেখানো

সম্ভব হলো না কিংবা কোনো মাসিক পত্রিকার সম্পাদকও এই ছবির প্রতিলিপি প্রকাশে রীতিমতো দ্বিধা ব্যক্ত করলেন। স্থির করলাম স্বামীজির গুণগ্রাহী বিশ্ব-বরেণ্য লেখক রমঁ্যা রলঁ্যাকে ছবিটি পাঠিয়ে দেখি —তাঁর এ ছবিতে কি প্রতিক্রিয়া হয়। সঠিক ঠিকানা না জানলেও শুধু জেনিভা, সুইটজারল্যাণ্ড লিখে তাঁর নামে রেজেস্ট্রী করে পাঠালাম। অনেকে খবরটি জেনে পরিহাসের তুফান তুলতে তৎপর হয়ে পড়লেন। 'ছবি পেয়ে খুশী হয়ে রলঁ্যা আমাকে সোনার মেডেল দেবার জন্যে তৎপর হয়ে উঠেছেন' —ইত্যাদি শুনলাম বহুবার। প্রায় মাস তিনেক পর একদিন একটি বেশ বড় আকারের খাম এসে পৌছাল আমার নামে যার ওপরে লাগানো ছিল রমঁ্যা রলঁ্যা। ভেতরে স্বহস্তে লিখিত চিঠির সঙ্গে ছিল রলঁ্যার সই-করা তাঁর একটি ফটোগ্রাফ।

ফরাসীতে লেখা চিঠির মর্মোদ্ধার করার জন্য কলেজে গিয়ে ডঃ. সুশীল মিত্রকে অনুরোধ করলাম, তিনি ছিলেন পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের ডি. লিট.। ব্যাপারটা নিয়ে কলেজের অধ্যাপক ও ছাত্রমহলে কিছুটা চাঞ্চল্যের সৃষ্টি হয়েছিল। পরের দিন চিঠির তর্জমায় জানলাম কি লেখা আছে। চিঠিতে রলঁ্যা জানিয়েছেন, "সারা বিশ্বে আজ কালীমাতার অনুশাসন চলছে।" ডঃ. সুশীল মিত্র ছিলেন উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে 'বিচিত্রা' পত্রিকার সহাধিকারী সম্পাদক। তাঁরা মৃত্যুরূপা কালীর ছবির সঙ্গে রলঁ্যার ছবি ও তাঁর চিঠিসহ আমার ফটো ছাপিয়ে আমার সম্পর্কে একটি বিবৃতি তাঁদের পত্রিকায় প্রকাশ করলেন। প্রত্যাখ্যাত কালীর মূল ছবির ফটোগ্রাফ দেখাবার জন্যে বহু অনুরোধ আসতে লাগল। বুঝলাম, রলঁ্যার চিঠিটাই কালীকে শ্রদ্ধা-সমাদর করবার পাদপীঠটার উচ্চতা হঠাৎ বাড়িয়ে দিয়েছে।

রলঁ্যার সঙ্গে পত্রে যোগাযোগ রেখেছিলাম এবং পারীতে গেলে তিনি তাঁর কয়েক জন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সঙ্গে আলাপ করতে বলেছিলেন। এঁদের সঙ্গে পরে দেখা করে আলাপ করতে পেরেছিলাম কিন্তু রলঁ্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করা ঘটে ওঠেনি। আমি যখন ফ্রান্সে তিনি তখন জেনিভায় কিংবা আমি যখন জেনিভায় তিনি তখন ফ্রান্সে তাঁর প্রিয় বাসস্থান 'ভেজলে'তে। পরে তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে পারীতে পরিচয় হলে, এ বিষয়ে আমার মনস্তাপের কথা তাঁকে জানিয়েছিলাম।

বাজারে ছবির জমা কাজ সম্পন্ন করতে অনেক সময় লাগত বলে কলেজের নিমিত্তিক ক্লাসে উপস্থিত থাকা সব দিন সম্ভব হতো না। একদিন অধ্যক্ষ রবীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ মহাশয় আমাকে ডেকে বললেন, "চিত্রের ক্ষেত্রে তুমি যে যোগ্যতা অর্জন করেছ এখানে পড়ার ক্ষেত্রেও তুমি অনুরূপ যোগ্যতা দেখাবে আশা করি, কিন্তু এত ক্লাস কামাই করে সেটা কি করে সম্ভব হবে?" যখন জানালাম যে, আমার নিজের পড়াশুনার ব্যয়ভার নিজের উপার্জনে নির্বাহ করতে হয় এবং সেই কারণেই ক্লাসে আমার এত অনুপস্থিতি। তিনি তখনই আমার জন্য একটি বৃত্তির ব্যবস্থা করবেন বলায়, আমি জানালাম যে দ্বিতীয় মানে ইণ্টারমিডিয়েট পাস-করা

ছাত্রকে বৃত্তি দেওয়া নীতিবিরুদ্ধ হবে। তখন তিনি আমাকে পড়ার বেতন আর দিতে হবে না বলায়, আমি সে সুযোগেরও অধিকারী নই জানালাম। হঠাৎ মনে হলো, বিশ্ববিদ্যালয়ের একখানা কাগজ পাবার চেষ্টা করে চলেছি অপরের বলা অশিক্ষিতের অপবাদ দূরীকরণে! তারপর বিনা দ্বিধায় কলেজ ছেড়ে দিয়ে সরকারি স্কুলের শিক্ষকতার একটি চাকুরি জুটিয়ে নিলাম। কিন্তু এতে জীবন-সমস্যার কোনো সমাধান হলো না। সিউড়িতে বীরভূম জেলা স্কুলের অতি সীমাবদ্ধ গণ্ডির বন্ধন থেকে সাময়িক মুক্তি পেতাম শনি-রবিবারে কখনও কখনও শান্তিনিকেতনে গিয়ে সুরেন কর, নন্দলাল বসু ও কবির স্নেহাশ্রয়ে।

সিউড়িতে থাকাকালীন একদিন মনে প্রশ্ন উঠল, ই. বি. হ্যাভেল অবনীন্দ্রনাথ প্রবর্তিত শিল্পধারার যে পরিণতি শিল্পাচার্যের শিষ্যবর্গের রচনায় অভিব্যক্ত দেখে গিয়েছিলেন তাঁদের অনুসৃত ছাত্রদের শিল্প-রূপায়ণ দেখলে তিনি কি অভিমত জ্ঞাপন করবেন! আমার কয়েকটি রচনার ফটোগ্রাফ ও রঙিন প্রতিলিপি সহ একটি মূল ছবি তাঁকে অক্সফোর্ডের ঠিকানায় পাঠিয়ে দিলাম। বেশ কয়েক মাস বাদে তার জবাব এল, তবে হ্যাভেল লিখিত নয়। আমার ছবি ও চিঠি পৌছাবার কয়েক দিন আগেই হ্যাভেলের জীবনান্ত ঘটেছিল। চিঠি লিখেছিলেন তাঁর স্ত্রী লিলি হ্যাভেল—

1935 — Hide Hus
March 22 — Pullens Lane
Headington Hill

Dear Mr. Chintamoni Kar,

I am writing for my dear husband, I am his widow. I lost my dear husband on the 30 of December last, and I have been quite unable to do anything since until quite lately. This is why nothing has been done regarding exquisite present for my dear husband which came here to Oxford just when my heart was most sorrowful, and my health was broken down and I was unable to do anything.

তিনি নিজের পরিচয় দিয়ে লিখেছেন—

"I am from Denmark and have been trained in Paris by the great Master Rodin who I am sure you know, and I followed every step of my dear husband's career. I learnt to understand his points of view regarding the Art of India and could share his enthusiasm."

হ্যাভেলের কাজ সম্বন্ধে বলেছেন—

"He offered himself for his work, giving his great gifts,

talents his unique enthusiasm with open hands to India. He loved and understood and her very soul, and that is why he will never be replaced till God raises up another gifted in the same unique way as he was···

তাঁর দীর্ঘ ছয় পৃষ্ঠার চিঠিতে প্রত্যেক লাইনে তাঁর বিগত পতির প্রতি তাঁর অসীম ভালোবাসা, ভক্তি ও বিয়োগের নিদারুণ বেদনা ব্যক্ত হয়েছে। ঠাকুরবাড়ির গগণেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথের সঙ্গে তাঁদের ঘনিষ্ঠতায় সুখানন্দময় দিনের অভিজ্ঞতার উল্লেখ করে আমাকে মনে রাখতে বলেছেন—

"Art requires the whole of you. The whole soul, mind and thought. Art is a hard road to climb, much suffering is on the road, Art is a despotic mistress. I have seen a great many great Artists suffer."

হ্যাভেল পত্নী সম্বন্ধে কিছুই জানা ছিল না এবং তিনি বিশ্ববিখ্যাত ভাস্কর রোদ্যাঁর ছাত্রী ছিলেন সংবাদ পেয়ে প্রত্যাশা প্রবল হয়েছিল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয়ের। কিন্তু সময় আমার সে আশা পূরণের কোনো সুযোগ দেয়নি।

পিটার বোয়কি

জীবনে অপ্রত্যাশিতভাবে কখনও কখনও এমন মানুষের সঙ্গে সংযোগ ঘটে যায় যার ফলে মানুষের প্রায় নির্দিষ্ট খাদে-পড়া অস্তিত্বে ধাক্কা লেগে জীবনপথের অভিসন্ধান চলতে শুরু করে এক নতুন কিংবা অনির্দিষ্ট গতিপথে যা আগে ধারণা, কল্পনা বা ইচ্ছায় বিভাসিত হলেও মনে হতো তাকে পাওয়া একেবারে অসম্ভব ও অলভ্য।

১৯৩৫ সালে ডাঃ. পিটার বোয়কির সঙ্গে পরিচয় ও বন্ধুত্বের সংযোগে পেয়ে গেলাম অসম্ভবকে সম্ভব করার আত্মবিশ্বাস ও সঙ্কল্প। তখন চৌরঙ্গীর ওয়াই. এম. সি. এ.'র সেক্রেটারি ছিলেন মিঃ. রসেটি। ইনি ক্রিশ্চিয়ান সারমন-এর সঙ্গে গীতার শ্লোক উল্লেখ করে আলাপ-আলোচনা করতে ভালোবাসতেন। তাঁর ভারতীয় সংস্কৃতির প্রতি বেশ অনুরাগ থাকায়, সমানুরাগী ভারতপ্রেমিকদের সমাগম হতো তাঁর ভবনে। সেখানেই একদিন দেখা ও পরিচয় হলো ডাঃ. পিটার বোয়কির সঙ্গে এবং তখনই আমন্ত্রণ ঠিক হয়ে গেলো তাঁর বাড়িতে মধ্যাহ্ন ভোজনের।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পর্যন্ত যে সব মানুষ দেশান্তরী হয়ে আমেরিকায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিলেন তাঁদের চরিত্রে ও আচার-ব্যবহারে পূর্বদেশজ চিহ্ন ও সংস্কার একেবারে মুছে বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। ভিন্ন জাতি-সম্ভূত বংশজদের আজ যেমন পূর্বদেশজ সত্তার প্রায় সম্পূর্ণ অপনয়ন ঘটে সমভাব ও চরিত্রের প্রায় এক নব্য-

আমেরিকান জাতির উদ্ভব হয়েছে, চল্লিশ কি পঞ্চাশ বছর আগেও তার এত প্রকট আত্মপ্রকাশ ফুটে ওঠেনি —এ কথা বলা চলে।

হাঙ্গেরী-সম্ভূত পিটার বোয়কি আট বছর বয়সে তিন ভাই ও মা'র সঙ্গে পূর্ব আগত পিতার সঙ্গে আমেরিকায় স্থায়ী বাস শুরু করেন। হাঙ্গেরীয়ানদের মধ্যে একটি ধারণা ব্যাপকভাবে প্রচলিত যে, তাঁদের পূর্বপুরুষেরা সুদূর অতীতে এসেছিলেন ভারত থেকে। যে কারণেই হোক ইয়োরোপের অন্য দেশবাসীর চেয়ে হাঙ্গেরীয়ান-দের ভারতপ্রীতিতে একটা স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। যুবক বোয়কি ড্যাভনপোর্টের (আইয়োয়া) Palmer School of Chiropractic থেকে স্নাতক হয়ে সিনসিনাটি শহরে ক্লিনিক খুলে পেশা শুরু করেন। এখানে তাঁর আলাপ শুরু হয় রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী পরমানন্দের সঙ্গে এবং তাঁর অনুরোধে পনেরো মাসের জন্য ভারত ভ্রমণে আসেন এবং দেশে ফিরে কয়েক মাস পরেই যেন কোনো এক দৈব আহ্বানে তাঁকে ফিরে আসতে হলো ভারতে। কলকাতার ৪ নম্বর লী রোডে প্রতিষ্ঠিত হলো তাঁর Chiropractic Institute.

পিটারের ভাবী পত্নী এ্যাডেলেড-এর সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় ১৯২৩ সালে ড্যাভনপোর্টে এবং বছর ছয়েক পরে তাঁরা পরিণয়বদ্ধ হন। ১৯৩৫ সালে আমার সঙ্গে ডাঃ. বোয়কির যখন আলাপ হয়েছে মিসেস বোয়কি শিশুপুত্র সহ তখন কলকাতায় এসে গেছেন। বোয়কির বাসগৃহের একটি বিশেষত্ব ছিল —প্রত্যেকটি ঘর সাজানো থাকত ফুলের সমারোহে এবং এর সবিশেষ সজ্জা দেখা যেত রোগীদের বসবার ও পরীক্ষা করবার ঘর দুটিতে। তিনি বলতেন, জীবনে সব চেয়ে প্রয়োজনীয় ও কাম্য হচ্ছে পবিত্রতা এবং তার অনুভূতিকে পাওয়া যায় ফুলের সান্নিধ্যে। জীবনে যে সব মুহূর্তে মন পবিত্রতা স্মরণ ও আকাঙ্ক্ষা করে থাকে যেমন জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু কিংবা দেবারাধনা, মানুষ আদিমকাল থেকে উপলব্ধি করেছে যে, তাকে পাওয়ার প্রয়োজনে চাই সৃষ্টিকর্তা দত্ত প্রকৃতির ফুল।

তাঁর রোগী পরীক্ষার ঘরটির সামনের দেওয়ালে টাঙানো থাকত একটি ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তির বড় ফটোগ্রাফ; ছবিটির পাদপীঠে একরাশ সদ্যোফোটা পদ্ম। তাঁর মতে ফুলের মতো নিষ্পাপ ও পবিত্র আত্মার দেবোপম খ্রীষ্ট ও বুদ্ধকে মানুষ এ জগতে পেয়েছে বহু ভাগ্যফলে কিন্তু অজ্ঞতায় দৃষ্টিহীন মানুষ তাঁদের শান্তিভরা প্রভায় নিজেদের সিক্তিত ও শুদ্ধ করে নিতে পারে না। মাঝে মাঝে দু' একটি খাপছাড়া পরিস্থিতি এসে ছোটখাট ঝড় তুলত বোয়কি দম্পতির শান্তিভরা নীড়ে।

একদিন দেখি, এক মরণাপন্ন সিংহলী বৌদ্ধ সাধুকে রাস্তা থেকে কুড়িয়ে এনে বোয়কি তাঁর খাস কামরায় রেখে সেবা-শুশ্রূষায় রত। এ্যাডেলেড বললেন, "দেখ পাগলের কাণ্ড! যেখানে আমরা শিশুসন্তান নিয়ে বাস করি সেখানে এই মুমূর্ষু ও তীব্র ক্ষয়কাশ রোগাক্রান্তকে ঘরে না তুলে হাসপাতালে পাঠানো কি ঠিক হতো না?" শুনে নির্বিকার বোয়কি জবাব দিলেন, "প্রভু বুদ্ধ আমার হাতে তুলে

দিয়েছেন এই পীড়িত সাধুটিকে এবং এঁর প্রয়োজন হাসপাতালের হৃদয়হীন পরিচর্যা নয়, গৃহীর গৃহে মমতায় দেওয়া সেবা। বুদ্ধের আশীর্বাদই রোগ-সংক্রমণ থেকে আমাদের রক্ষা করবে।" তারপর আমাকে উদ্দেশ্য করে বললেন, "সাধু রাস্তায় অচৈতন্য অবস্থায় পড়ে ছিলেন এবং দেখলাম লোকের ভিড়ে কৌতূহলী দৃষ্টি অপেক্ষা করছে কখন এঁর প্রাণ নির্বাপিত হবে। আমাদের দেশে ত্রাণকর্তা হিসাবে একটি অবতারকে পাওয়াই যথেষ্ট কিন্তু তোমাদের দেশে পীড়িত খ্রিষ্টের ত্রাণের জন্য দরকার একটা বুদ্ধ নয়, যুগে যুগে, পলে পলে বহু বুদ্ধের ও অবতারের কিন্তু তা সত্ত্বেও খ্রিষ্টের ত্রাণকার্যে এগিয়ে আসে মাত্র কয়েকটি হাত!" এ্যাডেলেডের দুশ্চিন্তা ও ভয়ের অবসান ঘটল এক সপ্তাহের মধ্যেই সাধুর পরিনির্বাণে।

বোয়কি গৃহে সমাগম হতো বহু বিশিষ্ট নাগরিক ও মনীষী ব্যক্তিদের। এখানেই আমার পরিচয় হয় অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার ও ডাঃ. রফিউদ্দীন আহমেদের সঙ্গে। গান্ধিজীর সঙ্গে ডাঃ. বোয়কির যে সাধারণ পরিচয়ের চেয়ে বেশী ঘনিষ্ঠতা ছিল তা বোঝা যেত গান্ধিজীর কলকাতা আগমনে কর্মসূচীর একটি নির্দিষ্ট দফা ছিল বোয়কির ক্লিনিকে এসে তাঁর হাতে অঙ্গ-সংবাহনে দেহকে সক্রিয় করে নেওয়া। গান্ধিজীর 'কায়রোপ্রাকৃটিক'-এ আসক্তি ও বিশ্বাস বেশ দৃঢ় ছিল।

গান্ধিজীর সঙ্গে যোগাযোগের ফলে বোয়কি কলকাতা ত্যাগ করে গেলেন বম্বেতে এবং পরে তাঁর আশ্রমে। এর ফলে বোয়কির ক্রমপরিবর্তন কেবল খদ্দরের কাপড়ের বেশভূষা ও আশ্রমবাসীদের পরিচর্যা করাতেই সীমাবদ্ধ হয়নি, নিরামিষ আহার পর্যন্ত অভ্যাসে তিনি একেবারে আশ্রমের অন্তেবাসীদের একজন হয়েছিলেন বিশুদ্ধভাবে। চিঠি লেখায় নিয়মনিষ্ঠ বোয়কির তৎকালীন জীবনের দিনপঞ্জী ভালোভাবে জানা গিয়েছিল তাঁর পত্রাবলী থেকে। তিনি লিখেছিলেন—

"Soon after my return on having unpacked everything and again repack I came to Segram live with Mahatma Gandhi at his invitation. I remained there until New Year when Gandhiji and the various members and myself came to Bardoli. I shall be here until Gandhiji remains. What I shall do after I cannot say. It depends on him now. My life is in his hands so I don't know what he intends to do with me."

বোয়কি মনেপ্রাণে ভালোবাসতেন কবিতা ও ছবি। তাঁর সঙ্গে এ প্রসঙ্গে আলোচনায় উদ্দীপনা পেতাম যথেষ্ট। একদিন কথাপ্রসঙ্গে বললাম, "আমার একান্ত ইচ্ছা যে একবার ইয়োরোপে গিয়ে চিত্র-ভাস্কর্যের উপকরণ ও শৈলীর চর্চায় নিজের রচনাকে আরও উন্নততর করতে সক্ষম হই। কিন্তু আমার মতো বিত্তহীন স্কুলের শিক্ষকের এ বাসনা একেবারেই দিবাস্বপ্নের মতো অপূর্ণ থেকে যাবে।" শুনেই তিনি বলে উঠলেন, "দিবাস্বপ্ন! কে তোমাকে বলেছে ও কথা? তুমি

অনায়াসে যেতে পার যদি তোমার যাওয়ার ইচ্ছাটায় ভেজাল না থাকে।" বললাম, "কিন্তু যেতে গেলে এবং ওখানে থাকতে প্রচুর অর্থের প্রয়োজন, আমার সে সঙ্গতি কোথায়!" তাঁর জবাব এল, "দেখ অর্থের প্রশ্ন পরে হবে। প্রথমে যাওয়ার জন্ত অর্থ ছাড়া অন্য সব প্রয়োজনীয় কাজ, যাতে বেশী অর্থ লাগে না তার তালিকা প্রস্তুত হোক। প্রথমে একটি পাসপোর্ট করিয়ে ফেল।"

এই প্রচেষ্টায় প্রথম বাধা এল এই কারণেই যে, স্বদেশী-আন্দোলনে জড়িত থাকার অপরাধে পাসপোর্ট দিতে কর্তৃপক্ষ গররাজী ছিলেন। ভাগ্যক্রমে আমার এক ছাত্রের পিতা জেলাশাসক হয়ে আসায় তাঁর সাহায্যে অল্পায়াসেই পাসপোর্ট পেয়ে গেলাম। কত কম টাকায় জাহাজে যাওয়া সম্ভব সেই অন্বেষণে অর্ধেক মূল্যে মাল ও যাত্রীবাহী জাহাজে (বি. আই. এস. এন.) কলকাতা থেকে ইংলণ্ডের টিল্‌বারি বন্দর যাওয়ার টিকিট পেলাম যা ব্যয় করা আমার সঙ্গতির মধ্যেই ছিল। সঞ্চয়ের যেটুকু অবশিষ্ট ছিল তা দিয়ে পোশাক ও পথের খরচটুকু মিটিয়ে তহবিল শূন্য হয়ে গেলো। তাই বোয়কিকে বললাম, "এ পর্যন্ত যা সংগৃহীত হয়েছে তাতে লণ্ডনে পৌছাব ঠিক কিন্তু তারপর অনাহারে মরতে হবে।"

বোয়কি উত্তেজিত হয়ে বললেন, "তুমি সেখানে গিয়ে কাজের যোগাড় করে জীবন চালাবে। কিন্তু যদি এমনই ঘটে যে অর্থাভাবে তোমায় অনাহারে পীড়িত হতে হয় তা হলে তুমি নিশ্চিন্ত থাক যে, ও দেশের লোকেরা তোমাকে অনাহারে মরতে দেবার কলঙ্ক বরদাস্ত করবে না। তার আগেই চাঁদা তুলে তোমার জাহাজ ভাড়া দিয়ে তোমায় স্বদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করে দেবে যাতে নিজের দেশে ফিরে তুমি বিনা দ্বিধায় অনাহারে মরতে পার।"

* * *

দেশ ছেড়ে চলে যাবার আগে ডাঃ. বোয়কিকে আমার দশটি মূল ছবি দিয়ে অনুরোধ করেছিলাম যে, তিনি শীঘ্রই যখন স্বদেশে যাচ্ছেন তখন ও দেশে আমার ছবিগুলি যে কোনো উপযুক্ত দামে বিক্রি করে লণ্ডনের টমাস কুকের ঠিকানায় টাকা পাঠালে বিশেষভাবে উপকৃত হব। তিনি সে অনুরোধ রক্ষা করেছিলেন যথাযথভাবে এবং অর্থ পৌছেছিল অতি সঙ্কটকালীন সময়ে। লণ্ডন ছেড়ে পারী পৌছেছিলাম ঐ অর্থের সম্বলে। ডাঃ. বোয়কির চিঠিতে লেখা ছিল, "I hope that you will find the new life in Paris inspiring and uplifting and strengthening so that you may return to Mother India and lead the country in the great awakening to free the spirit from the shakels of bondage and slavery." —July 14, 1938. ডাঃ. বোয়কির সঙ্গে যোগাযোগ না ঘটলে জানি না কোন পথে আমার জীবন অভিগমন করত।

লণ্ডনে কয়েক দিন

প্রায় আটত্রিশ দিন কেবল জল ও আকাশ দেখার পর যে-দিন লণ্ডনের টিল্‌বারি বন্দরে পৌছালাম সে দিন যে কি অপূর্ব আনন্দ পেয়েছি তা ভাষায় ব্যক্ত করা শক্ত। আনন্দ সংশয়চিত্তে বার বার মনে হতে লাগল যেন কতদিনের কাঙ্ক্ষিত কল্পনাকে নিবিড়ভাবে বাস্তবে অনুভব করছি।

কল্পরাজ্যের উল্লসিত মন কিন্তু অর্দ্ধেক হয়ে গেলো বাস্তবতার রূঢ়তায়। ট্রেনের জানালা দিয়ে দেখলাম লাইনের দু'ধারে আবর্জনাভরা, কয়লার গুঁড়ো আর ধোঁয়ায় মলিন ছোট-বড় বাড়ির সারিগুলি সৌভাগ্য ও সৌন্দর্যের সঙ্গে সঙ্গে আরও এক রাজ্যের সাক্ষ্য দিচ্ছে।

ভারতীয় ছাত্রসঙ্ঘে রাতের খাওয়াটা সেরে নিলাম। বহু ভারতীয় ছাত্রের ভিড়ে ডুবে গিয়ে অনুভব করলাম অন্য কিছু চালচলন যাই বদলাক খাওয়ার পর সুখালস আসনে গল্প ও ধূমপানের অভ্যাস ভারতীয় ছাত্রদের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মণ্ডলীতে বেশ সজীব হয়ে আছে। এমনই একটি দলে একজন বিতাড়িত জার্মান ইহুদীর বলা একটি গল্প শুনলাম। 'হিট্‌লার একদিন এক জ্যোতিষীর কাছে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, কবে এবং কেমন দিনে তার ৺ঈশ্বর প্রাপ্তি ঘটবে?' উত্তরে জ্যোতিষী বলল, 'You will die on a Jewish holiday.' হিটলার তো চটে লাল। বললেন, 'তোমার স্পর্ধা তো কম নয়! জানো ফুরেহ্‌রকে অসম্মানের সাজা কি?' সে বললে, 'আজ্ঞে, সে তো জানি, কিন্তু আমি কি করব, সত্যিই When you will die, Jews will have a holiday.'

আমাদের মেছুয়াবাজারের মেসকে হার মানায় এ রকম একটি হোটেলে, জাহাজের কেবিনের মতো ছোট ঘরের জন্য প্রাতরাশ বাদে সপ্তাহে এক গিনি দিতে আমার মনে বেশ কষ্ট হতো। কয়েক দিন লণ্ডনে ঘুরে মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারী দেখলাম, কিন্তু উদ্দেশ্যসিদ্ধির বিশেষ সম্ভাবনা না দেখে ঠিক করলাম পারীতে চলে যাব।

১৯৩৮-এর সেপ্টেম্বর মাস। চেকোশ্লোভাকিয়া নিয়ে ইয়োরোপে মহা গণ্ডগোল চলছে। যুদ্ধ আসন্নপ্রায়। ২৬শে সেপ্টেম্বর বেলা সাড়ে তিনটের সময় ট্রাফাল্‌গার স্কোয়ারে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি জনতার মধ্যে বেশ একটা চঞ্চল বিক্ষুব্ধভাবের সৃষ্টি হলো।

কানে এল ট্যামবুরিনের কর্কশ শব্দ, সেই সঙ্গে চোখে পড়ল একদল ইউনি-ফরম-পরা কিশোর কুচকাওয়াজ করে এগিয়ে আসছে। সামনের দুটি ছেলে লাঠিতে বাঁধা একটি লাল কাপড় উঁচু করে ধরেছে, তাতে লেখা ছিল, 'Union of Young Socialist Party.'

ক্ষণপরেই জনতা ভেঙে যেতে লাগল। যে যে-দিকে পারছে ছুটে পালাচ্ছে। একদল অশ্বারোহী পুলিশ ঘোড়া ছুটিয়ে জনতাকে হটিয়ে নিয়ে যেতে লাগল। আমি রাস্তার একধারে ফুটপাথে দাঁড়িয়েছিলাম, দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে একজন পুলিশ আমায় সে স্থান ত্যাগ করতে বললে। ভাবলাম এই পুলিশ হাঙ্গামার কারণ বুঝি ঐ কিশোর দলটির কোনো রাষ্ট্র-বিরোধী শোভাযাত্রা। আমি অপেক্ষাকৃত নির্জন রাস্তা দিয়ে চলে যাবার সময় দেখলাম সেই ছেলের দলটি সগর্বে পা ফেলে ঢাক বাজিয়ে চলে গেলো। তখন একজন পথচারীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ পুলিশ সমারোহের কারণ কি?" সে বললে, "তুমি কি আকাশ থেকে পড়লে না-কি হে! যুদ্ধ যে লাগল তার খবর রাখ না?"—সত্যিই রাখিনি। কয়েক দিন ঘোরাঘুরির ফলে খবরের কাগজের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক ছিল না। সে বললে, "কোনো বিদেশী রাষ্ট্রদূত আসছেন জরুরী ব্যাপারে তার জন্যই এত পুলিশের ভিড়। ভাবলাম, আমাদের দেশে লাট সফরে বেরুনর অভিনয় এ দেশেও তা হলে হয়ে থাকে।

২৮শে সেপ্টেম্বর ইয়োরোপের রাজনীতিজ্ঞরা যুদ্ধ নিশ্চিত বলে ঘোষণা করলেন। আমি ঠিক করেছিলাম ঐ দিনই পারী যাব। বাড়িওয়ালী বললে, "কর, তুমি কি আজ পারী যাচ্ছ?" হ্যাঁ, বলায় বললে, "তোমার এ রকম আসন্ন যুদ্ধের সময় পারী যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না।" বললাম, "যুদ্ধ যদি বাধেই তা হলে পারী বা লণ্ডনে থাকা একই কথা।" কিন্তু সে ভীষণ আপত্তি জানিয়ে বলল, "আজ তোমার যাওয়া হতেই পারে না। তোমার নাম আমি পাড়ার থানাতে দিয়ে এসেছি। এখুনি সেখানে যাও একটা গ্যাস্ মাস্ক নিয়ে এস।" আমাকে থানায় যেতে সে বাধ্য করলে। আমার সঙ্গী হলো আরও তিন জন ভারতীয় ছাত্র। থানায় পৌঁছে দেখি লোকের লম্বা সারি দাঁড়িয়ে গেছে। রাত প্রায় আটটা। টিপ্‌টিপ করে বৃষ্টি পড়ছিল। একখানি খবরের কাগজ দিয়ে মাথা রক্ষা করে দাঁড়িয়ে রইলাম। প্রায় এক ঘণ্টা পরে থানার ভেতরে প্রবেশের সুযোগ পেলাম। ভেতরে একটি প্রশস্ত হলের মধ্যে কয়েকটি মেয়েপুরুষ স্তূপীকৃত মুখোশের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। আমরা একদল ঢুকতেই এক একজন এসে আমাদের প্রত্যেককে একটি করে মুখোশ পরিয়ে দিলো। মুখোশটা পরে আমার দম আটকাবার মতো অবস্থা। যে পরিয়েছিল, বললে, নিশ্বাস জোরে টানতে কিন্তু আমার অবস্থা তখন সঙ্গীন। দেখা গেলো, বাতাস ঢোকার স্থানটিতে ক্যাপ দেওয়া ছিল। সেখানকার কর্তৃপক্ষ থেকে গ্যাস মাস্কটি বিনা দক্ষিণায় দেওয়া হলো।

২৮ তারিখেই কতকগুলি টিউব স্টেশন বন্ধ হয়ে গেলো। ছোট ছেলেমেয়েদের গ্রামে পাঠাবার ধুম পড়ে গেলো। কয়েক দিন আগে থেকেই লণ্ডনের পার্কগুলিতে ট্রেঞ্চ খোঁড়া আরম্ভ হয়েছিল। দেখা গেলো, সকলেই বাড়ির জানালায় কালো পর্দা, কিংবা রঙ লাগিয়ে আত্মরক্ষার ব্যবস্থায় তৎপর হয়েছে। সবাই জানে যুদ্ধ হবেই। ২৯শে সকালে শোনা গেলো চেম্বারলেন মহাশয় শান্তি স্থাপন করে

ফেলেছেন। ১লা অক্টোবর আর বিলম্ব না করেই আমি পারী রওনা হলাম। তখন আমার মনে দারুণ সংশয় পারী যদি লণ্ডনের মতো হয়। কেন জানি না, লণ্ডনের শিল্পসংগ্রহ মিউজিয়াম, বেশ উন্নত হলেও আমার মন তৃপ্ত হয়নি। চোখের সামনে যা পড়ত তাই যেন আমাকে শোনাত —তুমি পরাধীন তুমি বিদেশী।

পারী

ডিয়েপ থেকে পারী পর্যন্ত ট্রেনে যেতে দু'ধারের দৃশ্য আমার খুব ভালো লেগেছিল। ফ্রান্সের গ্রামের শোভা অতুলনীয়। কোনো কোনো স্থানের দৃশ্য দেখে আমার মনে হচ্ছিল যেন ভারতের কোনো একটি স্থান দিয়ে ট্রেন চলেছে। ফ্রান্সের একখানি মানচিত্র কাছে ছিল। সেটিকে সামনে রেখে কল্পচোখে দেখতে লাগলাম দক্ষিণ পূর্বে আল্পস্ পর্বতমালা জেনোয়া উপসাগরের তীর থেকে ফরাসী ইতালী সীমান্ত হয়ে উত্তরকে আলিঙ্গন করতে হাত বাড়িয়েছে। সুইটজারল্যাণ্ড, জার্মানী ও বেলজিয়াম ; ফ্রান্সের পূব থেকে উত্তর পশ্চিম সীমানা বেষ্টন করে আছে। অস্থির ইংলিশ চ্যানেল ও দুরন্ত বিস্কে উপসাগর ফ্রান্সের উত্তর পশ্চিমের ভূমি বিধৌত করছে। স্পেনের উত্তর দরজায় পিরিনিজ পর্বতমালা মাথা উঁচু করে ফ্রান্সের দক্ষিণে পাহারা দিচ্ছে। ভূমধ্যসাগর দক্ষিণ ফ্রান্সের রিভিয়েরার অঞ্চলে আদুরে ল্যাপ-কুকুরের মতো লুটোপুটি খাচ্ছে। আল্পস্ পাহাড়ের মাঝে মাঝে সমান উঁচু স্থান দিয়ে নদী চলে গেছে। কোথাও নদীর দু'ধারে খাড়া পাহাড় দৈত্যের মতো দাঁড়িয়ে আছে। কিন্তু তার ওপরেই হয়ত সবুজ সমতল ক্ষেত্র, গোমেষাদির চারণভূমি। নীচের সমতল ক্ষেত্রে ভুট্টা চাষের জমি, তারই নীচে আঙুরের ক্ষেত। ঝলমলে সোনালী রোদ রসভারাবনত ফলের গুচ্ছের ওপর পড়ে যেন জমাট বেঁধে গেছে। পাহাড়ের গায়ে পাইন, ফার প্রভৃতি গাছের ঘন সন্নিবেশ গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়েছে। তার মধ্যে মাঝে মাঝে রক্তলোলুপ নেকড়ের দল বা বুনো শুয়োরের দর্শনও মেলে। আল্পসের একটু উঁচুতে কেবল তুষারের তরঙ্গায়িত শুভ্রতা। ফ্রান্সের চারটি বড় নদী, স্নেন, লোয়ার, গারোন্ ও রোনের ধারে ইতিহাসে দাগ রেখে অনেক শহর গড়ে উঠেছে। স্নেন নদী এঁকেবেঁকে মন্থর গতিতে চলতে চলতে হঠাৎ দুমড়িয়ে একটি গোল পাক খেয়ে ফ্রান্সের রাজধানী পারীকে সেই পাকের মধ্যে আলিঙ্গনাবদ্ধ রেখে উত্তর পশ্চিমে প্রবাহিত।

কল্পরাজ্য ছেড়ে বাস্তবে যখন পারীর গার্ সাঁলাজার স্টেশনে পৌঁছালাম, তখন ফরাসী ভাষার সম্বল আমার কিছুই ছিল না। পূর্বপঠিত, প্রবন্ধাদির ধারণায় বদ্ধমূল থাকায় আমি মনে করলাম, এক চোরের রাজ্যে প্রাণটা মাঠে মারা যাবে। সঙ্গে লণ্ডন থেকে ইংরাজী-বলা একটি হোটেল এবং ডক্টর 'ন'-এর ঠিকানা

এনেছিলাম। ট্যাক্সিওয়ালাকে হোটেলের ঠিকানা দেখিয়ে গাড়ীতে উঠলাম। কুলিরা কয়েকটা জিনিস বয়ে ছিল, তার জন্য স্টেশনে কর্তৃপক্ষ কর্তৃক বিহিত ছাপানো বিল দিয়ে পয়সা চেয়ে নিল।

হোটেলে পৌঁছে হোটেলওয়ালার নির্দেশমতো ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে 'ন' মশায়ের সন্ধানে বেরলাম—তখন ছ'টা হবে, রাস্তা চিনি না, যাকে জিজ্ঞাসা করি মাথা নেড়ে হস্তভঙ্গি এবং ঘন ঘন স্কন্ধ স্পন্দনে জানিয়ে দেয় যে ইংরাজী জানে না। দু'একজন আমাকে বোঝাবার চেষ্টা করে শেষে অপারগ হয়ে হাল ছেড়ে দেয়। অনেক পরে একটি ছাত্রকে পেলাম, সে ইংরাজী বোঝে কিন্তু বলতে পারে না। সে আমাকে সঙ্গে নিয়ে বহুক্ষণ ঘুরে বাড়িটা বের করে দিলে, কিন্তু 'ন'কে বাড়িতে পাওয়া গেলো না।

এ রকম ভদ্রলোক ও দেশে প্রায়ই দেখতে পাওয়া যায়। আমার মনে পড়ে, লণ্ডন যাওয়ার পথে মার্সাইতে নেমে দুটি চিঠি পোষ্ট করতে বেরিয়েছিলাম। রাস্তায় এক ভদ্রলোককে চিঠি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, 'পোষ্ট-অফিস'? ভদ্রলোক ইঙ্গিতে আমাকে অনুসরণ করতে বললেন। প্রায় পনেরো মিনিট হাঁটবার পর পোষ্ট অফিস পাওয়া গেলো। ভদ্রলোকটি আমার কাছ থেকে পয়সা নিয়ে টিকিট কিনে লাগিয়ে চিঠি পোষ্ট-বাক্সে ফেলে কাফেতে তার সঙ্গে কিছু পানের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। আমার মনে হলো, লোকটা নিশ্চয় বদ, না হলে এত হৃদ্যতা দেখাচ্ছে কেন? নিশ্চয় কোনো খারাপ জায়গায় নিয়ে গিয়ে পয়সা মেরে দেবার মতলব, এই মনে করে অত্যন্ত অভদ্রের মতো তাঁর নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করেছিলাম এবং পরে নিজের ভুল বুঝতে পেরে অনুতপ্ত হয়েছিলাম। পরদিন 'ন'কে আবিষ্কার করে অতি প্রয়োজনীয় কয়েকটি ফরাসী শব্দ গলাধঃকরণ করে শহরটার কয়েকটি স্থান মোটামুটি দেখা গেলো।

ফ্রান্সের ছোট গ্রাম থেকে আরম্ভ করে বড় শহর পর্যন্ত গড়ে উঠেছে ঠিক শাবক-পরিবেষ্টিত মুরগীর মতো। ফ্রান্সের খুব ছোট গ্রাম থেকে আরম্ভ করে বড় গ্রাম পর্যন্ত দেখা যাবে, সবচেয়ে উঁচু জায়গায় একটি গীর্জা আর তার চারপাশ ঘিরে ছোট বড় বাড়ি। শহরগুলি এই রকম কয়েকটা গীর্জার সমষ্টি নিয়ে গড়ে উঠেছে। পারী শহরেও যে এর ব্যতিক্রম ঘটেনি তা বেশ বোঝা যায়—বিখ্যাত নোতর্‌দাম, সাঁ সুল্‌পিস্‌, স্যাঁজেয়ারমাঁ প্রভৃতি গীর্জাগুলির অবস্থান থেকে। সাধারণ শহুরে বাড়িগুলি বেশ শক্ত, বেশ পুরাতন আভিজাত্যের ছাপ আছে। বাড়িগুলির এক বাড়ির সঙ্গে আর এক বাড়ি লাগিয়ে শেষ পর্যন্ত একটানা। 'আমার দেওয়ালে ঘর তুলো না'—এই ব্যাপার নিয়ে মামলা-মোকর্দমা হয় না। প্রায় প্রত্যেক বাড়ির নীচে মাটির তলায় শক্ত পাথরে গাঁথা ঘর আছে তাকে বলে 'কাভ'। এগুলি মদ রাখার জন্য সাধারণত ব্যবহার করে, কিন্তু বর্তমান যুদ্ধের পূর্বে বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার আশ্রয় হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছিল। পুলিশ থেকে প্রত্যেক বাড়ির দরজায়

লেখা আছে, ক'জন লোক 'কাভ'-এ আশ্রয় নিতে পারবে এবং আক্রমণ-সঙ্কেতের ভোঁ বাজলেই লোক মুখোশ পরে এর তলায় ঢোকে।

পারীর মধ্যে চলে গেছে অসংখ্য বুলভার বা প্রশস্ত রাজপথ। এগুলি কলকাতার চৌরঙ্গীর দু'গুণ তিনগুণ চওড়া। বিখ্যাত বুলভার সাঁজেলিজে পৃথিবীর একটি প্রশস্ততম রাজপথ। প্রায় প্রত্যেক বুলভারের দু'পাশে সুন্দর গাছের সারি। কোনো কোনো বুলভারের দু'পাশে 'প্লেন' গাছের সারি, এগুলি শরৎকালে নতুন পাতার আর পুরাতন বল্কলমুক্ত সোনালী রঙের কাণ্ডে অপূর্ব দেখায়। রাতে গাছের সারির পাশে আলোর সারি, গাছের ডালপালা পাতার ফাঁক দিয়ে রাস্তায় আলোর বন্যা বইয়ে দেয়। যুদ্ধ নিবন্ধনে যে-দিন থেকে পারীকে ওপরে ঢাকনী দেওয়া মিটমিটে আলোর সাজ দেওয়া হলো রাস্তায় বেরুলে মনে হতো আলোকময়ী পারীর শরীর বিষিয়ে বিবর্ণ হয়ে গেছে। রাস্তায় আলোর হাসির সঙ্গে মিলিয়ে পথচারীর প্রাণখোলা হাসি যেন এক যাদুকরের সম্মোহনে স্তব্ধ হয়ে গেছে। মাঝে মাঝে দেখা যায়, আবছায়া আলোয় বিষ-বিরস মুখের ভয়াতুর দৃষ্টি। যাক, অবান্তর কথায় এসে পড়লাম। পারীর বুলভার ছাড়া ছোট ছোট রাস্তাগুলির সৌন্দর্যও কম নয়। দু'পাশের দোকানের সুসজ্জিত পণ্য-সজ্জাকক্ষ থেকে বিভিন্ন দ্রব্য পথচারীকে প্রলুব্ধ করার জন্য যেন কাঁচের আবরণ ভেদ করে রূপের ছটায় চোখ ধাঁধিয়ে দিচ্ছে। ফ্রান্সের সর্বত্রই গ্রীষ্মের মাঝামাঝি থেকে শীতের আরম্ভ অর্থাৎ আগস্ট থেকে প্রায় অক্টোবরের প্রথম পর্যন্ত স্কুল, কলেজ, দোকান বন্ধ থাকে। ১৯৩৯-এর বন্ধের পর সেগুলি আর খোলা হয়নি। দোকানের মালিকরা এসে বিমান আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য দোকানের গায়ে কতকগুলি কাঠের তক্তা লাগিয়ে শহরকে যেন কুষ্ঠ-রোগগ্রস্ত করে তুলেছিল।

সমস্ত পারী শহরটি কুড়িটি বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত, তার এক একটিকে বলে আরানদিস্ম। এ ছাড়া কলকাতাতে যেমন ভবানীপুর, শা'নগর, সিমলা, গড়পার প্রভৃতি পাড়া আছে, পারীতেও মোঁপারনাস, কার্তেলাত্যাঁ, মোমার্ত, অপেরা প্রভৃতি বিভিন্ন পাড়া আছে। কার্তেলাত্যাঁটি ছাত্রদের পাড়া। এখানে রাস্তায় কাফে, রেস্তরাঁ, সর্বস্থানেই বিশ্বের লোককে খুঁজে পাওয়া যায়।

পৃথিবীতে যদি সত্যিকার আন্তর্জাতিক ও বিশ্বজনীন শহর থাকে তো সে পারী। ইংলণ্ড বাদ দিলে ইয়োরোপের আর কোথাও বর্ণ-বিদ্বেষ বা জাতিবিদ্বেষ খুঁজে পাওয়া যাবে না। অবশ্য হিটলারীয় শাসনের পর থেকে জার্মানীতে বর্ণ ও জাতি-বিদ্বেষ বিশেষ প্রবল হয়েছিল তবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর ব্যতিক্রম ঘটেছে। মোমার্ত এবং মোঁপারনাস দুটিই শিল্পীদের পাড়া। এই দুই পাড়ার শিল্পীরা শিল্পে স্ব-শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে সর্বদাই ঝগড়া করে থাকে কিন্তু প্রতিভাবান উৎকৃষ্ট শিল্পীকে দু'পাড়াতেই নিজেদের বিভেদ ভুলে প্রশংসা করে থাকে।

শহরের মাঝে সুন্দর পার্ক আছে। ফরাসী উদ্যানের বিশিষ্টতা সর্বজনবিদিত।

জার্দ্যাঁ দ্য লুক্সেমবুর্গ ও জার্দ্যাঁ দ্য তুইলারি মনোহর প্রস্তরমূর্তি এবং কেয়ারী-করা ফুলের গাছে লাবণ্যময়। এর মাঝে মাঝে মূর্তি-অলঙ্কৃত ফোয়ারা বাগানের সৌষ্ঠব আরও বাড়িয়ে দেয়। এ ছাড়া আরও বোয়া দ্য বুলোন, বোয়া দ্য ভ্যাঁসেন প্রভৃতির প্রাকৃতিক শোভা অতুলনীয়।

পারী শহরের মধ্যে এত গাছপালা থাকার জন্য এবং শহরটির চারপাশে বন থাকায় বিমান আক্রমণকারীদের দৃষ্টিবিভ্রম জন্মিয়ে দেয়। কালো বনের ফাঁকে কোথায় যে শহরটি আত্মগোপন করে আছে অনেক সময় ওপর থেকে রাতে তারা তা বুঝতে পারে না। তবুও অমূল্য সংস্কৃতি ও সভ্যতা-সম্পদের নিদর্শনে পূর্ণ পারীকে অসভ্য নিপীড়কদের থেকে রক্ষা করার জন্যে রাষ্ট্রের কর্তৃপক্ষ যথেষ্ট সাবধানতা অবলম্বন করেছিলেন। পার্কগুলির মাঝে ট্রেঞ্চ কেটে বড় বড় বিমান-ধ্বংসী কামান বসানো হয়েছিল। সন্ধ্যা হলে দেখা যেত অসংখ্য রবারের ফানুসে আকাশ ছেয়ে গিয়েছে। বৈদ্যুতিক তারের সঙ্গে এগুলি বাঁধা, এয়ারো-প্লেন এর গায়ে ঠেকলেই তার জড়িয়ে মাটিতে পড়ে যাবে। প্রসিদ্ধ স্মৃতিসৌধ, মূল্যবান সংগ্রহশালা ও মর্মর-মূর্তিগুলির চারপাশে বালির বস্তা দিয়ে ঢেকে দেওয়া হয়েছিল।

মোমার্ত পারীর অত্যন্ত পুরনো পাড়া, এখানে সাক্রেকর বলে অতি আধুনিক ধরনের একটি গীর্জা আছে। এর চেহারায় প্রাচ্য স্থাপত্যের সঙ্গে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পুরাতন মোমার্তের পাড়ায় ঘুরলে মনে হয়, যেন বিখ্যাত ফরাসী ঔপন্যাসিক দ্যুমা অথবা য়ুগোর বর্ণনাগুলি চোখের সামনে দেখা যাচ্ছে। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দী এবং তার আগের কালের রাস্তা, বাড়ি, একই অবস্থায় এখনো বর্তমান রয়েছে। মোঁপারনাস বোহেমিয়ান পাড়া, বেশীরভাগ আমেরিকানদের ভিড় এখানে। এখানকার কয়েকটি কাফে বিশেষ প্রসিদ্ধ।

ফ্রান্সের প্রত্যেক বড় শহরে, এমন কি ছোট গ্রামে পর্যন্ত রাস্তার ধারে ধারে কাফে দেখতে পাওয়া যায়। ফ্রান্সের জাতীয় জীবন, সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে এই কাফের মধ্যে। পারীতে বড় বুলভারের ধারে বহুসংখ্যক বড় কাফে দেখতে পাওয়া যায়। প্রত্যেকটি কাফেই আলোকমালা এবং চেয়ার ও ছোট টেবিলে সাজানো। কাফের দেওয়ালগুলি নানা রূপ অলঙ্করণ-চিত্রে সুসজ্জিত। সর্বদাই এখানে গান-বাজনা হচ্ছে। এক কাপ চা অথবা কফি নিয়ে বসে যান —থাকতে দেবে আপনার যতক্ষণ খুশী, এর জন্য আলাদা কিছু লাগে না। পানীয়টির দাম দিলেই চলে। এই কাফের মধ্যে বসে বড় বড় ফরাসী লেখক তাঁদের অমূল্য গ্রন্থাদি রচনা করেছেন। কত বিখ্যাত দার্শনিক তত্ত্বচিন্তায় এখানে ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছেন, কত বৈজ্ঞানিক নতুন আবিষ্কার-স্বপ্নে বিভোর হয়েছেন, কত রাজ-নীতিকের চিন্তাধারা এখানে গড়ে উঠে দেশের অবস্থাকে কতবার অদল-বদল করে দিয়েছে। ছাত্রদের মধ্যে অনেকে এখানে এক কাপ কফি ও কয়েক ভ্যলুম বই নিয়ে বসে যান গবেষণায় বা পরীক্ষার পড়াশুনায়। এখানে বসলে দেখতে এবং

শুনতে পাওয়া যাবে, প্রত্যেকটি টেবিল ঘিরে ছোট ছোট আন্তর্জাতিক সম্মিলনী ও তাদের নানা ধরনের আলোচনা। এই কাফে থেকে নানা দেশের মনীষীদের সঙ্গে আলাপ করা যায়, তা ছাড়া জনসাধারণ তাঁদের সঙ্গে আলাপ করে, তর্ক করে তাঁদের চিন্তাধারায় উদ্বুদ্ধ হয়। সাঁজেলিজের কাফে উঙ্গারিয়া, কাফে তিরোল প্রভৃতিতে রাতে সুন্দর অর্কেস্ট্রা ও জিপ্‌সি, রাশিয়ান ও সুইস নর্তক-নর্তকীদের নৃত্যের বন্দোবস্ত আছে। এখানে নয়ন ও শ্রুতি উভয়েরই রঞ্জন হয়ে থাকে।

মনে পড়ে একদিন সন্ধ্যায় কার্তেলাত্যাঁর একটি কাফেতে বসে আমার জনৈক পোলিশ বন্ধুর সঙ্গে গল্প করছিলাম। আমাদের পাশের টেবিলে একটি মহিলা আমাদের কথার ফাঁকে বুঝেছিলেন যে, আমি ভারতীয়। হঠাৎ উঠে এসে, "বসতে পারি" বলে গারসোঁকে (পরিবেষণকারীকে) কফির হুকুম করে বললেন, "আপনি ভারতীয় ?" "হ্যাঁ" বলাতে তিনি বললেন, "ভারত হচ্ছে তাঁর ধ্যান, চিন্তা এবং জীবন।" বললেন, "পূর্ব জন্মে বোধহয় তিনি ভারতীয় ছিলেন।" এই রকম জন্মান্তর-বাদী বহু ও দেশী লোকের সঙ্গে আমার দেখা হয়েছে। মহিলাটি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি 'ইয়োগী' কি-না ? না বলাতে তিনি প্রথমে অবাক হলেন এবং পরে মাথা নেড়ে বললেন, "আমাকে ফাঁকি দিতে পারবেন না। আমি জানি ভারতীয়রা তাদের আধ্যাত্মিক জিনিস বিদেশীদের দিতে বা বলতে চায় না। কিন্তু আমি নিরামিষ খাই এবং প্রাণায়াম করি" —বলেই নাক টিপে আমাকে দেখাতে লাগলেন ও বললেন, "কোনো ভারতীয়কে অতি কষ্টে ভুলিয়ে তিনি এই অমূল্য রত্নটি আদায় করেছেন।" আমি ইয়োগী নই বারম্বার বলেও তাঁকে বিশ্বাস করানো গেলো না। ভারত সম্বন্ধে অসংখ্য প্রশ্নের পর যখন আমরা ওঠার জন্যে প্রস্তুত হচ্ছি, তখন তিনি আমার ঠিকানাটি আদায় করে বললেন, "আজ না বললেও আর একদিন পরের প্রণালীটি তাঁকে দেখিয়ে দিতে হবেই হবে, না হলে তিনি ছাড়বেন না।" অগত্যা তাঁকে বললাম, "এর পরের প্রণালী হচ্ছে নাকের কাছে হাতের ওপর এক মুঠো পাউডার রেখে ধীরে ধীরে নিশ্বাস নেওয়া ও ফেলা। লক্ষ্য রাখবেন, পাউডার যেন না ওড়ে।" তিনি খুব খুশী হয়ে ঘন ঘন করমর্দন করে অসংখ্য ধন্যবাদ জানালেন। এরপর কি করবেন জিজ্ঞাসা করায় বললাম, "কয়েক বার এটি অভ্যাস করবার পর অন্য ভারতীয়ের সঙ্গে দেখা হলে জিজ্ঞাসা করবেন।"

অনেকেই হয়ত আমার এই কাজটিকে সু-চোখে দেখবেন না। কিন্তু এই সব ভারতের অন্ধ ভক্তদের কিছু না বলে পালিয়ে যাওয়া অসম্ভব। যদি মিথ্যাও বলা যায়, এঁরা খুশী হয়ে যাবেন ; না হলে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হবেন এবং মনে করবেন তাঁরা বিদেশী ম্লেচ্ছ বলে আপনার ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার্থে 'এরা কিছু বলতে চায় না।' এদের শুধু সত্য অক্ষমতা জানিয়ে ফেরানো বড় মুস্কিল। ফ্রান্সে আমি দু'শ্রেণীর ভারতভক্ত দেখেছি। এক দল মনে করে, ভারতে এখনও বেদ-উপনিষদের যুগ চলছে এবং প্রত্যেক ভারতীয় হচ্ছে এক একজন যোগী বা বুদ্ধ, তারা মিথ্যা কি তা

জানে না, হিংসা কখনো তাদের মনে স্থান পায় না, সকলেই সচ্চরিত্র, সজ্জন—একেবারে ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির। এরা অনেক সময়ে ইচ্ছা করে জানতে চায় না আমাদের দেশের বর্তমান আসল রূপ কি।

ইয়োরোপের সংস্কৃতি ও সভ্যতা দ্রুতগতিতে এগিয়ে চললেও রাজনৈতিক বর্বরতা এদের মনে এই ধারণা জন্মিয়ে দেয় যে, এই সভ্যতার অগ্রগতি, বর্বরতা ও ধ্বংসকে আরও কাছে এনে দেবে। এরা সাধারণত অত্যন্ত রক্ষণশীল। অনেক সময় আমাদের দেশের অন্ধ রক্ষণশীলদের এরা হার মানিয়ে দেয়। এখনও পৃথিবীতে এমন একটি দেশ আছে যেখানে সব কিছুই মহান্, নৈতিক ও মানবতায় পূর্ণ—এই ধারণাকে মনে আটকে রেখে নিজের মনকে এরা প্রবোধ দিতে চায়। এদের দেখলে অনেকে ভাববে এরা পাগল, কিন্তু নিজেদের মতবাদে এদের দৃঢ় বিশ্বাস অটল।

ইয়োরোপে যাবার সময় জাহাজে এক থিওজফিষ্ট জার্মান মহিলার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে তাঁর সম্বন্ধে দু'এক কথা বলা আশা করি অবান্তর হবে না। রোজই সকালে তাঁকে ডেকের ওপর হলুদ রঙের অদ্ভুত জামা, গাঢ় নীল রঙের অধোবাস, মাথায় একটি পাতলা হাল্‌কা রঙের ওড়না করে বাঁধা একটি বড় রেশমী রুমাল এবং কান দুটিতে তিব্বতীয় কর্ণাভরণ পরে থাকতে দেখতাম। ইংরেজ যে নয়, তা প্রথম দৃষ্টিতেই যে-কেউ বুঝতে পারত। বড় কৌতূহল হলো। একদিন সাহস করে জিজ্ঞাসা করলাম, "মাপ করবেন, আপনার স্বদেশ জানতে পারি কি?" উত্তর এল, "আমি জার্মান, বর্তমানে আমেরিকার নাগরিক, কিন্তু আসলে মনে আমি তিব্বতীয়—আমি থিওজফিষ্ট।" আমি জাহাজে ফরাসী জানা লোকের সন্ধানে ফিরতাম; জিজ্ঞাসা করলাম, "আপনি ফরাসী জানেন?" বললেন, "জানি, কিন্তু অনেক দিন চর্চার অভাবে প্রায় ভুলে গেছি।" কাছে একখানি ফরাসী ব্যাকরণ ছিল, সেটি নিয়ে গিয়ে অনুরোধ করলাম, একটি উচ্চারণ দেখিয়ে দিতে। কিন্তু নানা গল্পের ফাঁকে আমার নিজের উদ্দেশ্য চাপা পড়ে গেলো। বেশীরভাগ কথা হতে লাগল, ভারতীয় ধর্ম, পুরাণ ও রূপক সম্বন্ধে। প্রাচীন ভারতীয় ইতিবৃত্ত ও ধর্ম সম্বন্ধে তাঁর অগাধ জ্ঞান দেখে মনে মনে প্রশংসা না করে থাকতে পারলাম না। সব চেয়ে অবাক হলাম তাঁর ভারত আগমনের কাহিনী শুনে। ইনি বলতে লাগলেন, "জানেন, আমি পূর্বের এক জন্মে কি ছিলাম?" "না" বলাতে তিনি বললেন—

"আমি ছিলাম প্রাচীন মিশরের এক ফ্যারাওয়ের রাণী। তখন আমার পার্থিব ভোগ-জীবনের প্রতি আকর্ষণ থাকলেও মনটা বেশ একটা আধ্যাত্মিক উচ্চস্তরে বাঁধা ছিল। তার ফলে পরবর্তী এক জন্মে তিব্বতীয় এক লামার ঘরে জন্মাই। কিন্তু সেই জন্মে পুনরায় বিষয়াসক্ত হওয়ায় আমার এই জন্মের পরিণতি। আমি একজন যুবকের খুব উজ্জ্বল বড় চোখ এবং দীপ্তিযুক্ত দৃষ্টি দেখে মনে করেছিলাম আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে সে বেশ অগ্রবর্তী, ফলে তার প্রেমে পড়ে বিয়ে করি। কিন্তু কয়েক বছর

পরে আমার ভুল ভাঙল, সে অত্যন্ত তামসিক, আমার যোগ-ধ্যানকে সে সু-চোখে দেখত না, তাই তাকে ছেড়ে বেরিয়েছি আমার গুরুর কাছে। তিনি তিব্বতীয়, তাঁর নাম …তাঁকে কোনো দিন আমি দেখিনি বা তাঁর ঠিকানা জানি না। কেবল আমার ধ্যানের মধ্যে তাঁকে একবার দেখেছি। তাঁরই সন্ধানে তিব্বত গিয়েছিলাম, কিন্তু তিনি দেখা দিলেন না। ধ্যানে জানালেন, এখনো সময় হয়নি তাঁর, তাই ফিরে যাচ্ছি জার্মানীতে বাপ-মায়ের কাছে।"

আশ্চর্য হলাম, তাঁর ভারতীয় অধ্যাত্মবাদের আবেগ এবং অন্ধ ভাবপ্রবণতা দেখে। সুদূর আমেরিকা থেকে একটা অজানা, অচেনা, গুরুর সন্ধানে তিব্বতের মতো দেশে —যার সঙ্গে পৃথিবীর সম্বন্ধ নেই বললেই চলে —আমার ইচ্ছার পিছনে কত বড় প্রেরণা থাকলে এ সম্ভব তা আমরা কল্পনা করতে পারি না। কিন্তু ও দেশে যারা ভারতের আধ্যাত্মিকতাকে শ্রদ্ধা করে, জানতে চায়, তারা এই রকমই ভারতীয় ভাবে আত্মহারা।

ফ্রান্সে আর একদল ভারতভক্ত দেখেছি, এঁরা প্রাচীন ভারতকে যথেষ্ট জানলেও বর্তমানকে মন থেকে তাড়িয়ে দেননি। বর্তমান ভারতীয় জীবন এবং প্রত্যেকটি আন্দোলন সম্বন্ধে এঁরা রীতিমতো সচেতন। এঁরা ভাবপ্রবণতায় বাস্তবকে, যুক্তিকে ভুলে যাননি। ভারতের মুক্তিসংগ্রামকে এঁরা শ্রদ্ধা করেন এবং নিজেদের এতে যোগ দেওয়াটা বড় কাজ বলে মনে করেন। তর্ক করে, সাধারণ সভায় বক্তৃতা করে ও দেশের জনসাধারণকে জানাতে চেষ্টা করেন আমাদের দাবীর যোগ্যতাকে। এঁদের অনেককে ফ্রান্স-প্রবাসী ভারতীয়দের চেয়ে ভারত সম্বন্ধে বেশী খবর রাখতে দেখেছি। আমরা এক ভারতবন্ধু ফরাসী মহিলার কাছে প্রায়ই যেতাম, সুভাসচন্দ্র, নেহেরু, রায় এঁরা বর্তমানে কি করছেন, কংগ্রেসের খবর কি প্রভৃতি জানতে। কারণ তিনি কেমন করে জানি না, আমাদের সকলের চেয়ে আগে সব খবর পেতেন। ফ্রান্সে, বিশেষ করে পারী শহরে এঁদের সংখ্যা বিরল নয়। জানি না, যাঁরা ওখানে বেড়িয়ে ফিরেছেন, তাঁদের সঙ্গে এই শ্রেণীর লোকের আলাপ হয়েছে কি-না, কিন্তু তাঁদের লিখিত বিবরণীতে কদাচিৎ এ বিষয়ে লেখা দেখেছি। সম্ভবত, তাঁরা স্মৃতিসৌধ, রঙ্গালয়, পানাগারের বর্ণনার মধ্যে এ সব লেখা যুক্তিযুক্ত মনে করেননি।

ফরাসী শিল্প-শিক্ষায়তন, মডেল ও শিল্পীসমাজ

পারীতে আসার চার দিন পরে ডক্টর 'ন' বললেন, "চলুন আপনাকে একটি আতলিয়েতে (শিল্পীদের কর্মশালা) নিয়ে যাই, দেখুন, আপনার যদি সেখানে ভাস্কর্য শেখার সুবিধে হয়।" তাঁর সঙ্গে 'আকাদেমী ন্ত লা গ্রাঁদ শমিয়ের' শিল্প

শিক্ষায়তনে গেলাম। যে রাস্তার ওপর এটির অবস্থান তারই নামানুসরণে এর নাম। এই রাস্তাটির দু'ধারে আরও অনেকগুলি 'আকাদেমী'র সাইন বোর্ড চোখে পড়ল। পারীর সব আরান্ দিস্‌মতে দেখা যাবে, শিল্পীরা দলবেঁধে নিজেদের স্বতন্ত্র পাড়ার সৃষ্টি করেছে। এক একটি রাস্তার দু'ধারের সব বাড়িগুলিই স্টুডিয়ো। এই স্টুডিয়োগুলিতে এক একজন পারদর্শী শিল্পীর তত্ত্বাবধানে এক একটি শিল্প বিদ্যালয় গড়ে উঠেছে। আধুনিক শিল্পান্দোলন ও তার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গে এর সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি পর্যন্ত, সরকারীভাবে সমর্থিত শিল্পীরা যেমন প্রতিষ্ঠা পেয়েছিলেন সেই সঙ্গে অর্থোপার্জনও করেছিলেন প্রচুর। বলা বাহুল্য সরকারী প্রতিষ্ঠানের শিল্পীরাই এই সুযোগ সর্বাগ্রে লাভ করতেন। আধুনিক শিল্পান্দোলনের স্রষ্টা শিল্পীশ্রেষ্ঠ সেজান-এর ভাগ্যে জীবদ্দশায় প্রতিষ্ঠা না জোটার কারণ, তিনি স্বাধীনভাবে শিল্পসাধনা করেছিলেন এবং তাঁর অঙ্কনপদ্ধতি ও চিন্তা-ধারা সরকারী বিদ্যায়তনের শিল্পীগোষ্ঠীদের দ্বারা সমর্থিত হয়নি। উনবিংশ শতাব্দী এবং তার পূর্বে শুধু ফ্রান্সে কেন, ইয়োরোপের সব দেশেই শিল্পীরা ধনীদের পৃষ্ঠপোষকতায় চলতেন। কাজেই তাঁদের পছন্দসই ভাববিলাসী চিত্রণ ও ভাস্কর্যের অবতারণা করেই শিল্পীদের জীবন কাটত। অবশ্য ধনীদের রুচি অনুসারে কাজ করলেও তাঁদের শিল্পনৈপুণ্যে ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য যথেষ্ট ফুটিয়ে তুলেছেন। কিন্তু ইম্প্রেশনিজম শিল্পধারার রচয়িতা 'ম্যানে' 'মানে' এবং তাদের পক্ষীয় শিল্পীমণ্ডলী, ধনী সম্প্রদায়ের বন্ধন থেকে সম্পূর্ণ সরে এলেন এবং সেজানের মতবাদ প্রতিষ্ঠা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে বন্ধনের ক্ষীণ প্রভাবটুকুও সম্পূর্ণ রূপে নিঃশেষ হয়ে গেলো। অবশ্য এই আন্দোলন চালাতে এঁদের সকলকে যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল এবং জনসাধারণের আপত্তির চেয়ে সরকারী আপত্তি তাঁদের অধিকতর পীড়ন করে-ছিল। ধনী ও সরকার সমর্থিত শিল্পী ও শিক্ষায়তনগুলি উপরোক্ত মতবাদের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে লোকচক্ষে হেয়, অবজ্ঞাত হয়ে পড়ল। সেই সময়ে বেসরকারী শিল্প-শিক্ষায়তনগুলি বহুল পরিমাণে গড়ে উঠল।

সরকারী ও বেসরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলিতে শিক্ষা-প্রণালী ও কর্ম-সময় নির্ঘণ্টের যথেষ্ট তফাৎ আছে। সরকারী শিল্প-শিক্ষালয় 'একোল্ নাসিয়ন্যাল দে বোজার্'-এ নির্দিষ্ট বাৎসরিক শিক্ষাতালিকা মেনে চলতে হয়। বেসরকারী আতলিয়েতে বাৎসরিক নির্দিষ্ট শিক্ষা-তালিকার প্রচলন নেই। যে কেউ যে কোনোদিন ভর্তি হয়ে কাজ আরম্ভ করতে পারে। শিক্ষার্থীদের মান অনুসারে কোনো শ্রেণীবিভাগ নেই। একই ঘরে প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন শিল্পী থেকে আরম্ভ করে প্রথম শিক্ষার্থী পর্যন্ত এক সঙ্গে কাজ করছে। ফলে প্রথম শিক্ষার্থীরা অগ্রবর্তীদের শিক্ষালাভের বিভিন্ন পরিণতি একই সময়ে দেখবার সুযোগ পায়। এই সকল আতলিয়েতকে ঠিক আমাদের ধারণায় বিদ্যালয় মনে করা ভুল হবে। অনেক শিল্পী,

যাঁদের স্বতন্ত্র মডেল রেখে কাজ করবার অর্থসঙ্গতি নেই তাঁরাও এখানে এসে কাজ করে থাকেন। সবাই এখানে স্ব-স্ব মতানুসারে কাজ করে। প্রতি সপ্তাহে এক দিন আকাদেমী কর্তৃক নিযুক্ত কোনো এক বিখ্যাত শিল্পী ছাত্রদের কাজ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়ে ও সমালোচনা করে অধ্যাপকের কাজ করে থাকেন। আতলিয়েতের দক্ষিণা ও অধ্যাপনার দক্ষিণা আলাদা দিতে হয়। কাজেই যার ইচ্ছা হয় সেই কেবল অধ্যাপকের সাহায্য নিয়ে থাকে। অধ্যাপকের সমকক্ষ নিপুণ শিল্পী যাঁরা এখানে কাজ করেন তাঁদের আর অনাবশ্যক অধ্যাপনার দক্ষিণা দিতে হয় না।

'গ্রাঁদ শমিয়ের' পারীর একটি উৎকৃষ্ট বেসরকারী শিল্পশিক্ষা প্রতিষ্ঠান। রোদ্যাঁর প্রিয় ও উপযুক্ত ছাত্র, বিশ্ববিশ্রুত কবিভাস্কর বুর্দেল এর প্রতিষ্ঠাতা। তিনি যতদিন বেঁচেছিলেন, ততদিন 'গ্রাঁদ শমিয়ের'-এর ভাস্কর্য বিভাগে অধ্যাপকের কাজ করেছিলেন। পরে তাঁর সুযোগ্য ছাত্র অধ্যাপক ভেল্‌রিক তাঁর স্থানে কাজ করেছেন। মিঃ. ভেল্‌রিক ইয়োরোপ ও আমেরিকায় একজন শ্রেষ্ঠ ভাস্কর হিসাবে পরিচিতি লাভ করেছিলেন।

পারীর স্টুডিয়ো সম্বন্ধে পূর্বে অনেক বিচিত্র কথাই শুনেছি কাজেই প্রথম যে-দিন 'গ্রাঁদ শমিয়ের'-এ গেলাম বুকের ভিতর কেমন টিপ্‌টিপ করতে লাগল —যেন কি এক অনির্দিষ্টের উদ্দেশ্যে অভিযান করছি।

প্রকাণ্ড হলে স্টুডিয়োর ভাস্কর্য বিভাগের কাজ চলছিল। ভিতরে যেতে চোখে পড়ল সম্পূর্ণ বিবসনা একটি যুবতী চুপ করে একটি চৌকির ওপর দাঁড়িয়ে আছে আর তারই চারপাশে এগারো জন ছাত্রছাত্রী টুলের ওপর কাদামাটি দিয়ে অনুকৃতি গড়ছে। অসম্ভব রকমের একটি বেঁটে শিল্পী আমাদের দিকে এগিয়ে আসতে ডক্টর 'ন' তাকে কি বললেন। অল্পক্ষণের মধ্যেই সে আমাকে একটি মডেলিং টেবল, লোহার একটি কাঠামো ও কাদামাটি দিয়ে গেলো।

এগারোটা বাজতেই যে মেয়েটি এতক্ষণ পুতুলের মতো নিস্পন্দ দাঁড়িয়েছিল, নড়ে উঠল এবং একবার আড়ামোড়া ভেঙে তার কাষ্ঠাসন থেকে নেমে এল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে নিস্তব্ধ ঘরখানাকে সকলের সঙ্গে তর্ক করে বেশ সরগরম করে তুলল। তর্ক যে রাজনীতি নিয়ে হচ্ছে, সেটা বুঝলাম মাঝে মাঝে বিভিন্ন রাষ্ট্র-নায়কদের নামোল্লেখে। তারপর সে আমাদের সকলের কাজ দেখে কি সব মন্তব্য করতে লাগল —ভাষা না জানায় তার মর্ম বুঝলাম না।

প্রথম যে-দিন মাঁসিও ভেল্‌রিককে ক্লাসে আসতে দেখলাম, সে দিন আমার মনে যথেষ্ট ক্ষোভ হচ্ছিল, তাঁর কথা বুঝব না বলে। কারণ তখনও ফরাসী ভাষা আমার বিশেষ আয়ত্ত হয়নি। তাঁর প্রকাণ্ড চওড়া কপাল, উন্নত নাসা, চোখের স্নিগ্ধ চাহনি এবং গোঁফ-দাড়ি দেখে আমার মনে হলো 'আনাতোল ফ্রাঁসের' আর একটি সংস্করণ। পরণে তাঁর অতি সাধারণ কোট এবং পাণ্টালুন। তবু মনে হলো যেন কত তার বাহার। ফ্রান্সে বড় বড় শিল্পী, কবি, মনীষীদের গোঁফ-দাড়ির বৈশিষ্ট্য

তো আছেই, তাঁদের বেশভূষার ধরনও বেশ কিছু অদ্ভুত। এ যে তাঁরা ইচ্ছে করে লোক দেখাতে করে থাকেন তা নয়। এঁরা নিজেদের সাধনায় এত আত্মহারা যে, বেশভূষায় সব সময় সামাজিক ভব্যতাকে মেনে চলতে ভুলে যান। কিন্তু সেই অতি সাধারণ পারিপাট্যহীন পোশাকেরও যেন একটা আলাদা, আভিজাত্য আছে। বড় বড় মনীষী পণ্ডিত হলে কি হয়, মনের সারল্য দেখলে মনে হয় এঁরা শৈশবের সরলতার গণ্ডী আজও ছাড়াতে পারেননি। যখন মঃ. ভেল্‌রিক আমাদের কাজের সমালোচনা আরম্ভ করলেন, আমরা তাঁকে ঘিরে শুনতে লাগলাম। বলার কি অপূর্ব ভঙ্গি! হাতের মুদ্রায় তাঁর বক্তব্য এমন নিখুঁতভাবে ফুটে উঠল যে, আমার ভাষা না জানার ক্ষোভ চলে গেলো; তাঁর বক্তব্য বুঝতে বিশেষ কষ্ট হলো না। যতদিন আমার ভাষা আয়ত্ত হয়নি ততদিন আমাদের সহকর্মী ম্যানে ক্যাজ্ (ইনি ফ্রান্সের একজন খ্যাতনামা শিল্পী হিসাবে চিহ্নিত হয়েছিলেন) সর্ব ব্যাপারে দোভাষীর কাজ করে আমায় যথেষ্ট সাহায্য করতেন।

প্রথম পরিচয়ে অধ্যাপক ভেল্‌রিক যখন শুনলেন আমি এঁ্যাদু (হিন্দু) তিনি বললেন, "শিব, বুদ্ধ, নটরাজ স্রষ্টাদের ছেড়ে শিখতে এসেছ আমাদের কাছে!" বললাম, "সে সব শিল্পীর সন্ধান আজকাল আর ভারতে মেলে না। ভারতের শিল্প ইতিহাসে যে বিরাট ফাঁক আছে তারই অন্ধকারে মিলিয়ে গেছে এই বিরাট স্রষ্টাদের শেষ শিখাটুকু।"

মঃ. ভেল্‌রিক শুনে বললেন, "তাতে কি হয়েছে? আমরা হয়ত আধুনিক শিল্পের ব্যাখ্যা করতে পারব, কিন্তু বর্ণপরিচয়ের সন্ধান মেলে প্রাচীন ভারত, মিশর ও গ্রীসের শিল্প ভাণ্ডারে। বুদ্ধ শিবের স্রষ্টারা তো আর তাঁদের রচনার প্রেরণা বা কর্মকৌশল বিদেশে গিয়ে অর্জন করেননি, ছেনী হাতুড়ী নিয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন পাহাড়ে। প্রকৃতিই তাঁদের প্রেরণা ও শিক্ষা দিয়েছিল সে মহান্ মূর্তিগঠন কৌশলের। তাঁদের রচনা এবং প্রকৃতি হবে তোমার গুরু, যাও দেশে গিয়ে কাজ আরম্ভ কর।"

ভারতের প্রতি, ভারতীয় শিল্পের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ও ভক্তি দেখে, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় আমার মাথা নত হলো, মুগ্ধ হলাম তাঁর আন্তরিকতায়। শুধু বললাম, "সে ভাবে কাজ করবার অনুপ্রেরণাও হারিয়ে আজ আমরা সম্পূর্ণ নিঃস্ব, অসহায়। আপনাদের কাছে এসেছি আপনাদের শিল্পের ও কর্মধারার নকল করতে নয়, প্রকৃত শিল্প স্থষ্টির অনুপ্রেরণা নিতে।"

সে দিন যাবার সময় মঃ. ভেল্‌রিক বললেন, "কর, তুমি মাঝে মাঝে আমার স্টুডিয়োতে এলে এবং তোমার সঙ্গে আরও কথাবার্তা হলে খুশী হব।"

কয়েক দিন পরে এক রাতে কর্মক্লান্ত দেহে শয্যাশ্রয় করতে গভীর নিদ্রিত হয়েও স্বপ্ন দেখলাম, যেন এক রঙ্গালয়ে বসে আছি। সামনের পর্দায় ক্রমাগত ছবি আসছে যাচ্ছে। সব দৃশ্য মনে নেই, কিন্তু ভুলিনি সেই দৃশ্যটি যখন ফরাসী শিল্পী

হ্বাতো এসে বল্লেন, 'আমি সপ্তদশ শতাব্দীর নাট্যকার, আমার রচনায় আছে কেবল নাচ আর গান।' ছবি বদ্‌লালো, সঙ্গে সঙ্গে শুনতে পেলাম মেঠো গানের সুর। পুষ্পিত কুঞ্জ বনস্পতিভরা এক টুক্‌রো জমির পিছনে সমুদ্র বেলাভূমি ছুঁয়ে দিগন্তে মিশে গেছে। সামনের সবুজ প্রান্তরাঞ্চলে বাঁশীর সুরের তালে কয়েকটি সুসজ্জিত নরনারী নেচে নেচে রতিদেবীর মূর্তিকে প্রদক্ষিণ করছে।

সকালে রাস্তায় বেরিয়ে মনে হলো স্বপ্নের ঘোর বুঝি কাটেনি। বুলভারের দু'ধারে প্রকাণ্ড গাছের গোড়ায় মাঝে মাঝে চাষাদের ক্ষেত-খামারের কাগতাড়ুয়ার মতো কি দেখা যাচ্ছিল। কাছে গিয়ে দেখি কাগতাড়ুয়া নয়, বেরে টুপি মাথায় শিল্পী এক মনে ছবি আঁকছে। এক বুলভার দিয়ে চলতে দেখি ফুটপাথের দু'ধারে চিত্র ভাস্কর্যের প্রদর্শনী বসে গেছে। ছোট একটি চৌকিতে বসে শিল্পী স্বপ্নালস চোখে পাইপ টানছে পাশে তার স্ত্রী কোনো দর্শক এলে অভ্যর্থনা করে কাজ দেখাচ্ছে। যদি কেউ দেখে চলে যাবার সময় বলে, 'ধন্যবাদ' অমনি সে প্রতিবাদ করে বলে, 'আপনি যে অনুগ্রহ করে ছবি দেখলেন এর জন্য অশেষ ধন্যবাদ।' সন্ধ্যায় এক কাফেতে কফি খাচ্ছি সামনের রঙ্গমঞ্চে অর্কেষ্ট্রার সঙ্গে নাচ হচ্ছিল। এক কোণে শিল্পী নিবিষ্ট মনে এঁকে যাচ্ছে, নর্তকীদের বিচিত্র লাস্য, বাদকদের কৌতুকভরা চোখ আর ভ্রূভঙ্গের ভঙ্গিমা এবং আলাপনরত দর্শকদের পেশাদারী হাততালি।

ফরাসী দেশের শিল্পে বাস্তব নকল মিশে এক হয়ে গেছে। যে জীবন্ত ছবি দেখি গ্রামে, শহরে, রাস্তায়, বাগানে, মাঠে, প্রাসাদে, কুটীরে, কোনো শিল্পপ্রদর্শনীতে গেলে দেখি রচনাগুলি সেই জীবনের কথাতেই পূর্ণ। রাস্তার ধারে সংযোগস্থলে, প্রাসাদোদ্যানে, প্রবেশ দ্বারে, তোরণে ফরাসী শিল্পীরা তাদের দেশের কথা, জাতির কথা, সংস্কৃতির কথা, তাদের আত্মজীবনী রঙ দিয়ে, গঠন দিয়ে সর্বসাধারণকে জানিয়ে দিচ্ছে। ফরাসী জাতি শিল্পীর রচনাকেই কেবল পুজো করে না, রচয়িতার মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে, তার জন্ম ও মৃত্যু দিনে ফুলের মালা দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন করে। নাগরিকরা রাস্তা, বাগান গ্রাম শিল্পীর নামে উৎসর্গ করে চায় তার স্মৃতিকে চোখের সামনে উজ্জ্বল রাখতে। আমরা যাই, সে-সব দেখে তারিফ করে দুটো সস্তা প্রশংসা বিস্ময়ের কথায় রসজ্ঞের ভান করি কিন্তু দেশে ফিরলেই রুচির মোড় ঘুরে যায়। উৎকট স্বাধীনতা ও পরিবর্তনকামীরা বলত —ভেঙে দাও সব টটেম্‌ আর ট্যাবু। শিল্পী! তারা তো বুর্জোয়াদের চাটুকার। এই সব সমাজের প্যারাসাইট্‌স্‌দের সরিয়ে দিতে চাই কামাল আতাতুর্ক …ইত্যাদি। যাদের কাছ থেকে পেয়েছিল এই বুলি, একটু চোখ মেলে দেখলে বুঝত যে, বিপ্লবী বলসেভিকরা সাম্রাজ্যবাদ, ধনতন্ত্রবাদ ধ্বংস করে নতুন সমাজ প্রতিষ্ঠা করলে তারা শিল্পীদের সহায়তায় বিজ্ঞাপন চিত্রের দ্বারা নিরক্ষর জনসাধারণের মাঝে বিপ্লবের বীজ ছড়িয়ে দিয়েছিল। তারা দেশে শান্তি স্থাপিত হলে শিল্পরচনা সংগ্রহ করে নগরে নগরে শিক্ষাকেন্দ্রে সংগ্রহ-

শালার প্রতিষ্ঠা করেছে। প্রাচীন ধর্মমন্দিরের ভাস্কর্য ও অলঙ্করণ সম্বলিত ইটের একটি টুক্‌রোও সরায়নি, কেবল মন্দিরে ভগবান বেচা বন্ধ করে করেছে পাঠশালার পত্তন।

গোটা ফরাসী দেশটাকেই মনে হয় একটি বিরাট শিল্প শিক্ষালয়। বড় শহরগুলি যেন এক একটি কেন্দ্র। শহরের মধ্যে ছড়িয়ে আছে অসংখ্য শিল্প-শিক্ষায়তন। শহরে শিল্প প্রদর্শনী ও সংগ্রহশালার সংখ্যাও কম নয় প্রতি মাসে যে তিন শতেরও অধিক চিত্র ভাস্কর্যের প্রদর্শনী কেবল পারীতেই অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা একশ বছর আগে কেউ ভাবতেও পারেনি। আধুনিক শিল্পধারার অগ্রদূতেরা যখন থেকে শিল্পী ও শিল্পকে সরকারী বন্ধন থেকে মুক্ত করে জনসাধারণের কাছে পৌছে দিলেন তখন থেকে শিল্পের ও শিল্পান্দোলনের প্রসার বেড়েই চলেছে। আধুনিক শিল্পধারার আন্দোলনকে প্রতিরোধ করতে সরকার যে লজ্জাকর উপায় অবলম্বন করেছিলেন তার কালিমা আজও সরকারী শিল্প-বিদ্যালয়গুলিকে মলিন করে রেখেছে। শিল্পীরা তার প্রতিক্রিয়ায় পূর্বেকার সরকারী শিল্পশালা ও তার অন্তর্ভুক্ত শিল্পীদের বিশেষ প্রীতির চোখে দেখেন না এবং এই আন্দোলনের পূর্বের সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় অনুগৃহীত শিল্পধারাকে 'আকাদেমিক' বলে ঘৃণার চোখে দেখেন। 'আকাদেমিক' বলতে এরা অর্থ করে, যে শিল্প গতানুগতিক কোনো ভাব বা শিল্পধারার নির্দিষ্ট নিয়মে সীমাবদ্ধ ও তার আড়ষ্ট প্রাণহীন প্রকাশে স্বতঃস্ফূর্ত আবেগের অভাবে কলঙ্কিত। বাস্তবিক পক্ষে বর্তমান সরকারী ও বেসরকারী শিল্প-বিদ্যালয়ের উন্নতিশীল আন্দোলনে, ভাবধারা বা প্রকাশধারায় বিশেষ কোনো প্রভেদ নেই, কিন্তু বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের সরকারী শিল্প ও শিল্পীর প্রতি নাসিকাকুঞ্চন সমানই রয়ে গিয়েছে। সরকারী শিল্প প্রতিষ্ঠানের প্রতি বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের শিল্পীদের যে মনোভাবই থাক, তাঁরা বর্তমানে সরকার প্রদত্ত সাহায্য ও উৎসাহ সমানভাবে পেয়ে থাকেন।

ফরাসী দেশে, শিল্পীরা শিল্প-বিদ্যালয়গুলিকে শিল্পের অক্ষর পরিচয়ের স্থান এবং কর্মশালা হিসাবে গণ্য করে থাকেন। কেবল মাত্র শিল্প-শিক্ষালয়েই শিক্ষা সম্পূর্ণ হলো এ তাঁরা মনে করেন না। এঁদের জীবনের কর্মচঞ্চল প্রত্যেক মুহূর্তটি শিল্পীকে পূর্ণতার দিকে এগিয়ে দেয়। শিল্পসম্ভারপূর্ণ আবহাওয়া এদের আদর্শ শিল্পী করে গড়ে তুলতে সহায়তা করে। পার্কে বসলে ফুলভরা ডালগুলির ফাঁক থেকে ইসারা করে হয়ত কোনা মূর্তি বলে 'দেখ আমায়। জানো কি, আমি ছিলাম কার মানসী?' জানি না বললে হয়ত একটু কৌতুকভরে হাসে। রাস্তার ফুটপাথ দিয়ে চলছি, হঠাৎ হাত বাড়িয়ে কোনো মূর্তি পথরোধ করে বলে, 'দাঁড়াও, আমায় না দেখে এগিয়ে যেও না। জানো, ইতিহাসের পাতায় কত লেখা আছে আমার কর্মজীবনের কাহিনী?' কোনো প্রাসাদের সামনে দিয়ে যেতে কোনো মূর্তি রক্তাক্ত পতাকা চোখের সামনে মেলে ধরে, দামামার শব্দে বুক কেঁপে যায়। বড় বুলভারের একটি সংযোগস্থলে

দাঁড়িয়ে শুনি, মার্শাল নে অসি আস্ফালন করে চিৎকার করছেন, 'আন্ এ্যাভাঁ' (সামনে অগ্রসর হও)। এইখানে তাঁকে সামরিক বিচারে গুলি করে মারে। কিন্তু শিল্পী এইখানেই তাঁকে পুনর্জীবন দিয়ে অবিরাম বলাচ্ছে, 'আমার সৈন্যদল এগিয়ে চলো।' অপেরার সামনে দাঁড়ালে একদল নরনারী উদ্দাম নাচ নেচে, প্রাণখোলা হেসে বলে, 'হেসে নাও, বন্ধু আনন্দে নেচে নাও, জীবন দু'দিনের বই তো নয়।' লুক্সেমবুর্গ প্রাসাদের বাগানে হুবাতো, দুলাক্রোয়ার প্রতিমূর্তির সামনে কারা যেন দাঁড়িয়ে। কাছে গেলে বলে, 'চিনলে না বন্ধু আমাদের ? আমরাও এক এক শিল্পীর মানসী। তারা তাদের বন্ধুর গলায় মালা দিতে আমাদের পাঠিয়েছে। কত দিন ঝড় বৃষ্টি, রোদ মাথায় করে মালা ধরে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু ওদের গলায় দিতে ভরসা পাচ্ছি না। তুমিই বলো না, এই মালা দিয়ে কি ওদের দাম দিতে পারব!' অবজারভেতোয়ার-এর সামনে চার মূর্তি দাঁড়িয়ে বলছে, 'এশিয়া, ইয়োরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকা থেকে আমরা এসেছি। শিল্পীকে উপহার দেবো বলে পৃথিবীটা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছি, কিন্তু শিল্পী আমাদের মাথায় ভার চাপিয়ে চলে গেছে।' তলায় কতকগুলি কচ্ছপ মুখ থেকে পাদপীঠের ঘোড়াগুলির গায়ে জল ছিটিয়ে বলছে, 'আমাদের পাঠিয়েছে তারই এক বন্ধু। তোমরা অনেক ঘুরে এসেছ, তোমাদের ধূলিধূসর গা ধুইয়ে দেবো, শরীরকে স্নিগ্ধ শীতল করে তুলব জলকণা ছড়িয়ে।' একোল্ পলিতেক্নিক্-এর গায়ে তিনকোণা পার্কে গাছের আড়াল থেকে ভেল্তেয়ার ব্যঙ্গ হেসে বিকট তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন। দেখে চলে যাবার সময় শুনতে পাই, 'কিগো, আমায় পছন্দ হলো না ? তা আমায় অনেকেই পছন্দ করেনি কেবল ভাস্কর হুদোঁ আমায় ভালোবেসে এখানে বসিয়ে রেখেছে।'[১]

গ্রাঁদ শমিয়ের-এ যখন সকলের সঙ্গে বেশ পরিচয় হয়েছে, তখন একদিন আমার এক সহপাঠি জিজ্ঞাসা করলে আমি কমিউনিস্ট কি-না। বললাম 'না'।

তখনই আবার প্রশ্ন করলে, আমি ফ্যাসিষ্ট অথবা সোশ্যালিষ্ট কি-না। আমি এর কোনোটাই নই বলায় সে অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "এ ছাড়াও অন্য রাজনৈতিক মতবাদ ভারতে আছে না-কি ?"

আমি বললাম, "তোমাদের এখানে যেমন ঐ মতবাদের একটি না একটি প্রত্যেকে মানে এবং সেই মতাবলম্বীদের দলভুক্ত হয় আমাদের দেশের লোকেরা কোনো বিশেষ মত নিয়ে চললেও তাদের মত বা দলের রাজনৈতিক নামকরণে ব্যক্তিগত পরিণতির বিষয়ে বিশেষ আগ্রহ দেখায় না। তাই বলে দল যে নেই তা নয়। তবে তা স্বতন্ত্র রাজনৈতিক চিন্তাধারাভুক্ত বিশিষ্ট নেতার পক্ষাবলম্বন করে।" পরে বললাম, "আমি শিল্পী —রাজনীতিতে আমার কি প্রয়োজন ?"

১। মূর্তিটি দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে জার্মান সৈন্যরা ধ্বংস করে দিয়েছে।

কথাটা অবশ্যই মূর্খের মতো বলেছি বুঝলাম, কিন্তু বলা শেষ হয়ে গেছে,কাজেই নিরুপায়।

সে বললে, "বলছ কি হে! সমাজ নিয়েই তো রাজনীতি! শিল্পীরা কি সমাজ এবং তার নিয়মের বাইরে? তুমি ছবি আঁক, মূর্তি গড়—এ তোমার পেশা, কিন্তু তোমার দেশের অপর একটি লোকের রাজনৈতিক বন্ধন ও অধিকার যা তোমারও তাই। তোমার কাজের ভালোমন্দ তোমার দেশের রাজনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। দেখ না তোমার দেশের অন্যান্য লোকের মতো, শিল্পী হলেও তুমি ইংরেজের প্রজা, পরাধীন। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান, সংস্কৃতি সকলের মূলে রাজনীতি। রাজনৈতিক বিপর্যয়ের সঙ্গে সংস্কৃতিরও বিপর্যয় ঘটে থাকে। রাজনৈতিক অবস্থা ভালো হলেই শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞানের উন্নতি হয়। ফ্রান্স যে আজ সাহিত্য, বিজ্ঞানে এবং বিশেষ করে শিল্পে বড়, সে রাজনৈতিক কারণেই।"

বললাম, "এখানেও তো শিল্পীরা ভালোভাবে খেতে পায় না।"

বন্ধু উত্তরে বললে, "সত্যি কথা, শিল্পী কেন—অন্য পেশার অনেক লোকও এখানে দরিদ্র, তার কারণ ধনসম্পদ অসমানভাবে ছড়ানো রয়েছে বলে। সেই জন্যই রাজনৈতিক সংগ্রাম এখনও শেষ হয়নি, হয়ত বিগত বিপ্লবের চেয়ে আরও ক্ষমতাশালী বিপ্লব এসে এ সমস্যার সমাধান করে দেবে। অতি প্রাচীন কাল থেকে শিল্পীরা ধনীদের দাস। তাদের স্বাধীন চিন্তার প্রকাশ করা মানে তাদের মৃত্যু। কিন্তু আর্থিক চিন্তা থেকে অব্যাহতি পাওয়ায় প্রাচীন শিল্পীরা ধনী জীবনের কৃত্রিম প্রকাশেও আপনাদের প্রতিভার পরিচয় দিতে পেরেছেন। কিন্তু বর্তমানের ধনী সম্প্রদায় শিল্পীকে না আর্থিক না তার স্বকীয় সহজাত প্রেরণা মূর্ত করার প্রয়াসের পৃষ্ঠপোষকতা করে। তবে বিপ্লবের পর থেকে এখানে শিল্পীরা কতকাংশে রাষ্ট্রীয় সাহায্য এবং জনসাধারণের সহানুভূতি লাভ করে ধনীদের দাসত্ব-নিগড় মোচন করতে সমর্থ হয়েছে। আজ এখানে শিল্পীর বিষয়বস্তু ভাববিলাসী ধনী সম্প্রদায়ের মনোরঞ্জক অভিনয় নয়। তার সহজাত প্রেরণা ও অকৃত্রিম হৃদয়োচ্ছ্বাস দিয়ে গড়া তার রচনা আজ জনসাধারণের মনকে স্পর্শ করেছে। জনসাধারণের মধ্যেই সে খুঁজে পেয়েছে বহুদিন-হারিয়ে-যাওয়া তার ভাষাকে। হোক না অর্থের দিক দিয়ে গরীব সে, জগতের লোকের হৃদয় কিনে সে আজ মহাধনী, যা কোনো দিগ্বিজয়ী সম্রাট আজও হতে পারেনি। তবে শিল্পীর অর্থসঙ্কটকে আমরা একেবারে উপেক্ষা করছি না। এর একমাত্র উপায় ধনী সম্প্রদায়ের উচ্ছেদ। যাতে তাদের মন জুগিয়ে চলবার মতো আমাদের আর চিত্তবিকার হবে না; অথচ জনসাধারণের আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল না হলে শিল্পীকে কে সহানুভূতি দেখাবে? আজ তারই অভিযানে আমরা বেরিয়েছি। হয়ত আগামী বিপ্লবই এর সমাধান করে দেবে।"

বললাম, "তোমার কথা খুবই যুক্তিযুক্ত এবং মর্মস্পর্শী, কিন্তু শিল্পী স্রষ্টা, তার যদি ধ্বংসে প্রবৃত্তি হয়, তবে তাকে আমি শিল্পী বলতে কুণ্ঠিত হব।"

বন্ধু বললে, "আমি তো ধ্বংসের কথা বলিনি! বলেছি বিপ্লবের কথা। যে-কোনো বিষয়ে উন্নতিশীল পরিবর্তনকে বিপ্লব বলি। তবে উন্নততরর প্রতিষ্ঠায় যদি অপকৃষ্টকে ধ্বংস করা হয় তবে তাকেই প্রকৃত সৃষ্টি বলব। পাথরে মূর্তি গড়ার সময় তুমি যে তার পূর্বের আকৃতিটা কেটে নতুন করে আকৃতি দিলে তাকে তুমি ধ্বংস বলবে, না সৃষ্টি বলবে?"

বললাম, "তুমি ঠিকই বলেছ বন্ধু, আজও এমন করে আমরা জীবনকে আলোচনা করতে, দেখতে চাই না বলেই আমাদের জাতীয় শিল্পের সজীব অগ্রগতি নেই। ধনীদের দাস হলেও প্রাচীন ভারতীয় শিল্পীদের রচনা-দক্ষতার যে প্রকাশ দেখতে পাই তা যদি তোমাদের দেশের মতো আজ পর্যন্ত অবিচ্ছিন্নভাবে চলে আসত তা হলে হয়ত ভারতের শিল্প ইতিহাসের বহু গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় অন্যান্য দেশের শিল্পকে ম্লান করে দিত। কিন্তু আমাদের দেশের শিল্পধারার মধ্যে যে বড় বড় বিচ্যুতি ঘটেছে তার সন্ধি কোনো অতিমানুষ শিল্পীও করতে পারে না। তোমরা হয়ত জানো না, রাজপুত ও মোগল ধনীর ব্যসন-বিলাসের খোরাক জুগিয়েও শিল্পীরা সাধারণের মধ্যে কতখানি প্রভাব বিস্তার করেছিল। তার প্রমাণ পাবে তাদের আঁকা ভারতের জাতীয় সাধারণ জীবনের দৈনন্দিন ঘটনার চিত্রে! সে ধারা যদি মাঝখানে না থেমে যেত, আমার মুখেই শুনতে, জগতে ভারতীয় সংস্কৃতির আরও বড় দানের কথা। আজ অর্ধ শতাব্দীও হয়নি আবার নতুন করে আমাদের দেশে শিল্পান্দোলন শুরু হয়েছে। কিন্তু সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণে বড় পঙ্গু সে আন্দোলন। প্রাচীন শিল্পের শুকনো কাঠামোখানা নিয়ে আমরা ছুটে যাই ধনীর দুয়ারে কিন্তু সেখানে আর দান নেই, তবু বারম্বার তাদেরই করুণা ভিক্ষে চাই। জনসাধারণের কাছে যাবারও উপায় নেই। কারণ তারা বঞ্চিত, নিপীড়িত, নিরক্ষর, নিরুপায়ের দল, কি পাব তাদের কাছে! তবে আমি আশাবাদী, আমার আশা, একদিন তোমাদের শুনিয়ে দিয়ে যাব ভারতীয় শিল্পীদের নবপ্রতিষ্ঠা, যতখানি তোমরা বহুদিন ধরে পাতা আসনে করতে পারনি। আমাদের প্রয়াস হবে, তোমাদের থেকে বড়, কারণ তোমরা আমাদের মতো এত নিগৃহীত, নিঃসম্বল নও।" আবেগের ঝোঁকে কথাগুলো বলেছিলাম, ওরা ভালো বুঝতে পারেনি, কিন্তু অন্তরে সকলেই অনুভব করেছিল।

গ্রাঁদ শমিয়ের-এ দুটি চিত্রণ, একটি ভাস্কর্য ও তিনটি ক্রকী (এক রঙ বা পেন্সিলের দ্রুত অঙ্কন পদ্ধতির দ্বারা মডেলের অনুকৃতি করা) বিভাগ নিয়ে ছয়টি আতলিয়েতে প্রতিদিন সকাল ৯টা থেকে ১২টা এবং বিকেল ২টা থেকে ৫টা আবার ৭টা ও রাত ৮টা থেকে ১০টা পর্যন্ত কাজ চলে। আমার কাছে গ্রাঁদ শমিয়ের-এর ভাস্কর্য বিভাগটি বেশ লেগেছিল। এইটি প্যারীর একটি সর্বোৎকৃষ্ট ভাস্কর্য-শিক্ষায়তন। সেজান-এর শিল্পধারাবলম্বী বিখ্যাত চিত্রকর আঁদ্রে লোত-এর বিদ্যালয়টি চিত্রণ-শিক্ষার্থীর পক্ষে চমৎকার। কারণ লোতের মতো আরও শিল্পী ফ্রান্সে যথেষ্ট

মিললেও তাঁর মতো অধ্যাপক বোধহয় আর একটিও ছিল না। একদিন মঃ. লোতের বিত্যালয়ে এক বন্ধুর সঙ্গে, তাঁর অধ্যাপনা দেখতে গেলাম। বেশ বলিষ্ঠ চেহারা এবং তাঁর সতেজ কথাবার্তার মধ্যে একটি অপূর্ব মোহ আছে। আমার মনে হলো, এ যেন বৈদিক যুগের এক ঋষির আশ্রম, গাছের তলায় গুরুকে ঘিরে ছাত্রদের শাস্ত্রাভ্যাস। শুধু মঃ. লোত বলে নয়, ফ্রান্সের যত অধ্যাপকের অধ্যাপনা দেখেছি, অধ্যাপন ব্যাপারে সকলের তন্ময়তা দেখে আমার ঐ একই ধারণা মনে জাগত।

পারীর মধ্যে এই রকম অসংখ্য আতলিয়ে ঘিরে হাজার হাজার শিল্পী নিজেদের যেন একটি স্বতন্ত্র সমাজ গঠন করে বাস করছে। জন ও বৈচিত্র্যবহুল পারী শহরে, দারিদ্র্যের সঙ্গে সতত যুদ্ধরত এই শিল্পীকুল নির্বিকারভাবে নিজেদের ব্যক্তিগত অস্তিত্বকে লুকিয়ে শিল্প-সাধনা করে চলেছে। এরা চট করে ধরা দেয় না, কিন্তু একবার এদের সংস্পর্শে এলে যে বন্ধুত্বের সূচনা হয় তার বন্ধন অক্ষয়। প্রায় পৃথিবীর সব দেশের লোককে এই শিল্পীসমাজে খুঁজে পাওয়া যাবে। কিন্তু শিল্পী ছাড়া এদের অন্য জাতীয় পরিচয় যেন লোপ পেয়ে গেছে। কি অপূর্ব মহামিলনের ভাব এদের মধ্যে সর্বদা পরিস্ফুট! আমাদের দেশের শিল্পীমহলে পরস্পরের সহযোগিতার কথা ভেবে এদের সঙ্গে তুলনা করলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়ে যায়। নিজে আনন্দ পাওয়ার উদ্দেশ্যে শিল্প সৃষ্টি ছাড়া শিল্পীর বৃহত্তর ধর্ম 'to make the beauties of the world loved and understood' এদের মনে সর্বদা জাগ্রত।

নানান দেশ থেকে শিল্পীরা পারীতে আসেন পয়সা রোজগারের আশায় নয়, কেবল মাত্র শিল্পশিক্ষার্থে। এখানে দু'একজন শিল্পী ছাড়া আর সকলেই প্রায় গরীব, ভালোভাবে খেতে পায় না, অনেক সময় স্ত্রী-পুত্রের লজ্জা নিবারণের সামর্থ্যটুকুও নেই। দারুণ শীতে কয়লার অভাবে ছবি বা মূর্তি বদল দিয়ে কয়লা কেনা শিল্পীদের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার। তবু এদের শিল্প-সাধনা ব্যাহত হয় না—কারণ ভালো খেতে না পেলেও তার কাজের যোগ্য সমাদর ও সহানুভূতি পায় বলে। যে কয়লার বদলে ছবি নিলে তারও শিল্পবোধ যথেষ্ট। উপায় থাকলে, শিল্পীকে অন্য উপায়ে সাহায্য করবার মতো মন তাদের আছে। তবে সময় সময় শিল্পীরা বঞ্চিতও হয়ে থাকে। আমার একটি ভাস্কর বন্ধুর দাঁত খারাপ হওয়াতে নকল দাঁত বসালে। চিকিৎসকের পাওনা হয়েছিল ৫০০ ফ্রাঙ্ক, অর্থাৎ প্রায় ৪১ টাকা মাত্র। টাকা দেবার সামর্থ্য নেই, বন্ধু চিকিৎসককে তার বদলে মূর্তি নিতে বললে। তিনি এই সুযোগ নিয়ে বন্ধুটির সুন্দর দুটি ব্রোঞ্জের তৈরী মূর্তি নিয়ে গেলেন।

আমি আগে ব্যাপারটা জানতাম না। পরে শুনে বললাম, "আমি তোমাকে এখনই ঐ টাকাটা, এমন কি এর দ্বিগুণ টাকা দিতে পারি, আমায় মূর্তি দুটি তার কাছ থেকে এনে দাও।"

বন্ধু হেসে বললে, "তা হয় না বন্ধু, আগে বললে হতো, এখন দেওয়া জিনিস আনতে গেলে আমার কথার দাম থাকবে না, মানও থাকবে না।" দৈন্যদশা হলেও অদ্ভুত আত্মসম্মানবোধ এই শিল্পীদের।

ফ্রান্সে জনসাধারণের শিল্পবোধ মনে হয় অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক উন্নত। প্রতি রবিবারে লুভ্‌র, লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি শিল্পসংগ্রহশালাগুলিতে প্রবেশ মূল্য লাগে না। ঐ দিন দলে দলে জনসাধারণ, অতি প্রাচীন থেকে অত্যাধুনিক, চিত্র, ভাস্কর্য ও শিল্পসংগ্রহের রসাস্বাদন করে থাকে। হয়ত কোনো অধ্যাপক কোনো একটি গ্যালারীর সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছেন—তাঁকে ঘিরে বহু লোক ধীরভাবে তাঁর বক্তব্য শুনছে। আমার প্রত্যেকটি লোককেই দেখে মনে হতো সে শিল্পী, যখন দেখতাম কত আগ্রহে তারা শিল্পপ্রসঙ্গে ব্যাপৃত রয়েছে। ফ্রান্সে ক্রেতার তুলনায় শিল্পীর সংখ্যা অত্যন্ত অসমানভাবে বেশী হওয়ায় ছবি বা মূর্তি কেনা-বেচা বড় কম। কিন্তু সকলেই শিল্পীদের শ্রদ্ধা করে, তার কাজকে বুঝতে চায়। একটি ছুটি ঘটনা থেকে তার নিজে যা পরিচয় পেয়েছি তা জীবনে ভুলব না।

সোরবন্‌-এর (পারীর বিশ্ববিদ্যালয়ের) একটি ছাত্রী একবার আমার এক বন্ধুর সঙ্গে আমার ভারতীয় প্রথায় আঁকা ছবিগুলি দেখতে আসেন। ছবি দেখা শেষ হলে তিনি বললেন, "আপনার একখানি ছবি নিতে আমার খুবই ইচ্ছে হচ্ছে, কিন্তু কিনতে পারি এমন ক্ষমতা নেই। তবে আপনি যদি রাজী হন তা হলে যতদিন লাগে ততদিন আপনার মডেল হয়ে সেই পারিশ্রমিকে ছবির দাম শোধ দিতে পারি।" ভাবলাম ঠাট্টা করছে। কিন্তু পরে বহুবার আমার বন্ধুকে দিয়ে তিনি অনুরোধ করিয়েছিলেন এবং তাঁর দেহের গঠন মডেল হবার উপযোগী মনে করি কি-না তার পরীক্ষাও দিতে চেয়েছিলেন।

আর একবার দেশে ফিরে আসার সময়, যুদ্ধ-ঘোষণার প্রায় তিন সপ্তাহ পরে একটি বন্ধু এসে বললেন, আমার একটি ছবি কিনবেন। আমি তো অবাক! তিনি যুদ্ধনিবন্ধন সৈন্যদলভুক্ত হয়েছেন এবং পরদিনই ফ্রন্টে যুদ্ধে যাবেন। বললাম, "যাচ্ছেন যুদ্ধে, এখন ছবি কিনে কি হবে, তা ছাড়া বেঁচে ফিরবারও যখন স্থিরতা নেই।"

হাতে টাকাটি দিয়ে বন্ধুটি বললেন, "যদি মরি তো ছবিটা ভোগ না করতে পারার ক্ষোভের সেখানেই পরিসমাপ্তি হবে। আর যদি বেঁচে ফিরি তখন তোমায় বা বিশেষ করে হয়ত তোমার এই ছবিখানি পাওয়া সম্ভব না হলে আমার যথেষ্ট ক্ষোভের কারণ হবে। এর মধ্যে অনেক বিপর্যয় ঘটবে সত্যি। কিন্তু আমার ভালো লেগেছে তাই নিলাম, পরে কি হবে ভেবে দেখিনি।"

আমার খুবই আশ্চর্য লেগেছিল। হয়ত এই রকম ঘটনাগুলি খুব বেশী চোখে পড়ে না, কিন্তু ওদের জীবনে খুব সাধারণ না হলেও এ ঘটে থাকে।

গ্রীষ্মকালে রবিবার বা অন্যান্য ছুটির দিন বেশ পরিষ্কার আবহাওয়া থাকলে দলে

দলে শিল্পীরা নিজেদের ছবি বা মূর্তির বোঝা মাথায় করে বড় বড় বুলভারে উপস্থিত হয়। ফুটপাথের ওপর বাড়ির দেওয়ালের গায়ে ছবি টাঙিয়ে, মূর্তি সাজিয়ে পথে প্রদর্শনীর অবতারণা করেন ফ্রান্সে শিল্পীরা অর্থাভাবে কোনো বড় প্রদর্শনীতে কাজ না দিতে পেরে হতোৎসাহ হন না। তাঁরা কোনো বড় গ্যালারী, প্রদর্শনীর বা প্রদর্শনীর চিত্রভাস্কর্য নির্বাচনে নির্বাচকের মতামতের ধার ধারেন না। রাস্তায় ছবি টাঙানোর জন্য তাদের মান নষ্ট হয় না, কারণ যেখানেই থাক তাদের কাজের যোগ্য সম্মান দর্শক দিয়ে থাকে। অনেক সময় এঁদের ছবির মধ্যে খুঁজে পাওয়া যায় রাষ্ট্রের কোনো একটি বিধির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ যে প্রতিবাদে হয়ত জনসাধারণের যথেষ্ট সহানুভূতি আছে। শিল্পী সেটি আরও পরিস্ফুট করে লোকচক্ষে তুলে ধরেন।

ইয়োরোপ-প্রত্যাগত অনেক বন্ধু আমায় প্রায়ই বলেন, 'আচ্ছা আপনারা কেন আমাদের দেশের দৈনন্দিন জীবনের চিত্র বা সাধারণ পথ, গ্রাম, শহরের দৃশ্য আঁকেন না? এর মধ্যে কি আর্ট নেই? ইয়োরোপে বর্তমান শিল্পের বিষয়বস্তু তো এইগুলিই।' কিন্তু তাঁরা বলার সময় ভুলে যান যে, এটা ভারতবর্ষ এবং শিল্পীরা এখানে যে সামাজিক ও রাজনৈতিক আবেষ্টনের মধ্যে বাস করে তা ও দেশ থেকে যথেষ্ট ভিন্নতর। আমাদের দেশে শিল্পীরা আজও ধনীদের দাস। ধনীদের ভাব-বিলাসী মনে পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত চিত্রের পরবর্তী উন্নতিশীল অগ্রসরের শিক্ষা নেই, কাজেই শিল্পীদেরও সে যুগ মনে আনন্দ ও অনুপ্রেরণা না দিলেও তারই আড়ষ্ট, প্রাণহীন অনুকরণ নিয়ে ধনীদের দরজায় ভিক্ষার্থী হতে হচ্ছে। রামায়ণ মহাভারতের বিষয়কে দেখবার চোখ থাকলে নতুন করে, বর্তমান করে দেখা যায়। ইয়োরোপে আজও শিল্পীরা গ্রীক পুরাণ ও বাইবেলের বিষয় নিয়ে ছবি এঁকে থাকেন কিন্তু তা পুরাতনের পুনরাবৃত্তি নয়। আবার কেবল রামায়ণ মহাভারত ছেড়ে বর্তমান দৈনন্দিন জীবনের দৃশ্যকে বিষয়বস্তু করলেই তো শিল্প হবে না। তাকে প্রকাশ করার ভাষা জানা চাই হৃদয়ে, তার প্রতি সহানুভূতি থাকা চাই।

এ দেশে অনেকেই তো এখন সাধারণ কৃষক শ্রমিকদের জীবনচিত্র, গ্রাম শহরের দৃশ্য এঁকে থাকেন। কিন্তু সে সব ছবি দেখলে মনে হয় না, তাঁরা আগ্রহ করে এগুলি রচনা করেছেন। এর মধ্যে বর্তমানকে পাওয়া যায় না, উদ্দেশ্য প্রকাশে ও ভাবপ্রয়োগ রীতিতে দেখা যায় সেই পুরাতন রামায়ণ কথার অসম্পূর্ণ অক্ষম প্রকাশ। শিল্পীদেরই এ দেশে জীবনকে দেখবার মতো দৃষ্টি নেই পরকে তাঁরা কি দেখাবেন!

সাধারণের বিশেষ করে শিল্পীদের, শিল্পবোধ-দৃষ্টি জাগ্রত করার একমাত্র ক্ষেত্র জাতীয় শিল্পসংগ্রহশালা। এ ছাড়া উপযুক্ত সমালোচনা ভিন্ন শিল্প, সাহিত্য বাঁচতে পারে না। সমালোচনাতেই পরিচয় পাওয়া যায় উপলব্ধির ও সমাদরের। দেশের লোকের শিল্পবোধই নেই, এত বড় দেশ, আমরা প্রাচীন সভ্যতার গৌরব

বহন করে বেড়াই সর্বত্র, অথচ আমাদের একটি জাতীয় শিল্পসংগ্রহশালা নেই, যেখানে গিয়ে সাধারণের শিল্পবোধ জাগ্রত হবে। ব্যক্তিগতভাবে শিল্পীকে উন্নতিশীল করার পূর্বে, শিল্পের উন্নতি ত্বরান্বিত করার জন্য আমাদের উচিত জাতীয় শিল্পসংগ্রহশালা গঠনের প্রাণপণ চেষ্টা। ইতালীয় রেনেসাঁস যুগের পর থেকে ফ্রান্স যে শিল্পের নিত্যনব ধারা ও নতুনতর ব্যাখ্যা করে জগতের শিল্পীগোষ্ঠীকে রসদ যোগাচ্ছে তার জন্ম হয়েছে ফ্রান্সের বিখ্যাত শিল্পসংগ্রহশালার পুণ্যতীর্থে—বহু শিল্পীর আজীবন দর্শন ও সাধনার ফলে।

ফরাসী শিল্পসংগ্রহশালার পুণ্যতীর্থে

প্রায় এক মাস হলো পারীতে রয়েছি। দু'একজনকে বেশ ঘনিষ্ঠ বন্ধুভাবে পেয়ে তাঁদের সাহচর্যে নবাগত হিসেবে আমার অসুবিধা ক্রমে কমে আসছিল। এক সন্ধ্যায় একটি বইয়ের দোকানে দাঁড়িয়ে বই দেখছি এমন সময় 'বঁসোয়ার মঁ্যসিয় কর' বলে সান্ধ্যাভিবাদন জানিয়ে ভাস্কর জঁা দালুগো আমার কাঁধটি ধরে বেশ খানিকটা নাড়া দিলেন। মঃ. দালুগোর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল একটি কাফেতে। এঁর মতে শিক্ষকের বিনা সাহায্যে কাজ করাটা বেশী উপকারী। আমি বলেছিলাম, প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে অধ্যাপকের সাহায্য অপরিহার্য। বেশ তর্ক হলো অথচ কেউ কারো মতে এক হতে পারলাম না। মঃ. দালুগো বললেন, "শিল্পসংগ্রহশালায় গিয়ে কাজ দেখে একটি আদর্শ মনে ঠিক করে আমি কাজ করে থাকি, তবে সংগ্রহশালার দ্রষ্টব্যগুলি দেখারও একটি ধারা আছে"—কথাটি খুবই মূল্যবান। মঁ্যসিয় আন্দ্রে লোত ও অনেক বিখ্যাত শিল্প-অধ্যাপককে দেখেছি, অধ্যাপনার সময় কোনো একটি ভালো শিল্পরচনার উদাহরণ দিয়ে তাকে কেমন করে দেখে অনুশীলন করতে হবে, তার উপদেশ দিয়ে ছাত্রদের লুভ্‌র, লুক্সেমবুর্গ প্রভৃতি সংগ্রহশালায় পাঠিয়ে দিতে। তাঁরা কদাচিৎ তুলি রঙ দিয়ে এঁকে দেখান। তাঁরা বলেন, হাত তো কাজ করে না, চোখের আজ্ঞা পালন করে মাত্র। যদি শিল্পী হতে চাও তো আগে চোখ তৈরী করে নাও। মঃ. দালুগোকে তাই বললাম, "কেমন করে শিল্প-রচনা দেখতে হবে, তা শিখতেও তো অধ্যাপকের সাহায্য লাগে।"

তিনি বললেন, "অত তর্কে প্রয়োজন নেই, চলো কাল আমরা দু'জনে লুভ্‌র দেখতে যাব।" সানন্দে রাজী হলাম এ প্রস্তাবে, কারণ তখনও আমি লুভ্‌র দেখিনি। ঠিক হলো, আমরা গল্প করতে করতে পদব্রজেই যাব।

বুল্‌ভার সঁ্যামিশেল ধরে কিছু দূর উত্তরে যেতেই আমরা স্তেন নদী পেলাম। তার ধার দিয়ে পশ্চিমে চলতে লাগলাম। এই নদী বৃত্তাকার হয়ে চলে গেছে পারীর ওপর দিয়ে। মাঝে দু'তিন স্থানে দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে শহরের মাঝে

কয়েকটি দ্বীপের সৃষ্টি করেছে। এরই একটির শেষ প্রান্তে বিখ্যাত নোৎরদাম গীর্জার অবস্থান। নদীর বুকে অসংখ্য সেতু, বহু বুলভারকে সংযুক্ত করে গমনাগমনের বেশ সুবিধে করে দিয়েছে। নদীটির দু'ধারে বেশ উঁচু করে সিমেণ্ট কংক্রীটের বাঁধ এবং পাশে প্রকাণ্ড চওড়া বাঁধানো চত্বর পারীর সীমানা ছাড়িয়েও কিছু দূর একটানা। প্রকাণ্ড গাছের সারি নদীর দু'ধারে চত্বরে, রাস্তায়, জলের ওপর ডাল-পাতা ঝুলিয়ে নদীটিকে স্বপ্নময় মনোরম করে তুলেছে। বাঁধের ওপর টিনের ঢাকনী দেওয়া অসংখ্য কাঠের বাক্স সারবন্দীভাবে প্রায় পারীর এক সীমানা থেকে অপর সীমানা পর্যন্ত নদীর দু'ধারে সাজানো। বহু বিক্রেতা এই বাক্সয় পুরাতন বই, ছাপানো ছবি ও পুরনো নানা দ্রব্যের স্মৃতি-সংগ্রহ ইত্যাদি রেখে বিক্রী করছে। এগুলি দেখে মনে হলো, ফরাসী বিখ্যাত সংগ্রহশালার খেলাঘরের ক্ষুদ্র সংস্করণ। এ রকমের নদীর ধারে বই ও নানা সংগ্রহের দোকান আর কোনো দেশে নেই বলে শুনেছি। বই দেখা আমার একটি নেশা। বই দেখতে দেখতে আমরা যেতে লাগলাম লুভ্‌র-এর দিকে। মঃ দালুগো সারা পথ তাঁর বংশের প্রাচীন আভিজাত্যের মহাভারত-কাহিনী অনর্গল ইংরাজী ও ফরাসীর খিচুড়ী ভাষায় আমায় বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন। যেটুকু আমার কানে গিয়েছিল তার মর্মার্থ হচ্ছে, তিনি অতি প্রাচীন নরম্যান বংশাবতংস এবং একবারে খাঁটি নরম্যান রক্ত তাঁর শরীরে বিদ্যমান।

আমরা যখন পোঁ (সেতু) ক্যারুসেল-এ পৌছলাম, লুভ্‌র-এর বিরাট গাঢ় ধূসর মূর্তি চোখে পড়ল। সেতুটি পেরিয়ে বিরাট ফটকের বাঁ-দিকের প্রবেশদ্বার দিয়ে লুভ্‌র-এ প্রবেশ করা গেলো। লুভ্‌র-এর চিত্র-ভাস্কর্য সংগ্রহশালায় প্রবেশ পথ অনেকগুলি। কিন্তু প্রথম দর্শকের পক্ষে পোঁ ক্যারুসেল দিয়ে ক্যারুসেল উদ্যানে প্রবেশ-তোরণের বাঁ-দিকের দরজা সব চেয়ে সুবিধার পথ।

আমরা ঢুকেই যে বিভাগে এসে পড়লাম, সেটি ফরাসী ভাস্কর্যের গ্যালারী। খৃষ্টীয় ত্রয়োদশ চতুর্দশ শতাব্দী থেকে ইতালী শিল্প ঐশ্বর্যে যখন জগদ্বাসীকে বিস্ময়ান্বিত করছিল, ফ্রান্সে তখন গথিক গীর্জার গায়ে ফরাসী চিত্র, ভাস্কর্য এক বিশিষ্ট রূপ নিয়ে ভবিষ্যতে শিল্পের এক বিরাট পরিকল্পনাকে সৃষ্টি করছিল। এ শিল্পীদের রচনা-শিক্ষা কোথায়, তা আজও পুরাতাত্ত্বিকদের গবেষণায় মেলেনি। অনুমান হয়, এরা ফ্রান্সের মাটিতেই পেয়েছিল চিত্র-ভাস্কর্যের বর্ণপরিচয় শিক্ষা। এ বিভাগে রক্ষিত প্রাচীন মূর্তিগুলি গীর্জার গাত্র-সজ্জার উদ্দেশ্যে করা হলেও তার মধ্যে শিল্পীর যে সাধনা ও জীবন ফুটে উঠেছে তা আজও কলারসিককে মুগ্ধ করে। ফরাসীরা প্রাচীন সংস্কৃতিকে শ্রদ্ধা করে।

ডুবুরী যেমন সমুদ্রের গভীর তলে মুক্তার সন্ধান করে, ফরাসী শিল্পী, কবি, অতীত যুগের স্মৃতি ও সাধনাভরা মন্দিরপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষের স্তূপে খোঁজে হারিয়ে-যাওয়া বা বলতে গিয়ে থেমে-যাওয়া ভাষাকে। তারা প্রাচীনকে নবীন

করে, নতুন রূপ দিয়ে, নতুন কথা বলতে পারে। একবার শার্থ-এর বিখ্যাত গীর্জাটি দেখতে গিয়ে আমার ভ্রম হয়েছিল, আমি যেন উন্মুক্ত প্রান্তরে শিল্পশিক্ষার্থীদের ক্লাশে এসে পড়েছি। গীর্জাটির প্রাঙ্গণে, প্রকোষ্ঠে যে দিকে তাকাই দেখি শিল্পীদের ভিড়। কেউ জল-রঙে কোনো একটি সেণ্টের মূর্তির অনুলিপি করছে, কেউ বা তেলরঙে বা পেন্সিলে কারুকার্যখচিত খিলানের জানালার রঙিন কাঁচের ছবির রূপটি নকল করছে, এই রকম আরও কত কি। এদের জিজ্ঞাসা করলে শুনবেন, এরা এই জীর্ণ মন্দিরে আধুনিক প্রাণরস দিয়ে এর নির্মাতার দৃষ্টিকে পরিপূর্ণ করে দেখতে চেষ্টা করছে। যে দেখতে জানে সে ঐতিহাসিক যুগের মানব-অঙ্কিত গুহায় বাইসনের রেখাচিত্র, মিশরের স্ফিঙ্কস্, গ্রীসীয় ভাস্কর প্রাক্সিটেলের ভেনাসের ভগ্নমূর্তি, ভারতের বুদ্ধ, নটরাজ, নিগ্রোদের অদ্ভুত-দর্শন কাষ্ঠমূর্তিতে, সমান রস উপভোগ করতে পারে। সে দেখবে, শিল্পী তার ভাবকে কতখানি ভাষা দিতে পেরেছে!

মঃ. দালুগো আমায় কতকগুলি কাহিনী বললেন। বলার সময় তাঁর আনন্দোজ্জ্বল মুখভাব দেখে বুঝলাম, মুখে নিজেকে নরম্যান প্রতিপন্ন করবার চেষ্টা করলেও অন্তরে তিনি খাটি ফরাসী শিল্পী। কোনো ধর্মপ্রাণা মহিলা বা মেরীর একটি কাঠের বিনষ্টপ্রায় মূর্তি একটি কাঁচের আবরণ দিয়ে সযত্নে রাখা হয়েছে। তার সৌন্দর্য জীবনে কোনোদিন ভুলব না। আমাদের দেশের কোনো কোনো মন্দিরের গায়ে যেমন নশ্বর জীবনের অসারতা রূপায়িত করে যে-সকল চিত্র-ভাস্কর্য থাকে, ফ্রান্সেও ত্রয়োদশ, চতুর্দশ শতাব্দী কি তারও পূর্বের গীর্জাভ্যন্তরে, কবরের উপরস্থ স্মারকমূর্তির তলায় কীটদষ্ট, গলিতমাংসহীন বিকৃত মূর্তির চিত্র-ভাস্কর্য নশ্বর ভোগজীবনের প্রতি অনাসক্ত ভাব জাগাবার জন্য আঁকা বা খোদা থাকত। এ বিভাগে আরও কতকগুলি উন্নত ধরনের সংগ্রহ দেখা গেলো। সে যুগে, চিত্র ভাস্কর্যে অনেক মূর্তিকে রঙ করে আরও জীবন্ত করার প্রচেষ্টা ছিল, তারও কয়েকটি নিদর্শন এখানে রয়েছে। রেনেসাঁস যুগের ফরাসী ভাস্কর্যের বিচার নিয়ে এখনও সমালোচকরা যুদ্ধ করে থাকেন। এ নিয়ে আমাদের মাথা না ঘামানোই ভালো। যা দেখলাম এবং উপভোগ করলাম পুরাতাত্ত্বিক সমালোচকের পর্যায়ভুক্ত হলে লাভের চেয়ে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশী। পরবর্তীকালে গীর্জা ও ধর্মযাজকের কঠিন বন্ধন থেকে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা ও অধিকার যখন অনেক স্বাধীন হলো, তখনকার রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় শিল্পীরা এতকাল ধর্মীয় অনুশাসনে রুদ্ধ ভাবকে প্রকাশ করবার একটা পন্থা খুঁজে পেল।

গীর্জা-কবলিত যুগের ভাস্কর্য-বিভাগ ছেড়ে আমরা ষোড়শ শতাব্দীর ভাস্কর্য বিভাগে প্রবেশ করলাম। এই বিভাগের বিরাট হলে, সে যুগের সেরা ফরাসী ভাস্কর জঁ। গুজঁর অমূল্য ভাস্কর্য-সংগ্রহ, মেরী, সেণ্ট ও মঠ-নিবাসিনী সন্ন্যাসিনীদের মূর্তির স্মৃতিকে ম্লান করে চোখকে সহজে অভিভূত করে দেয়। হলের মাঝখানে

গুজ্যঁর খোদিত ডায়না ও-মৃগের একটি বিরাট মার্বেল, মূর্তি। ডায়নাকে আমার ভালো লাগেনি। কিন্তু ডায়নার-সঙ্গের কুকুরটিকে ভাস্কর্য-শিল্পে একটি অপূর্ব দান বলে আমার মনে হলো। গুজ্যঁর-কৃত ফঁতাইন দে ইনোসাঁৎ ফোয়ারার জলকলাবৃতা চারটি নারীর লীলায়িত ভঙ্গি জগতের কলারসিকদের চিরকাল মুগ্ধ করে শ্রদ্ধা অর্জন করবে।

এরই পরে দর্শকের চোখকে আকৃষ্ট করে, হলের একটি কোণে তিনটি নারীমূর্তি পরস্পরের হাত ধরে একটি ত্রিকোণাকৃতি স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। এরা একটি সোনালী রঙের আধার মাথায় ধারণ করে আছে। গুজ্যঁর পরবর্তী বিখ্যাত শিল্পী পিলঁর নাম করতে হয়। এটি তাঁরই রচনা। যখন সম্রাট দ্বিতীয় আঁরি মারা যান তখন ক্যাথরিন দ্য মেদিচি, প্রথম ফ্রঁসোয়া এবং দ্বাদশ লুই-এর সমাধির চেয়ে উন্নততর সমাধিমন্দির নির্মাণ করে শোক প্রকাশ করতে ইচ্ছা করেন। দ্বিতীয় আঁরির হৃদপিণ্ডটি একটি আধারে সেলস্তাঁ গীর্জায় দেওয়া হয়, সম্রাজ্ঞী ক্যাথরিন দ্য মেদিচি-র ইচ্ছানুযায়ী পিলঁ এই তিনটি অবর্ণনীয় নারীমূর্তির সৃষ্টি করে তাদের মস্তকে স্বর্ণাধারাটি স্থাপন করেন। গীর্জার নীতিতে অশ্লীলতাকে এড়ানোর জন্য মূর্তিগুলিকে বস্ত্রপরিহিতা করলেও শিল্পীর রচনা দক্ষতায় তাদের ললিত তনুর গঠন সর্বাঙ্গে পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ পেয়েছে। বিগত বিপ্লবের সময় মূর্তিটি স্বর্ণাধার সমেত লুণ্ঠিত হয়। মূর্তিটি পুনরুদ্ধার করা হয়েছে, কিন্তু বেচারী দ্বিতীয় আঁরির হৃদপিণ্ড বা স্বর্ণাধারটির আর সন্ধান পাওয়া যায় না। এখন সোনালী রঙের কাঠের নকল একটি আধার তার স্মৃতি বহন করছে। বহু মূর্তিই ছিল হলটিতে। মঃ. দালুগো কতকগুলি প্রতিকৃতি দেখিয়ে বহু প্রশংসাই করলেন। সেগুলি সবই প্রায় রাজা রাণী বা বিখ্যাত ধর্মযাজকের মূর্তি। তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব বা রচনা-নৈপুণ্যের বৈশিষ্ট্য না দেখে আমি মুগ্ধ হতে পারিনি।

সপ্তদশ শতাব্দীতে চতুর্দশ লুই-এর অত্যাচারিত শাসনে ফ্রান্সের মাটিতে রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছিল, আকাশ রণদামামার শব্দে বিক্ষুব্ধ হয়েছিল। এ যুগে শিল্পীর সন্ধানে ফেরা মনে হয় বাতুলতা। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, এ আবহাওয়াতেও কয়েক জন প্রকৃত শিল্পী বেঁচে ছিলেন এবং ফ্রান্সকে তাঁরা যা দান করেছেন, তা শিল্প-ইতিহাসে স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে। 'এ যুগে লুই ফ্রান্সের একমাত্র ব্যক্তি যাঁর শিল্পবোধ ও রুচি আছে' —এই ছিল তাঁর চাটুকারদের বন্দনাবাণী। এটা ঠিক, ফ্রান্সের রুচিকে নিজ ইচ্ছানুযায়ী নিয়ন্ত্রণ করতে তিনিই একমাত্র ব্যক্তি ছিলেন। লঁব্রু সম্রাটের রুচিতে শ্রেষ্ঠ শিল্পী হিসাবে পরিগণিত হয়েছিলেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী শিল্পী ও ভাস্কররা রাজানুকূল্য লাভ করতেন। রাজানুগ্রহ পেয়ে যারা ভের্সাইয় ও ফঁতাইনব্লোর প্রাসাদ উদ্যানকে মূর্তি দিয়ে সাজিয়েছে, তাদের অসংখ্য শিল্প-রচনার মধ্যে শিল্পীর ব্যক্তিত্ব হারিয়ে গেছে। কেবল অর্থ দিয়ে তো শিল্পীর সাধনাকে কেনা যায় না। তাই যারা রাজপ্রসাদ লাভ করলে, দিতে পারল না

রূপের অকৃত্রিম প্রকাশকে। নিজ দেশে নিপীড়িত, বঞ্চিত কিন্তু পরদেশে সম্মানিত অমর ভাস্কর প্যুগে, দারিদ্র্যের সঙ্গে মিতালি করে জগৎকে জানিয়ে গেলেন, অকৃত্রিম রূপভিক্ষুর ভিক্ষাঝুলি সম্রাটের মুকুট, দণ্ড দান করলেও পূর্ণ করা যায় না। নিজ দেশে অবজ্ঞাত হয়ে প্যুগে জীবনের অধিকাংশ সময় ইতালিতে কাটিয়ে ছিলেন।

এঁর কয়েকটি কাজ তৃতীয় ঘরে ও একটি উঁচু মঞ্চের মতো ঘরে রয়েছে। বন্যজন্তু-কবলিত এক বিরাট পুরুষের আর্তনাদ মূর্ত হয়েছে মিলোঁর দ্য ক্রোতন মূর্তিতে। একটি প্রাচীন কাহিনীকে রূপ দিয়েছে এই মূর্তিটি।

খৃষ্টপূর্ব প্রায় ৫০০ অব্দে মিলো এক বিখ্যাত ব্যায়ামবীর ছিলেন। তিনি ছয়বার অলিম্পিক ক্রীড়ায় বিজয়মাল্য পেয়েছিলেন এবং পরে তাঁর সমকক্ষ প্রতিদ্বন্দ্বী না পেয়ে ক্রীড়াতে আর বড় যোগ দিতেন না। বনের সিংহ ভালুকদের ধরে শুধু হাতে ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করা তাঁর সখের ব্যাপার ছিল। যখন তিনি বেশ বৃদ্ধ, একদিন এক বনের ধার দিয়ে যেতে যেতে দেখলেন কয়েক জন লোক একটি গাছের কাণ্ড দ্বিখণ্ডিত করার চেষ্টা করে কৃতকার্য হচ্ছে না। মিলো তাদের কাজটি স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে শুধু হাতে সম্পন্ন করতে চাইলেন। কাঠের দুইটি অংশ ধরে তিনি এমন জোরে সম্প্রসারিত করলেন যে, কাঠের কীলকগুলি খুলে পড়ে গেলো। কিন্তু সেই মুহূর্তে তাঁর দুর্বলতা আসায় মুষ্টিবদ্ধ হাত শিথিল হয়ে কাঠের অংশ দুটির মাঝখানে নিষ্পেষিতভাবে আবদ্ধ হন। কাঠুরিয়াগণ তাঁকে বিদ্রূপ করে সেই অবস্থায় ফেলে রেখে চলে গেলো। অত্যাচারিত বন্য জন্তুরা বহুদিন পরে তাদের শত্রুকে এমন অসহায় অবস্থায় পেয়ে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করলে।

এই মূর্তিটির আমি প্রশংসা করায় ও দেশী সমালোচকদের কথার প্রতিধ্বনি করে মঃ. দালুগো বললেন, "প্যুগে ইতালিতে থাকার ফলে কতকগুলি দোষ তাঁকে সংস্কারাচ্ছন্ন করেছিল। বন্য জন্তুর কবলে পড়ে ব্যায়ামবীর মিলোর জীবনে শোচনীয় পরিণামটা দেখানোর চেয়ে মাংসপেশী ও দেহ-সংস্থানের দিকে বেশী মনোযোগ দিয়েছেন। সিংহটির আকৃতির অনুপাতে মিলোর দেহ অতিরিক্ত মাত্রায় বড় হয়েছে।" …ইত্যাদি

আমি কিন্তু একটু ব্যথিত হলাম তাঁর কথা শুনে। বুঝলাম নিজের দেশের শিল্পে বৈদেশিক প্রভাবটা এঁদের সহ্য হয় না, এ ভাবই প্রকাশ। ফ্রান্স ষোড়শ শতাব্দী থেকে ইয়োরোপীয় ভাস্কর্যের গতিধারাকে নিয়ন্ত্রণ করে আসছে এবং নব-নব শিল্পান্দোলনে অপর দেশকে নিজ ভাবে অনুপ্রাণিত করেছে, এবং এর জন্য ফরাসী শিল্পীর গর্বকে শ্রদ্ধা করি, কিন্তু অপর দেশের শিল্পকে বা তার উন্নত প্রভাবকে ছোট করে দেখা, সঙ্কীর্ণতা বলব। সৌভাগ্যের বিষয় এ সঙ্কীর্ণতা ব্যক্তিগতভাবে মাত্র কয়েক জনের মধ্যেই দেখা যায়। বললাম, "সিংহটিকে ছোট ও মিলোকে বিরাট করাই শিল্পীর উদ্দেশ্য ছিল বলে আমার মনে হয়। মিলো

ব্যায়ামবীর, বনের পশু চিরকাল তাঁর কাছে অবনত ও হীন ছিল। আজ দৈব-দুর্বিপাকে পড়েই মিলো পশুর দ্বারা নিপীড়িত হচ্ছেন। তাই বলে তিনি তাদের চেয়ে ক্ষুদ্র হয়ে যাননি। পশুশক্তি মানুষী শক্তিকে সময়ে সময়ে জয় করলেও মানুষী শক্তি পশুশক্তির চেয়ে চিরকাল বড়। বোধহয় শিল্পী এই কথা বলতে চেয়েছেন মূর্তিতে। আমাদের দেশের কবি শিল্পীরা বিষয় বস্তুর প্রাধান্য হিসেবে অতিরঞ্জন করে থাকেন। আপনি হয়ত জানেন না, অজন্তা গুহাচিত্রের একটি দৃশ্যে, বুদ্ধের পুত্র রাহুল মাতার আদেশে বুদ্ধের কাছে পিতৃধন ভিক্ষা করছেন। বুদ্ধকে, তাঁর পত্নী বা পুত্রের চেয়ে বহুগুণ বড আকৃতিতে এঁকে শিল্পী সাধারণ থেকে বুদ্ধের মহত্ত্ব এবং বিরাট পুরুষাকার দেখিয়েছেন। এ অতিরঞ্জনকে কি আপনি অশ্রদ্ধা করেন?"

মঃ. দালুগো হেসে বললেন, "প্যাগে দেখছি তোমায় কবি করে ছাড়লেন।"

বললাম, "না মশাই, আমরা সুজলা-সুফলা-শ্যামলা, রবিকরোজ্জ্বলা দেশের লোক —এ আবহাওয়ায় থাকলে মন কবি হবেই। কল্পনার সম্পত্তি আমাদের যা আছে তা আপনাদের কাছ থেকে ধার না নিলেও কোনোদিন ফুরোবে না। কল্পনার আপনারা জানেন কি? আমাদের বস্তুর বৈচিত্র্যের চেয়ে দৃষ্টির বৈচিত্র্য অনেক বেশী দেখতে পাবেন। দেখতে জানেন না বলেই আপনারা অনেকে আমাদের দেশের শিল্পকে অবজ্ঞা করে থাকেন। আজ বিশ্বের শিল্প-দরবারে আমাদের দেশের শিল্পীর স্থান নেই। তার অবশ্য অন্য যথেষ্ট কারণ আছে। কিন্তু আপনারা জ্ঞানী রসজ্ঞ বলে গর্ব করেন, অথচ আমাদের গ্লানিটুকুই দেখেন। হিমালয়ের মতো বিরাট ভারতীয় সংস্কৃতিকে একটা ক্ষুদ্র খেয়ালী কবির আবেগ বলতে একটুও কুণ্ঠিত হন না।"

মঃ. দালুগো লজ্জিত হয়ে বললেন, "মাপ চাচ্ছি কর, আমি উপহাসচ্ছলে কথাটা বলেছি। তোমাদের অসম্মান করতে পারি এমন স্পর্ধা করব কিসে! আজও যে জগতের মনের মানুষ সেরা কবি তাগোর (রবীন্দ্রনাথ) তোমাদের হিমালয়ের মতো আকাশ ছুঁয়ে বসে আছেন।"

অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেকগুলি ভাস্করের রচনা এ বিভাগের শেষ প্রান্তের ঘরগুলিতে আছে। নিপুণ ভাস্করের মূর্তিগঠন কৌশলের যথেষ্ট পরিচয় দিলেও মূর্তিগুলির রচনা উৎকর্ষের গতি অবনতির দিকে। এ বিভাগে বিদেশী ভাস্করদের মধ্যে বিখ্যাত ইতালীয় ভাস্কর বার্নিনির কতকগুলি অপূর্ব প্রতিমূর্তি ও বিশ্ববিশ্রুত ভাস্কর মিকেল আঞ্জেলোর ক্রীতদাসের বিখ্যাত মূর্তি দুটিও আছে। আঞ্জেলোর দাসত্ব বন্ধনে নিগৃহীতের ব্যথা দর্শকের মর্মে আঘাত করে। শিল্পীর সারাজীবন ব্যাপী দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের এটা আত্মপ্রকাশ কি-না কে জানে! লুভ্‌র বন্ধ করবার জন্য তাগিদের চিৎকারে আমাদের দেখা সে দিনের মতো বন্ধ করতে হলো। বাড়ি ফেরার পথে দালুগোকে বহু ধন্যবাদ জানিয়ে বললাম, "মাপ করবেন যদি আপনার

মনে আঘাত দিয়ে থাকি। আপনি এত ভদ্রতা করে লুভ্‌র-এ আমায় নিয়ে এলেন অথচ কৃতজ্ঞতার বদলে কি অশিষ্ট আচরণই না করলাম!"

মঃ. দালুগো আমার কাঁধটি দু'হাতে চেপে ধরে বললেন, "এ আনন্দের কথা কর, নিজের দেশের সম্মান সম্বন্ধে সকলেরই সচেতন থাকা উচিত। এ রকম আলোচনায় আমাদের মনের অনেক গলদ চলে যায়। এস, এখন ও সব ভুলে এক কাপ গরম কফি খেয়ে চিত্ত নির্মল করি।"

লুভ্‌র

ইল্ দ লা সিতের দক্ষিণ প্রান্তে যেখানে স্যেন নদীর প্রসারিত বাহু দুটি মিলে গিয়েছে সেখানে জলের সেই বিস্তারকে ডিঙিয়ে দাঁড়িয়ে আছে পোঁদেজার সেতুটি। এই সেতুর বাঁ-দিকের মুখে দাঁড়ালে দেখা যায় নদীর অপর পারের কিনারা ধরে চলে গিয়েছে লুভ্‌র প্রাসাদের গাঢ় ধোঁয়া রঙের একটানা ইমারত যার স্তরে স্তরে জমা হয়ে আছে ইতিহাসের কত কাহিনী—কত রাজন্য শক্তির উত্থান ও পতনের উচ্ছ্বাস, কত ব্যক্তি ও জনগত আশা ও হতাশায় হৃদয়ের স্পন্দন।

দিনের পর দিন কর্মান্তে বেড়াতে গিয়ে নদীর ধারে বেঞ্চে বসে দেখতাম দিনের নিভে-আসা আলোয় ঘোলাটে আকাশের পটভূমিকে আচ্ছন্ন করে দাঁড়িয়ে লুভ্‌র। এই সীমারেখা ধরে চোখ যেন দেখত কোনো এক প্রাগৈতিহাসিক অতিকায় জানোয়ারের শায়িত মূর্তি যা বার্দ্ধক্যের জরায় শক্তিহীন এবং এর শেষ নিশ্বাস যেন যে কোনো মুহূর্তে নির্গত হয়ে গিয়ে একটা প্রাণহীন জড়ে পরিণত হবে। রাস্তার আলোগুলি সহসা জলে উঠলে মনে হয় তার গায়ের পুরু পর্দার খাঁজগুলিতে যেন কাঁপন লাগল। প্লেন গাছের চূড়ার ওপরে দৃশ্যমান টাওয়ার ও চিমনিগুলি বাতাসে উড়ে-যাওয়া কুয়াশার ফাঁকে আলোর আভায় দেখলে মনে হয় যেন দুলছে।

ইল্ দ লা সিতের দ্বীপটিতে ছিল পারী শহরের আদি পত্তনি এবং এই ভিটেয় বাস করত 'পারিসাই' জাতি যাদের পরিচয়ে এই নগরীর নামকরণ হয়েছিল। রোমানরা এ অঞ্চলে পৌছাবার আগে একে বলা হতো 'লুতেতিয়া'। নরম্যাণ্ডি, রাইন্‌ল্যাণ্ড ও ব্রিটানী থেকে পূবে দক্ষিণে অভিযানকারীদের কিংবা ইয়োরোপের দক্ষিণ-পূর্বের বাসিন্দাদের উত্তর পশ্চিম সীমানায় পাড়ি দেবার চলতি পথের মাঝে পড়ত এই দ্বীপটি ও এর আশপাশের এলাকা।

অনেক সময় বন্যায় ডুবে যাওয়ার ফলে বিজয়ী রোমানরা ইল্ দ লা সিতের ডাঙা পরিত্যাগ করে নদীর বাঁ-দিকে মঁ সাঁ জেনভিয়েভের উঁচু টিলায় প্রাসাদ ও সর্বজনীন স্নানাগার নির্মাণ করে শহর বানিয়েছিলেন। পরে ফ্র্যাঙ্ক সম্রাট ক্লোভিস-এর আমলে (পঞ্চম শতাব্দী) গল রাজ্যে খৃষ্টধর্মের প্রসার বৃদ্ধি হওয়ায় ঐ

দ্বীপটি ও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে কয়েকটি ক্যাথেড্রাল্ ও প্রাসাদের প্রতিষ্ঠায় পারী একাধারে ধর্মসংঘ-শাসিত ও সম্রাটাধীন এক রাজধানীতে পরিণত হলো। এরপর পরিবর্ধিত ব্যবসা-বাণিজ্য সমৃদ্ধিতে নির্মিত প্রাসাদ হর্ম্যে সুশোভিত এই ঐশ্বর্যশালী শহরকে লুটে নিতে এল কত দুর্দ্ধর্ষ জাতিরা এবং কেবল স্যেন নদীর আড়াল দিয়ে তাদের ঠেকানো ক্রমে ক্রমে অসম্ভব হওয়ায় কাপেত বংশীয় নৃপতি ফিলিপ অগুস্ত (ত্রয়োদশ শতাব্দী) পারীর চারদিকে প্রাকার তুলে ঘিরে দিলেন। তিনি এর দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে নদীর ডান-দিকে নগর সংরক্ষার প্রহরী স্বরূপ একটি দুর্গ নির্মাণ করে তার নাম দিলেন 'লুভ্‌র'। তারপর অগুস্তর এই দুর্গ পরবর্তী রাজাদের রুচি অনুযায়ী রূপান্তরে যোদ্ধা প্রহরীর চেহারা বদলে ক্রমে মনোরম সাজ নিতে শুরু করল।

যোড়শ শতাব্দী থেকে ফরাসী নৃপতিরা এই প্রাসাদে বসবাস আরম্ভ করেছিলেন। রাজসম্মান-উপযোগী রাজপুরী নির্মাণার্থে ফরাসী নৃপতি প্রথম ফ্রাঁশোয়া লুভ্‌র-এর পূর্ব আকারের সংস্করণ ও নতুন অংশ নির্মাণ করেছিলেন। পূর্ব দিকের অংশে তাঁর রাজত্বকালীন প্রবর্তিত রেনেসাঁস স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের নমুনা সগর্বে আজও অস্তিত্ব জ্ঞাপন করছে।

ফ্রান্সে প্রটেস্ট্যাণ্ট দলের সূচনা প্রথম ফ্রাঁশোয়ার সময়ে দেখা দেয় এবং তাকে দমন করে নিশ্চিহ্ন করবার তিনি দৃঢ় ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিলেন। যদিও প্রটেস্ট্যাণ্ট আন্দোলনের সূত্রে ছিল, পার্থিব ভোগ, ঐশ্বর্য ও বিলাস-ভরা ক্যাথলিক আরাধনায় কপট ধর্মাচারের তীব্র প্রতিবাদ কিন্তু ধর্মের দোহাই-এ আপন স্বার্থান্বেষী রাজপরিবার ও পারিষদবর্গ পরস্পরের সঙ্গে ষড়যন্ত্র ও সংগ্রামে লিপ্ত থেকে সারা দেশকে এক ভীষণ আলোড়ন-ভরা ধ্বংসের যজ্ঞকুণ্ডে পরিণত করেছিলেন। রাজ্ঞী ক্যাথরিন মেদিচির আমলে লুভ্‌র-এর অপর দিকে তুইলারি প্রাসাদ গড়ে উঠতে থাকে এবং এর ক্রমবর্ধিত কলেবর রাজা চতুর্থ আঁরির সময় লুভ্‌র-এর পাশে ভিড়েছিল।

প্রকাশ্যভাবে চতুর্থ আঁরি প্রটেস্ট্যাণ্টদের প্রথা ছেড়ে ক্যাথলিক ধর্মে দীক্ষিত হলেও তাঁর আসল ধর্মাসক্তি সম্বন্ধে সদা সন্দিহান ক্যাথলিক দলের একজন তাঁকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে লুভ্‌র-এর অদূরে।

রাজ্ঞী ক্যাথরিন-এর যে বিশেষ প্রবল কোনো সাম্প্রদায়িক ধর্মমত ছিল তা নয়। তাঁর একমাত্র লক্ষ্য ছিল যে, নিজের রাষ্ট্র-শাসন ক্ষমতাকে অক্ষুণ্ণ ও সবল রাখা। তাই তিনি প্রত্যেক বিপক্ষ দলকে পারস্পরিকভাবে সমর্থন ও বৈরীতায় একে অন্যের সঙ্গে বিবাদ ও সংগ্রামে লিপ্ত করে তাদের সহজে ধ্বংসের ব্যবস্থা করেছিলেন।

লুভ্‌র-এর প্রাচীন অংশের অদূরে সাঁজেয়ারমঁ। লক্সেরোয়ার সুশোভন গীর্জাটি। প্রাসাদের সামনে এবং গীর্জাটির প্রাঙ্গণে সেণ্ট বারথোলোমিউর দিনে ক্যাথরিনের আশ্বাসে আহুত ইউগোনোদের (প্রটেস্ট্যাণ্ট) তাঁরই আজ্ঞায় নৃশংসভাবে হত্যা

করা হয়েছিল। লুভ্‌র-এর বড় বড় থাম লাগানো অলিন্দে দাঁড়িয়ে ক্যাথরিন ছ মেদিচি উপসংহার পর্যন্ত দেখেছিলেন এই নরমেধ যজ্ঞ।

যদিও এই বিরাট হত্যার পিছনে না ছিল নীতি বা ধর্মের কোনো উচিত কৈফিয়ৎ, তদানীন্তন পোপ ক্যাথরিনকে ক্যাথলিক বিরোধীদের বিনাশের এমন নিখুঁত নিপুণ আয়োজনের জন্য অভিনন্দিত করেছিলেন এবং লোকে যাতে এই ঘটনাকে আনন্দসূচক দিনের স্মৃতি হিসাবে মনে অক্ষুণ্ণ রাখতে পারে তার জন্য বিশেষ স্মারক চিহ্ন সম্বলিত পদক তৈরী করে তার ব্যাপক বিতরণের ব্যবস্থা করেছিলেন।

এই বর্বরতায় আপাত বিপক্ষের শ্রেণীতে দোষী বা নির্দোষ কাউকে রেহাই দেওয়া হয়নি এবং গ্যাসপার কলিইনির মতো স্থির-ধর্মী দেশপ্রেমিক বিচক্ষণ বীরকেও আপন চক্রান্ত সিদ্ধিতে বলিদানে ক্যাথরিনের একটুও দ্বিধা ছিল না।

মানুষের এই নীচ নৃশংসতার দ্রষ্টা ছিল লুভ্‌র-এর সামনের দেওয়াল ও থামগুলি, ঘৃণা ও লজ্জায় তাই বুঝি তারা আজও আত্মগোপন করতে চায় বিবর্ণ ও ধূসর আস্তরের অন্তরালে।

রাজা চতুর্দশ লুইয়ের নাবালক অবস্থায় তাঁর অভিভাবক হওয়ার ক্ষমতালোলুপ রাজাত্মীয়দের মধ্যে কত ষড়যন্ত্র ও সংগ্রামের গুপ্ত ও প্রকাশ্য আয়োজনের অধিবেশন হয়েছিল এই প্রাসাদের ঘরে ও আঙিনায়। প্রাপ্ত বয়সে লুই যখন শাসনভার আপন হাতে তুলে নিয়ে বিজয় গর্বে রাজধানীতে ফিরে এলেন সেই উপলক্ষ্যে লুভ্‌র-এর গ্রাঁ গ্যালারীর সুদীর্ঘ হলে যে নাচ, গান ও ভোজের মহোৎসবের আয়োজন হয়েছিল তার আনন্দধ্বনির নিনাদে প্রাসাদের দেওয়ালগুলি প্রতিধ্বনির ঐকতানে নিরপেক্ষ ছিল না। লুভ্‌র প্রাসাদের অন্তরমুখী অংশে বহু থামে ভর করা লম্বা একটানা যে বারান্দা চলে গিয়েছে তার স্রষ্টা ছিলেন চতুর্দশ লুই।

রাজকীয় গৃহ-সংগ্রাম ও ষড়যন্ত্রের বিরাট ঘটনা ছাড়াও অনেক ছোটখাট প্রহসন যা রাজা, রাণী ও তাঁদের সমগোত্রীয় পারিষদের জীবনকেও এড়িয়ে যায় না তার কত দৃশ্য অভিনীত হয়েছিল এই প্রাসাদের কত কক্ষে ও অলিন্দে।

একদিন এই লুভ্‌র-এ লুই-এর সর্বসেনাধ্যক্ষ মার্শাল তুরেন অতিভোজন ও পানজনিত শ্লথ শরীরকে একটু সজীব ও সবল করে নেবার উদ্দেশ্যে শয্যাবাসেই এক অলিন্দে দাঁড়িয়ে বায়ু সেবন করছিলেন। পিছন থেকে না চিনতে পেরে এক পরিচারক তুরেনকে তার বন্ধু পাচক ভেবে 'কি জাঁ কেমন আছিস' বলে তাঁর পিঠে লাগিয়ে দেয় বিরাশী সিক্কার এক কিল। তিনি ফিরে দাঁড়াতে তাঁকে চিনতে পেরে অপ্রস্তুত, অপরাধী ও নতজানু ভৃত্য যখন তুরেন-এর ক্ষমা প্রার্থনা করল তখন তিনি শুধু বলেছিলেন —কিলটি বেচারী জাঁ-র জন্যে হলেও বেশ শক্ত ও বেদনাদায়ক।

ফরাসী বিপ্লবে সামন্ততান্ত্রিক বংশগুলি বিলুপ্ত হওয়ায় পারী এই প্রথম সম্পূর্ণ সংযোজিত ও পরিপূর্ণ একটি শহরে পরিণত হয়েছিল।

সম্রাট নাপোলেয়ঁর শাসনাধীনে নিও-ক্লাসিক্যাল রূপায়ণে রাজধানী পারী ছদ্ম পুরাতনের এক অভিনব সজ্জায় বিভাসিত হলো। এ যেন এক নতুন বিজয়দীপ্ত সিজ.ার-এর উপযুক্ত রাজধানী এক নতুন রোম। নাপোলেয়ঁর রাজত্বকালে শুধু যে বাইরের সাজে লুভ্‌র-এর পরিবর্তন ঘটল তা নয় বিজিত দেশের শিল্পরত্ন সম্ভারে তিনি ভরিয়ে দিলেন এর সারা ঘরগুলি। আজ বহুজনে নাপোলেয়ঁকে অভিহিত করে পরধন লুণ্ঠনকারী দস্যু বলে কিন্তু তাঁর সংগৃহীত শিল্পসম্ভারকে লুভ্‌র থেকে বাতিল করে দিলে অবশিষ্ট সংগ্রহ হয়ে যাবে ম্লান।

সম্রাট তৃতীয় নাপোলেয়ঁ নতুন প্রাসাদ ও উদ্যানের পরিকল্পনা ও নির্মাণে বিশেষ উৎসাহী ছিলেন। লুভ্‌র তাঁর রুচির প্রলেপে আর একটু পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হলো। তাঁরই নির্দেশে লুভ্‌র-এর গায়ে-লাগা তুইলারি প্রাসাদের প্রসারিত সংলগ্ন অংশ দুটিকে একত্রিত করে দেওয়া হয়েছিল।

পারী কমিউন-এর প্রকোপে তুইলারী প্রাসাদ দগ্ধ ও বিধ্বস্ত হয়ে যায় কিন্তু লুভ্‌র তৃতীয় নাপোলেয়ঁর দেওয়া সাজে আজও সগর্বে দাঁড়িয়ে আছে একইভাবে।

লুভ্‌র-এর বাইরের সাজে যেমন রেনেসাঁস থেকে আরম্ভ করে নিও-ক্লাসিক ও পরবর্তী মিশ্রশৈলীর প্রভাব দেখা যায় তার আভ্যন্তরিক অলঙ্করণেও তেমনি বিভিন্ন শৈলীর ও রুচির নিদর্শন আজও বিদ্যমান। অন্যান্য প্রদর্শিত শিল্পসম্ভারে দর্শকের দৃষ্টি সম্পূর্ণ আবদ্ধ হয়ে যাওয়ায় কামরার গাত্রাভরণ ও অলঙ্করণের রূপ অনেকের নজরে পড়ে না।

বেশীরভাগ ট্যুরিষ্টদের পারী দেখার মেয়াদ এক সপ্তাহ কি তার চেয়ে কম এবং বহু দ্রষ্টব্যের তালিকার মধ্যে অসংখ্য অমূল্য শিল্পরত্নের সংগ্রহশালা লুভ্‌র মিউজিয়ামকে দেখতে হয় হয়ত কেবল একদিনে। এই মন-ঠকানো শিল্প দেখার অভিজ্ঞতায় দ্রষ্টার মনে থেকে যায় হয়ত কেবল মোনালিসার হাসিমুখ, ভেনাস দ মিলোর মূর্তি ও আরও দু'একটা কিছুর আবছা স্মৃতি।

কত দেশের কত শতাব্দীর শিল্প-নিদর্শন, কত জাতির জীবনের সজীব ছবি দেখে পরিচয় করে নেওয়া যায় এই লুভ্‌র-এ যদি দর্শকের থাকে সময়, ধৈর্য ও দেখে আনন্দ পাবার মতো দৃষ্টি।

এর এক গ্যালারীতে এক দিন কাটালেও মনে জীবন্ত জেগে উঠবে বেশ কয়েক শত বছরের মানবসভ্যতা ও জীবন এবং কত যুগের রাজধানীতে, রাজপথে, প্রাসাদে গ্রামে ও কুটিরে ভ্রমণ করা চলবে, সাধারণ গৃহী ও গৃহিণীর অন্তঃপুরে তাঁদের জীবনের গোপন দৃশ্যে উঁকি দেওয়া যাবে অবাধে, কত শিল্পীর কর্মশালায় বসে গুঞ্জবে মন প্রমোদাপ্লুত হবে।

লুভ্‌র-এর গ্যালারীতে মধ্যযুগের ফরাসী গীর্জার সমবেত কণ্ঠে প্রার্থনা ধ্বনিত হয়ে ওঠে কোনো রাজন্যের বিবাহে, সন্তানলাভে বা অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সমাধানে। কাঠ ও পাথরে সূক্ষ্ম কাজের ঝিলিমিলি দেওয়া কুলুঙ্গী থেকে ম্যাদোনা, এঞ্জেল বা

'সেণ্ট-এর সদা প্রসন্ন, শান্ত ও স্বর্গীয় মুখচ্ছবি দর্শককে নিয়ে যায় মর্তের উর্ধ্বে আর এক কোনো অব্যক্ত জগতে।

কোনো মৃত নাইট-এর শায়িত মূর্তি সম্বলিত সমাধির চারদিকে শোকাবনত মংক ও নান্‌দের প্রার্থনারত রঙিন প্রতিমাগুলি জানিয়ে দেয় কত অভিযান ও বীরত্বের কাহিনী।

অন্য কোনো গ্যালারীতে মিশরের গ্রেনাইট পাথরে খোদিত অবেলিস্ক, সারকোফেগাই, স্ফিঙ্কস্ এবং পশু ও মানবাকৃতির মিশ্রিত রূপে দেবদেবীর নানাবিধ মূর্তি, পত্নী ও পুত্রকন্যা সমভিব্যাহারে দোর্দণ্ডপ্রতাপান্বিত ফ্যারাওগণ, প্রাসাদের পারিষদ ও কর্মচারীবৃন্দ, পিরামিড-এর মৃতপুরীর অন্ধকার ছেড়ে এই নতুন জগতের সামনে কত সুদূর অতীতের পুরাতন জীবনের পুনরাভিনয় করে চলেছে। কান পেতে শুনলে এই মূর্তিগুলি থেকে হয়ত শোনা যায় কত অগণিত বিজিত বন্দী দাসের কশাঘাত নিষ্কাষিত আর্তনাদ, ব্যথা ও শ্রমক্লান্তির দীর্ঘশ্বাস এবং অস্বাভাবিক আসন্ন মৃত্যুতে হৃদয়ের শেষ আক্ষেপ-ধ্বনি।

কোথাও বা স্বর্ণ-রবি-করোজ্জ্বল গ্রীসের অলিভ কুঞ্জে ক্রীড়ারত সুঠাম যুবক ও ও যুবতারা যেন মায়ায় সহসা থেমে গিয়েছে পাথরের মূর্তিতে, ফাইদিয়াস, প্রাক্‌সিতেলস মাইরন কি পলিক্লিতাস-এর করস্পর্শে। প্যান-এর বাঁশীর সুরে নৃত্যের ছন্দভঙ্গিমা দুলে ওঠে কত ভেনাসের পেলব দেহে। সে বাঁশীর তালের অনুরণন যেন ঝংকৃত হয় এ্যাপোলোর হাতে লিউট-এর তন্ত্রীতে আর তাঁর ব্যায়াম-পুষ্ট পৌরুষে গর্বিত দেহের পেশীগুলি স্পন্দিত হয় সে সঙ্গীতের তালে মানে। কত রোমান রাজ্ঞী, নৃপতি, নাগরিক ও নাগরিকারা পাথরে মূর্ত হয়ে ভোগ-লালসাময় স্বৈরাচারী জীবনের ছবিকে তুলে ধরেছেন অপূর্ব শৌর্য ও বীর্যের স্মৃতির পাশে পাশে।

মিকেল আঞ্জেলো রচিত বন্দী দাসের দুমড়ে-পড়া মূর্তি দুটিতে যে বেদনা মূর্ত, কে জানে হয়ত শিল্পীর জীবনে যে বিরাট পরিকল্পনাগুলি প্রকাশের সুযোগ পায়নি এরা তারই এক জমাট ব্যর্থতার অভিব্যক্তি।

আদি খৃষ্টীয় চিত্রাবলীতে চিমাবুয়ে ও জিয়োত্তোর কত ম্যাদোনা ও জেসাস সোনালী আকাশের দৃশ্যপটে দাঁড়িয়ে দ্রষ্টার মনকে অভিভূত করেন।

ফ্রাঞ্চেস্কা, বত্তিচেলী, দাভিঞ্চি, আঞ্জেলো, রাফাএল, কারাভাগ্‌গিয়ো, লাতুর, পুস্যাঁ, ভাতো, হাল্‌স, রেমব্রাণ্ট, ভারমিয়ের, এল্ গ্রেকো, ভেলাথকুয়েথ, গোয়য়া, দাভি, দ্বলাক্রোয়া, এঁ্যাগ্র, ম্যানে, ম্যনে, সেজান, দোগা, ভ্যান হফ, গগ্যাঁ এবং আরও কত শত ইয়োরোপের শিল্পী প্রমুখরা রেখে গিয়েছেন তাঁদের চোখ আর মনের ফাঁদে ধরা দুঃখ, সুখ, ত্যাগ, বিলাস, পার্থিব ও আধ্যাত্মিক কল্পনা-জল্পনার কত ছবি ও কত বিচিত্র রূপ।

স্েন নদীর ধারে একটি সন্ধ্যায়

এক সন্ধ্যায় বুল্ভার সাঁ মিশেল দিয়ে চলছি। মনে পড়ছিল, বাংলার শ্যামল বুকে সন্ধ্যা কেমন সাদর সন্তর্পণে আঁধার আঁচলখানি বিছিয়ে দেয়। আগত সন্ধ্যার স্বচ্ছ আঁধারের আবরণখানি ভেদ করে কয়েকটি প্রদীপশিখা, নির্বাপিত দিবালোকের আত্মা যে একেবারে নিঃশেষ হয়নি জানিয়ে যেন জ্বলে ওঠে। মঙ্গলশঙ্খ, উলুধ্বনি যেন সাবধান বাণী শোনায় —এই শব্দের সঙ্গে সব গোলমাল চুপ হয়ে যাক, 'ক্ষান্ত হও, ধীরে কও কথা, ওরে মন নত কর শির, দিবা হল সমাপন, সন্ধ্যা আসে শান্তিময়ী।' কানের মধ্যে ঝিল্লীরবের একতান বাজছিল, তাকে বিদীর্ণ করে বেজে উঠল কোনো কাফের অর্কেষ্ট্রোর উচ্চতান। সুবেশ নরনারীর চলমান স্রোতে উত্থিত হাসির কলধ্বনি অর্কেষ্ট্রোকে যেন আরও একপর্দা চড়িয়ে দিলো। বৈদ্যুতিক আলোর বন্যায় আঁধার ডুবে দু'একটি অট্টালিকার কোণে আশ্রয় পাবার ব্যর্থ চেষ্টা করে তলিয়ে গেলো। রঙ্গমঞ্চ নিঃসৃত সঙ্গীত, প্রশংসা ধ্বনি, প্রমোদাবেশাপ্লুত পারীবাসীর সঙ্গে একযোগে বিদ্রূপ করে যেন বললে, 'সন্ধ্যা, তোমার কালিমার স্থান এখানে নেই, তোমার নিস্তব্ধতাকে আমরা পছন্দ করি না। পারী সুন্দরীর তাচ্ছিল্যভরা হস্তভঙ্গিমার কঙ্কণ যেন পানপাত্রের ঠুনঠুন শব্দে বেজে উঠল। প্রস্থানোন্মুখী সন্ধ্যার আঁচলের খানিক যেন স্েন নদীর ওপর লুটিয়ে চলছিল, তারই একপ্রান্তে বসে গেলাম।

সঙ্গে ছিলেন এক বন্ধু। নিস্তব্ধতা বোধহয় তাঁর খুব প্রিয় নয়। প্রশ্ন করলেন, "কর, এত বিষয় থাকতে শিল্পকে তোমার জীবনের লক্ষ্য স্থির করলে কেন? আমাদের দেশের বর্তমান অবস্থায় এর প্রয়োজন কি? তা ছাড়া তোমাদের কেউ বুঝছে বা আদর করছে তারও তো কোনো লক্ষণ দেখি না।"

আমি বললাম, "আমাদের আদর যে নেই তার প্রমাণ তুমি নিজেই। আর প্রয়োজনের কথা বলছ, মানুষের প্রাথমিক প্রয়োজনটুকু মিটিয়েই কি মানুষ বাঁচতে পারে? তোমার রুচিমতো করে না থাকলে তোমার মন অসুস্থ হয় অথচ তোমার রুচিমতো নয় এমন অবস্থাতেও তুমি বেঁচে থাকতে পার। কোনো মানুষ বেঁচে থাকতে পারে এমন আহার, বাসস্থান, পোশাকটুকু দিলেই কি সে সন্তুষ্ট থাকে? কবিতা না লিখলে, গান না গাইলে কি জীবন বাঁচে না, তবে কেন তা চাও? যে গাছের ফুল হয় না, পত্রস্তবক ভরা শাখা-প্রশাখা ছায়া বিস্তার করে না তার যা মূল্য, সাহিত্যে, শিল্পে, সম্পদহীন স্বাধীন জাতের মানবসমাজে তার চেয়ে বেশী দাম নয়; তাই বলে স্বাধীনতা চাই না তা বলি না। জাতি স্বাধীন না হলে, আমাদের দেশ শিল্প-সম্পদে আবার ঐশ্বর্যশালী হয়ে উঠবে না, কিন্তু স্বাধীনতার পরিপূর্ণতা হবে সাহিত্য, শিল্প, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতির সম্পদ দিয়ে। কিন্তু মনে ভেব না, শিল্প সাহিত্যের

বিকাশ শান্তির ফসল। ইতিহাসে পাই, সম্রাট ও ধনীদের অত্যাচারে জর্জরিত জন-সমাজে বিক্ষুব্ধ অসন্তোষাগ্নির আবহাওয়ার মধ্যে কবি রুশো, শিল্পী ডমিয়ের স্পেনের দরদী শিল্পী গোয়য়া প্রভৃতি কবি শিল্পীদের উদ্ভব হয়েছে। শিল্প, সাহিত্যকে উপেক্ষা করে কোনো রাজনৈতিক আন্দোলন পরিপূর্ণ হয় না। গণ-সংগ্রামকে সুসংবদ্ধ করতে যে শিক্ষার প্রয়োজন তা কেবল বর্ণপরিচয়ে হয় না —কাব্য, শিল্প, সঙ্গীত সে শিক্ষা সহজে স্বতঃস্ফূর্তভাবে দিতে পারে। বিপ্লবের সময় রাশিয়ার অশিক্ষিত জনসাধারণকে, রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও তাদের কর্তব্য সম্বন্ধে, বিজ্ঞাপনি চিত্র দ্বারা উদ্বুদ্ধ করেছিল তা অনেকের অবিদিত নয়। দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শক্তি প্রবল হলেই যে শিল্প ও শিল্পীর আদর হয়ে থাকে তা নয়। চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকালে বিক্রমে, সম্পদে বলীয়ান ফ্রান্স, তখনকার সেরা ভাস্কর প্যুগেকে অবজ্ঞা করেছে। সম্রাট ও ধনীদের চোখে লব্রুঁ হলো সেরা শিল্পী। সে হলো রাজকীয় শিল্পীদের সভাপতি —অর্থবলে, রাজকীয় কৃপায় শিল্পীদের মধ্যে যেন আর এক সম্রাট।”

বন্ধু হঠাৎ ফরাসী শিল্প ইতিহাসের গল্পে আকৃষ্ট হয়ে পড়লেন। প্রশ্ন করলেন, “আচ্ছা লব্রুঁ এবং চতুর্দশ লুইয়ের পর এ দেশের শিল্পের, বিশেষ করে ভাস্কর্যের অবস্থা কেমন হলো ?”

বললাম, “পরিবর্তন যে হয়নি তা নয়। তবে স্থাপত্যে কিছু পরিবর্তন ছাড়া ভাস্কর্যে এমন কিছু বদল হলো না যার উল্লেখ করা যায়। কারণ, স্থূল, গুরুভার বস্তুর প্রাকৃতিক নিয়ম অনুসারে শিল্প-সৃষ্টির উপাদান ভাস্করের রচনার স্ফুরণকে সীমাবদ্ধ করে দিয়েছে। চিত্রকর, কিরণচ্ছত্রের বিচিত্র প্রতিফলনকে রঙে আবদ্ধ করে আমাদের চোখে বর্ণের হিল্লোল বইয়ে দিতে পারে। সমুজ্জ্বল সূর্যোদয়ের রক্তিমাকে তরল উচ্ছ্বাসে ঢেলে দিতে পারে। বিম্বাধরীর মুখকমলের সুষমাকে মুকুরে প্রতিবিম্বিত করে দেখাতে পারে রূপযৌবন মদে মত্তার গর্বকে। ভাস্কর এ সুবিধে না পেলেও ক্ষান্ত হননি রূপ রচনায়। সে বলে, একবর্ণ প্রস্তর মৃত্তিকায়, আলোছায়ার প্রলেপ দিয়ে আমি বহুবর্ণের, উচ্ছ্বাস দেখাই। ব্রোঞ্জ, মর্মরে গঠন দিয়ে আমি দেখাই ত্বকের সজীবতা, ধমনীর রক্তসঞ্চালন। দর্শক চোখে দেখে রচনার স্পর্শসুখ অনুভব করবে। কিন্তু তবুও চিত্রকর তার রচনা শৈলীতে যত বৈচিত্র্য আনতে পেরেছে ভাস্কর ততটা পারেনি। লব্রুঁর মৃত্যুর পর পোশাক পরিচ্ছদের একটু বাহুল্য কি সংক্ষিপ্তকরণ, দেহসংস্থান, পেশী বা ত্বকের সূক্ষ্ম গঠন ভঙ্গিমার বৈচিত্র্যের মধ্যে সম্ভ্রম বা কামোন্মত্ততার কদর্য রূপ, শুদ্ধ পবিত্রতা বা অসভ্যতার প্রকাশ রচনাশৈলীতে কিছু পরিবর্তন আনেনি। চতুর্দশ ও পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকাল থেকে বিপ্লব পর্যন্ত, ফরাসী জনসাধারণের অত্যাচার ও দারিদ্র্য-জ্বালায় জর্জরিত প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখতে সমস্ত শক্তি নিঃশেষ হয়ে যেত। এই সময়ে জাতীয় বৈশিষ্ট্য ও উচ্চাকাঙ্ক্ষা লুপ্ত হয়ে শিল্পের কেন্দ্র জাতীয় জীবন থেকে

সরে সঙ্কীর্ণ হচ্ছিল। সংস্কৃতির সব কিছু ধনীদের সখের ওপর নির্ভর করে চলছিল। রাজা শিল্পধারার বিধান দিতেন আর ধনীরা তাই মাথা পেতে গ্রহণ করে কৃতার্থ মনে করতেন। সম্রাট পঞ্চদশ লুই ছিলেন কামোন্মত্ত, লম্পট। রাজা ও রাজসভার অনুকূল আবহাওয়ায় শিল্পের প্রকাশও কামভাবোত্তেক হয়েছিল। এই সময়ের শিল্পী বুশের চিত্রণে ও ক্লদিয়ঁর ভাস্কর্যে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। তবে তাঁদের রচিত সরল, যৌবনপুষ্ট, অপ্রাকৃত নগ্নমূর্তি, সমাজে নৈতিক অবনতি ঘটাবার তত সুবিধা পায়নি। ১৭১৫ খৃষ্টাব্দের রিজেন্সি কর্তৃক পরিচালিত রাষ্ট্র থেকে বিপ্লবের পূর্ব পর্যন্ত ফ্রান্সে চিত্রণ ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের ধরন বেশ উন্নত হয়েছিল এবং প্রায় সমগ্র ইয়োরোপে ফরাসী সভ্যতার প্রভাব ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছিল। ইতালীয় ও ক্লাসিক রীতির আধিপত্য থেকে ভাস্কর্য পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে সম্পূর্ণ নিজস্ব জাতীয় এক ধারার পরিপূর্ণ রূপ দিয়েছিল। এই সময়ের আবক্ষ প্রতিমূর্তির ব্রোঞ্জ ও প্রস্তর অবয়বে জীবনের স্পন্দন অনুভব করা যায়। ত্বকের সুষমা সম্পাদনই যেন ভাস্করের চরম লক্ষ্য হয়েছিল। নাতিয়ে, লাতুর ও শারদাঁ বর্ণ, ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের অমর রূপ দিয়ে এ যুগের চিত্রণকে মহনীয় করেছেন। প্রতিকৃতি নির্মাণে দক্ষ বিখ্যাত ভাস্কর হুদোঁ এই সময়ের ভাস্কর্যকে উন্নতির পথে আরও এগিয়ে দিয়েছিলেন।

"অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি সময়ে নানা রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিতে ফরাসী শিল্পী, সমালোচক ও জনসাধারণের মন ক্লাসিক যুগে ফিরে যাচ্ছিল। বুশে ও ক্লদিয়ঁর অপ্রাকৃত রচনা দর্শকদের আর আকৃষ্ট করতে পারছিল না। ১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে পম্পেই আবিষ্কারের ফলে জনসাধারণ, প্রাচীন গ্রীক ও রোমানদের কাহিনী সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধিৎসু হয়েছিল। ষোড়শ লুই, কোঁৎ দাঁজভিয়েরকে রাজকীয় শিল্প-স্থাপত্যের সমগ্র ভার দিয়েছিলেন। দাঁজভিয়ের নিজের খেয়াল মতো শিল্প ও শিল্পীর ওপর প্রভুত্ব করেছিলেন। নাপোলেয়ঁর সময়, গতানুগতিক জীবন থেকে বহু পরিবর্তিত, ঘটনাবহুল চাঞ্চল্যময় জীবনের পরিণতিতে শিল্পীরা নতুন বিষয়, নতুন উদ্যম ও উৎসাহ পেয়েছিলেন। ফরাসীদের ইতিহাসে এমন যুগ দেখতে পাই না, যখন শিল্প ও শিল্পান্দোলন তাদের সাধারণ ও ব্যক্তিগত জীবনে অপরিহার্য বিষয় ছিল না। প্রথম নাপোলেয়ঁর রাজত্বকালে শিল্প, ঐশ্বর্যে ফ্রান্স সর্ব যুগাপেক্ষা উন্নত ও গৌরবান্বিত হয়েছিল। এই সময় থেকে শিল্পে যে সব উদ্যমের সূত্রপাত হলো, জেরিকো ও দ্যলাক্রোয়া সঙ্কীর্ণ সীমাবদ্ধ ক্লাসিক ভাবধারার থেকে সরে এসে, নব রোমান্টিক শিল্পধারার প্রতিষ্ঠা করে, তার অন্যতর পরিণতি দেখালেন। ভাস্কর্যে রুদ্, দাভিদ, দাঁজে ও বারুই প্রকৃতির সাক্ষাৎ অনুশীলনে সকল শিল্পধারার সংস্কারমুক্ত এক আবেগময় মূর্তিগঠন ধারার সৃষ্টি করলেন। চিত্রণে রোমান্টিক ভাবধারার বদল হয়ে বর্তমান কালের মধ্যে বহু শিল্প-পদ্ধতির উদ্ভব ঘটেছে। নাপোলেয়ঁর বিজয়স্তম্ভ আর্ক ত্য ত্রিয়াঁফ-এ রুদ্-কৃত সৈন্যদলের অভিযানের

যে বীরত্বপূর্ণ তেজ ও গতির সমাবেশ তা প্রত্যেক দর্শকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তুমি তো দেখেছ অবসারভেতোয়ার পার্কের বাইরে একপ্রান্তে মার্শাল নের কি অপূর্ব শক্তিশালী ও নির্ভীক বীরমূর্তি। রুদ্-এর ভাস্কর্যে শুধু যে মূর্তিগুলির প্রাণের স্পন্দন অনুভব করা যায় তা নয়, কানে তাদের উল্লাস চিৎকার ধ্বনিও যেন আঘাত করে। রুদ্-এর ছাত্র ভাস্করশ্রেষ্ঠ কার্‌পো, তাঁর রচনায় লাবণ্য ও কমনীয়তার সুষমা গঠনে দেখিয়েছেন। অপেরার সামনে নৃত্যশীল নরনারীর দলটি কার্‌পোর শিল্পসাধনার একটি উন্নততম বিকাশ জানবে।"

বন্ধু হঠাৎ প্রসঙ্গ ভঙ্গ করে বললেন, "থামাও বাপু তোমার ইতিহাসের নজির। আর অন্ধকার ভালো লাগছে না। চলো, কোনো কাফেতে গিয়ে বসে একটু পান ও গান উপভোগের চেষ্টা করি।"

ফ্রান্সের শিক্ষায়তন

ফ্রান্সে যাবার আগে আমার এই ধারণা ছিল যে ফরাসী ভাষাটা দু'দিনেই আয়ত্ত করে ফেলব। কোনো বিষয়ের বিশেষ খোঁজ না করেই তার চূড়ান্ত বিচারে আমরা চিরকালই বেশ পটু। কিন্তু প্রথম একমাস ফরাসী ভাষা বুঝে চলতে আমায় যথেষ্ট বেগ পেতে হয়েছিল। রেস্তরাঁর পরিচারিকাকে হুকুম করি 'এান্‌অমলেৎ' সঙ্গে সঙ্গে সে চিৎকার করে পাচকঠাকুরের উদ্দেশ্যে ব্যাকরণ শুদ্ধ করে 'উন্‌অমলেৎ'। প্রায় সকলের দৃষ্টি পড়ে আমার ওপর, আমি লজ্জিত হয়ে মাথা হেঁট করে খেয়ে যাই। দেশ থেকে ভাষা না শিখে যাওয়ায় লাভ হয়েছিল এইটুকু যে, দেশে শেখার বিকৃত টানকে —যাকে ভোলা বড় শক্ত, জিবের আড় ভাঙিয়ে খাঁটি উচ্চারণ করার ব্যর্থ প্রচেষ্টা করতে হয়নি। প্রথম দু'একমাস দু'একজন ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে ইংরাজী শেখাবার বিনিময়ে ফরাসী শেখার চেষ্টা করেছিলাম। এভাবে হয়ত শিখতে পারা যায়। কিন্তু গল্পপ্রিয় হলে আসল শেখার চেয়ে অন্য কথায় উদ্দেশ্য চাপা পড়ে যায়। হঠাৎ একদিন ঠিক করে ফেললাম স্কুলে পড়ব। আমার পাড়াতেই ছিল বিদেশীদের জন্য ফরাসী শেখাবার সরকারী স্কুল আলিয়ঁাস্ ফ্রঁাসেজ। এই স্কুলে দিনে পড়াশুনা ছাড়া রাতেও পড়ানো হয়ে থাকে। এতে দিনে যারা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকে তাদের ফরাসী শেখার বেশ সুবিধা হয়। এখানে বুধ ও শুক্রবার সন্ধ্যায় অবৈতনিক ক্লাস হয়ে থাকে। গরীব বিদেশী ছাত্ররা এ সুযোগ অবহেলা করে না। আলিয়ঁাস্ ফ্রঁাসেজ ছাড়াও বিদেশীদের জন্য বহু বেসরকারী ফরাসী ভাষা-শিক্ষালয় আছে। অনেকগুলি স্কুলে ইয়োরোপের সব দেশের ভাষা শেখার ব্যবস্থা আছে। স্কুলে ভর্তি হয়ে প্রাথমিক পাঠের ঘরে প্রবেশ করে দেখি প্রায় কুড়ি জন নানা জাতির ছেলেমেয়ে থেকে বৃদ্ধ বৃদ্ধা, ফরাসী ভাষা প্রথম আয়ত্ত করার চেষ্টা করছে। স্কুলের অধ্যাপক সকলেই

মহিলা। এঁদের পড়াবার রীতি দেখে মুগ্ধ হলাম। শিক্ষক ছাত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'জো সাঁৎ',[১] মানে কি? ছাত্র চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। সে জানে 'জো'র অর্থ 'আমি' কিন্তু 'সাঁৎ' কি জানে না। শিক্ষক অমনি গুনগুন করে গেয়ে উঠে বললেন 'সাঁৎ'। ছাত্র বুঝল, 'আমি গান গাই।' এমনি সোজাসুজি প্রাসঙ্গিকভাবে শিক্ষা দেওয়ায় বাড়িতে বিশেষ না খেটেও তাড়াতাড়ি ভাষাটা অভ্যাস হয়ে যায়। প্রত্যেকটি ক্লাসকে একটি আন্তর্জাতিক সম্মিলনী করে, শিক্ষার মধ্য দিয়ে সর্বজাতির মিলন সাধন করছে এই বিদ্যালয়টি। সামান্য গুটিকয়েক ফরাসী কথা আর বাকিটা হাত-মুখ নেড়ে ছাত্রদের পরস্পরকে জানবার কি আকুল আগ্রহ! আমার আসনের পাশে একটি চেকোশ্লোভাকিয়ান মেয়ে বসত। যে-দিন হিটলার চেকের স্বাধীনতা চোরের মতো সিঁদ দিয়ে চুরি করলে, সে সন্ধ্যায় মেয়েটি ক্লাসে এল না। পরের দিন অতি গম্ভীরভাবে সে ক্লাসে এল। প্রফেসার বললেন, "মাদ্‌ময়জে.ল তোমার দেশটা চুরি গেলো!" সে তখুনি কান্নার উচ্ছ্বাসে ফুঁপিয়ে উঠল! দেখলাম প্রত্যেকটি ছাত্রছাত্রীর তার দিকে সহানুভূতির সজল চাহনী। মেয়েটি বলল, "যদি তারা যুদ্ধ করে হেরে যেত তা হলে এত দুঃখের কারণ হতো না। চেক সৈন্যের হাতের অস্ত্র হাতেই রইল একটি গুলিও কেউ ছুঁড়তে পারলে না!" স্বাধীন দেশে দ্বন্দ্ব-বিক্রম যাদের জীবনের প্রধান অঙ্গ তাদের বীর্যকে কৌশলে অপমানিত করার জ্বালা কতখানি যে তারা অনুভব করে, বহুদিন ধরে পরাধীন আমরা তা বুঝতে পারি না। আমাদের চোখে পড়ে কেবল মানচিত্রের রঙ ও সীমারেখার পরিবর্তন।

ফরাসী গণতন্ত্রের মন্ত্র —লির্বাতে, এগালিতে ও ফ্রেতারনিতে সব চেয়ে সার্থক হয়েছে ফরাসী শিক্ষায়তনে। অর্থকরী জ্ঞান বেচার গ্লানি এদের শিক্ষামন্দিরে এলে সম্পূর্ণ ভুলতে হয়। অধিকাংশ সরকারী প্রাথমিক শিক্ষালয়গুলি অবৈতনিক। যেখানে বেতন নেওয়া হয় তার পরিমাণ অতি সামান্য হওয়ায় অতি দরিদ্রও সে অর্থ দিতে সমর্থ। ছাত্রদের উৎসাহিত করবার জন্য বৃত্তির ব্যবস্থা আছে অসংখ্য এবং সেগুলি যে কেবল ফরাসী ছাত্রদের জন্য তা নয়, বহু বিদেশী ছাত্র যাদের সঙ্গে ফ্রান্সের কোনো স্বার্থই জড়িত নেই তারাও বহু বৃত্তি লাভ করে থাকে। অধ্যাপকরা অতি সদাশয়, ছাত্রের কাজে সন্তুষ্ট হলে তাঁরা তাদের শিক্ষায় সর্বতোভাবে সাহায্য করে থাকেন। ফরাসী দেশে সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান যথেষ্ট থাকলেও বেসরকারী শিক্ষায়তনের সংখ্যা কম নয়। কিন্তু উভয় প্রকারের প্রতিষ্ঠানগুলিকে রাষ্ট্রীয় শিক্ষাবিভাগের তত্ত্বাবধানে ও নিয়মে চলতে হয়। শিক্ষাক্ষেত্রে ফ্রান্সে, বহুকাল ধরে চার্চ ও স্টেট-এ সংঘর্ষ চলেছিল। ১৮০৬ খৃষ্টাব্দে নাপোলেয়ঁ আইন করে ফ্রান্সের সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিকে কেন্দ্রীভূত করেছিলেন এবং রাষ্ট্রীয় বিশ্ব-বিদ্যালয় নাম দিয়ে বিশিষ্ট কর্মনির্বাহক গভরমেণ্টের হাতে রাষ্ট্রে শিক্ষার একচ্ছত্র

১॥ 'জ'-এর উচ্চারণ zo-র মতো হবে।

অধিকার দিয়ে দেন। বর্তমান শতাব্দীতে সকল দ্বন্দ্বের অবসান হয়ে শিক্ষাবিভাগ সম্পূর্ণ রূপে রাষ্ট্রের আয়ত্তাধীন হয়েছে। পারীর বিশ্ববিদ্যালয়কে সরবনও বলা হয়ে থাকে। রবেয়ার দ্য সরবন কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ের ভবনটি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় বিদ্যায়তনটির নাম প্রতিষ্ঠাতার নামে হয়েছে। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে সরবন পারী নগরীর সম্পত্তিতে পরিণত হয় এবং তৃতীয় নাপোলেয়ঁর সময় ভবনটি সংস্কৃত ও বর্দ্ধিত করা হয়। প্রথমে ফ্রান্সের নিখিল রাষ্ট্রীয় শিক্ষাকেন্দ্র ছিল পারী। ১৮৯৬ খৃষ্টাব্দে এই নিয়ম ভেঙে শিক্ষাবিভাগ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য বিভিন্ন কেন্দ্রের সৃষ্টি করা হয়। বিদ্যায়তনের কেন্দ্র অনুসারে ফ্রান্সকে সতেরোটি বিভাগে ভাগ করা হয়েছিল। বর্তমানে সেই বিভাগগুলিতে একটি করে বিশ্ববিদ্যালয় গড়ে উঠেছে।

১৭৯১ খৃষ্টাব্দ থেকে ফরাসী বালক বালিকাদের ছয় থেকে তেরো বছর বয়েস পর্যন্ত অবৈতনিক বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার আইন করা হয়। ঐ বয়েসের কোনো শিশু বাড়িতে পড়াশুনা করলে প্রতি বছর তাকে একটি পরীক্ষা দিতে হয় এবং তাতে অকৃতকার্য হলে অভিভাবকরা তাকে স্কুলে দিতে বাধ্য হন। প্রাথমিক শিক্ষালয়ের চারটি বিভাগ আছে। (১) 'একোল্ মাতারনেল্' (শিশুবিদ্যালয়) বর্তমান ফ্রান্সের উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠান। এই শিক্ষালয়গুলিতে সমগ্র ফ্রান্সে প্রায় তিন লক্ষ শিশু পড়ে। (২) ছয় থেকে তেরো বছর বয়েসের ছেলেমেয়েরা 'একোল্ প্রিমোয়ার এলেমেন্তোয়ার'-এ (নিম্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়) পড়ে। (৩) ষোল বছর বয়েস পর্যন্ত ছেলেমেয়েরা যাতে বিনা বাধায় নিম্ন প্রাথমিক স্কুলের চেয়ে উচ্চতর শিক্ষায় অগ্রসর হতে পারে তার জন্য 'একোল্ প্রিমোয়ার সুপেরিওর'-এর (উচ্চ প্রাথমিক বিদ্যালয়) সৃষ্টি। এখানে টেক্‌নিকাল ও কৃষি বিষয়ে সাধারণ শিক্ষা দেওয়া হয়ে থাকে। ফরাসী সরকারী শিক্ষা পরিষদের ঘোষণায় দেখা যায়, তাঁরা ছাত্রদের সাধারণ সংস্কৃতি, মন ও চরিত্র গঠনে অনুপ্রাণিত করা ছাড়া, বিদ্যাশিক্ষার সঙ্গে জীবনের ব্যবহারিক অভিজ্ঞতার দিকে শিশুদের উৎসাহিত করে থাকেন। (৪) উচ্চতর টেক্‌নিকাল শিক্ষার জন্য স্বতন্ত্র 'একোল্ প্রফেসিয়নেল'-এর (উপজীবিকা শিক্ষালয়) ব্যবস্থা আছে। গ্রাম্য উচ্চ প্রাথমিক স্কুলগুলিতে সাধারণ টেক্‌নিকাল শিক্ষায় কৃষি সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হয়। এই বিদ্যায়তনগুলি ছাড়া 'অস্‌পিস দেজাফাঁ এ্যাসিস্তে'তে আত্মীয়স্বজনহীন, পীড়িত অথবা কারাবন্দী পিতামাতার সন্তান এবং পরিত্যক্ত অজ্ঞাতপিতৃক শিশুদের লালন-পালন ও শিক্ষার ভার রাষ্ট্র বহন করে থাকে। তেরো বছর বয়সের পর ছেলে-মেয়েদের এখান থেকে নানা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও কৃষি-শিল্প-প্রতিষ্ঠানে শিক্ষানবিস করে দেওয়া হয়।

কর্সিকা সমেত ফ্রান্স নব্বইটি 'দেপার্‌তেম'তে ভাগ করা। প্রত্যেক দেপার্‌তেম-এ দুটি করে ট্রেনিং কলেজ আছে। কলেজের অধ্যাপকেরা 'সাঁ ক্লুদ' ও 'ফঁতনে ওরোজে'র নর্মাল স্কুলে অধ্যাপনার শিক্ষা পেয়ে থাকেন। ফ্রান্সে উচ্চতর শিক্ষার

জন্য সেকেণ্ডারী স্কুলগুলির নাম 'লিসে'। লিসের শিক্ষকদের অধ্যাপনা বিষয়ে শিক্ষিত করবার উদ্দেশ্যে প্রথম নাপোলেয়ঁ 'একোল্ নর্মাল স্যুপেরিওর'-এর প্রতিষ্ঠা করেন। লিসের সব চেয়ে ভালো ছাত্রদের রাষ্ট্র কর্তৃক বাসাহার ও বৃত্তি দিয়ে শিক্ষিত করা হয়। তারাই পরে লিসের শিক্ষক হয়ে থাকে। একোল্ নর্মাল স্যুপেরিওর ও লিসেগুলি প্রধানত স্টেটের দ্বারা ও অধীন কলেজগুলি স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক পরিচালিত হয়। সাহিত্য, বিজ্ঞান, চিকিৎসাবিদ্যা, আইন ও ধর্ম বিষয়ে শিক্ষা দেবার পৃথক পৃথক বিভাগকে 'ফাকুল্তে' বলা হয়। উপরোক্ত পাঁচটি বিষয়ের ফাকুল্তে নিয়ে পারী বিশ্ববিদ্যালয় গঠিত। বিজ্ঞান ও সাহিত্যের ফাকুল্তে-তে এবং সেই সংক্রান্ত পুস্তক সংগ্রহশালা সর্‌বন-এ প্রতিষ্ঠিত। বিজ্ঞান ও সাহিত্য বিষয়ে ফাকুল্তে-তে শিক্ষার ক্রমোচ্চমান অনুযায়ী ছাত্ররা তিন প্রকারের উপাধি পেয়ে থাকেন —(১) বাকালোরেয়া, (২) লিসাঁস ও (৩) দক্তরাৎ।

ফ্রান্সের জ্ঞানালোচনার সর্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র রাষ্ট্রীয় পরিচালনাধীন 'এঁ্যাস্তিত্যু দ্য ফ্রাঁস'। এই বিদ্যা প্রতিষ্ঠানটি 'আকাদেমী ফ্রাঁসেজ', 'আকাদেমী দে সিয়াঁস', 'আকাদেমী দে বোজার', 'আকাদেমী দে সিয়াঁস মরাল এ পলিতিক' ও 'আকাদেমী দে জঁ্যাসস্‌ক্রিপ্‌সিয়ঁ এ বেল্ লেৎর্' এই পাঁচটি শিক্ষা-সমিতির সমবায়ে গঠিত। সর্‌বন-এর বিদ্যাভবনেই আকাদেমীর অবস্থান। আবার পারী বিশ্ববিদ্যালয়ের নিকটেই আইন ও চিকিৎসাবিদ্যার ভবনগুলির অবস্থান। এরই নিকটে সর্‌বনের অবস্থান-পথের বিপরীত দিকে সম্রাট প্রথম ফ্রাঁসোয়া কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত 'কলেজ দ্য ফ্রাঁস'-এর বিরাট ভবন। এখানে বিখ্যাত নির্বাচিত গুণী অধ্যাপকরা নানা বিষয়-বিভাগের শিক্ষাসনের প্রধান রূপে অধিষ্ঠিত। উল্লিখিত ফাকুল্তেগুলি ছাড়া অন্যান্য বিশেষ শিক্ষাদানের জন্য বহু রকমের সরকারী ও বেসরকারী শিক্ষালয় আছে। 'ম্যুজে দিস্তোয়ার নাতুরেল'-এ প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় শিক্ষা ও গবেষণা হয়ে থাকে। এর প্রকৃতি বিজ্ঞান সম্পর্কীয় পুস্তকাগারটি বেশ সমৃদ্ধ ও বিখ্যাত। সর্‌বনের অন্তর্গত 'একোল্ প্রাতিক দেগওৎ এতুদ্' ছাত্রদের উচ্চ গবেষণায় উৎসাহিত করার জন্য প্রতিষ্ঠিত। 'একোল্ স্পেসিয়াল দে লাঙ্ ওরিয়ন্তাল' ভাষা শিক্ষার জন্য প্রসিদ্ধ। 'একোল্ নাসিয়নাল এ স্পেসিয়াল দে বোজার' ও 'একোল্ দ্য লুভ্‌র্'-এ শিল্পশিক্ষা ও শিল্প-ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণার বিশেষ ব্যবস্থা আছে। 'এঁ্যাস্তিত্যু নাসিয়নাল আগ্রোনমিক' কৃষি বিষয়ক, 'একোল্ নাসিয়নাল দে মিন্' খনি ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ক, পাস্তুওর বিদ্যায়তনে বীজাণুতত্ত্ব ও নানাবিধ বিজ্ঞান বিষয়ক, 'একোল্ লিবর দে সিয়াঁস পলিতিক'-এ রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয়শাসন পরিচালনা বিষয়ক। 'একোল্ স্যুপেরিয়র দ্য গেয়ার'-এ যুদ্ধ বিষয়ক, 'একোল্ পলিতেকনিক'-এ সামরিক ইঞ্জিনীয়ারিং ও সাঁসির-এ সাধারণ সামরিক কর্মচারীর শিক্ষা বিষয়ক, মারঁ্যা বিভাগে নৌযুদ্ধ, ও কলোনিতে কর্মচারী হবার জন্য বিদ্যালয়ে বিশেষ শিক্ষার বিরাট প্রতিষ্ঠানগুলি ফ্রান্সকে সভ্যতা ও সংস্কৃতির পথে

অভাবনীয় রূপে উন্নয়নশীল করেছে। এ ছাড়াও যে বিভিন্ন বিষয়ের অসংখ্য বিদ্যালয় আছে তার সম্পূর্ণ বিবরণী দিতে গেলে একটি স্বতন্ত্র বই লিখতে হয়, ফরাসী দেশে, কেবল মাত্র বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানে শিক্ষা দিয়ে দেশবাসীকে পরিপূর্ণ শিক্ষিত করা হলো —কর্তৃপক্ষরা তা মনে করেন না। শিক্ষা সম্পূর্ণের জন্য প্রত্যেক বিদ্যায়তন-সংলগ্ন পুস্তকাগার ও সংগ্রহশালার ব্যবস্থা আছে। পারীতে স্বতন্ত্র সংগ্রহশালা ও পুস্তকাগারের সংখ্যা দেখলে বিস্মিত হতে হয়। পৃথিবীর সব গ্রন্থাগারের চেয়ে সুন্দর পারীর বিখ্যাত 'বিব্লিওথেক নাসিয়নাল'-এর কথা শিক্ষিত কারো অবিদিত নয়।

এঁ্যাস্তিতুর সদস্য ও ভারতীয় মূর্তিতত্ত্বে বিশেষজ্ঞ পণ্ডিত ফুশের সঙ্গে আমার আলাপের সৌভাগ্য হয়েছিল। তাঁর আনুকূল্যে কয়েকটি গ্রন্থাগার ও সংগ্রহশালায় কাজ করার অনুমতি ও সুযোগ লাভ করেছিলাম। কয়েক বছর হলো, 'এঁ্যাস্তিতু দ্য লার্-এ দ্য লার্শিওলজি'র (শিল্পকলা ও স্থাপত্য বিদ্যায়তন) একটি স্বতন্ত্র বিরাট ভবন নির্মিত হয়েছে। প্রথম তিনটি তলায়, প্রাচীন, মধ্য ও আধুনিক যুগের শিল্প সম্পর্কীয় সুবৃহৎ পুস্তকাগার আছে। ওপরের শেষ, চার তলায়, প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের ও আসিরিয়, মিশরীয় স্থাপত্য নিদর্শনের অবিকল নিখুঁত প্লাষ্টারের ছাঁচ ঢালাই মূর্তির সংগ্রহশালা। প্রত্যেক মূর্তির পাদপীঠে কোন কোন বইয়ে মূর্তিটি সম্বন্ধে নিবন্ধ আছে তার তালিকা দেওয়া আছে। এতে আলাদা পুস্তক তালিকা দেখে বই খোঁজার পরিশ্রম বেঁচে যায়।

সর্বনে ভারতীয় সংস্কৃতি সম্বন্ধে একটি বিশিষ্ট বিদ্যায়তন প্রতিষ্ঠিত। এখানে ভারতীয় সংস্কৃতি ও ইতিহাস সম্বন্ধে গবেষণা করে ছাত্ররা 'দক্তরাৎ' উপাধি পেতে পারেন। এখানে ভারত সম্পর্কীয় পুস্তকসংগ্রহ নিন্দনীয় নয়। একদিন এই বিভাগের পাঠভবনে বসে আছি এমন সময় পণ্ডিত ফুশে এক বৃদ্ধার সঙ্গে আমার আলাপ করিয়ে দিলেন। তিনি তিব্বতীয় ভাষা ও শাস্ত্রে সুপণ্ডিত। চায়ের নিমন্ত্রণ পেয়ে একদিন তাঁর বাড়ি গিয়ে দেখি সব ঘর এমন কি শোবার এবং ভাঁড়ার ঘরের দেওয়াল পর্যন্ত বই-ভরা আলমারী ও র‍্যাকে চাপা রয়েছে। চায়ের টেবিলে নানা প্রসঙ্গের পর তিনি প্রস্তাব করলেন, "মঁ্যসিয়ো কর, তুমি আমায় ইংরাজী শেখাবে? তা হলে তার পরিবর্তে আমি তোমায় ভালো ফরাসী শিখিয়ে দেবো।"

বললাম, "আপনি এই বৃদ্ধ বয়সে ইংরাজী শিখে কি করবেন?"

তিনি বললেন, "দেখ, আমার বয়স হলো চৌষট্টি বছর। আমি চিরকুমারী, কাজেই আমার সংসারে আর কারো দায়িত্বের বালাই নেই। ভালো করে পড়লে ছয় বছরে নিশ্চয়ই ইংরাজী আয়ত্ত করে ফেলব। তারপর আশী বছর বয়স পর্যন্ত আমি নিশ্চয়ই সক্ষম থেকে দশ বছরে অন্তত দশখানি বই লিখতে পারব।"

অবাক হলাম তাঁর আশা দেখে! জিজ্ঞাসা করলাম, "তাঁর ইংরাজীতে বই লেখার এত আগ্রহ কেন?"

বললেন, "ফরাসীর ভালো অনুবাদ অপর জাতি করতে পারে না। ফরাসী গদ্য

অন্য ভাষার কাব্যের ছন্দকেও হার মানায় —এমনই এর শব্দের বাঁধুনী। অপর জাতির লেখক এর অনুবাদ করতে গিয়ে সমস্ত মাধুর্য নষ্ট করে দেন। ইংরাজীতে অনুবাদ করলে বইয়ের প্রচার হবে সমগ্র জগতে, তাই আমি ঠিক করেছি আমার নিজের লিখিত ফরাসী বই নিজেই ইংরাজীতে অনুবাদ করব।"

খুব সাধারণ না হলেও ফ্রান্সে এ ধরনের দৃষ্টান্ত অপ্রতুল নয়। এই অকৃত্রিম শিক্ষানিষ্ঠাই ফরাসী দেশকে ইয়োরোপে সংস্কৃতির শ্রেষ্ঠ আসন লাভে সমর্থ করেছে এবং সে নিষ্ঠার জীবন্ত প্রতীক প্রত্যেকটি বিদ্যায়তনে শিক্ষাগুরু ও জিজ্ঞাসু সুধী ছাত্রবৃন্দের মধুমিলন মন্দিরে সুপ্রতিষ্ঠিত।

পারীর অপেরা ও ফরাসী শিল্পী

রাত আটটা হবে অপেরার সামনে দাঁড়িয়ে আছি, বন্ধু জেলিনিস্কির অপেক্ষায়। বন্ধু জাতে পোল, গানবাজনার বড় ভক্ত। আজ অপেরায় গ্যেটের ফাউষ্ট অভিনয় দেখতে সে আমায় নিমন্ত্রণ করেছে।

পাঁচটি ছোট বড় রাজপথের সংযোগস্থলে অপেরার বিরাট ধূসর সৌধ অসংখ্য যানবাহন, পথচারীর চলমান স্রোতাবর্তের মাঝে দাঁড়িয়ে আছে। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে সে যুগের সেরা স্থপতি গারনিয়ে, তখনকার শ্রেষ্ঠ ভাস্কর চিত্রকরদের সহযোগিতায় এই সঙ্গীতাভিনয়ের মনোজ্ঞ মন্দিরটির রূপ দিয়েছিলেন। এই অপেরা-ভবনই পারীর বিখ্যাত সঙ্গীতশিক্ষা পরিষদের আসন। সৌধটির নীচের তলায় বহির্গাত্রে সজ্জিত কণ্ঠ-সঙ্গীত, যন্ত্র-সঙ্গীত, নৃত্য ও গীতিনাট্যের চারটি প্রস্তরে গঠিত অপূর্ব রূপক মূর্তি সে যুগের কয়েক জন বিখ্যাত ভাস্করের জীবনকে অমর করে রেখেছে। ওপরের তলায় অলিন্দের উন্মুক্ত গোলাকৃতি বেষ্টনীগুলির মাঝে শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতনায়ক, নট ও নাট্যকারদের আবক্ষ মূর্তিগুলি যেন সামনের জনসমুদ্রকে আহ্বান করে বলছে, 'ওগো তোমাদের কর্মক্লান্ত দেহটাকে একটু বিরাম দাও। এস, ভিতরে এস, তোমাদের জন্য সুখাসন পেতে রেখেছি। তোমাদের কানে সঙ্গীতের অমৃতধারা বর্ষণ করে কর্মজীবনের রূঢ় বাস্তবতাকে দূরে সরিয়ে দেবো। বাস্তব জগতের নির্মম, মধুর জীবন-কাহিনীকে নৃত্যগীতাভিনয়ের বিচিত্র ছন্দ ভঙ্গিমায় উপভোগ্য করে তুলব।'

"কি হে কতক্ষণ" —বলে জেলিনিস্কি অপেরার প্রবেশ পথের পাথরে বাঁধানো সিঁড়ি থেকে ডাক দিলেন।

ভিতরে বিচিত্র আকৃতির আলোকাধারের সজ্জা ভেদ করে অভিনয় কক্ষের সোনালী কারুকার্যের ঈষৎ উদ্গতগাত্রে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে বাদকদলের উজ্জ্বল মসৃণ যন্ত্রের গায়ে, আসন, মঞ্চে ও বৃতি-বেষ্টিত বিশিষ্ট মঞ্চে অর্থ-গরবিণীর কর্ণ

হস্তাভরণের মণি-মাণিক্যের ওপর পড়ে এক স্বপ্নময় আবহাওয়ার সৃষ্টি করছিল। ক্ষণপরেই বেটোফেন, ভাগনার মোসর্ট-এর রচিত সুর-তরঙ্গের উচ্ছ্বাস ভবনকে পূর্ণ করে দিলো। অভিনয় মঞ্চের সামনে ভারী রঙিন চিত্রিত পর্দাটি উন্মুক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ফাউষ্টের জীবনে বীতস্পৃহার গান গম্ভীরকণ্ঠে ধ্বনিত হলো। আলোছায়ার অপরূপ সমাবেশ-কৌশল কাহিনীর রূপকে বেশ প্রীতিপদ ও স্পষ্ট করে তুলল। ফাউষ্ট বিষ পানের জন্য পাত্রে ওষ্ঠ স্পর্শ করা মাত্র বিকট কর্কশ শব্দের হঠাৎ অবতারণায় দর্শককুল চমকে উঠল। এ কি! অভিনয়-মঞ্চের এক কোণ থেকে সর্বশরীর কাপড়ে-ঢাকা বিবর্ণ নীল বিকট-দর্শন এক প্রেতকায় মূর্তি আবির্ভূত হলো। বুঝলাম এ মেফিষ্টফেলিস। তারপর পটভূমির পর্দায়, আলোর খেলায় পরিবর্তিত প্রকৃতির ধীরে ধীরে বিকাশিত ও মিলিয়ে-যাওয়া রূপ, মার্গারিটার প্রেম, শেষ বিচারের দিনে নরকের ভয়াবহ দৃশ্য এবং অর্কেষ্ট্রার বিচিত্র সুরবিন্যাস আমাদের এক কল্পনাতীত আবহাওয়ার মধ্যে নিয়ে গেলো। এরপর একটি 'বালে' নৃত্যাভিনয় হলো। ফরাসী 'বালে'-নৃত্য পৃথিবীখ্যাত। অদ্ভুত অভিনয়, মুখে বাণী নেই, সুর নেই, কেবল মাত্র অঙ্গের বিচিত্র বিন্যাস ও নৃত্য একটি নাটিকার রূপ দিলে। একটি কিশোরী ঘরে টাঙানো এক সুপুরুষ রাজপুত্রের আলেখ্যের সঙ্গে নিজের মধুর সম্পর্কের কল্পনায় বিভোর। সে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখল, যে এতদিন প্রেমের বেষ্টনীতে নীরব আলেখ্য মাত্র হয়েছিল, সে জীবন্ত বাস্তব রূপ নিয়ে তার সামনে এসে প্রেম-নিবেদন করল। তারপর তাদের মিলন উৎসবে আরও কত প্রেমিক দম্পতিরা এসে তাদের শুভেচ্ছা জানিয়ে গেলো। ভোরের আবছা আলোয় জেগে সে রাজপুত্রকে পাশে না দেখতে পেয়ে চমকে উঠল। অন্তর্হিত রাজপুত্রের সন্ধানে তার কি অপূর্ব আকুলতা ফুটিয়ে তুলল তার নৃত্য ভঙ্গিমায়। ছবির দিকে তাকিয়ে সে দেখতে পেল আগের মতো অর্থহীন দৃষ্টিতে রাজপুত্র তার দিকে চেয়ে আছে। স্বপ্নে-পাওয়া মিলনের বিচ্ছেদ-বেদনায় সে উন্মত্ত হয়ে বারবার প্রশ্ন করতে লাগল, তুমি কি চিরকাল শুধু পটে লেখা ছবি হয়ে থাকবে? তুমি আসবে বলে কতদিন থেকে আমার হৃদয়-দ্বার খুলে রেখেছি। স্বপ্নে এসে মাঝে মাঝে পরশের ব্যথাটুকু দিয়ে চলে গেছ। কবে তোমায় চিরন্তন করে পাব!

সৌন্দর্যের এমন একটি অবদানকে দেখবার সৌভাগ্য ঘটাবার জন্য জেলিনিস্কিকে অসংখ্য ধন্যবাদ দিলাম। জেলিনিস্কি আমায় অপেরা অভিনয় দেখিয়ে যে আনন্দ দিয়েছে তা জীবনে ভুলব না, কিন্তু তার নিজের জীবননাট্যের পরিণতি আমায় চিরব্যথিত করে রেখেছে।

জার্মানীর পোল্যাণ্ড অভিযানের চার দিন আগে সে দেশের জন্য যুদ্ধে যোগ দিতে চলে গেলো। চলন্ত ট্রেনের জানালায় যতক্ষণ তার ঝুঁকে-পড়া শরীরটা দেখা গেলো তার স্ত্রী সেই দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন। আশ্চর্য! এক ফোঁটা চোখের জলকেও তিনি ফেলতে দিলেন না, পাছে স্বামীর কর্তব্য-কঠোর মন, মমতায়

ব্যথিত হয়। কয়েক দিন পরে যখন তাঁর সঙ্গে দেখা করতে গেলাম, শয্যাবলম্বিনী মাদাম্ জেলিনিস্কি অস্ফুটভাবে শুধু বললেন, "ইল্ এ মর্, ইল্ এ মর্। (সে মারা গেছে, সে মারা গেছে)।" তিনি পারী ছেড়ে চলে যাবার দিন সকালে আমরা আর্ক ত্য ত্রিঅঁফ্-এর তলায় অজ্ঞাত সৈনিকদের কবরে ফুল দিয়ে দেশমাতৃকার সম্মান রক্ষার্থে নিহত বন্ধুর উদ্দেশে স্মৃতিতর্পণ করবার সময় ভাবছিলাম, অপেরার কল্পনাময় অভিনয়ে এবং বন্ধুর বাস্তব জীবনের রঙ্গমঞ্চে নির্মম অভিনয়ে, কোনটায় বেশী ফাঁকি।

এ সব দার্শনিক তত্ত্ব ছেড়ে এখন অপেরা দেখা রাতের কথা বলে শেষ করি। রাতে ঘুম আসছিল না। নর্তক, নর্তকী, নট, নটী আর বাদ্যকরদের চিন্তা মনে ভিড় করে মস্তিষ্ককে ক্লান্ত করে তুলছিল। চাই না তাদের কথা ভাবতে। মনশ্চক্ষু থেকে তাদের ছবি মুছে দিতে চাইলে তারা যেন আরও বেশী হট্টগোল করে আক্রমণ করতে থাকে। জেগে, বাস্তবে যে অভিনয় দেখেছি তারই ক্রমানুবর্তী দৃশ্য দেখতে লাগলাম স্বপ্নে; তবে ফাউষ্ট বা 'বালে' নৃত্যের অভিনয় নয়, বিষয় ও অভিনয় ভঙ্গিমা ভিন্নতর ও আরও বাস্তব।

পাংগুটে সন্ধ্যার অন্ধকারকে মসীধূমাচ্ছন্ন করে একটি ব্রোঞ্জ-নির্মিত হাতের তৈলবর্তিকা একটি সরু গলিপথের খানিকটা স্থান ঘোলাটে আলোয় ভরিয়ে রেখেছে। ভারী কালো পোশাকের আবরণে কিম্ভূতকিমাকার প্রেতমূর্তির মতো দু'একজন লোক বহুকালের জীর্ণ ওভারকোটের ছিদ্রগুলি হাত চেপে আঁধারে লুপ্ত এক দরজার ফাঁক থেকে বেরিয়ে অপর দরজায় বা গলির বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছিল। একটি জানালার ভেজানো কপাটের ফাঁক থেকে আলোর ফালি ও হট্টগোল, হাসির উচ্ছ্বাস বাড়িতে একটু বড় রকমের 'রঁদেভূ' (আড্ডা)-র আভাস দিচ্ছিল। কি কৌতূহলে জানি না, বাড়িটাতে ঢুকে পড়লাম। একটি নাতিপ্রশস্ত হলে কয়েকটি প্রৌঢ় চাষী-মজুর ও তাদের স্ত্রী-পুত্রেরা মোটা সস্তা পানপাত্রে মদ খাচ্ছিল। এক পাশে একটি ছেলে কাঠের বাঁশীতে, গাল দুটো যতদূর সম্ভব ফুলিয়ে, কর্কশ স্বরের অবতারণায় মোহিত হয়ে, নিজেকে নিজে তারিফ করে মাথা দোলাচ্ছে। কয়েকটি মহিলা প্রৌঢ়দের গল্পরস এক মনে শুনছিল। কানা-তোবড়ানো টুপির ফাঁক থেকে একজন চাষী আড়চোখে আমায় দেখে বললে, 'কি হে ছোকরা! হাঁ করে কি দেখছ? বসে যাও একপাত্র সুধারস নিয়ে। আমরা হলামই বা গরীব গেলোই বা রাজার খাজনায় সব বিকিয়ে, আনন্দকে তো আর বিসর্জন দিতে পারি না! গরীব হলেও আমাদের মধ্যে কেবল চাষী-মজুরই নেই, এর মধ্যে খুঁজে পাবে শিল্পী, কবি, গায়ক। দেখো না সব শিল্পী চায় রাজার প্রসাদ পেতে, আঁকে তাদের তাঁবেদারী ছবি। কিন্তু ঐ কোণে বসে যে তিন জনকে দেখছ ওরা ছবি তৈরীতে রাজার কারিগরদের চেয়ে কম ওস্তাদ নয়। তবে ওরা আমাদের বড় ভালোবাসে। রাজার কৃপাকে উপেক্ষা করে ওরা আমাদের জীবনক্ষেত্রকে ওদের 'আতলিয়েত'

(কর্মশালা) করেছে।' জিজ্ঞাসা করলাম, 'ওরা কে ?' সে অবাক হয়ে বলল, 'সে কি হে! ন্যাঁ ভ্রাতৃত্রয়কে তুমি চেনো না!'

মনে পড়ল ন্যাঁ ভ্রাতাদের আঁকা চাষী পরিবারের ছবিগুলি। সঙ্গে সঙ্গে দেখি যেন লুভ্‌র মিউজিয়ামে ন্যা ভ্রাতাদের আঁকা ছবির সামনে দাঁড়িয়ে আছি। শিল্পীর জীবদ্দশায় কেউ সমাদর করেনি বলে, বোধ হলো ছবির মূর্তিগুলি বিদ্রূপভরা দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। হঠাৎ দেখি আবার সেই গলিটি, যেখানে বড় রাজপথ এসে মিশেছে সেইখানেই দাঁড়িয়ে আছি। রাস্তায় বিরাট শোভাযাত্রার মতো কতকগুলি লোক চলছিল। ঠিক তাদের মাঝে বেশ জমকালো পোশাক পরে, হীরে মণি-মাণিক্যের আভা ছড়িয়ে একজন ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিল। বগলে পাকানো কাগজ, হাতে রঙ, তুলির আধার ও ভাস্কর্য-কাজের সরঞ্জাম ইত্যাদি নিয়ে একদল লোক তাকে ঘিরে চলছিল। অশ্বারূঢ় লোকটি যখন যার প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করছিল, সে যেন নিজেকে কৃতার্থ মনে করছিল। সকলেই তার সঙ্গে একটু কথা বলে যেন ধন্য হতে চায়। পাশে যে আগে দেখা চাষী-মজুরগুলি কখন এসে দাঁড়িয়েছে লক্ষ্য করিনি। একজন ঐ দলটির দিকে ঘৃণাপূর্ণ দৃষ্টি ফেলে বললে, 'বৃথা দম্ভ! লব্রুঁটা রাজার দেওয়া রাজকীয় শিল্পীদের সভাপতির খেতাব পেয়ে মনে করছে নিজেও যেন আর এক চতুর্দশ লুই। আর দেখো না ঐ চাটুকার পটুয়ার দলটি। সভাপতির পদলেহনে যেন ওদের জন্ম সার্থক মনে করছে!' আর একজন বলল, 'আমরা কি যুগেই জন্মেছি, শিল্পী যে স্বাধীনভাবে রূপ রচনা করবে তারও উপায় নেই, সেখানেও মানতে হবে রাজার খেয়াল।' ন্যাঁ ভ্রাতারা বললেন, 'এরা শিল্পী-জীবনকে কলঙ্কিত করেছে, এর জন্য ভবিষ্যতের শিল্পীকুল এদের কোনোদিন ক্ষমা করবে না।' কি খেয়াল হলো জানি না, দলটির পিছনে আমিও সঙ্গ নিলাম। চলতে চলতে একস্থানে ভিড় দেখে দাঁড়িয়ে গেলাম। দণ্ডায়মান দর্শকদের ঘন বেষ্টনীকে অতিক্রম করে দেখবার চেষ্টায় সহজেই যেন লম্বা হয়ে গেলাম। আমার মাথাটি অগণিত মস্তকের চেয়ে উঁচু হওয়ায় দেখতে পেলাম বারোয়ারী থিয়েটার হচ্ছে। অভিনয় হচ্ছিল ধর্মপুরাণ কাহিনী নিয়ে। বাঃ দৃশ্যপটগুলির রঙ তো বেশ! কিন্তু চিত্রিত নিসর্গ দৃশ্য ও যবনিকার আকৃতি বেশী বড় ও স্পষ্ট হওয়ায় নট-নটীদের বড় ও আশানুরূপ স্পষ্ট দেখাচ্ছিল না। আমার পৌছানোর সঙ্গে সঙ্গেই অভিনয় শেষ হয়ে গেলো। একজন যবনিকার বাইরে এসে বললেন, 'এ দৃশ্যপটগুলি ও নাটক আমার রচনা। ইতালির রাফাএলের রচনা দেখে আমি উৎসাহিত হয়ে এই অভিনয়ের সৃষ্টি করেছি। এতে হয়ত অনেক দোষ-ত্রুটি থেকে গেছে, কিন্তু আশা করি আপনাদের কিছু আনন্দ দিতে সক্ষম হয়েছি।' দর্শকদের মধ্যে থেকে কিছুক্ষণ নানা সমালোচনা শুনলাম। বহু লোক বলছিল, 'শিল্পী পুস্যাঁ জীবনের বেশী সময়টা ইতালিতে কাটিয়েছেন বলেই রাজার খেয়াল তামিলের অত্যাচার থেকে রক্ষা পেয়ে কিছু নিজের কথা নতুন দৃশ্য-পটে, নতুন রঙে দেখাতে পেরেছেন।' বুঝলাম উপসংহারের বক্তা শিল্পী পুস্যাঁ।

আমার চলার বিরাম নেই। জনসঙ্ঘ, অট্টালিকা সব ক্রমে পিছনে মিলিয়ে গিয়ে, সামনে নীল আকাশ, শ্যামল বনানী, প্রান্তর সব এগিয়ে আসছিল। একটি বাগানের এক পাশে এক যুবক-শিল্পীকে অঙ্কনরত দেখে নিঃশব্দে তার পিছনে গিয়ে ছবি দেখতে লাগলাম। তার আঁকা ছবির মধ্য হতে বাঁশীর মিঠে তান, কুঞ্জবনের ফুলের গন্ধের সঙ্গে ভেসে এল। গ্রাম্য তরুণীরা সরল হাসি হেসে তরুণদের হাতে হাত শৃঙ্খলিত করে বৃত্তাকারে নাচতে লাগল। ছবি ছেড়ে শিল্পীর দিকে চেয়ে দেখি কেউ নেই। এইমাত্র দেখেছিলাম তাকে ছবি আঁকতে, এই মুহূর্তেই সে গেলো কোথায়! দেখা গেলো তার তুলিটি কেবল মাটিতে পড়ে আছে। সামনে চাইতেই ছবির তরুণ-তরুণীর দলটি এগিয়ে এসে প্রশ্ন করলে, 'কি খুঁজছ?' বললাম, 'এইমাত্র এখানে একজন শিল্পীকে আঁকতে দেখেছিলাম, সে গেলো কোথায়?' তারা হেসে বললে, 'ওঃ শিল্পী হ্বাতোকে খুঁজছ? সে তো পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে।' শুনে বড় দুঃখিত হলাম। তরুণ-তরুণীরা আমার মনের ভাব বুঝে বললে, 'দুঃখ করো না, যদিও সে মাত্র সাঁইত্রিশ বছর মর্ত্যে থেকেছে, দান কিছু সে অপূর্ণ রেখে যায়নি। তার যাওয়াকে অকাল বলে যারা ক্ষুব্ধ হবে, আমরা নেচে গেয়ে তাদের দুঃখ ভুলিয়ে দেবো।' তারপর আমায় ঘিরে তারা নাচ আর গান আরম্ভ করে দিলো।

শহরে ফিরে দেখি, এইটুকু সময়ে ঘোর পরিবর্তন ঘটে গেছে। লোকগুলি অত্যন্ত মদ্যপ এবং প্রকাশ্যভাবে লাম্পট্য দেখিয়ে গর্ব প্রকাশ করছে। একটি প্রাসাদের অলিন্দে কয়েকটি কুভাবোদ্দীপক নগ্না নারীর ছবি ঝুলছিল। সেগুলির দিকে চোখ পড়তেই কে একজন আমার হাতে টান দিয়ে বলল, 'এ দিকে এস, তোমায় ভালো ছবি দেখাব। ঐ ছবিগুলি রঙে ও অঙ্কন-নৈপুণ্যে ভালো হলে কি হয়, যেমন হয়েছে লম্পট রাজা পঞ্চদশ লুই, তেমনি আঁকে তার শিল্পী বুশে।' লোকটির সঙ্গে একটি বাড়িতে গিয়ে দেখি, গৃহস্থের জীবনভিত্তিক কয়েকটি সাধারণ ঘটনাকে রূপ দিয়ে শিল্পী এক নতুন রসের সৃষ্টি করেছেন। লোকটি বলল, 'এর রচয়িতাকে বোধহয় চেন না। ইনি শার্দাঁ, সাধারণ ঘটনাবলীকে রঙে রসে উপভোগ্য করে তুলতে ইনি ফরাসী শিল্পীদের মধ্যে অদ্বিতীয়।' কয়েক জন ডাচ শিল্পী ছবিগুলির দিকে তাকিয়ে মৃদু হাসছিলেন।

ছবি দেখে একটি বড় বুলভার দিয়ে চলছি, এমন সময় ময়লা, ছেঁড়া পোশাক পরা রুক্ষ চেহারার অসংখ্য লোক লাঠির ডগায় কাস্তে, কুড়ুল ও নানা রকমের অস্ত্রফলক বেঁধে, বিকট চিৎকার ও হল্লা করতে করতে এগিয়ে আসতে লাগল। দলটিকে অতিক্রম করে একদিকে পালাতে গিয়ে, সামনে একটি বিরাট কাঠের ফ্রেমে ঝুলানো প্রকাণ্ড ধারালো ভারী অস্ত্রফলকের জৌলুসে চোখ ঝলসে গেলো। কয়েকটি লোক, রাজকীয় দর্শনধারী একজনকে ফ্রেমের মাঝে বেঁধে সজোরে অস্ত্র ফলকটি ফেলে দিলে। তার মুণ্ডটি ছিটকে পড়ল। মুণ্ড ও কাটা গলা থেকে বেগে

নির্গত রক্তস্রোতে লুটোপুটি খেয়ে, রক্তমাখা হাত ওপরে তুলে কয়েক জন চেঁচিয়ে উঠল, 'ভিভ্‌লা রেভলুসিয়ঁ।' সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ লক্ষ লোকের মধ্যে শবের রক্ত-মাখানো একফালি কাপড়ের জন্য কাড়াকাড়ি পড়ে গেলো, তাদের সমবেত চিৎকার বজ্রনাদকে অতিক্রম করে গেলো। ভিড় ঠেলে অপেক্ষাকৃত ফাঁকা জায়গায় এসে দেখি, একটি উঁচু মঞ্চের ওপর একটি লোক চিৎকার করে বলছে, 'গ্রীক এবং রোমানদের মতো বীর চাই, আমরা চাই সাধারণতন্ত্র।' তার সামনে গ্রীক, রোমানদের কাহিনী-বিষয়ক কয়েকটি ছবি ঝুলছিল। তারপর বিক্ষুব্ধ জনতার মাঝে, অস্ত্রের ঝন্‌ঝনানি, ঘোড়ার হ্রেষারব, মানুষের দৃপ্ত করুণ চিৎকারে সংজ্ঞা হারিয়ে ফেললাম। যখন জ্ঞান হলো, দেখি দিকে দিকে বিজয়োৎসবের ধুম পড়ে গেছে। একজনকে প্রশ্ন করলাম, 'এ কার বিজয়োৎসব?' সে অবাক হয়ে বললে, 'জানো না? সম্রাট নাপোলেয়ঁর। ঐ যে বিজয়ী সৈন্যদলের পুরোভাগে সাদা ঘোড়ায় তিনি আসছেন, নতজানু হয়ে সম্মান দেখাও।'

যে লোকটি একটু আগে ছবি দেখিয়ে চিৎকার করছিল সে দেখি একটি অট্টালিকার বিরাট বাতায়ন প্রান্তে দাঁড়িয়ে চিৎকার করছে, 'নাপোলেয়ঁ দীর্ঘজীবী হও।' লোকটি কে জানবার প্রবল ইচ্ছায় বাড়িটিতে ঢুকে পড়লাম। একটি প্রশস্ত ঘরে অনিন্দ্যসুন্দরী, বিদুষী মাদাম রেকামিয়ে-এর একখানি প্রতিকৃতির সামনে তাঁর কয়েক জন ভক্ত সেই জানালায় দেখা লোকটির সঙ্গে করমর্দন করে বলছিল, 'দাভি, তুমি এ যুগের সেরা শিল্পী। তোমার দানের সামনে শুধু আমরা নই, ভবিষ্যতের শিল্পীরাও, শ্রদ্ধাঞ্জলি দেবে।'

তারপর কেমন করে যে স্নেন নদীর ধারে এসে পড়লাম তা স্বপ্নই বলতে পারে। কয়েক জন লোক নদীতে ভাসমান একটি শবদেহ তুলে নিয়ে এল। মৃতের কয়েক জন বন্ধু শবদেহটি ফুলের স্তবকে আবৃত করে বললে, 'বন্ধু জঁা গ্র, তুমি সম্রাট নাপোলেয়ঁর সভাশিল্পীর সম্মান পেয়েও সন্তুষ্ট হতে পারলে না। তোমার শিক্ষাগুরু দাভির ক্লাসিক শিল্পধারা তোমাকে আচ্ছন্ন করতে পারেনি, কারণ তুমি যুদ্ধ-বিগ্রহের মাঝ থেকে বাস্তব জীবনের প্রতিরূপ দিয়েছ। তোমার রোমান্টিসিজম ছেড়ে ক্লাসি-জম-এর ব্যর্থ প্রচেষ্টাকে তরুণ শিল্পী-সম্প্রদায় ব্যঙ্গ করেছে বলে তুমি কেন এভাবে আত্মহত্যা করলে বন্ধু!' তাদের ঐ শোকসভায় আমার থাকাটা অশোভন দেখাচ্ছিল, তাই সরে এলাম।

এ সব বাস্তব দৃশ্য ছেড়ে দেখি লুভ্‌র-এর রোমান্টিক ও রিয়েলিষ্ট গ্যালারীর মধ্যে চলে গেছি। আঁগ্র্‌-এর আঁকা জলকলস-ধৃতা নিষ্পাপনগ্না লা স্যুরস্‌ ও স্নানার্থিণীর লাবণ্যময়ী মূর্তির প্রতি বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে চেয়ে আছি। পাশে জেরিকোর অঙ্কিত বিশাল তরঙ্গে ভাসমান মেদুসা ভেলায় নিমজ্জিত জাহাজের মৃত ও মৃতপ্রায় আরোহীদের বিবর্ণ পাণ্ডুর দেহ আবছায়া আলোয় ভয়াবহ দেখাচ্ছিল। দ্যলাক্রোয়ার আঁকা সিয়োর হত্যাকাণ্ড ছবিটিতে আহতের গোঙানী, রক্তস্রোত, অশ্বের হ্রেষারবে

বিক্ষুব্ধচিত্ত হয়ে আবার গ্যালারীর বাইরে চলে গেলাম। সন্ধ্যার আবছায়া অন্ধকারে স্থেন নদীর ধার দিয়ে চলতে —শাখা দিয়ে জল ছুঁতে ব্যগ্র গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে অস্পষ্ট দৃশ্যমান সেতু যেন একখানি নিসর্গ চিত্রের মতো দেখাচ্ছিল। দারুণ ক্ষুধার্ত, তৃষ্ণার্ত হয়েএকটি রেস্তরাঁতে গিয়ে পরিবেষিকাকে খাবার দিতে অনুরোধ করলাম। পরিবেষিকার সচকিত চিৎকারে চমকে দেখি তার হাত থেকে একটি সদ্য-কাটা মানুষের কান মাটিতে গড়াগড়ি যাচ্ছে, আর সে একটি চিঠি হাতে থরথর করে কাঁপছে। চিঠির লেখাটি রক্তাক্ত হরফে আমার সামনে জ্বলতে লাগল। 'শেরি তোমায় আমি অন্য কিছু দিতে পারি না বলে তুমি আমার কান চেয়েছিলে। তাই ক্রিষ্টমাসের উপহার-স্বরূপ, তোমার প্রার্থিত আমার একটি কান পাঠালাম। আশা করি, আমার এ দীন উপহার তোমায় খুশী করবে। ইতি —ভ্যান্‌গঘ।' পরিবেষিকা আর্তস্বরে বললে, 'কি ভয়ানক লোক সে! রহস্যকে এমন সত্যভাবে নিলে! আর নিজের কান নিজে কাটলে! উঃ, শিল্পী জাতটাই অদ্ভুত!' কানে ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা ভ্যান্‌গঘ দেখি তার দিকে অর্থহীন দৃষ্টিতে তাকিয়ে নীরবে পাইপ টানছেন। একটা গুলি ছোড়ার প্রচণ্ড শব্দে ভ্যান্‌গঘের মূর্তি অন্তর্হিত হলো, চোখে পড়ল গুলিবিদ্ধ শিল্পীর দেহ ঘাসের ওপর পড়ে, শেষ একবার হাত পা ছুঁড়ে নিস্পন্দ হয়ে গেলো। ঘুম এবার পাতলা হয়ে এসেছে, আধোজাগ্রত অবস্থায় এক ভোজ-সভার মাঝে স্বপ্ন আমায় পৌছে দিলো। শিল্পী ম্যনে, পিসারো, রোনোয়া এবং আরও অনেকে সেজানের শিল্প-শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করে তাঁকে অভিনন্দন দিতে এই ভোজের আয়োজন করেছেন বলে শুনলাম। সেজান পৌছানোর পর ম্যনে তাঁকে অভিনন্দিত করে বক্তৃতা করলেন। সাশ্রুনেত্রে মাথা নত করে সেজান শুনে গেলেন। ম্যনের কথা শেষ হওয়া মাত্র সেজান উঠে বললেন, 'ম্যনে, তুমিও আমায় বিদ্রূপ করে সকলের কাছে হাস্যাস্পদ করলে!' তারপর সবেগে সভা থেকে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গে অনেকে হতবাক হয়ে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে গেলেন। কিন্তু কেউ তাঁকে বোঝাতে পারলেন না যে, তাঁর যোগ্যতা ও শ্রেষ্ঠত্ব উপলব্ধি করে অকৃত্রিমভাবে এই প্রশংসাপত্র পাঠ করা হয়েছে। ক্ষুব্ধ ম্যনে শুধু বললেন, 'এত বড় শিল্পীকে কেউ আদর দিলে না, বুঝলে না। তাঁর এ ভ্রম স্বাভাবিক যে, তাঁকে প্রশংসা করা বিদ্রূপেরই নামান্তর। এ ভ্রমের পিছনে তাঁর সারা জীবনলব্ধ যে পুঞ্জীভূত অবহেলা, অসম্মান, অপমানের বোঝা আছে, তাকে এক মুহূর্তের দুটি মিষ্টি কথায় ভুলিয়ে দিতে যাওয়াই আমাদের ভুল।'

দারুণ ঠাণ্ডা বাতাসের এক হিল্লোল এসে আমার গায়ে যেন শত ছুরিকাঘাত করল। ঘুম ভেঙে গেলো। হোটেলকর্ত্রী স্বয়ং এসে আমার ঘরের জানালা খুলে পর্দা সরিয়ে দিচ্ছিলেন। আমায় জাগ্রত দেখে বললেন, "দরজায় অনেক ধাক্কা দিয়ে তোমার সাড়া না পেয়ে ঢুকেছি, এর জন্য মাপ চাচ্ছি; কিন্তু তুমি কি অসুস্থ? দশটা বাজে, আজ স্টুডিয়োতে যাবে না?"

বললাম, "সুপ্রভাত মাদাম্, আমি সুস্থই আছি কেবল কাল রাতে আমার মস্তিষ্কে কিছু গোলযোগ ঘটেছিল।"

দক্ষিণ ফ্রান্সে কয়েক দিন

প্রাতরুত্থান কথাটি ইয়োরোপে এসে ভুললেও কাল রাতে কথাটি বারবার মনে করে শুতে হয়েছে। শীতের প্রভাত যেন ওত পেতে বসে আছে, কেউ লেপের বাইরে এলেই তার চোখে, মুখে, শরীরে ঠাণ্ডা ফুঁ দিয়ে অসাড় করে দেবে। সাতটায় এক প্রিয় বন্ধুকে বিদায় জানাতে যেতে হবে —'গার্ দ্যু নর'-এ। পাঁচ মাসের আলাপ, মনে হয় পাঁচ যুগের সংযোগ! বিদেশে কেউ মনের মানুষ হলে এমনি হয়ে থাকে। হঠাৎ প্রীতি এত গভীর হয়ে পড়ে যে, পুরনো না হলেও আলাপের প্রথম দিন এবং ঘটনা পর্যন্ত ভুলে যাই।

রাস্তায়, বাড়ির জানালার ওপর, নীচের আলসেতে, ছাদের কার্নিসে রাতের পড়া তুষারের সাদা স্তূপ জমা হয়ে আছে। একটু কুয়াসাও ছিল, তবে লণ্ডনের মতো জমাট কালো নয়। গত রাতের চাঁদের আলো সারা রাত জেগে পাণ্ডুর হয়ে পথের ওপর পড়ে যেন ঝিমোচ্ছে।

স্টেশনে পৌঁছাতে বন্ধু একগাল হেসে বললেন, "তবু ভালো যে এসেছ। এই শীতে সকালে সুখশয্যা ছেড়ে যে তুমি আসবে, ভাবতেই পারিনি।"

ঠিক বিদায়ের আগে মামুলী কথাবার্তার বর্ষণে বিচ্ছেদের ব্যথাকে ঢাকবার চেষ্টা চলছিল। কিন্তু অভিনয়কে বেশী দীর্ঘ করতে হলো না। ট্রেন ছাড়ল বলে। বন্ধু সচাপ করমর্দন করে বললেন, "খবরদার কর, দুঃখ করা চলবে না। তোমার সঙ্গে আর হয়ত কোনোদিন দেখা হবে না। কিন্তু যে ক'মাস আমরা পরস্পরের সাহচর্য পেয়েছি, তার আনন্দময় মুহূর্তগুলি স্মৃতির খাতায় জমা রইল, তাকে ব্যথা দিয়ে ভেঙেচুরে মুছে দিও না! আচ্ছা বিদায়।"

আজ আর স্টুডিয়োতে যাবার ইচ্ছে নেই। মন থেকে হঠাৎ সব চিন্তা যেন ফুরিয়ে গেছে। আজ আগ্রহ স্পৃহা কেবল আভিধানিক শব্দ মাত্র। দরজায় মৃদু করাঘাত হঠাৎ অবচেতন ভাবকে ভেঙে দিলো। নিতান্ত নিস্পৃহভাবে বললাম, "আঁত্রে (প্রবেশ করুন)।"

"কেমন আছেন"—বলেই 'ন' মশায় ঢুকে পড়লেন। এত সকালে 'ন' আগমনে বুঝলাম সংবাদ আছে। বললেন, "মশায় দক্ষিণ ফ্রান্সে চলুন, ভূমধ্য-সাগরের তীরে সোনালী রোদ আর মলয় বাতাস শরীরটাকে চাঙ্গা করে তুলবে।"

অতি উত্তম প্রস্তাব, কিন্তু মা লক্ষ্মীর খাতায় অঙ্কের পরিমাণে শাঁসগুলি ঝরে শীর্ণ হাড় কয়টি পেটে ধর্মঘট চালাবার ষড়যন্ত্র শুরু করেছে। এ অবস্থায় যাওয়া কি

সমীচীন! কিন্তু 'ন'-এর সনির্বন্ধ অনুরোধ এবং ফরাসী রিভিয়েরার বহুশ্রুত সৌন্দর্য শেষ পর্যন্ত আমায় উদ্যোগী করে তুললে।

'ন' মশাই ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিত। ফরাসী আল্‌প্‌স মারিতিম-এর প্রত্যেকটি বালুকণা ও প্রস্তরখণ্ড তাঁকে চেনে। পাহাড়ের অনেক স্থানই তাঁর সকণ্টক বুট ও হাতুড়ীর ঘায় আর্তনাদ করেছে। তাদের বুকের ক্ষত আজও মিলায়নি। কিন্তু তারা এবার প্রতিশোধ নেবে। এরই পার থেকে 'ন' এক প্রিয়জনের বিদায়সম্ভাষণ জানাতে চলেছেন। ভাবলাম, বন্ধু-বিদায়ের 'এপিডেমিক' শুরু হলো না-কি! আমাদের যাবার অবশ্য আর একটি বড় কারণ ছিল। একজন বাঙালী ছাত্র—'কুণ্ডু', রোগাক্রান্ত হয়ে কান্‌-এর এক নার্সিং হোমে পড়ে আছে। তার মেরুদণ্ডে ক্ষয় রোগ বাসা বেঁধেছে। তার শেষ ইচ্ছা যদি তাকে দেশে পাঠানো সম্ভব হয় তো তার ব্যবস্থা করা।

রাত সাড়ে আটটা হবে। স্টেশনে শীত করছিল। দুটি কম্বল ও বালিস ভাড়া নিয়ে আমরা তৃতীয় শ্রেণীর একটি কামরা দখল করে বসলাম। জানালার ধারে মুখোমুখি আসন দুটিতে রিজার্ভড কার্ড ঝুলছিল। 'ন' বললেন, "দেখুন আবার কোন অকথ্য লোক হয়ত ঐ আসনের মালিক।"

একটু ঠাট্টা করে বললাম, "অত হতাশ হবেন না, আমি দিব্যচক্ষে দেখছি আপনার পাশের আসনে একটি অবিগতযৌবনা এবং আমার পাশের আসনে একটি উদ্ভিন্নযৌবনার শুভাগমন হবে" —রসিকতা দেখি সত্যে পরিণত হলো। কাশতে কাশতে বছর ত্রিশের একটি ফরাসী মেয়ে 'ন'-এর পাশের আসনে এসে বসল। গাড়ী ছাড়বার কয়েক মুহূর্ত আগে একটি অল্পবয়স্কা জার্মান মেয়ে ব্যস্তসমস্তভাবে গাড়ীতে উঠে জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে 'আউফ ভিদার-জেয়েন' চিৎকার করে বিদায়-সম্ভাষণ শুরু করে দিলে।

গাড়ী ছাড়তে তার গতিবেগ বৃদ্ধির সঙ্গে ফরাসী মহিলাটির কাশির বেগও বেড়ে চলল। আবছায়া আলো হলেও বেশ দেখা যাচ্ছিল বিপরীত কোণে 'ন'-এর কুকুর-কুণ্ডলী হয়ে ছোঁয়াচ বাঁচাবার আপ্রাণ চেষ্টা। একবার বললেন, "টি. বি. রুগী নয় তো!" জার্মান মেয়েটি হঠাৎ উঠে নিজের কতকগুলি কাপড় ভাঁজ করে অতিশয় আদরে ও সন্তর্পণে ফরাসী মহিলাটির মাথার তলায় দিয়ে কি সব বকতে লাগল। ভাবলাম, তারা বুঝি বন্ধু। কিন্তু পরে বোঝা গেলো, তারা কেউ কাউকে চেনে না, পরস্পরের ভাষাও বোঝে না। বেশ লাগল তার বিদেশী প্রীতিটুকু।

রেডিয়েটার কামরাটাকে বড় গরম করে তুলেছে। 'ন' এবং আমি বালিস দুটো ওদের দান করে জড়ো করা কম্বলে মাথা রেখে ঝিমোচ্ছি। জার্মান মেয়েটা রাক্ষস না-কি! সমস্ত ক্ষণ খেয়েই চলেছে। কি খেয়াল হলো, আমাদের দিকে একটি লেবু এগিয়ে দিয়ে বললে, "নাও।" 'ন' সেটি ধন্যবাদ সহকারে প্রত্যাখ্যান করতে চাইলে, সে সেটি জোর করে আমাদের গছিয়ে দিয়ে খুব হেসে উঠল, যেন কি

একটা মজার ব্যাপার হয়েছে। ভোরের দিকে 'ন' মশায় তার সঙ্গে ভাঙা জার্মানে বেশ আলাপ জমিয়ে তুললেন। আমাকে অবশ্য মাঝে মাঝে তর্জমা করে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন। মেয়েটি বিতাড়িত জার্মান ইহুদী, নাম সেসিলিয়া, বাড়ি —ভিয়েনায়। সে এবং তার ভাই হিট্লারের চরদের চোখে ধুলো দিয়ে অতি কষ্টে পালিয়ে এসেছে। ফরাসী মেয়েটির সঙ্গে আলাপে জানা গেলো সে নর্তকী ও গায়িকা, কান্-এর কোনো উৎসব-মন্দিরের আহ্বানে চলেছে। তার কাশি বন্ধ হয়েছে দেখে একটু গানের ফরমাশ করা গেলো। মার্সাইতে ফিরবার পথে দেখা করবার, বিশেষ অনুরোধ করে সেসিলিয়া নেমে গেলো।

এতক্ষণ বাইরে লক্ষ্য করিনি। দক্ষিণ ফ্রান্সের মাটিতে আমরা এসে গেছি, লাল পাহাড়ের গায় ঘন সবুজ বনানীর ওপর সোনালী মিমোসা ফুলের তোড়া দেখে মনে হচ্ছিল যেন মুক্ত-প্রাঙ্গণে কয়েকটি কার্পেট সাজানো রয়েছে। যে দিকেই তাকাই, ফুল-ফোটা প্রকৃতি চোখের চাহনীতে ইসারা করছে, 'এস বসবে?' মাঝে মাঝে বেশ বিস্তৃত শ্বেতশুভ্র চেরী ফুলের রাশি, জমা তুষারের একটি বড় বরফির মতো দেখাচ্ছিল। ঈষদুষ্ণ বাতাস পারীর শীতে-জমা হাড়গুলিকে একটু সজীব সচল করে তুললে। নানা রকমের প্রস্তরস্তূপের বিচিত্র লীলাভঙ্গ দেখে ন'কে দু'একটা প্রশ্ন করতেই তিনি আমায় চমৎকার করে বলতে লাগলেন, পৃথিবী কেমন করে তার শরীরের এক জায়গায় মেদ-চর্বিবহুল স্থূল করে তোলে, আবার খেয়াল হলে সেখানেই মাংস সরিয়ে লোলচর্ম হাড় বের করে, কখনও বা লাভা বমন করে রুক্ষ মেজাজে ভয় দেখায়।

আমরা কান্-এ এসে গেছি। যার জন্য এত দূর আসা তিনি আমাদের দেখেই প্ল্যাটফরমে হাতনাড়া শুরু করে দিলেন। জিনিসপত্র ক্লোক-রুমে জমা রেখে কাফেতে সামান্য জলযোগ সেরেই আমরা তাড়াতাড়ি নার্সিংহোমে রওনা হলাম, কারণ শুনলাম কুণ্ডুর অবস্থা খারাপ। নার্সিংহোমের সাদা দেওয়াল, দরজা, পর্দা সবই যেন বিয়োগান্ত যবনিকা। সব এত চুপচাপ যে সুস্থ মানুষকে ক্ষণকালের মধ্যে অসুস্থ করে তোলে। হোমের কর্ত্রীর সঙ্গে লিফ্‌টে চারতলায় উঠলে তিনি নীরবে কুণ্ডুর কামরাটি সঙ্কেতে দেখালেন। একটি লোহার খাটে কুণ্ডুর সমস্ত শরীর 'মমি'র মতো প্লাস্টার ও ব্যাণ্ডেজে বাঁধা। মুখটার একাংশ পক্ষাঘাতে বেঁকে গেছে, মাথার ব্যাণ্ডেজের সঙ্গে বাঁধা একটি প্রকাণ্ড ওজন খাটের পাশে ঝোলানো। মনে হচ্ছিল বাস্তি-র কারানরকে নির্মম সাজার দৃশ্য।

আমাদের দেখেই কুণ্ডু কেঁদে উঠল, 'বাঁচাও ভাই, আমাকে বাঁচাও। তোমাদের কাছে আমার শেষ ভিক্ষে আমায় বাঁচাও। এখানকার নিসঙ্গতা আমায় পাগল করে তুলেছে। ভূমধ্যসাগরের অবিরাম ফোঁস্‌ফোঁসানি শুনে আমার মনে হয় চার-পাশে কারা যেন বুকফাটা নিশ্বাস ফেলে আমার শেষ নিশ্বাসের অপেক্ষা করছে। আমি এ সহ্য করতে পারছি না, ভয় করছে। নিয়ে যাও আমায় ভাই এখান থেকে

সরিয়ে, আমি দেশের মাটিতে মরতে চাই। দেশে না হলেও, পারীতে অন্তত তোমাদের সামনে মরব।' তার দু'চোখের জল আর বাঁধ মানছিল না। বাঁচবার জন্য মুমূর্ষুর কি আকাঙ্ক্ষা! এই কুণ্ডুই কয়েক মাস আগে বলেছিল —'অভাগা দেশে আর ফিরব না। যদি মরি তো এই দেশেই মরব।' হায়! বেচারী তখন কি জানত যে সত্যিই তার দেহ ফ্রান্সের মাটিতে শেষ আশ্রয় পাবে। 'ন' কুণ্ডুকে কতকগুলি অক্ষম প্রবোধ, প্রতিশ্রুতি দিয়ে বললেন, 'আমরা কাল নিস্-এ যাচ্ছি, সেখান থেকে আপনাকে অবিলম্বে দেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে জানাব।'

নিস্-এ রাতে পৌঁছে পথশ্রমে বড় ক্লান্ত হয়ে পড়েছি; ভীষণ ক্ষিদেও পেয়েছে। যেমন করে নিস্কে অভিনন্দন জানাবার কবিত্ব মনে মনে করে রেখেছিলাম, তা কোথায় হারিয়ে গেলো। বসন্তোৎসবের যাত্রীরা নিস্ ভরিয়ে ফেলেছে, কোথাও স্থান পাই না। অনেক ঘুরে শেষে একটি হোটেলে মাথা বাঁচাবার স্থান জুটল।

সকাল হয়েছে। এক টুক্‌রো ঝরঝরে নীল আকাশ, স্নিগ্ধ বাতাসের দু'একটি হিল্লোল, আর সোনালী রোদের একফালি জানালার পর্দার পাশ থেকে হাতছানি দিয়ে বলল, 'সুপ্রভাত।' রাস্তায় বেরিয়ে দেখি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন নগরীটিতে আসন্ন উৎসব-সজ্জার ধুম পড়ে গেছে। বড়, সোজা বুলভারগুলিতে ব্যস্তসমস্ত যানবাহনের ভিড় নেই। যানবাহন, পথচারী সবই কোনো শোভাযাত্রার শেষ দলের শেষাংশটির মতো সার বেঁধে ধীরে ধীরে চলেছে। বসন্ত আবাহন উৎসবের গৌরচন্দ্রিকায় বর্ষিত কুসুম দল রাস্তায় ঘাটে সর্বত্র পড়েছিল। রাস্তার মাঝে মাঝে আলোর মালায় সাজানো তোরণ। সেগুলিকে আলোক-উৎসবের রাত্রিতে জ্বালিয়ে দেওয়া হবে।

পরের দিন সকালে 'বাতাই দ্য ফ্লোর' (পুষ্পরণ) উৎসব শুরু হলো। প্রচুর ফুলে নানাভাবে সাজানো গাড়িগুলিতে সুন্দরী তরুণীরা, রাস্তার দু'পাশে ভিড়-করা পুরুষদের, ফুলের তোড়ার প্রহারে জর্জরিত করে চলছিল, আর পুরুষরাও তাদের ফুলের ডালি তরুণীদের গায়ে উজাড় করে দিতে কসুর করছিল না।

আর একদিন বড় বড় মুখোশ পরে সং-এর শোভাযাত্রা হলো। ফ্রান্সে বহু প্রাচীন উৎসবগুলি আজ সভ্যতার প্রগতি ও বিজ্ঞানের অগ্রগতির চাপে কমে যায়নি। জাতটা যে খেয়ালী, কলারসিক তার প্রমাণ পাওয়া যায় —প্রাণঢালা নাচে, গানে, হাসিতে, কথায়, বেশভূষায়। ভূমধ্যসাগরের বেলাভূমির প্রায় ওপরেই উঁচু বাঁধানো রাস্তাটি বড় চমৎকার। অনেকে বেলায় রৌদ্রস্নান করছে। আমরা টমাস কুকের অফিসে গিয়ে কুণ্ডুকে দেশে পাঠানো সম্বন্ধে খোঁজখবর নিয়ে শহরটার ধারে একটি পাহাড়ে উঠলাম। তাসের ঘরের মতো দৃশ্যমান বাড়ির ছাদগুলি রোদে ঝল্‌মল করছিল। দূরে আল্‌পসের তুষারাবৃত চূড়া দেখা গেলো। নামবার সময় দেখলাম, একজন জেলে তার জাল ঠিক করছে, তার নিকটে ধীবরপত্নী তার ছেলে এবং মেয়েটিকে আদর করছে। বেশ লাগল এ দৃশ্যটি। তাদের অজ্ঞাতে একটি ছবি তুলে নেওয়া গেলো।

পরদিন বিকেলে শারাবাঙ্কে মন্তেকার্লো শহরে গেলাম। শহরটির যত প্রশংসাই থাক, ধনীর অর্থগরিমা উচ্ছ্বাসের তুচ্ছ সমাবেশ ছাড়া আর কিছুই উল্লেখ করবার নেই। চমৎকার কেয়ারী-করা ফুলের বাগান, ফরাসিনীর চোখে সুর্মা, গালে, ঠোঁটে রঙ মাখিয়ে বেশী সুন্দরী হবার মতো কৃত্রিম শোভার কাষ্ঠ-হাসিতে মন ভোলাতে পারেনি। শহরটির আকর্ষণ সৌন্দর্যের নয় —জুয়ার আড্ডার।

'ন' বন্ধু-বিদায় পর্ব শেষ করে একটু মুহ্যমান হয়ে পড়লেন। দক্ষিণ ফ্রান্সের সৌন্দর্য তাঁর বিচ্ছেদব্যথাকে ভোলাতে পারছে না দেখে ঠিক করলাম নিস্-এর কাছে বিদায় নেব।

আবার কান্-এ এসেছি। বসন্তকে নিয়ে এখানেও মাতামাতি পড়ে গেছে। মিমোসা সুন্দরীকে আজ অভিনন্দিত করা হবে। বাড়ির প্রবেশপথে, রাস্তার তোরণে রাশিরাশি মিমোসা পুষ্পস্তবক মৃদু বাতাসে দোল খাচ্ছে। একটি তরুণীকে মিমোসা ফুলের সাজে সাজিয়ে শোভাযাত্রা বেরবে। কুণ্ণুর ভাবনা-পীড়িত মনে আমরা ঋতুরাজকে পূজার অক্ষমতা জানিয়ে বললাম, 'অরভোয়ার।'

আর দেরি নয়, সময় অতি অল্প। এর মধ্যে আমাদের একবার গ্রাস্-এর কাছে দাল্‌কোতায় যেতে হবে। আমায় ভেজলে থেকে মঁ্যসিয়ো রমঁ্যা রলাঁ চিঠিতে যে সকল শিল্পীর ঠিকানা দিয়ে দেখা করতে বলেছিলেন, দাল্‌কোতার মাদাম্ আঁদ্রে কার্পেলেস তাঁদের একজন। ইনি কিছুকাল ভারতে ছিলেন। বাস-এ করে 'ন' ও আমি রওনা হলাম। পুষ্পিত বৃক্ষ-লতা-গুল্মগুলি যেন চারদিকের পর্বত তরঙ্গের ওপর ভাসমান শুক্তি, শঙ্খ, প্রবালের মেলা। মহাকবির বর্ণিত—

> পর্য্যাপ্তপুষ্পস্তবকস্তনাভ্যঃ স্ফুরৎ-প্রবালোষ্ঠ-মনোহরাভ্যঃ।
> লতাবধূভ্যস্তরবোঽপ্যবাপুর্বিনম্রশাখাভুজবন্ধনানি ॥

একে বাস্তবে এমন করে মূর্ত কোনোদিন দেখিনি।

একটি স্থানে ন'য়ের নির্দেশানুসারে বাস থেকে নেমে দাঁড়ানো হলো। একটু পরেই স্বামীসহ মাদাম্ কার্পেলেস হাজির হলেন। তাঁদের গাড়ীতে আর কয়েক কিলোমিটার যেতে হলো। হ্যাঁ, কবি-শিল্পীর খেয়াল বটে! আল্প্‌স মারিতিমের পাণ্ডব-বর্জিত বেওয়ারিশ জমির ওপর তাঁদের নিরাভিমানী কুটিরটি। মাদামের স্বামী সুইডেন-বাসী এবং পণ্ডিত লোক। দু'জনে বই লেখেন, খেয়াল হলে মাদাম্ ছবি আঁকেন, তখন তাঁর স্বামীর কাজ —সেটি কেমন হচ্ছে দেখা ও তারিফ করা।

চায়ের টেবিলে মাদাম্ বললেন, "কর, তোমাদের শিল্পান্দোলনের খবর কি?"

বললাম, "খবর মন্দ নয়। নব্যবঙ্গীয় শিল্পীকুল রেখার খেলায় এবং ভাবের গভীর উন্মাদনায় মেতে গেছেন। আপনাদের 'ইজম'-এর অপরিষ্কার ছিটেফোঁটা তার ওপর সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কয়েকটি শিল্পীর মধ্যে যে রসের সৃষ্টি করেছে তা প্রায় নেমিসিসের পাত্র ভরে দেবার মতো। তবে আশা এই, শিল্পীরা ঐ অবস্থাতেই চুপ করে বসে থাকবে না, তার প্রমাণও কিছু পাওয়া গেছে।"

অবনীন্দ্রনাথের দু'একটি শিল্পবিষয়ক বই মাদাম্ ফরাসীতে অনুবাদ করেছেন। বললাম, "অবনীন্দ্রনাথের বই পুরাতাত্ত্বিককে আনন্দ দেবে, পুরাতনের পুনরাবৃত্তিতে শিল্পীদের সাহায্য করবে, কিন্তু ভবিষ্য-শিল্পী, যারা নতুন কথায় শিল্পের নব ব্যাখ্যা করবে, তাঁর বই তাদের নব শিল্প-মন্দিরের একটি ধাপেও উঠিয়ে দিতে সক্ষম হবে না। তবে ইতিহাস হিসেবে এগুলিকে আমি অসম্মান করছি না।"

এ বার ফিরতি পথে মার্সাইতে নেমে সেসিলিয়ার খোঁজ পাওয়া গেলো। তার ভাই ও মঁ্যসিয়ো পোলাক বলে আর একটি অষ্ট্রীয়ান ইহুদী ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হলো। মঃ. পোলাক খানিক পিয়ানো বাজিয়ে আমাদের শোনালেন। তিনি ইয়োরোপের সেরা সঙ্গীতের দেশের লোক, তার পরিচয় প্রত্যেক সজীব সুর-তরঙ্গে ফুটে উঠেছিল। কিন্তু সুরের মূর্চ্ছনায় বিতাড়িতের বেদনাও ছিল প্রচুর। সন্ধ্যায় মার্সাই-এর বিখ্যাত গীর্জা —নোতর্‌দাম দ্য লা গার্দ্-এর উচ্চ অবস্থানটিতে সকলে মিলে বেড়ানো হলো। আবার বিদায়।

সেই পুরাতন পারী। দু'দিনের জমা গায়ের উত্তাপ শীতের ফুৎকারে আবার নিভে গেলো। নৈমিত্তিক কাজের ফাঁকে কাফের কোণে বসে কফি ও সময়ের সদ্ব্যবহারে ক'দিনের ঘটনাগুলি স্মৃতির অস্পষ্ট রেখায় মিলিয়ে যেতে লাগল।

মাঝে সেসিলিয়ার দুটি বান্ধবী সহ আমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। অনেক কথার পর তারা বললে, "মঁ্যসিয়ো কর, আপনার খেলা দেখাচ্ছেন কবে?"

"মানে"? আমি তো হতবাক!

বললে, "কেন, আপনার ট্রাপিজের খেলা? আপনি তো সার্কাসের আর্টিষ্ট।" ওঃ এতক্ষণে বোঝা গেলো, 'ন' মশাই-এর জার্মানী আলাপের সেসিলিয়া টীকা করেছে চমৎকার। আমি কোন শ্রেণীর শিল্পী বলার পর, ট্রাপিজের খেলা না দেখতে পেয়ে তারা বড় মনঃক্ষুণ্ণ হয়েছিল।

কাফেতে বসে আছি, গল্প জমেছে বেশ। ক্লান্ত অবসন্ন পা ফেলে শ্লথ শরীরে 'ন' প্রবেশ করলেন। তাঁর প্রথম কথা, "শুনেছেন কুণ্ডু মারা গেছে?" সব গোলমাল ঐ ক'টি কথায় চুপ হয়ে গেলো। 'ন' বললেন, "তাকে কবর দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ভারী অন্যায় মশায়, হিন্দুর ছেলেকে শেষে কবর দিলে!" বললাম, "মরার পর পোড়ানো আর কবরে কি এসে যায় মশাই!" আর কোনো কথা হলো না। কিন্তু আমার কানে তখন প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল কুণ্ডুর শেষ কথা কয়টি, 'বাঁচাও ভাই আমাকে বাঁচাও, তোমাদের কাছে আমার শেষ ভিক্ষা ···আমি দেশের মাটিতে মরতে চাই।'

কবরে শুয়ে সাগরের ফোঁস্‌ফোসানির ভীতি থেকে কুণ্ডু পরিত্রাণ পেয়েছে কি-না কে জানে!

বোলে

সূর্যাতঙ্কে আলো নিভিয়ে পারী যেন রূপকথার রাজধানীর মতো স্বপ্নময় হয়েছে। প্লাস সাঁমিশেল স্যেন নদীর ধারে দাঁড়িয়ে আঁধারের পটভূমিতে অস্পষ্ট নোতরদাম গীর্জা দেখে মনে হচ্ছিল, যেন কত ছায়াময় মূর্তি, প্রাঙ্গণে, প্রকোষ্ঠে, স্তম্ভগুলির আড়ালে, খিলানের কুক্ষিতে ঘোরাফেরা করছে। ঘণ্টাবাদক কুব্জটি যেন গীর্জার চূড়ামণ্ডপের কীর্তিমুখের ছিদ্র দিয়ে নীচের লোকগুলিকে দেখছে। কি উদ্ভট কল্পনা! রাতের পারী কত যুগ-যুগান্তের কাহিনী চিন্তা দিয়ে লোককে ভাবুক, পাগল করে তোলে। নদীর সেতুর ওপর দিয়ে যে যানগুলি গমনাগমন করছে তারা যেন দিনের বেলার সময় ও গতির প্রতিযোগী বিংশ শতাব্দীর বাস বা ট্যাক্সী নয়, আট ঘোড়ায় টানা গোবলঁ্যা কার্পেটে-মোড়া গাড়ী। এরই একটিতে হয়ত মাদাম পম্পাদুর বা 'নানা' বসে। পথচারীর দলগুলিতে উচ্চরব আর হস্ত আস্ফালন দেখে মনে হচ্ছিল তারা যেন লা সিতেতে কারও গিলোটিন দেখে তারই উত্তেজিত বর্ণনা ও আলোচনা করছে। অন্ধকার রাতে নির্বাপিত দীপ —পারী যেন বিংশ শতাব্দীর আধুনিক চুণ-বালির আস্তর ফেলে পুরনো সপ্তদশ শতকে ফিরে গেছে।

একটি চেনা গলি দিয়ে যাচ্ছিলাম। গলিটি চেনা হলে কি হয়, যখনই এ পথে পা দিই, গলিটি অচেনা হয়ে ভয় দেখায়। এই বুঝি গা ঢাকা দিয়ে কে একজন সাঁ করে পাশ দিয়ে চলে গেলো। হাতে তার কি একটা চক্‌চক করছিল না! একটি কাঠের দরজায় খড়ি আর কাঠকয়লা দিয়ে কি ভয়ানক আর নোংরা ছবি আঁকা। কোনো দুষ্টু ছেলের কাজ বোধহয়। কিন্তু বাড়িওয়ালা, পাড়ার লোক এগুলি মুছে দেয় না কেন? জিজ্ঞাসা করলে হয়ত বলে বসবে, 'এ দাগ পাঁচ শতাব্দীর রোদ জল খেয়ে পাকা হয়ে গেছে, কিছুতেই আর তোলা যাবে না। কে একজন দরজা খুলে বাইরে এল —সঙ্গে সঙ্গে চোখে পড়ল উজ্জ্বল আলোকিত একটি কাউন্টার, আর তার সামনে উঁচু টুলে কয়েকটি মেয়ে-পুরুষ পানপাত্র নাড়াচাড়া করছে। একটা ভ্যাপসা গন্ধ ভিতর থেকে বেরিয়ে নিশ্বাসটাকে বন্ধ করে দেবার যোগাড় করলে। এটি একটি বিশেষ কাফে অর্থাৎ নৈশ পানাগার। এই পানাগারটির পিছনে অনেক ইতিহাস আছে বলে ট্যুরিষ্ট কোম্পানীর পরিদর্শকেরা পর্যটকদের এখানে প্রায়ই নিয়ে আসেন। আমি বন্ধু 'ন'-র আমন্ত্রণে এখানে এসেছিলাম।

কৌতূহল নিয়ে ভিতরে প্রবিষ্ট হলাম। কিন্তু ঢুকেই সামনে যা দেখলাম তাতে আত্মার যে অস্তিত্ব আছে তার প্রকট প্রমাণ পেলাম, কারণ তিনি দেহকে ছাড়তে চাইছিলেন। একটি কঙ্কাল, তার চক্ষু কোটরগত ও বিকাশিত দন্তমুখ-গহ্বরে লাল বাতি জ্বলজ্বল করে জ্বলছিল —আর মাথার ওপর একটি বৃহৎ পাখীর কঙ্কাল। তার চঞ্চুটি ঠিক আমার ব্রহ্মতালুকে লক্ষ্য করে ঝুলছিল। ঘরে যথেষ্ট আলো

থাকলেও ধোঁয়ায় কিছু ভালো দেখা যাচ্ছিল না। একটা গলা-চেরা হাসি উঠল, তারপর হাহা হোহো হিহি খকৃখক! বাপরে, ভুশুণ্ডীর মাঠে তালবেতালের সভায় এসে পড়লাম না-কি! অন্ধকার থেকে আলোয় হঠাৎ আসায় সাময়িক অন্ধ হয়েছিলাম। চোখে আলো যখন সয়ে গেলো সঙ্গে সঙ্গে দেখলাম —তালবেতালের দলটি সভ্য নরনারীতে পরিণত, তখন অপ্রস্তুতের একশেষ। 'ন' আমার আগেই এখানে এসে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি আমাকে তাঁর এক বান্ধবীর সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বুঝতে পারছিলাম না, কেন কাফেটিকে এত ভুতুড়ে করে রেখেছে। দেওয়ালে অসংখ্য প্যাষ্টেলে আঁকা মুখ। তাদের ভাবভঙ্গি দেখলে মনে হয়, যত রাজ্যের শুঁড়ী, মাতাল, ডাকাত, চোর, খুনে আর নটনটীর দল। দেওয়াল, ছাদ, মেঝে সবই অত্যন্ত অসমান আর ধোঁয়া-ঝুলে ভর্তি। মাটির নীচে থেকে একটা হল্লা, গান আর হাসির শব্দ মাঝে মাঝে মেঝেটাকে কাঁপিয়ে দিচ্ছিল। ন'য়ের বান্ধবী বললেন, "আসুন, নীচে থেকে একবার ঘুরে আসি।" পিতৃদেবকে স্মরণ করে ভাবলাম, এরও আবার নীচে? রসাতলই হবে।

একজন কোনোমতে ঢুকতে পারে এমন একটি গর্তে ছোট বড মাঝারি হরেক রকম আকৃতির ধাপ বেয়ে টাল সামলে একটি সমান জায়গায় নামলাম। মাথা ঠুকে যায় এমন নীচু ছাদওয়ালা এমটি ঘরে কয়েকটি বেঞ্চিতে কয়েক জন বসে মদ্যপান করছিল আর তাদের সামনে একটি সামান্য উঁচু মঞ্চে কয়েকটি মেয়ে-পুরুষে গান বাজনা করছিল। এই ঘরে ঢুকতে সামনে একটি কূপ পড়ে। শুনলাম, পূর্বে অপরাধীদের এই কূপে ফেলে দেওয়া হতো। এই ঘরের অপর দিকে আর একটি ছোট গহ্বরের মতো বায়ু-প্রবেশপথবিহীন ঘরে কে একজন যেন নিশ্চিন্তভাবে আরামে শুয়ে রয়েছে। ভালো করে দেখি তার হাত পা পশুর মতো লোহার শিকলে বাঁধা। এটা কাফে না ডাকাতের ডেরা! ওপরে উঠতে ব্যস্ত হতেই সঙ্গী বললেন, "আরে, ভয়ে ব্যস্ত হচ্ছ কেন, ও জীবন্ত নয়, মাটির মূর্তি। কিন্তু ঐখানে একদিন আসল জীবন্ত মানুষটি ঐভাবে দশ বছর বাঁধা ছিল। আঠারো বছরের ছেলেকে বন্দী করে তার আটাশ বছর বয়সে এই শহরের বুকে সমস্ত লোকের সামনে জীবন্ত পুড়িয়ে মারে।"

বললাম, "কারা মারে?"

বন্ধু বললেন, "কে আবার, তদানীন্তন সম্রাট ও তাঁর শাসন। গরীবের উদরের ক্ষুধার বহ্নি হৃদয়ে পৌছে যে জ্বালা ধরিয়েছিল তারই আগুনে মত্ত কয়েকটি বিপ্লবী আত্মাহুতি দিয়ে ভবিষ্যতের বৃহত্তর বিপ্লব-পথের সৃষ্টি করেছিল। এ ছেলেটি তাদেরই একজন। আজ এই নকল বীভৎস রূপ দেখে তোমার সভ্য মন ভয়ে পিছিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু এর ইতিহাস জানলে তোমার মনেও হয়ত উত্তেজনা আসবে। চতুর্দশ লুইয়ের রক্ষিতা মাদাম্ পম্পাদুরের প্রাসাদ এইখানে ছিল। এই বোলে কাফে ছিল তাঁর অশ্বশালার ঘাস ও দানা রাখবার ভাণ্ডারের একটি অংশ। পঞ্চদশ ষোড়শ লুইয়ের রাজত্ব কালে এরই ভূগর্ভস্থ ঘরে বসে কত বড় বড় বিপ্লবী অত্যাচারী

শাসককুলের উচ্ছেদের স্বপ্ন দেখেছেন এবং তাঁদের স্বপ্ন সফল হলে এই ঘরেই হয়ত কত বিচারগৃহের অভিনয় হয়ে কত হতভাগ্য রাজপরিবার ও কাউণ্ট ডিউকের জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটেছে। এইখানেই রবস্‌পিয়ের, মারা, দাঁতোর কত পরামর্শ ইতিহাসের পাতাকে রক্তে রঞ্জিত করেছে। তখন এর ওপরে ঠিক আজকের মতোই চলত মদ্যপান আর হাসি, নীচে চলত এমনি কুৎসিত, অশ্লীল গান আর বিগতযৌবনা গণিকার প্রেমাভিনয়, আর এরই অন্তরালে শাণিত হতো বিপ্লবীর গিলোটিন। পারীর অনেক কিছুরই ওপর আধুনিকতার ছাপ পড়েছে কিন্তু বোলের একটি দাগও মুছে কেউ নতুন রঙ নতুন সজ্জা দিতে পারেনি। এর রূপ বীভৎস, কিন্তু এর মধ্যেই জড়িত রয়েছে বহু শতাব্দীর ইতিহাস ও মানব-জীবনের উত্থান-পতনের নির্মম সত্য কাহিনী।"

কাফেটির ওপর নীচে সর্বত্রই দেওয়ালে আঁকাবাঁকা প্রাচীর সমসাময়িক নামের রেখায় ভর্তি। এরই মধ্যে হয়ত কোনো হতভাগ্য নির্বাপিত জীবনদীপের অঙ্গার-টুকুও কয়েকটি রেখায় অমর করতে চেয়েছে, আবার হয়ত কোনো জিঘাংসু বিপ্লবী বন্ধশিকারের তালিকা লিখে শাসকদলের অদৃষ্টের পরিহাস করেছে। কৌতুহলী দর্শক দল মুহূর্তের আনন্দ, পান ও হাসির মধ্যেও নিজের উপস্থিতিকে অমর করতে ভোলেনি। বন্দী বা বিপ্লবীর আঁকা রেখা নতুন রেখার জালে মুছে যায়, কালদেবতা অলক্ষ্যে হয়ত হাসে। বহু মনীষী লেখক এই বোলেতে বসে জীবনের অনেক স্মরণীয় এবং আনন্দময় মুহূর্ত কাটিয়েছেন। স্বদেশ থেকে বিতাড়িত অস্কার ওয়াইল্ড এইখানে মদিরা ও হাস্য পরিহাসে ডুবে হয়ত বিতাড়নের বেদনা ভুলবার চেষ্টা করতেন।

ওপরে যখন উঠলাম তখন দেখি হাস্য পরিহাস গুরুতর তর্কে পরিণত হয়েছে। কাউণ্টারের পাশে উপবিষ্ট একজন মজুর এক ব্যাঙ্কের কেরানির সঙ্গে রাজনৈতিক মতভেদে বিষম তর্ক লাগিয়েছে। মজুরটির অভিমত—দেশের জাতির ভবিষ্যৎ মঙ্গলের একমাত্র পথ কমিউনিজম। কেরানি বললে, 'একজন ডিক্টেটর—তার হাতে সব সমস্যা তুলে দিয়ে নিশ্চিন্ত মনে যে যার কাজ করো। রাজনীতিতে সকলে মাতলে অন্য কাজ করবে কে? তোমার কমিউনিজম তো বলে নির্মম হও, সকলকে মারো, বাপ-মাকে ত্যাগ করো, আগুন লাগাও—এই তো?' কাউণ্টারে প্রচণ্ড এক ঘুষি মেরে মজুর বললে, 'চোপরাও, ফ্যাসিষ্ট ইতর! তোমরা রক্তশোষা ধনীদের অন্নদাস, তাই তাদের গুণ গাইতে এসেছ। যারা ধনী তারা চিরকাল ধনী থাক, গাড়ী চড়ে প্রাসাদে থেকে মুরগীর-লড়াইয়ের বাজিতে পয়সা উড়িয়ে দিক, আর আমরা মুখে রক্ত তুলে খেটে তাদের সৌভাগ্যের প্রাসাদে একটির পর একটি সোনার ইট বসিয়ে দিয়ে তারই দেওয়ালে নিজেদের কবরের ব্যবস্থা করি। আমরা চাচ্ছি ধনীরা অপব্যয় বন্ধ করে গতর খাটাক—আর আমরা আমাদের পরিশ্রমের উপযুক্ত পারিশ্রমিক পেয়ে একটু পেট ভরাই। তা তোমাদের সহ্য হচ্ছে না বলেই হয়ত আবার গিলোটিন খাড়া করতে হবে।' কেরানি গলার সব ক'টা শিরা ফুলিয়ে

বলল, 'শুনলেন তো মশায়রা, ওঁরা বিচার মীমাংসা ফেলে জোর জবরদস্তি খুন গলাকাটা দিয়ে দেশে সুখশান্তি আনতে চান।' কেরানির নৈশাহারের আদবী পোশাকে গলায় একটি সাদা সিল্কের বড় রুমাল বাঁধা ছিল। মজুরটি হঠাৎ সেটি টেনে গলায় ফাঁস লাগিয়ে বলল, 'বল, ফ্যাসিষ্ট কুকুর, আর কমিউনিজমের নিন্দে করবি।' ফাঁসের চাপে মুখ লাল, চোখ ঠেলে বেরিয়ে এলেও কেরানি ভাঙাগলায় বললে, 'কমিউনিজম প্রচারের কি সৎ উপায় দেখুন।' ব্যাপার এত দূর গড়াবে কেউ আশা করেনি। কেরানির সমর্থনকারী একজন একটি মদের বোতল আস্ফালন করে বললে, 'ছেড়ে দে বলছি খুনে ইতব, নইলে এই বোতলে তোর মাথা ভাঙব।' যারা এতক্ষণ দাঁড়িয়ে মজা উপভোগ করছিল তারা সবাই এল ছাড়াতে। তাদের মধ্যে এক বৃদ্ধ বললেন, 'আরে, তোমার কমিউনিজমই বড় হোক আর ফ্যাসিজমই বড় হোক —সব চেয়ে বড় কথা আমরা সকলেই ফরাসী, এতে আর কোনো সন্দেহ নেই। এ তো তোমরা স্বীকার করো?' দু'জনে সমস্বরে বলল, 'নিশ্চয়ই।' বৃদ্ধ তখন গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তবে কেন বাপু, মিছে ঝগড়া করছ। আমার মতে ফান্সের মাটি থেকে যদি তোমাদের ফ্যাসিজম, কমিউনিজম, সোশ্যালিজম-এর ভূতগুলি চলে যায়, তা হলে সব চেয়ে মঙ্গল হবে। এগুলি কেবল আমাদের মধ্যে বিভেদের পাঁচিল তুলছে।' কেরানি নরম হয়ে বললে, 'ঐ তো আগে আমায় গালাগালি করলে।' মজুর তিক্ত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কমিউনিজম আর ফ্যাসিজম তো অমনি জন্মায়নি, জন্মিয়েছে শ্রেণীগত প্রয়োজনে এবং স্বার্থে। মিছে নিন্দে না করে কমিউ-নিজমকে ভালো করে বোঝবার চেষ্টা করো না।' তারপর নিজেই মাথা নেড়ে বলল, 'না, তুমি কিছুতেই বুঝবে না। এ কেবল ভুক্তভোগীতেই বিনা তর্কে বুঝতে পারে। তোমার সঙ্গে আমার ঝগড়া নেই।'

গোলযোগ মিটে গেলো। কেরানি হুকুম দিলো, 'দু'গ্লাস মদ।' মজুর বললে, 'দাম কিন্তু আমিই দেবো।' কেরানি ব্যস্ত হয়ে বলে উঠল, 'আরে না না, ঝগড়াটা আমিই বাধাই, দাম দেবার আমিই অধিকারী।'

আবার বুঝি তর্ক, হাতাহাতি লাগে। কাফের কর্ত্রী তাড়াতাড়ি বললেন, 'আপনারা তর্ক ও মীমাংসা করে আমাদের যে আনন্দ দিলেন তার সম্মানে এ পানীয়টির সদ্ব্যবহার আমার খরচেই হোক।'

সামনে একটি কুলঙ্গীতে একটি নরকপালের চোখ লাল আভায় রক্ত হয়ে যেন এ মীমাংসাকে সমর্থন করছিল না। 'ন' অনেক আগেই চলে গিয়েছিলেন। তাঁর বান্ধবীকে ধন্যবাদ দিয়ে আমিও নিষ্ক্রান্ত হলাম। কিন্তু এখন আর ভয়ে নয়, কৌতূহল ও উত্তেজনায়।

রোদ্যাঁ ও বুর্দেল-এর কর্মশালা

সপ্তাহের সব ক'টি বারের মধ্যে রবিবারের বৈশিষ্ট্য সব দেশেই বেশ অনুভব করা যায়। বেলা এগারোটায় আলস্য ও দীর্ঘসূত্রতার মোহকে ক্ষুণ্ণ করে রাস্তায় বেরিয়ে মনে হলো মধ্যাহ্ন-ভোজনটা একটু বিশেষ রকম করতে হবে, কারণ আজ রবিবার। ভোজন-পর্ব সেরে লুক্সেমবুর্গের বাগানে একটি বেঞ্চে সময়নষ্টাভিলাষী কোনো এক বন্ধুকে ধরবার চেষ্টায় বসে আছি। সামনে মাটির ওপর দুটি শিশু বালির কেল্লা গড়ে টিনের সিপাই, বন্দুক, কামান সাজিয়ে লড়াই-এর খেলা খেলছিল। যে দেশ, যে জাতির জীবনে রাজনৈতিক ও সামাজিক সংগ্রাম স্নানাহারের মতো ঘটে থাকে তাদের শৈশবের খেলার আমোদেও তার আভাস দেখতে পাওয়া যায়। হঠাৎ শিশু দুটি মারপিট আরম্ভ করে দিলে। ঝগড়ার কারণ, একজন আর একজনের পুতুল ভেঙে দিয়েছে। আমার জাতিগত সদাসন্ত্রস্ত সংস্কারবশত শিশু দুটিকে থামাতে গেলাম। কিন্তু তাদের বাপ-মা আমাকে নিরস্ত করে বললেন, "ওদের কিছু বলবার দরকার নেই, ওদের রাগ ও বৈরীভাবের এইখানেই পরিসমাপ্তি হোক। না হলে ওদের মনে অসন্তুষ্টি বাসা বেঁধে থাকবে। মারপিট করে ক্লান্ত হলে আপনিই থেমে যাবে—তখনই ওদের ভুল বুঝবে। আমরা হাজার বক্তৃতা দিলেও ওরা বুঝবে না যে, এ অন্যায়। শিশুদের বিচারবুদ্ধি স্বতঃস্ফূর্তভাবে গড়ে ওঠা উচিত।" খানিক পরেই তাদের ঝগড়া থামতে তাদের বাপ-মা তাদের নিয়ে চলে গেলেন। আমি ভাবছিলাম এ রকম ঘটনা যখন আমাদের দেশে ঘটে, তখন শিশুদের বাপ-মায়ের মধ্যে লেগে যায় সংগ্রাম, তারপর হয়ত আইন ও আদালত!

অদূরে ছাগলটানা গাড়ী ও খেলার নৌকাগুলির চারপাশে শিশু ও মায়েদের ভিড় লেগে গেছে। রবিবারে শিশুদের যত আনন্দ, যত খেলা, তাদের বাপ-মায়েরও তাতে ভাগ আছে। তারাও অতীত ডিঙিয়ে যেন ছুটির দিনের মেজাজে ছোট হয়ে গেছে।

বসে ভাবছি নানা কথা, এমন সময় হঠাৎ পিছন থেকে কোটটিতে এক টান পড়ল। চেয়ে দেখি চেনা মুখ। বলল, "কি কর, বসে বসে দিবাস্বপ্ন দেখছ? এমন উজ্জ্বল রবিবার, চলো বেড়াবে?"

বললাম, "বেড়াব বলেই তো সঙ্গীর অপেক্ষায় বসে আছি। এখন যাবে কোথায় স্থির করো।"

সে বলল, "রোদ্যাঁ মিউজিয়াম কখনও দেখিনি, চলো না সেখানে একটু বুঝিয়ে দেবে।"

সানন্দে রাজী হয়ে, ভূগর্তস্থ ট্রেনে যাত্রা করে আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই 'রু ভ্যারেন'-এ পৌঁছালাম। রোদ্যাঁর কর্মক্ষেত্র 'ওতেল বিরঁ' এখন রোদ্যাঁ মিউজিয়ামে

পরিণত হয়েছে। ফরাসীদের মতো মার্জিত সভ্য জাতিও তাদের জাতীয় গৌরব—জগতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাস্কর রোদ্যাঁকে প্রথমে বিশেষ সমাদর করেনি। এই 'ওতেল' থেকে রোদ্যাঁকে উঠে যেতে সরকার থেকে আদেশ এসেছিল যখন তিনি কল্পনা করছিলেন, এইখানেই তাঁর সমস্ত শিল্পসংগ্রহ দিয়ে একটি সংগ্রহশালার সৃষ্টি করে নিজের দেশ ও জাতিকে দান করে যাবেন।

উনবিংশ শতাব্দীর ফরাসী ভাস্কর্য —অর্ধেক ঐতিহ্যের বহমান স্রোত, বাকি অর্ধেক রোদ্যাঁর নব ভাস্কর্য-প্রেরণার নতুন রচনা। রোদ্যাঁর সৃষ্টি না হলে শুধু ফরাসী ভাস্কর্য কেন, বর্তমান ভাস্কর্যের অগ্রগতি কি রূপ নিত বলা শক্ত। শুধু অক্ষম ভাস্করদের তুলনায় যে রোদ্যাঁ বিরাট প্রতিভাশালী স্রষ্টা ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন সেরা ভাস্করদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তাঁর জন্মের সময় গিয়োম, কেঁ, সয়র-এর মতো ভাস্করগণ সৌভাগ্য ও প্রতিষ্ঠার উচ্চতম শিখরে উন্নীত ছিলেন। বারি, ব্যারে, পল দ্যুবোয়া, কারপো, ফ্রেমিয়ো, এঁ্যা জালবেয়ার মারকেৎ, ফালগ্যুয়ের, দালু এবং বুশে-র মতো ভাস্কর্য-রথীরা তাঁর সমসাময়িক। রক্ষণশীলতা মানুষের স্বভাব-ধর্ম। তাই ভাস্কর্যের গতানুগতিক আড়ষ্ট জীবনে নতুন প্রাণ, নতুন ছন্দ ও স্পন্দন এনে রোদ্যাঁ যে বিপ্লবের সূচনা করেছিলেন তাকে সাধারণে তখনই গ্রহণ করতে পারেনি। প্রদর্শনীতে রোদ্যাঁ-কৃত 'লাজ ব্রোঁজ' ও 'তরসো'কে জীবিত দেহ থেকে ছাঁচ নিয়ে ঢালাই করা মূর্তি বলে যে অন্যায় ঘৃণিত অপবাদ রটেছিল, তা পরবর্তীকালে অপবাদী বহু শিল্পরসিকের সুনামে কালিমা লেপন করেছিল। রোদ্যাঁ তাঁর কর্মচারী ও মডেলদের নিজের আত্মীয়ের মতো দেখতেন। তাঁর ইচ্ছা ছিল, তাঁর উইলে এদের জন্য কিছু দান করে যাবেন। কিন্তু তাঁর ইচ্ছা কার্যে পরিণত হয়নি, মৃত্যুর আগে কয়েক দিন তাঁর বাক্‌রোধ ও অচৈতন্য অবস্থার সুযোগ নিয়ে সরকার নিযুক্ত কর্মনির্বাহকেরা রোদ্যাঁর পুরাতন ভৃত্য ও কর্মচারীদের কর্মচ্যুত করেছিল। তাঁর প্রিয় কুকুরটি পর্যন্ত আহার ও আশ্রয়ে বঞ্চিত এবং বিতাড়িত হয়েছিল। আজ শতসহস্র শিল্পী, কলারসিক ও দর্শকরা রোদ্যাঁ মিউজিয়াম দেখে শ্রদ্ধাবনত মস্তকে প্রশংসা জানায় ফরাসী সরকারের গুণগ্রাহিতার। তারা অনেকেই জানে না, এ দান সম্পূর্ণ শিল্পীর নিজের, ফরাসী জাতি ও দেশকে ভালোবেসে দেওয়া। এ দেওয়ায় সরকারী প্রতিকূলতা ও প্রতারণা তাঁকে মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্ত পর্যন্ত পীড়া দিয়েছে।

'ওতেল বির'র উদ্যানে প্রবেশ করেই ডান-দিকে একটি গীর্জা বাড়ি দৃষ্টিগোচর হয়। এটিতে রোদ্যাঁ কর্তৃক শিল্পসংগ্রহ ও তাঁর করা কয়েকটি অমূল্য ভাস্কর্য রক্ষিত। সংগ্রহে কয়েকটি দারুময় ভারতীয় ভাস্কর্যের নমুনা আছে। বলা বাহুল্য যে, রোদ্যাঁর ভাস্কর্যসৃষ্টির সঙ্গে এগুলির প্রকাশধারা স্বতন্ত্র। এ কথা হয়ত বলা যেতে পারে, যে সব প্রেরণার উৎস থেকে রোদ্যাঁর শিল্পসৃষ্টি সম্ভব হয়েছে, এগুলিও সেই একই উৎস থেকে সৃষ্ট। রোদ্যাঁ যেমন গথিক ভাস্কর্যকে শ্রদ্ধা করেছেন এবং তা থেকে

শিল্পসৃষ্টির অনুপ্রেরণা ও উপাদান পেয়েছেন, এগুলির মধ্যে সেই সম্পদের কিছু অপ্রতুল তিনি দেখেননি। শিল্পের বিশ্বজনীনতা তার সার্বভৌমতায়। এ ভাবাকে বুঝতে হলে দৃষ্টির প্রসারতা চাই, হৃদয় চাই। প্রকৃত শিল্পী ও শিল্পরসিকের কাছে প্রাচ্য পাশ্চাত্যের, গুহাবাসী মানব-কৃত রেখাচিত্র, মিশরের চিত্রলিপি ও ভাস্কর্য, গথিক গীর্জা ও ভারতীয় মন্দিরগাত্রালঙ্কৃত ধর্মানুপ্রেরণাপ্রসূত চিত্রণ ও ভাস্কর্য, চীন জাপানের ছবির কবিতা, ইয়োরোপের ক্ল্যাসিক, রোমান্টিক, রিয়্যালিষ্ট, ইমপ্রেশ্যনিষ্ট ও ফোব্‌স প্রভৃতি শিল্পধারার রসোপলব্ধির আনন্দের ভেদ নেই।

অদূরে রোদ্যাঁ-কৃত বাল্‌জাক-এর বিখ্যাত বিরাট মূর্তিটি দেখা যাচ্ছিল। এই অদ্ভুত বিকট দর্শন মূর্তিটি সকলের মনে প্রথমে শিল্পীর মানসিক সুস্থতা সম্বন্ধে সন্দেহ জাগায়। মনে প্রশ্ন আসে, 'বাল্‌জাককে এমন অদ্ভুত করে সৃষ্টি করবার কারণ কি!' ঠিক এই একই প্রশ্ন ওঠাতে, যাঁরা এই মূর্তিটি শিল্পীকে গড়তে দিয়েছিলেন, তাঁরা গ্রহণের অযোগ্য বলে এটি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। কিন্তু রোদ্যাঁ যে দৃষ্টিতে বাল্‌জাককে দেখেছেন তার সঙ্গে পরিচিত হলে মূর্তিটি আর এত অদ্ভুত লাগবে না। বাল্‌জাক রোদ্যাঁর কাছে মস্তিষ্ক-সর্বস্ব লোক। তার লেখার ওজস্বিতা এক বিরাট ব্যক্তিত্বকে রূপ দিয়েছে। মূর্তিটিকে একটি ড্রেসিং গাউন দিয়ে গলা পর্যন্ত আবৃত করে দেওয়ায় লক্ষ্য পড়ে কেবল তাঁর মুখের ওপর। যেন বিরাট একটি প্রস্তরখণ্ডের ওপর তাঁর মাথাটি মিশরীয় স্ফিংকসের ন্যায় মহনীয়ভাবে উন্নত। চোখের সাধারণ আকৃতি না দিয়ে অদ্ভুত আলোছায়ার সমাবেশে যে দৃষ্টি আমরা দেখতে পাচ্ছি তা দৃশ্যমান জগৎকে সাধারণভাবে দেখার দৃষ্টি নয়, চিন্তাশীল দৃষ্টির প্রকাশ। রোদ্যাঁর সৃষ্টিতে কোনো একটি বিশেষ রীতির আনুগত্য নেই। ভিক্তর য়্যুগোর মূর্তিতে তিনি যে বিরাটের সমন্বয় দেখিয়েছেন তা মিকেল আঞ্জেলোর ভাস্কর্যের সঙ্গে তুলনা করতে পারা যায়। ভিক্তর য়্যুগোর সাধারণ আকৃতির চেয়ে —তাঁর প্রতিভার বিরাট সৃষ্টি শিল্পীকে বেশী আকৃষ্ট করেছে। তাই প্রসারিত ডান হাতে তাঁর কর্মক্ষমতা, দৃঢ়তা ও সৃষ্টির সাফল্য সম্বন্ধে নিশ্চয়তার প্রকাশ অপূর্বভাবে মূর্ত করেছেন। শিল্পীমন কলাকৌশলের যত প্রকার রীতি ও ভাবধারা প্রকাশ করেছেন, রোদ্যাঁ তার অনেক-গুলিতে আরও বিস্তৃতভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। এঁর রচনার কতক-গুলিতে তিনি পূর্ব প্রকাশিত ধারাকে অতিক্রম করতে পারেননি, কতকগুলি তাঁর সাফল্যের সূচনা ও পরিণত অবস্থাকে প্রকাশ করছে।

তাঁর রচিত কোনো মূর্তি প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর ফিডিয়াসের যুগকে স্মরণ করিয়ে দেয়, কোনো মূর্তিতে প্রাচীন মিশরীয় ভাস্কর্যের আধুনিক ব্যাখ্যা ফুটে উঠেছে, কোনো মূর্তি বা মধ্যযুগের ধর্মোন্মাদনাপূর্ণ শিল্পের স্বরূপ প্রকাশ করেছে। 'ল বেজে' (চুম্বন) মূর্তি মিকেল আঞ্জেলোর সৃষ্টির সরল ব্যাখ্যা বলতে পারি। আবার ইভের মূর্তিতে তাঁকে অনুসরণ করবার আভাস দেখতে পাই। 'পোর্ত দাঁফেয়ার' (নরকের দ্বার) পরিণত ফরাসী রেনেসাঁসের রূপ ধারণ করেছে। 'লেজাপেল ওজারম'

(যুদ্ধের ডাক) মূর্তিটির বিস্তারিতপক্ষ হস্তসঞ্চালন ও আহ্বানরত মুখের ভয়ঙ্কর রূপ যেন রুদ্‌-কৃত ভাস্কর্যকে নব তারুণ্য দিয়ে দেখবার প্রয়াস। 'সেল কি ফু ওলমিয়ের' মূর্তিতে বৃদ্ধা বারাঙ্গনার শেষ পরিণতি শিল্পী দ্যমিয়ের-এর ব্যঙ্গচিত্রের কথা মনে করিয়ে দেয়। 'বুর্জেয়া দ্য ক্যালে'র মূর্তি গথিক মূর্তিকে সাধারণ মানুষের প্রাণ ও গতি দিয়ে দেখাবার প্রয়াস।

গীর্জা বাড়ি ছেড়ে 'ওতেল বির'র প্রধান অট্টালিকার অভিমুখে যেতে উদ্যানের দক্ষিণে অবস্থিত 'ল পাঁসর'-এর চিন্তারত বিরাট ব্রোঞ্জ-নির্মিত মূর্তিটি ও বাঁ-দিকে পোর্ত দাঁফেযারের নরকদৃশ্যের মূর্তি ও ঘটনা সম্বলিত ব্রোঞ্জের বিরাট দরজাটি চোখে পড়ে। বির অট্টালিকার সামনের চত্বরটিতে সেণ্ট জনের বিখ্যাত মূর্তিটি রক্ষিত। সেণ্ট জনকে সাধারণত শিশু খৃষ্টের সঙ্গী, শিশু রূপে অথবা কদাচিৎ প্রৌঢ় খৃষ্টেরই আর এক সংস্করণ রূপে চিত্রকর ও ভাস্করেরা ব্যক্ত করেছেন। রোদ্যাঁ সেণ্ট জনকে মূর্ত করেছেন —কঠোর তপে দৃঢ়, মেদ-বর্জিত দেহ, স্বীয় ধর্মমতে সবল ও স্থির বিশ্বাসের দৃষ্টিসম্পন্ন, নশ্বর অভিমান ও পদ গরিমাশূন্য, সাধারণ কৃষকের ন্যায় আড়ম্বরহীন অভিব্যক্তি বিশিষ্ট। গথিক মূর্তির সকল গুণগুলি অব্যাহত রেখে গথিক শিল্পে জীবন ও গতি দিয়ে রোদ্যাঁ ভাস্কর্যের এক নতুন ভাবধারার সূচনা করেছেন। পাশের একটি ঘরে রোদ্যাঁ-কৃত কতকগুলি আবক্ষ মার্বেল প্রতিমূর্তি সাজানো আছে। সেগুলির প্রত্যেকটিতে রচনা-স্বাতন্ত্র্য থাকলেও রোদ্যাঁর সম্পূর্ণ নিজস্ব রচনাবৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে তাঁর করা ব্রোঞ্জ ও প্লাষ্টারের মূর্তিগুলিতে। তার নিযুক্ত তক্ষণবিশারদেরা (stone carvers) মূর্তিগুলি প্রস্তরে নকল করবার সময় আসল প্লাষ্টারের মূর্তিকে কিছু পরিবর্তিত করে ফেলেছেন। কিন্তু প্লাষ্টার ও ব্রোঞ্জে তার আঙুলের প্রত্যেকটি চাপ অক্ষত রয়ে গিয়েছে। রোদ্যাঁ-কৃত 'মায়ের কোল', 'সৃষ্টিকর্তার হাত', 'আর্তের মুখ', 'চিরাদরণীয় আদর্শ', 'আডনিসের মৃত্যু', 'স্বর্গীয় সংগীত', প্রভৃতি মূর্তিগুলির রস ও সৌন্দর্য ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

ভাস্কর্যে আলোছায়ার সমাবেশ, বিভিন্ন বর্ণাভাস ও ত্বকের সজীবতার রূপ রোদ্যাঁর অপূর্ব সৃষ্টি। কিন্তু স্থাপত্যের সঙ্গে ভাস্কর্যের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধকে উপেক্ষা করায় রোদ্যাঁর ভাস্কর্যের ত্রুটি থেকে গিয়েছে। তাঁর কৃত মূর্তিগুলির অধিকাংশই নির্মাণস্থান থেকে স্থানান্তরিত করে মুক্ত উদ্যানে বা অন্যত্র রাখলে সকল সৌন্দর্য লুপ্ত হয়ে সেগুলি অর্থহীন প্লাষ্টার-স্তূপ বা প্রস্তরখণ্ডের মতো দেখাবে। বৃহৎ প্রস্তর-খণ্ডের ওপর একটি মুখ খোদিত করে বাকিটা বন্ধুর অসমাপ্ত রেখে রোদ্যাঁ বস্তুটির স্বভাব-বৈশিষ্ট্য, বিরাট পর্বতশৃঙ্গের ভাবকে জাগ্রত করবার চেষ্টা করলেও প্রস্তর-খণ্ডের আসল পরিমাণের চেয়ে বিরাটের কল্পনা দর্শকের চোখে ভেসে ওঠে না। তা হলেও রোদ্যাঁ একটি নতুন শিল্পান্দোলনের জনক, তিনি ভাস্কর্যের গতানুগতিক ঐতিহ্যকে ভেঙে নতুন রূপ, নতুন রস দিয়ে পরিবর্ধিত ও জীবনময় রূপাভিব্যক্তির সৃষ্টি করেছেন। শিল্পী হিসাবে তাঁর স্থান, জগতের কয়েক জন মাত্র বিশ্ববিশ্রুত

শিল্পীদের মধ্যেই। রোদ্যাঁর সৃষ্ট ভাস্কর্যের নব আন্দোলন তাঁর রচনাতেই শেষ হয়নি। তারই নব নব বিকাশ ঘটেছে তাঁর পরবর্তী কয়েক জন অধুনা-বিখ্যাত ভাস্করদের রচনায়। যে বিরাটের কল্পনা রোদ্যাঁর সৃষ্টিতে অপূর্ণ ছিল তারই উচ্চতম বিকাশ দেখিয়েছেন তাঁরই সুযোগ্য ছাত্র ও সহকর্মী এমিল আঁতোয়াঁ বুর্দেল। রোদ্যাঁর অবজ্ঞাত ভাস্কর্য যখন চারদিকে প্রশংসা-মুখর হয়েছে তখন তাঁর কর্মজীবনের সহচর বুর্দেল তাঁর কর্মশালায় নীরবে শিল্প-সাধনায় রত ছিলেন। লালসাদীপ্ত মৃন্ময় মূর্তির গঠনে রোদ্যাঁ যে কামনা ও মোহের সৃষ্টি করেছিলেন, বুর্দেল তাকে মহান্ বিরাট করে প্রাচীন গ্রীক ভাস্কর্যের রূপ ও 'পেগান' আবেগের রস দিয়ে, ভাস্কর্যের নব রূপাবতারণায় কলারসিকদের বিস্মিত করেছেন।

বুর্দেলের কর্মক্ষেত্রে 'লা গ্রাঁদ শমিয়ের' ও 'এ্যামাপাস দু মেইন'-এর নির্জন আতলিয়েতে, আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, সুইডেন, রাশিয়া, বেলজিয়াম, সুইটজারল্যাণ্ড প্রভৃতি নানা দেশ থেকে শিল্প-সংগ্রাহকেরা এসে চারদিকে নতুন ভাস্কর্য সৃষ্টির বার্তা রটনা করছিলেন। স্পেন, জার্মানী, রুমানিয়া, চেকোশ্লোভাকিয়া, যুগোশ্লোভিয়া, পোল্যাণ্ড থেকে আগত শিল্পী ও ছাত্রেরা কবি-ভাস্কর বুর্দেলের শিক্ষাবেদী-মূলে সমবেত হয়েছিল। গুরু বুর্দেল, তাদের শোনাতেন তাঁর ভাস্কর্য সৃষ্টির নতুন বাণী, তাদের উৎসাহ দিতেন, সহানুভূতি জানাতেন, উপদেশ দিতেন, তাঁর সরল নম্র ব্যবহারে মুগ্ধ করতেন।

১৮৬১ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত চিত্রকর আঁগ্র-এর গ্রামে মঁতোবাঁতে বুর্দেল জন্মগ্রহণ করেন। স্বগ্রামে ও 'তুলুজ'-এ, শিল্পী লারক-এর নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সেরে পারীতে এসে প্রথমে ভাস্কর ফাল্‌গ্যুয়ের-এর স্টুডিয়োতে শিক্ষারম্ভ হয়। কিন্তু রোদ্যাঁ ও দালুর কর্মশালায় শিক্ষার প্রেরণাই তাঁর ভবিষ্যৎ জীবনের প্রতিষ্ঠায় প্রকৃত সাহায্য করেছিল। বুর্দেলের প্রতিভা বহুমুখী। তিনি অভিনব আসবাব-পত্রের গঠন, কাষ্ঠ ও প্রস্তর তক্ষণ, স্থাপত্য, অঙ্কন, চিত্রণ ও ফ্রেস্কো চিত্রণে কর্মরত থাকলেও সরকারী 'গোবলঁ্যা' চিত্র-যবনিকার নির্মাণালয়ে অধ্যাপক ও শিল্পী নিযুক্ত ছিলেন। তাঁর লিখিত কবিতা ও গ্রন্থাদি সাহিত্যজগতে কম প্রশংসা পায়নি।

শিল্পী-জীবন আরম্ভ করে মৃত্যু-সময় (১৯২৯) পর্যন্ত বুর্দেল এই পাড়াটিতে ছিলেন বলে মাদাম বুর্দেল এই স্থানটির মায়া আজও কাটাতে পারেননি। বুর্দেলের সমাদর বিদেশে যতটা হয়েছে তাঁর স্বদেশে ততটা হয়নি বলা চলে। তাঁর কৃত অমূল্য ভাস্কর্য-সম্পদ তাঁর স্টুডিয়োর মধ্যে আবদ্ধ হয়ে আছে। তাঁর কৃত বহু বিখ্যাত মূর্তি ফ্রান্সের ও পৃথিবীর অন্যান্য বিখ্যাত সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়ে সৌন্দর্য বর্ধন করছে। তাঁর স্টুডিয়োগুলিকে কিছুটা সংস্কার করে বর্তমানে বুর্দেল মিউজিয়ামে পরিণত করা হয়েছে।

দর্শকরা আতলিয়েতে প্রবেশ করলে মাদাম্ বুর্দেল প্রত্যেকটি কক্ষের দ্রষ্টব্যগুলি দেখাতে এবং বোঝাতে লাগলেন। একটি ছোট ঘরে এসে বললেন, "এইখানে

আমরা বিবাহের পর আমাদের ছোট সংসারটি পেতেছিলাম। আমি ছিলাম এমিলের কর্মশালার ভৃত্য আবার তার সংসারের কর্ত্রী।" বান্ধবী বললেন, "মাদাম্ এইখানে এলে, সম্ভবত আপনার স্বামীর কথা বেশী মনে পড়ে এবং হয়ত তাঁর বিরহে মনঃপীড়ারও উদ্ভব হয়।" তিনি বললেন, "বল কি! সারা দিনের মধ্যে আমার মন পড়ে থাকে কখন এখানে আসব। এইখানে এলে আমি তাঁর বিচ্ছেদ ব্যথাকে ভুলি। এইখানে এলে আমি তাঁর সঙ্গ অনুভব করি। এই মূর্তিগুলির মধ্যে আমার এমিল জীবিত রয়েছে এবং চিরদিন জীবিত থাকবে।" নিকটবর্তী একটি মূর্তিকে দৃঢ়ালিঙ্গন করে অর্ধনিমীলিত নেত্রে মূর্তিটির সারা অঙ্গে সাদরে হাত বুলোতে লাগলেন। এক অপূর্ব তৃপ্তির ভাব তাঁর মুখে ফুটে উঠল। সে দিন তিনি যেমন করে তাঁদের পারিবারিক ও শিল্পী-জীবনের কথা বলেছিলেন, তা পূর্বে কোনোদিন শোনবার সৌভাগ্য আমাদের হয়নি। তাঁর কথাগুলি আজও মনে গাঁথা আছে, কিন্তু তাঁর সেই আবেগ, সেই বর্ণনাকে ভাষায় রূপ দেওয়ার সামর্থ্য আমার নেই। একটি আতলিয়েতে একপাশে 'সেণ্টরের মৃত্যু'র বিরাট মূর্তিটি ছিল। তার কাছে গিয়ে মাদাম্ বললেন, "এমিল, পেগান আর্টকে ভালোবাসত, তার পরিসমাপ্তিকে 'সেণ্টরের মৃত্যু'তে প্রকাশ করেছে। প্রাচীন গ্রীক ও রোমক শিল্পে সেণ্টরের আকৃতিতে মানুষের দেহাংশের চেয়ে পশুর আকৃতিটুকু বড় করে দেখানো হতো। সর্ব বিদ্যায় পারদর্শী সেণ্টরকে আরও মানুষ করে দেখাতে মনুষ্যাকৃতির অংশকে এমিল পরিবর্ধিত করেছে। সেণ্টরের চার পায়ের অবস্থানের সঙ্গে ওপরের হাত, বীণা বা হেলানো মাথা সবই মাটি থেকে একই লম্বের সমান্তরাল থাকায় মূর্তিটিকে একটি ঘনকের মধ্যে কল্পনা করা যায়। আমার স্বামীর আদর্শ ছিল, স্থাপত্যের জন্য তার ভাস্কর্য এবং ভাস্কর্যের জন্য তার স্থাপত্য। তাঁর মতে একটি বিরাট স্থাপত্যের সম্পূর্ণ পরিকল্পনা ও নক্সা করার আগে স্থপতির ভাস্করের সঙ্গে পরামর্শ করা উচিত। তাতে স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের রচনা সুসমঞ্জস ও সম্পূর্ণ হয়ে থাকে। স্থাপত্যের নির্মাণ শেষ হলে ভাস্করকে ডেকে কিছু কাজ দিয়ে সৌন্দর্য-বর্ধন করতে বলা আর তৈরী পোশাক ছিঁড়ে তালি দিয়ে সৌন্দর্য-বর্ধন করার চেষ্টা একই কথা।"

রোদ্যাঁর 'নরকের দ্বার' ও বুর্দেলের 'সেণ্টরের মৃত্যু' এ দুটিই তাঁদের ভাস্কর্য রচনা-বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দেয়। গতি ও ভাবের দিক দিয়ে এ দুটি সহজে চিত্তাকর্ষক ও তাঁদের চিন্তাশীলতার বৈশিষ্ট্য প্রকাশক। রোদ্যাঁ 'নরকের দ্বার'-এ মানবের অতিমানুষী জীবন-সমস্যার সমাধান চেষ্টায় সংগ্রামরত রূপ দিতে প্রয়াস পেলেও বিশেষ সাফল্য লাভ করেননি। বুর্দেলের সেণ্টরের আকালিক স্থাপনাও বর্তমান কালের মানুষের পক্ষে মীমাংসা করা কঠিন। তবে আধুনিক যুগের ফরাসী ভাস্করদের মধ্যে বুর্দেল ও মাইয়ল্-এর মতো মৌলিক ও প্রচলিত রচনা-রীতিদোষশূন্য ভাস্করের সংখ্যা খুবই অল্প।

এরপর আর একটি ঘরে আমরা প্রবেশ করলাম। এখানে বিভিন্ন অবস্থা ও ভঙ্গিতে একুশটি বেটোফেন-এর মূর্তি ছিল। মাদামের কাছে শুনলাম, বুর্দেল ফরমায়েসী কাজ সেরে যখনই অবসর পেতেন তখনই বেটোফেন-এর মূর্তি বা প্রতিকৃতি রচনা করতেন। বেটোফেন-এর প্রতি আন্তরিক অনুরাগ তাঁর শেষ জীবন পর্যন্ত সঙ্গীতনায়কের প্রতিমূর্তি রচনায় নব উৎসাহ এনে দিত। বুর্দেল-কৃত বিরাট ভাস্কর্য-সম্বলিত স্মারক স্তম্ভ ও মূর্তি ফ্রান্স, ইতালি, পোল্যাণ্ড ও অন্যান্য বিভিন্ন দেশের দিকে দিকে তাঁর বিরাটের পরিকল্পনা রূপ নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

আতলিয়ে

বঁজু্র বঁজু্র।

সকাল ন'টা থেকে সওয়া ন'টা পযন্ত আতলিয়ে ঐ শব্দে সরগরম। ম্যাসিয়ের[1] স্টোভে লাগিয়েছে গন্‌গনে আগুন। সারা রাত্তিরের জমা ঠাণ্ডা, তাপের ঠেলা খেয়ে কোণে কোণে থেমে যাবে কি না যাবে ইতস্তত করছে।

কোট খুলে ওভারঅল পববার সময মুহূর্তের সুযোগে আগন্তুকের স্বল্প উন্মুক্ত শরীরে প্রস্থানোন্মুখ ঠাণ্ডা লাগায় দু'একটা আচমকা খোঁচা।

থ্রোনের ওপর নগ্না মডেল, স্টোভের কাছে দাঁডানো থাকলেও তার গায়ে হংসচর্মবৎ গুটির বিস্তার দেখে বোঝা যায়, সেও এই প্রায়-বিতাড়িত ঠাণ্ডার হাত থেকে রেহাই পায়নি।

বাইরের ইয়ার্ডে চৌবাচ্চায় রাখা ভিজে মাটি জমে কালো বরফ হয়ে গেছে। হাত-কোদাল দিয়ে তারই কয়েক তাল প্রত্যেকে নিয়ে আসছে।

খানিক পরে আতলিয়েটা হয়ে যায় নিস্তব্ধ। মাঝে মাঝে সেই নীরবতা ভাঙে, মডেল-থ্রোন ঘুরিয়ে দেবার শব্দে।

এক ঘণ্টা পরে ম্যাসিয়ের বলে 'রোপ্যো'[2]। স্পন্দনহীনা মডেল, যে এতক্ষণ যেন যাদুতে জমে পাথর হয়ে গিয়েছিল, হঠাৎ ম্যাসিয়েরের ঐ মন্ত্রবাক্যে মায়াজাল ভাঙায় সে যেন ফিরে পেল তার নড়বার শক্তি। উঁচু করল সে হাত দু'খানা। হাত না হয়ে পাখা হলে মনে হতো সে যেন ডানা মেলে উড়ে যাবার প্রয়াসী। ঘাড়ের এক দিকে মাথাটা হেলিয়ে তুলল একটা হাই। হাতের আড়াল দিয়ে হাই ঢাকবার ভান পর্যন্ত করল না। তারপর ধীরে তুলল একটি পা, নামাল অতি সন্তর্পণে থ্রোন থেকে। পাশে চেয়ারে রাখা একটি ঝোলা গাত্রাবাস উঠিয়ে ঢেকে নিল নগ্ন শরীরের খানিকটা।

১। যেখানে ছাত্ররা কাজ করে তাদের তদারককারী □ ২। বিরাম।

একটু আগে সে ছিল রূপরাজ্যের সিংহাসন-আসীনা দেবী, যার আদল নিয়ে এতগুলি পিগ্‌মেলিয়ান গড়ছিল তাদের গ্যালাতিয়া। ম্যাসিয়েরের ঐ 'রোপ্যো' শব্দেই সে পরিণত হলো সাধারণ নগ্না নারীতে—তার এল লজ্জা, সে হয়ে গেলো ঈভ আর সঙ্গে সঙ্গে ঢাকল তার উন্মুক্ত বক্ষ ও জঘন।

চেয়ারের ওপরে রাখা কাপড়-স্তূপে হাত ডুবিয়ে বার করল একটি শাঁসালো আপেল। মুহূর্তে শুরু হলো লালাসক্ত জিহ্বা, দন্ত আর আপেলের কষাকষি।

যে সব নরনারীর দল এতক্ষণ নিবিষ্ট মনে নীরবে গড়ছিল মূর্তি তারা হয়ে উঠল মুখর। আওয়াজে ভরে গেলো সমস্ত আতলিয়ে। সিগারেটের ধোঁয়া কুণ্ডলী পাকিয়ে জমিয়ে দিলো কুয়াসা। চলল পরস্পরের মূর্তি নিরীক্ষণ, বিচার ও মীমাংসা। শোনা গেলো শ্রেষ্ঠ ভাস্কয ও ভাস্কর-রথীদের নাম—আরকায়েক গ্রীক, এক্রুকান, বেনিন্, দোনাতেল্লো, ঘিবার্তী, রোদ্যা, বুর্দেল, ব্রাঙ্কুর্সী এবং আরও কত কি।

পনেরো মিনিট যেতেই ম্যাসিয়ের বলল, 'রোকমাসে সিল্ ভূ প্লে'[১] আবার এসে গেলো সেই নিস্তব্ধতা, প্রত্যেকে রত হলো তাদের গ্যালাতিয়ার গঠনে। ঈভ ফেলে দিলো তার লজ্জাবসন—নগ্নারূপা দেবী আরোহণ করলেন তার বেদীতে।

একই মানুষ, একই চোখ, একই নগ্না নারীকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখে বিভিন্ন ভাবে।

থ্রোনের ওপর দণ্ডায়মানা উলঙ্গ দেহের ওপর ওঠা-নামা করে চলেছে তাদের দৃষ্টি কিন্তু সে দৃষ্টি থেমে যায় না কোনো স্থানে কামনার ভিড় দেখে। নিস্পৃহ নিষ্কাম রূপ-তাপসের দৃষ্টি—কেবল দেখছে আর গড়ছে।

বারোটা বাজল। ম্যাসিয়ের আবার বলল, 'রোপ্যো—ইল এ মিদি।'

দেবী পুনরায় হলেন ঈভ এবং ঈভ হলো সাধারণ নারী। ঢিলে গাউনের আব্রু করে সে একে একে পরল ব্রাসিয়ের, স্লিপ প্যাণ্ট, ব্লাউজ সাসপেণ্ডার, স্টকিং, স্কার্ট ও জুতো। প্রত্যেকটি পরিধেয় তার সম্পর্কিত অঙ্গ ও তার ক্রিয়ার ইশারা যেন ব্যাখ্যা হতে লাগল তার গায়ে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে।

চিরুনি পড়ে চুল হলো সুবিন্যস্ত, গালে চড়ল রঙ, ঠোঁটে পড়ল কৃত্রিম রক্তিমা ও চোখে টেনে দিলো সুর্মা। কে এল, তার এক ছেলে বন্ধু। পরস্পরের বাহুতে, বাহুবদ্ধ হয়ে তারা চলে গেলো। যাবার আগে সবাইকে বলে গেলো, 'অরভোয়ার আদেম্যা'[২]।

দ্বার প্রান্তে অপেক্ষমান বা অপেক্ষমানা বন্ধু বা বান্ধবী, যে যার সঙ্গী নিয়ে উধাও হলো কাফেতে, নয় রেস্তরাঁয়। কেউ বা গেলো লুক্সেমবুর্গ উদ্যানে এবং বেঞ্চে বসে খেতে লাগল স্যাণ্ডুইচ।

১॥ আবার আরম্ভ করো। ২॥ বিদায়, কাল দেখা হবে।

দুটোর পর থেকে ফের শুরু হবে কাজ, আসবে অন্য এক মডেল। সকালে যারা কাজ করেছে তাদের কেউ না কেউ হয়ত থাকবে কিন্তু আতলিয়ে চলবে সকালের মতোই সেই একভাবে।

* * *

দারিদ্র্যেরও কৌলিন্য আছে। যে সবচেয়ে গরীব, তার অবস্থান স্যাণ্ডুইচ-খাওয়া শ্রেণীরও নীচে। শুধু শুকনো রুটি আর তাকে গলাধঃকরণ করতে যে রসনা-রসের প্রয়োজন তার উপায়ের চেষ্টা করে সে মাঝে মাঝে দু'এক টুকরো চীজে কামড় দিয়ে। এই ধরনের লাঞ্চ বা ডিনারের পরে এক কাপ কফি খেতেও তাকে করতে হয় হিসেব, কারণ এও মাঝে মাঝে হয়ে যায় শৌখিন খরচ।

বাগানের এক নিভৃত কোণে বসে সে ভাবে, অতুল ঐশ্বর্যে শোনা যায় অনেকে থাকে অসুখী, সেই জন্যে এই অসীম গরীবিয়ানায় তার হওয়া উচিত পরম আনন্দ। আতলিয়েতে কেউ যদি আসে পরিচিত হতে, সে তখনি তাকে করে নিরস্ত। ভয় হয়, যদি এই পরিচয়ের সঙ্গে হয় কাফেতে নিমন্ত্রণ! ভদ্রতার খাতিরে, সে নিমন্ত্রণের প্রতি-নিমন্ত্রণ দেবার ক্ষমতা তার নেই। চায় না সে পরিচয় —চায় না সঙ্গী, বন্ধু বা বান্ধবী। একলা সে —স্বেচ্ছায় নয়, ঘটনাচক্রে।

গ্যগাঁ তাঁর পত্রে লিখেছিলেন, সাধারণভাবে লোকের ধারণা যে, অন্তিম দারিদ্র্য দেয় শিল্পীকে মহাশিল্পের সন্ধান ও অনুপ্রেরণা। কিন্তু তারা ক'জন জানে যে, দারিদ্র্যের অন্তিম পারে পা দিলে মানুষের মস্তিষ্ক হয়ে যায় ঘোলা; আত্মাটাও ডুবে যায় অতল কালিমায়।

* * *

আতলিয়েতে সকলের পরিচিত আসল নামকে বিকৃত করে, ব্যঙ্গ নামকরণ করার একটা বাতিক ছিল অনেকের। একজন হোয়াইট রাশিয়ান ইহুদী, যার নাম ছিল পিটুকিন, সে ইংরেজী-বলা লোকেদের মহলে হয়ে গেলো 'পিগ্‌স্কিন।' ইংরেজ মহিলা মাদাম্ মিউভিল, হলেন 'মাদাম্ মুভেজ.।' যাদের নাম উচ্চারণে জিভের আড় ভাঙতে কষ্ট হতো, তারা তাদের দেশের নামেই খ্যাত হলো।

আমাদের ম্যাসিয়ের সিত্রিনোভিচ পোল্যাণ্ডের লোক বলে অভিহিত হতো 'পোলনে' এবং সুইডিস ডাগারম্যান হয়ে গেলো ম্যঁসিয়ো সুইদোয়া। আমি পেলাম খেতাবী নাম বুদা-সিলাঁসিউ —নির্বাক-বুদ্ধ। আমি ছাড়া আতলিয়েতে ছিল আরও একজন নির্বাক, যে চাইত না কারোর পরিচয় বা বন্ধুত্ব। আড়ালে সকলে তাকে বলত মুখ-বোঁজা-মার্থ।

আতলিয়ের প্রায় সব ছেলেরা চেষ্টা করেছে মার্থের সঙ্গে মাখামাখির কিন্তু তার তর্জন ও তাচ্ছিল্যে হার মেনে তারা হাল ছেড়ে দিয়েছিল। তাকে যে সত্যি কেউ ভালোবাসতে চেয়েছে, তা অবশ্য নয়। তাদের সকলের প্রয়াস ছিল তাকে জয় করবার। তারা তার পিছু নিয়ে দেখেছে, তার কোনো ছেলে বন্ধু আছে কি-না।

সে লেস্‌বিয়ান কি-না, তাও আবিষ্কারের চেষ্টা হয়েছে। কারণ তাদের ধারণায়, মেয়েরা যদি ছেলেদের সঙ্গে প্রেম না করে, তা হলে তাদের প্রণয় হবে মেয়েদের সঙ্গে। এ দুয়ের একটি হওয়া চাই।

কিন্তু যখন তারা জানল যে, মার্থ তাদের জানা কোনো শ্রেণীতেই পড়ছে না তখন তাদের চেষ্টা চলল জানবার, মার্থ মেয়ে হিসাবে শারীরিক পরিপূর্ণ কি-না। তাদের কৌতূহলী মন সকলভাবে তলিয়ে মার্থকে জানবার প্রয়াসে ব্যর্থ হয়ে এখন হয়েছে নিরুৎসুক ও নিস্পৃহ।

মনে পড়ে ছোটবেলায় পুকুরধারে দেখতাম জীবন্ত শামুক শুঁড় বার করে চলেছে। দিতাম একটা কাঠির ঘা, অমনি শুঁড়-বার-করা মুখ উধাও হয়ে যেত, নিমেষে শামুকটা হতো অজীব ও অচল। পা দিয়ে ঠেলা দিতাম, সেটা গড়িয়ে যেত। প্রাণের আর কোনো লক্ষণ দেখা যেত না। নিস্তব্ধে লক্ষ্য করলাম, আবার বেরিয়ে এল শামুক থেকে খয়ের রঙের জিভ, যার ডগায় রয়েছে উঁচিয়ে দুটো শিং। আবার ধীরে ধীরে মাটির গায়ে লেপ্‌টে চলছে সে।

মার্থকে দেখে আমার মনে হতো, সে যেন সেই শামুকেরই মতো হঠাৎ ঘা খেয়ে একটা খোলের মধ্যে নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছে। তাকে নাড়া দিলে আরও খোলের গভীরে নিজেকে সে তলিয়ে দেয়।

আমার পাশেই ছিল তার মডেলিং স্ট্যাণ্ড। একবার তাকে কি একটা কথা জিজ্ঞাসা করতেই আর সকলে আমায় দিলো তাড়া, 'ওর সঙ্গে কথা বলো না হে, কামড়ে দেবে। ক্ষেপা কুকুর দেখেছ? ও তার চেয়েও বেশী ক্ষেপা। কাজেই ওর ধার সামলে চলো।'

মার্থ এই কটূক্তিতে কোনো ভ্রূক্ষেপ করল না। তার চোখের ঘোর নীল তারা দুটি একবার যেন স্বচ্ছ হয়ে উঠল, কিন্তু পর মুহূর্তেই আবার সে দুটি পাথরের নকল চোখের মতো অভিব্যক্তিহীন ও স্থির হয়ে গেলো। সে করে চলল আপন কাজ।

ম্যাসিয়ের সিত্রিনোভিচ-এর আর্থিক সঙ্গতি ছিল প্রায় আমার, পিট্‌কিন, ডাগারম্যানের মতো কিন্তু উদারতায় সে ছিল সবচেয়ে ধনী। সে থাকত গত শতাব্দীর কোনো ধনীর পাঁচমহলা বাড়ির প্রাঙ্গণ প্রান্তে জুড়িগাড়ির আস্তাবলের একটি কামরায়, যেখানে আগে থাকত ঘোড়ার ঘাস। সে পাঁচমহলা বাড়ি এখন হোটেলে পরিণত আর আস্তাবলের প্রায় সবটাই ধোপার কাপড়-কাচাইখানা।

সেই আধ-অন্ধকার স্যাঁৎসেতে, সেদ্ধ-করা কাপড়ের ও সাবান জলের ভ্যাপ্‌সা গন্ধে ভরা ঘরখানিই ছিল সিত্রিনোভিচের বসবার দালান, শয়নকক্ষ ও কাজের স্টুডিয়ো এবং সেইখানেই বসে ছুটির দিনগুলোতে চলত আমাদের চারজনের শিল্পালাপ ও খোশগল্প।

পোল্যাণ্ডের ইহুদী সিত্রিনোভিচ ছিল বেঁটেখাট মানুষটি, যার ছোট চোখ দুটোয় সর্বদা দেখা যেত যেন সদ্য ঘুমভাঙা আঁখির জলভরা চাউনি। তার প্রায় টাক-পড়া

মাথার পিছনে ছিল শণের মতো জৌলুসহীন এক ঝুঁটি চুল, যা কয়েক বছর আগে হয়ত ছিল লাল্‌চে রঙের।

প্রত্যেক সাধারণ মানুষের মধ্যে যেন প্রচ্ছন্ন থাকে কিছুটা অসাধারণের সম্ভাবনা যা যোগাযোগে হঠাৎ উছলে বেরিয়ে আসে, আবার পারিপার্শ্বিক ঘটনাচক্রে তার অভিব্যক্তি অঙ্কুরেই লুপ্ত হয়ে যায়। সিত্রিনোভিচের ভাস্কর্যে অসাধারণ ক্ষমতার ব্যঞ্জনা ছিল। কিন্তু কোথায় যেন ধাক্কা খেয়ে তার ভাস্কর্যের উচ্চশির অযথা মাথা নামিয়ে জানাতে চাইত না তার প্রকৃত দৈর্ঘ্য ও মহত্বের পরিমাপ।

সে ছিল কট্টর কমিউনিস্ট।

ডাগারম্যান তাকে ঠাট্টা করে বলত, 'তোমার কমিউনিস্ট হওয়া অত্যন্ত অশোভন, কারণ তাদের উগ্রতা, অন্ধবিশ্বাস ও হিংস্রকঠিন স্বভাব তোমার মধ্যে একটুও নেই।'

সে একটুও না রেগে বলত, 'ওটা রিঅ্যাক্‌শ্যানারিদের কমিউনিস্ট সম্বন্ধে একটি মিথ্যা ধারণা। বন্ধু, আমরা উগ্র নই, কেবল আমাদের বিশ্বাসের তীব্রতা তোমাদের চোখে লাগায় ধাঁধা, আমাদের একনিষ্ঠতা জাগায় তোমাদের মনে ও হৃদয়ে আশঙ্কা। একবার আমাদের নীতি নিয়ে দেখো না, তোমার বহু শতাব্দীর জমা পচনশীল ও প্রস্তরীভূত অচল ধারণা একটু তাজা ও সূক্ষ্ম হয়ে উঠবে।'

একদিন সে তর্কে আমাকে বলেছিল, "আরে, এই যে পাথর কেটে মূর্তি গড়া সেটা কি কেবল ধ্বংস? এ কেবল অপ্রয়োজনীয়কে বাতিল করে আসল বক্তব্যকে সকলের সামনে পরিস্ফুট করবার একটি অবশ্য উপায় মাত্র। অনেক দিনের অবহেলিত ও নিবদ্ধ সমাজ এবং রাষ্ট্রে ধরে যায় মরুচে, তাকে একটু ঘষেমেজে না নিলে ক্ষয় অগ্রসর হতে থাকে তার প্রাণকেন্দ্রের অভিমুখে।"

আমরা যখন হেসে তাকে ক্ষেপাবার ছলে বলতাম, 'বকে যাও গো কার্ল মার্কসের তোতাপাখী, স্টালিনের পাঁচালি গাও তো তোমাকে দেবো আরও দানা।'

সেও তেমনি হেসে বলত, 'ডেকাডেন্সের ডেলা সব তোমরা—প্রগেসিভ রোলারের চাপে দেবো গুঁড়ো করে।' তারপরই হাত ধরে টানত কাফে দোমেতে যাবার জন্যে এবং তার শেষ কপর্দক খরচ করে আমাদের এক পেয়ালা কফি খাওয়াত।

মাঝে মাঝে চলত আমাদের মধ্যে নিঃস্ব সম্বলের বিনিময়ে পরস্পরকে সাহায্য করবার অক্ষম চেষ্টা।

সিত্রিনোভিচের জুতো জোড়া মেরামত হতে হতে শেষে তালির তালিতে আর যোগাযোগ রাখবার স্থান ছিল না। ফাটা চামড়ার পর্দা উঁচিয়ে প্রায়ই উঁকি মারত তার পায়ের বুড়ো আঙুল আর গোড়ালির কড়া। ডাগারম্যান একদিন, পুরনো হলেও সেলাই খোলেনি এমন একজোড়া জুতো এনে তাকে উপহার দিলো। বলল

যে, তার এক বন্ধু ভুলে তার হোটেলে জুতোজোড়া ফেলে গিয়েছে এবং তাকে লিখে জানিয়েছে যে তার ওটার আর প্রয়োজন নেই, তাই সে দিচ্ছে সিত্রিনোভিচকে। আমরা সবাই মেনে নিলাম তার কাহিনী, কেবল জানতাম যে, জুতোজোড়া ওর নিজেরই।

আতলিয়েতে একদিন সিত্রিনোভিচ এল অত্যন্ত উদ্দীপনা নিয়ে। সুসংবাদ—তার ভাগ্যে একটি ভাস্কর্য রচনার কমিশন মিলেছে। সে আমাদের তিনজনকে বললে যে, আমরা তাকে এ কাজে সাহায্য না করলে সে প্রতিশ্রুত সময়ে মূর্তিটি শেষ করতে পারবে না, অতএব আমাদের তার সঙ্গে হাত লাগানো চাই।

ভাবলাম বুঝি কোনো এক বিরাট মূর্তি তৈরী হবে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল আড়াই ফুট উঁচু একটি বছর দশেক মেয়েব প্রতিমা, যা সিত্রিনোভিচ নির্দিষ্ট সময়ে একাই অনায়াসে শেষ করতে পারত। আমাদের তাকে সাহায্য করা ভান মাত্র দেখাল, কারণ আসলে সে একাই করল সব কিছু।

কয়েক দিন পরে সে আতলিয়েতে এল হাতে একতাড়া একশো ফ্রাঙ্কের নোট নিয়ে—ভাবটা যেন ন্যাশনাল লটারী জিতেছে। নোটগুলিকে ব্যাঙ্কের কোষাধ্যক্ষের মতো পারদর্শিতা দেখিয়ে গুণে, সে চারটি সমান ভাগ করল এবং আমাদের তিন-জনের হাতে গুঁজে দিলো তারই এক একটি। বলল, তাকে সাহায্য করার পারিশ্রমিক।

সিত্রিনোভিচকে আমরা চিনতাম ভালো করেই। এ অর্থ ফিরিয়ে দেবার চেষ্টা করে কোনো লাভ হতো না। সে পেয়েছিল তো মোটে পাঁচশো টাকার মতো ফ্রাঙ্ক, তার আবার ভাগাভাগি! কিন্তু কে তাকে বোঝাবে এ কথা। আমরা পরামর্শ করে ঠিক করলাম, ঐ পন্থাতেই দেবো তাকে ফিরিয়ে, তার কষ্টলব্ধ পারিশ্রমিক।

পিট্‌কিন ভান করল একটি মূর্তি নির্মাণের কমিশন পেয়েছে এবং সে আমাদের ডাকল তাকে সাহায্য করতে। যখন তার মনগড়া একটি মূর্তি আমরা হাত লাগিয়ে শেষ করলাম, সিত্রিনোভিচকে আমাদের তিনজনকে দেওয়া তারই ফ্রাঙ্কগুলি তার পারিশ্রমিক বলে পিট্‌কিন তার হাতে দিলো।

সজল চোখে সিত্রিনোভিচ বলল, 'তোমরা আমায় অপমান করছ। চালাকি করে তোমাদের পারিশ্রমিক আমাকে ফেরৎ দিচ্ছ, আর মনে করো আমি এতই মূর্খ যে, এটা বুঝতে পারব না। আমি গরীব, সহানুভূতি দেখিও কিন্তু দয়া দেখাবার চেষ্টা করো না।'

ডাগারম্যান তার বিরাট দুই হাত সিত্রিনোভিচের প্রায় তুমড়ে-পড়া কাঁধের ওপর সস্নেহে রেখে বললে, 'বন্ধু, তুমি টাকাটাকে এত প্রাধান্য কেন দিচ্ছ? কয়েকটা ফ্রাঙ্ককে উপলক্ষ করে তুমি আমাদের জানিয়েছিলে তোমার অপরিসীম বন্ধুপ্রীতি, দিয়েছিলে আমাদের তোমার অকৃত্রিম ভালোবাসা উজাড় করে। আজ যদি আমরা

সে দানকে কত আদরে গ্রহণ করেছি তার একটা ক্ষুদ্র অভিব্যক্তি দেখাবার চেষ্টা করি, নির্দয় না হলে তুমি তা প্রকাশ করতে বাধা দেবে না।'

ডাগারম্যানের বলবার ধরনে ছিল যেন এক কলাকুশলী শেক্সপীয়েরিয়ান অভিনেতার সম্মোহনের ভঙ্গিমা। সে বাধ্য করল অভিভূত সিত্রিনোভিচকে ফ্রাঙ্কগুলি নিতে। সে নোটগুলি মুঠোর মধ্যে নিয়ে বলল, 'চলো শয়তানের দল, আমার সঙ্গে এখুনি কাফে দোমে। এই ছল-পারিশ্রমিকের কিছুটা খরচ করে আমার সঙ্গে একপাত্র মদিরা পান করলে তোমাদের বন্ধুপ্রীতি আশা করি শুকনো হয়ে উঠবে না।'

* * *

পারী ছাড়ার আগে আমার সামান্য সংগ্রহ ও সম্বলের পুঁজি রেখে এসেছিলাম সিত্রিনোভিচের আতলিয়েতে। বিদায় নেবার সময় সে বলেছিল, "জানো আমাদের দেশে একটি চলিত কথা আছে যে, প্রত্যেক বন্ধুকে বিদায়কালে আমরা দিয়ে দিই একখানা করে বুকের হাড়।"

বললাম, "বন্ধু আমি যেখানেই যাই না কেন, তোমার ঐ হাড়খানা অনুসরণ করে সর্বদা পৌছাবে তোমার সবটাই আমার মনে।"

সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে প্রলয়বিধ্বস্ত ইয়োরোপের ঘটনা পুরনো কথায় দাঁড়িয়েছে। ইয়োরোপে প্রত্যাবর্তন করে ভয়সঙ্কুল মনে খুঁজে বেড়িয়েছি হারানো বন্ধুত্বের স্রোতগুলি। কিন্তু সেগুলি কতক গেছে লুপ্ত হয়ে যুদ্ধাগ্নির শিখায় এবং কতকগুলি হারিয়ে গিয়েছে বিক্ষিপ্ত অজানা সংখ্যাহীন বিতাড়িতের গড্ডলিকায়।

গেলাম সিত্রিনোভিচের আতলিয়ের ঠিকানায়, কিন্তু পৌছে দেখি সেখানে সে বাড়ির কোনো চিহ্নই নেই। পড়ে আছে একফালি ফাঁকা জমি, যার বুকের ওপর কয়েকটা পুড়ে যাওয়া ভাঙা ইটের গাঁথুনি জানাচ্ছে এককালে সেইখানে হয়ত ছিল ঘর।

হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে আছি, এমন সময় সামনের হোটেলের দরজা থেকে হাত-ছানি দিয়ে ডাকল এক বৃদ্ধা কঁশিয়ার্জ। কাছে গেলে বলল, "কি খুঁজছ ওখানে?"

জিজ্ঞাসা করলাম সিত্রিনোভিচ ও তার ঘরের খবর।

বৃদ্ধা জানাল যে, সিত্রিনোভিচ আর এ জগতে নেই। হীন বশ্‌-রা তাকে হত্যা করেছে। এই পাড়ায় একটি জার্মান সৈন্যের কে গুপ্তভাবে প্রাণ নেয়, তার প্রতিশোধ নিতে নাৎসী শাসকরা গ্রেপ্তার করে একশো নিরপরাধ অসহায় নাগরিককে। তার মধ্যে ছিল বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী, কিশোর বয়সের ছেলেমেয়ে। সিত্রিনোভিচ ছিল তাদের একজন। তারা সকলেই হারিয়েছিল প্রাণ, কেবল সিত্রিনোভিচের মৃত্যু হয়েছিল একটু স্বতন্ত্রভাবে। বন্দীদের মধ্যে একটি যুবতীকে এক জার্মান সৈন্য ধর্ষণ শুরু করায় সিত্রিনোভিচ যায় এগিয়ে, তাকে রুখতে। কিন্তু সে বেশী দূর অগ্রসর হতে পারেনি, সেই সৈন্যের আগ্নেয়াস্ত্র মুহূর্তের মধ্যে শত গুলিতে তার দেহখানা

করে দিয়েছিল ঝাঁঝরা। শুধু তাই নয়, গেস্টাপোরা এসে ভাঙল তার আতলিয়ে আর সেই ভগ্নস্তূপে লাগিয়ে দিলে আগুন—তার অস্তিত্বকে ধরার বুক থেকে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করতে।

ডাগারম্যান ও পিট্‌কিন আজ কোথায় তা জানি না।

সিত্রিনোভিচের সংক্ষিপ্ত জীবনী ক'জনেই বা জানে, বা জানবার তাদের প্রয়োজন কি! আমার কাছে রয়ে গেছে তার স্মৃতির একটা ছাপ, যা মুছে দিতে চাইলেও মুছে যাবে না। আজও যেন শুনতে পাই তার স্বর, দেখতেও পাই যেন তার স্বরূপটা—একটি সাধারণ মানুষ, যাকে আরও দশজনে জানবার সুযোগ পেলে সে হতো অসাধারণ।

সিত্রিনোভিচকে কে বলবে না বীর? নিজের সামনে অসহায়া একটি যুবতীর পাশব ধর্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে দেখা তার পৌরুষে সহ্য হয়নি বলেই সে জেনেশুনেই এগিয়ে গিয়েছিল। প্রতিবাদের তীব্রতায় মৃত্যুকেও সে মনে করেছিল তুচ্ছ। এই পুরুষকার হয়ত সাময়িক, কিন্তু ঘটনাচক্রে সকলের মধ্যে থেকেই এটা ফুটে বেরোয় না। তার কথা ভাবতে ভাবতে মনে পড়ে যায় আর এক কাহিনী।

* * *

দেশে স্বাধীনতা-সংগ্রাম তখন পুরোদমে চলেছে। দলে দলে শিক্ষিত যুবক স্বার্থত্যাগ করে খদ্দরের সজ্জায় সজ্জিত হয়ে নেমেছে জাতীয় শিক্ষা পরিষদ প্রতিষ্ঠায়।

তাঁদের অনেকেই দু' একবার কারাবাস করে ফিরে এসেছেন। তাঁদেরই একজন ছিলেন হরিপদদা। তাঁকে কোন কারণে মাস্টার মশাই বা পদবী দিয়ে অভিহিত না করে কেন যে হরিপদদা বলা হতো তা জানি না।

তিনি ছিলেন আমাদের দাদাস্থানীয় বন্ধুদের শিক্ষক। একহারা কাঁচা সোনার রঙের চেহারা ছিল তাঁর। কদম ছাঁটা কালো চুল আর কালো এক জোড়া ভুরু ও কালো জ্বলজ্বলে চোখের বাহার মিলিয়ে তাঁকে সুপুরুষ বলা গেলেও, বীরোচিত কিছু ছিল না তাঁর চেহারায়। বরং ক্ষীণবপু সামর্থ্যহীনদের দলে তাকে পংক্তিভুক্ত করলে বিস্ময়ের কোনো কারণ ছিল না। তাঁর মুখে সর্বদাই হাসি লেগে থাকত কিন্তু মাঝে মাঝে সে হাসির পিছনে উঁকিঝুঁকি মারত দারুণ রাগের ছায়া, যা কোনো সময়ে ফেটে বেরুলেই ঝাঁঝিয়ে দিত রুদ্র তাণ্ডবের ডঙ্কা।

হরিপদদা আমাদের ছোটদের সঙ্গে কানামাছি খেলতে পর্যন্ত প্রস্তুত ছিলেন এবং আমাদের ওপর কোনোদিনই তাঁর রাগের উত্তাপ এসে পৌঁছায়নি। সেটা বরাদ্দ ছিল কেবল প্রাপ্ত বয়সীদের জন্যে।

একবার তিনি দুটি ছাত্রকে নিয়ে গিয়েছিলেন জু-গার্ডেনে। গার্ডেন থেকে তিনি স-ছাত্র শিয়ালদা স্টেশনে চলেছেন বালিগঞ্জের গাড়ি ধরতে।

দু' একদিন পরে বর্ষা আসবে জানিয়ে দু' এক পসলা বৃষ্টি হয়ে গেছে। পথে সস্তায় সওদা করেছেন একজোড়া মরসুমী ইলিশ মাছ। স্টেশনে তিনি উপস্থিত

হলেন, এক হাতে ছাতি অপর হাতে মৎস্যদ্বয়, আর তাঁর ঝোলা খদ্দরের পাঞ্জাবির দুই খেই ধরে তাঁর নাবালক সঙ্গী দুটি।

টিকিট চেকারদের অন্তপাশে দাঁড়িয়েছিল দুটি গোরা পল্টন। তাদের কোমরে রিভলবার, হাতে ছোট ছড়ি। গেট পেরিয়ে যেমন বাড়িমুখো কেরানিকুল প্লাটফর্মে ঢুকছে, অমনি তারা তাদের পিঠে সপাং করে এক ঘা বেত লাগিয়ে খিল্‌খিল করে হাসছিল। যেন কত মজার ব্যাপার।

হরিপদদা একবার ভালো করে এদিক-ওদিক তাকিয়ে বললেন, 'তোরা ঠিক আমার পিছনে থাকিস' —বলে বুকটাকে যতদূর সম্ভব সামনে চিতিয়ে তিনি গেট পেরুতে শুরু করলেন। সপাং করে পড়ল চাবুক তাঁর পিঠে —যেমন আরও বহু লোকের ওপর তা পড়েছিল। কিন্তু পর মুহূর্তে তাঁর বাঁ হাতের ইলিশ জোড়া যেন জ্যান্ত হয়ে বাঁ-দিকের গোরার মুখমণ্ডলে আছাড় খেতে লাগল আর সেই তালে তাঁর ডান হাতের ছাতির শেষাগ্র ডান-দিকের পল্টন সাহেবের উদরে বিশেষ উত্তেজনা সহকারে নৃত্য শুরু করল।

হরিপদদা যে সব্যসাচীর মতো এক সঙ্গে এমন দু'হাত চালাতে পারেন, এ দেখলে তাঁর পরিচিত অনেকেই হতভম্ব হয়ে যেত। ছাত্ররা তো ভয়ে আড়ষ্ট। এই বোধহয় হরিপদদার শেষ আস্ফালন। পল্টনরা এখুনি রিভলবার বের করে তাঁকে গুলি করে দেবে দফারফা করে। কিন্তু এই ভাবনা তাদের মাথায় ভালোভাবে কায়েমি হবার আগেই যে নিঃসহায় কাপুরুষ কেরানিকুল বেত খেয়ে নীরবে চলে যাচ্ছিল হঠাৎ যেন কার মায়া-আহ্বানে জেগে উঠে মার্‌মার শব্দে পল্টন দুটিকে ঘিরে ফেলল। কেউ তাদের হাতদুটি ধরল মুচড়ে পিছনে। একটু আগে এরা বীরত্বের দম্ভে হেসে মারছিল বেত, এখন ভয়ে কাঁচুমাচু হয়ে গলার স্বর মিহি করে চ্যাঁচাতে লাগল, 'হেল্‌প হেল্‌প'।

রেলওয়ে পুলিশ কয়েক জন সত্বর এসে পড়ায় তারা কোনোমতে উদ্ধার পেল মারমুখি জনতার পীড়ন থেকে। হরিপদদা গ্রেপ্তার হয়ে গেলেন ছোট সঙ্গী দুটির সঙ্গে। তিনি পুলিশদের বললেন, 'ও দুটোকেও গ্রেপ্তার কর, ওরাই প্রথম মেরেছে।'

ইতস্তত করে পুলিশরা খুব অমায়িকভাবে পল্টন দু'জনকে যেতে বলল। তারা বাধ্য শিশুর মতো চলল তাদের নির্দেশ অনুযায়ী।

স্টেশনেই একটি ছোট কোর্টের মতো আদালত বসল। যিনি জজিয়তি করছিলেন তিনি খুব আম্‌তা আম্‌তা করে টমি দুটিকে বললেন যে, বাবুটির এই অভদ্র আচরণে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত, তাঁর মারফৎ এই আদালতের সবাই তোমাদের এবং সরকারের ক্ষমা প্রার্থনা করছে।

এইবার হরিপদদার রাগের বম্‌ ফেটে পড়ল। যিনি জজিয়তি করছিলেন তাঁর দিকে না তাকিয়েই তিনি বলতে আরম্ভ করলেন টমি দুটিকে উদ্দেশ করে, 'বীরের সন্তানদের কি উচিত আচরণ নিরস্ত্র জনতা, যারা তোমাদের কোনো ক্ষতি করেনি

তাদের বেত মেরে বেইজ্জত করা ? কোমরে রিভলবার আর পণ্টনের ইউনিফর্ম পরে বড় দম্ভ তোমাদের —মনে করছ নিজেদের শাসক, আর আমরা তোমাদের গোলাম। আমি লিখব তোমাদের কমান্ড্যান্ট-এর কাছে, তোমাদের এই নির্লজ্জ তামাশার কথা আর তাতে সই থাকবে এই জনতার প্রত্যেকটি লোকের।'

জজ সাহেব তখন বলছেন, 'মশাই চুপ করুন, এ রকম বেয়াদপি করলে জেলে যাবেন।'

তাকে ধমক দিয়ে তিনি বললেন, 'চুপ করো মোসাহেব —ইংরাজের কেনা দাস। নিজের মানসম্ভ্রম ওদের পায়ে অঞ্জলি দিয়েছ, এখন চাও আমরাও তোমার মতো ওদের নিষ্ঠীবন ভক্ষণ করি।'

ইতিমধ্যে পণ্টন দুটি এগিয়ে হরিপদদার দুটি হাত ধরে বলতে শুরু করেছে, 'বাবু আমাদের ভুল হয়েছে, আমরা তোমার এবং সকলের কাছে মাপ চাচ্ছি, আমাদের ছেড়ে দাও। আমরা এ রকম অভদ্র আচরণ আর কোনোদিন করব না।'

জনতা তাদের এত নরম হতে দেখে চ্যাঁচাতে লাগল, 'মার বেটাদের, খুন কর' …ইত্যাদি।

কিন্তু হরিপদদা হঠাৎ শান্ত হয়ে বললেন, 'ছেড়ে দাও ওদের, আমরা ওদের পিষে মেরে ফেলতে পারি কিন্তু আমরা ভদ্র জাত। কুকুরে কামড়ালে তাকে কামড়ে দিয়ে প্রতিশোধ নেওয়া যায় না। আশা করি এই শিক্ষা যেন ওরা মনে রাখে।'

তারপর জজ আর পুলিশের অপেক্ষা না করেই তিনি ছাত্র দুটিকে বললেন, 'চল এখন বাড়ি।' কিছুটা যুদ্ধাহত অবস্থায় মাছ দুটি তখনও তাঁর হাতে। সদর্পে ছাতি বগলে বুক চিতিয়ে চলেছেন একটি ক্ষুদ্রবপু বাঙালী, যাঁর মনে প্রাণে জীবনীশক্তি টগ্‌বগ করে ফুটছে।

মডেল

রোপ্যো, অবুভোয়ার আদেম্যাঁ[১] —সকলেই চলে গেছে।

আমার আর মার্থের কাজ কিছু বাকি পড়ে যাওয়ায় আমরা আতলিয়েতে সে-দিন রয়ে গেছি। হঠাৎ আকস্মিক প্রশ্ন এল, "তোমার দুঃখটা কিসের ?" ভাবছি কথাটা মার্থ না আর কেউ বললে। এর আগে তার গলার আওয়াজ চেনবার সুযোগ আমার হয়নি। আমার দিকে তাকিয়ে সে আবার ঐ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করলে।

১। বিদায়কালে দেখা হবে

জবাব দিলাম, "না মাদ্‌ম্যয়জে.ল, আমার কোনো দুঃখ নেই।"

সে বললে, "তবে তুমি এত চুপচাপ কেন ?"

জানালাম, "কথা বললে হবে পরিচয় এবং পরিচয়ের সঙ্গে হবে নিমন্ত্রণ এবং নিমন্ত্রণের প্রতিদান দেবার সাধ্য আমার নেই বলে থাকি চুপচাপ। কিন্তু তুমি যে চুপ করে থাকো তা নিশ্চয়ই কোথাও ঘা খেয়েছ বলে।"

সে বললে, "আমি ঘা খেয়ে নির্বাক হয়েছি তা তোমাকে জানিয়েছে কোন পণ্ডিতে ?"

বললাম, "পণ্ডিতে বলেনি —তুমি এইমাত্র বললে যে, আমি চুপচাপ থাকি, আমার দুঃখটা কিসের ? কাজেই বোঝা যাচ্ছে তোমার ধারণায় দুঃখ না পেলে কেউ হয় না পরিচয়-নিসক্ত —নীরব।"

তার জবাব এল, "পরিচয় চাও না, তা হলে নিজেকে নিয়ে কাজের ফাঁকে করো কি ?"

উত্তর দিলাম, "স্তেন নদীব পাবে ঘুরি আর হাওয়া খাই। আর রবিবার যাই লুভ্‌ব-এ। এ দুটোই পাওয়া যায় বিনামূল্যে।"

সে বলল, "বেশ বেশ, আমিও যাই লুভ্‌ব-এ আর স্তেন-এর ধারে, হাওয়া খাওয়া আমারও অভ্যাস আছে। এ দুটোর কোনোটায় যদি তোমাকে কোনোদিন নিমন্ত্রণ করি তা হলে তার প্রতিনিমন্ত্রণ দিতে বোধহয় তোমার পকেট খালি হবে না।"

চমকে গেলাম, ভাবলাম এই কি সেই —ক্ষেপা কুকুরের চেয়ে যার বিষ বেশী ?

সে বলে চলল, "কিন্তু এই নিমন্ত্রণের একটি শর্ত আছে। সেটা হচ্ছে যে, আমরা কেবল পরিচিতের গণ্ডির মধ্যে রেখে দেবো এই আমন্ত্রণ। তার বাইরে যেন যেতে চেষ্টা করো না এবং সেই ইঙ্গিত কোনোদিন পেলেই আমাদের এই নিমন্ত্রণ ও প্রতি-নিমন্ত্রণের হবে সমাপ্তি।"

বেশ অব্যাহত ভাবেই বললাম, "ভয় নেই মাদ্‌ম্যয়জে.ল, আমি যে দেশ থেকে এসেছি সেখানে ছেলেমেয়েদের মধ্যে চুক্তিহীন নিমন্ত্রণ ঘটে ওঠে না। তাই তোমার দেওয়া গণ্ডিকে ডিঙিয়ে যাবার প্রচেষ্টা আমার দিক থেকে হবে না। কারণ এতে হবে আমার সঙ্কোচ ও ভয়।"

শর্ত রইল যে, আতলিয়ের আর কাউকে আমরা জানাব না এই নিমন্ত্রণের কথা, কারণ তারা জানলেই করবে কানাকানি, হবে নির্লজ্জ রসিকতা।

এরপর কয়েক দিন ধরে আতলিয়েতে' এক গোলমাল উপস্থিত হওয়ায় আমরা প্রায় ভুলে গেলাম একসঙ্গে বেড়ানোর নিমন্ত্রণ।

* * *

ডাগারম্যান মোমার্ত-এ দেখেছিল দুটি জিপ্‌সি মেয়েকে। তারা পথচারীদের হাত দেখে পয়সা ভিক্ষে করছিল, ডাগারম্যান তাদের একজনকে কাজ দেবে বলে এনেছে

আতলিয়েতে। যখন মেয়েটিকে বুঝিয়ে দেওয়া হলো যে, সে থ্রোনের ওপর দাঁড়াবে সম্পূর্ণ নগ্না হয়ে এবং তাকে দেখে আমরা গড়ব মূর্তি, তার হাতের রেশমী রুমাল-খানা অস্ত্রের মতো আমাদের সামনে নেড়ে, রুমানী ভাষায় অনর্গল কত কি বলল। ভঙ্গি আর আওয়াজে আমরা বুঝলাম যে, সে আমাদের গালাগালি দিচ্ছে। সজোরে মাটিতে পা দু' একবার ঠুকে সে চলল দরজার দিকে। সেই মুহূর্তে ডাগারম্যান ছুটে মেয়েটির সামনে গিয়ে তার বিরাট বাহুদ্বয় প্রসারিত করে হাঁটু গেড়ে বসল তার সামনে এবং অভিনয়-কেতাদুরস্ত চালে বলল, 'মাদ্‌ময়জে.ল চলে যাচ্ছ, কিন্তু যাবার আগে আমার বুকে একটা ছুরি মেরে আমাকে শেষ করে দিয়ে যাও।'

মেয়েটি তাকে ঠেলে সরিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সেই বপুর পাহাড়কে নড়াবার ক্ষমতা তার ভুজলতায় ছিল না। ডাগারম্যান বলে চলেছে, 'যবে থেকে তোমায় দেখেছি মোমার্ত-এ, আমার চোখে ভাসছে আধুনিক ভেনাসের মূর্তির ছবি এবং সে মূর্তি হচ্ছ তুমি। আমরা বেশী তো কিছু চাই না তোমার কাছ থেকে মাদময়জে.ল, কেবল চেয়েছি একটু তোমার অনবদ্য রূপের একটা আদল। ভেবে দেখ, আজ কত শত বছর ধরে লোকে মিলোর ভেনাসকে অর্পণ করে রূপদৃষ্টির অর্ঘ্য ও মুগ্ধ হৃদয়ের অঞ্জলি। তোমায় দেখে আমি যে মূর্তি গড়ব, আশা করি যখন তুমি থাকবে না বা আমিও থাকব না, এ জগতে থেকে যাবে শুধু আমার সাধনা ও তোমার রূপের মিলন, যা তৃপ্ত করবে কত শত বছরের কত সহস্র রূপ-পিপাসুদের। দেখো না আমরা সবাই সৌন্দর্যের পূজারী। আমরা শুধু পুরুষের দল হলে না হয় তোমার বলবার কিছু কারণ থাকত, কিন্তু ঐ দেখো না আমাদের মধ্যে মেয়েরাও একসঙ্গে একই কাজ করছে।' বলে ডাগারম্যান মার্থ-এর দিকে হাত দেখাল এবং সেইসঙ্গে তার চোখ যেন মার্থকে বলল, 'দোহাই তোমার, বেয়াড়া একটা কিছু বলে সব পণ্ড করে দিও না।'

সকলকে অবাক করে নির্বাক মার্থ বললে, 'ডাগারম্যান ঠিকই বলেছে। আমাদের উদ্দেশ্য কেবল রূপের সৃষ্টি করা এবং তার আয়োজনে সমাজগত শ্লীলতা ও আচারের সঙ্কীর্ণ গণ্ডিকে পরিত্যাগ করে এগিয়ে আসতে হবে তাদের —যাদের আদল থেকে চয়ন করে পরিস্ফুট হবে শিল্প।' সে বলে চলল, 'এই ধরো না গোয়্যার তৈরী নগ্না এল্‌বার ডাচেস। যাদের সামাজিক রুচি তুলে ধরে নিষেধের যষ্টি, তাদের মধ্যেই প্রমাণের চেষ্টা চলে, এ ছবির নায়িকা ডাচেস নয়। আমি বলি, গোয়্যার সঙ্গে গুপ্ত প্রেমকে চরিতার্থ করবার জন্যে ডাচেস গোপনে দেখাননি শিল্পীকে তাঁর নগ্ন শরীর। তিনি চেয়েছিলেন, বহু যুগ ধরে বহুজন দেখবে, শিল্পীর চোখে ধরা তাঁর নগ্ন দেহের মাধুরী।'

'ব্রাভো।' ডাগারম্যান মার্থর দিকে এগিয়ে গেলো তার অভ্যাস মতো বক্তার পিঠে বিরাশী সিক্কার চাপড় দিয়ে তারিফ জানাতে, কিন্তু মার্থ-এর উদ্যত তর্জনী যেন তাকে ধাক্কা মেরে থামিয়ে দিলো।

'থাক ম্যঁসিয়ো, আমার যা বিশ্বাস তাই বলেছি, তোমার তারিফ দিতে হলে অন্যকে দিও।'

মেয়েটি এ সব নাটকীয় কথা বুঝল কি-না জানি না। সে হঠাৎ ফিরে এল। থ্রোনের ওপর লাফিয়ে চড়ে ক্ষিপ্র হস্তে তার সব কাপড় খুলে এক কোণে ছুঁড়ে ফেলে দিলো, তারপর দু'হাতের আঙুল চালিয়ে খোঁপা দিলো এলিয়ে এবং সজোরে থ্রোনের ওপর পা ঠুকে চেঁচিয়ে বলল, 'নাও, করো শিগ্‌গির তোমার ভেনাস।' তারপর প্রায় অস্ফুট স্বরে বলল, 'যদি ফ্লোরিয়ান জানতে পারে যে, আমি এতগুলি পুরুষের সামনে দাঁড়িয়েছি ভেনাস হয়ে —যে ছুরি তোমার বুকে বসাতে বলেছিলে ম্যঁসিয়ো, সে তা আমার বুকে হাতল পর্যন্ত বসিয়ে দেবে।'

সে দিন আতলিয়ে বন্ধ হবার সময়ে মার্থকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "আচ্ছা মাদ্‌মায়জেল, তুমি ডাচেস এল্‌বা হলে কি করতে ?"

সে বললে, "আমি গোয়্‌য়াকে আঁকতে বলতাম আমার নগ্ন রূপ এবং ছবি শেষ হলে আমার ভৃত্যদের হুকুম দিতাম আমার সামনে শিল্পীকে অন্ধ করে দিতে, যাতে সে যতদিন বেঁচে থাকে তার মনের চোখে ভাসবে কেবল আমার রূপ এবং জগৎও জানবে যে গোয়্‌য়ার আমি শেষ ও একমাত্র নায়িকা।"

মনে মনে বললাম, 'ভাগ্যিস তুমি ডাচেস হওনি, বেচারী গোয়্‌য়া খুব বেঁচে গিয়েছেন।'

আতলিয়েতে আন্তর্জাতিক মডেলদের সুন্দরের হাটে জিপ্‌সি আদেলিতার দেহের গঠন ও লালিত্যের আভা আর সকলের রূপকে ম্লান করে দিয়েছিল। তার মাথায় এক ঝিনুক জল ঢাললে নিম্নগামী সে জলের ধারা বহমান রেখায় দেখাত উচ্চ অনুচ্চ দেহের সকল গঠনের অতুলনীয় আদর্শ সমন্বয়। অনতিরিক্ত মেদ, ঋজু ও সুঠাম এই দেহের কোথাও কাঠিন্যের আভাস মাত্র ছিল না। বেতসের মতো নমনীয়তা থাকলেও এ শরীরে তেজ ও শক্তি যেন উপচে উঠছিল। এ হেন দেহ-বল্লরীতে বৃন্তের ফুলের মতো তার মুখখানা, সুগঠিত চোখ, নাক ও ওষ্ঠ বিম্বাধর, লালিত্যের টল্‌টলে মধুক্ষরণ করত। তার আদর্শে মূর্তি গড়া পিগ্‌মেলিয়ানের কেবল গ্যালাটিয়াকে প্রাণ দেওয়া নয়, এ যেন তার রূপের সোনার কাঠিটি ছুঁইয়ে পিগ্‌মেলিয়ান চাইছে অন্তরে সুপ্ত রাজপুত্তুর ও পক্ষীরাজকে জাগিয়ে রাজকন্যার মালা পেতে, সাগর-জঙ্গমে পাড়ি দিতে। ডাগারম্যান অনেক সময় কাজ থামিয়ে মুগ্ধ নয়নে তার দিকে হাঁ করে তাকিয়ে থাকত।

মার্থ একদিন ঠাট্টা করে তাকে বলল, 'অত করে ওর দিকে চেয়ে থাকলে তোমার দৃষ্টির তাপে একদিন বেচারী গলে যাবে।'

আতলিয়েতে স্কেচিং ও পেন্টিং-এর জন্য যত মডেলের প্রয়োজন তারা প্রতি সোমবার আমাদের আতলিয়েতে আসত মনোনীত হতে। আদেলিতাকে নিয়ে আমরা দু'সপ্তাহ কাজ করেছি মাত্র। তারপর সোমবার আবার সকাল আটটা

থেকে কর্মপ্রত্যাশী পুরুষ মেয়ে মডেলদের ভিড় লেগে গেছে। হঠাৎ সুষ্ঠু সবল ও রোদে-পোড়া তামাটে রঙের একটি যুবক ঝোলা নীল রেশমের শার্ট পরে হাজির হলো। তার কালো তেল-চুপচুপে চুলে টেরি কাটা, লম্বা জুল্‌পি ও ইস্পাতের ফলার মতো ধারালো চাহনি দেখে কারো বুঝতে বাকি রইল না যে, সেও জিপ্‌সি।

আদেলিতা তাকে দেখে পাশ কাটিয়ে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করল, কিন্তু সে এক লাফে তার পাশে গিয়ে তার হাত শক্ত করে ধরে বলল, 'আদেলিতা, এখানে তুই কি করছিস ?'

সে জবাব দিলো, 'যাই করি না, তুমি এখানে কেন ?'

লোকটি একবার সবাইয়ের দিকে জ্বলন্ত চাউনি দিয়ে বলল, 'বুঝেছি, তুই এখানে মডেল হয়েছিস। গত দু'সপ্তাহ ধরে মনোলিতা একা মোমার্ত-এ হাত দেখে বেড়াচ্ছে, আর তোর কথা জিগ্যেস করলেই সে বলে, তুই মোঁপারনাস-এ কাজ নিয়েছিস। লজ্জা করে না তোর এতগুলো লোকের সামনে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে ? তুই যখন আমার স্ত্রী হবি এবং তোর ছেলেরা যখন শুনবে যে তাদের মা নির্লজ্জের মতো বস্ত্রহীনা হয়ে বাজারে দাঁড়াত, তখন কোথায় আমি মুখ দেখাব ?'

আদেলিতা তখন গলা উঁচু পর্দায় চড়িয়ে আরম্ভ করেছে, 'আমার ছেলেরা কি ভাববে, সে খোঁজে তোর দরকার নেই—আর তোকে যে আমি তাদের পিতার অধিকার দেবো—এ তোকে কে বলেছে ? আমায় দেখে এরা গড়ছে ভেনাস, আর তোকে দেখে এরা কি গড়বে ?—বোধহয় চোরের সর্দার।'

আমরা সবাই বুঝলাম ইনিই ফ্লোরিয়ান। ততক্ষণে রাগে তার মাথায় রক্ত চড়েছে। সে আদেলিতাকে জাপটে ধরে তার নিতম্বদেশে দ্রুত চপেটাঘাত বর্ষণ শুরু করল। হট্টগোল চারদিক মুখর করে তুলল এবং সব আওয়াজকে ছাপিয়ে উঠছিল ফ্লোরিয়ানের গর্জন ও আদেলিতার গালি—অ্যাম্বেশিল, শালো, সোভাজ. ...ইত্যাদি।

সারা আতলিয়ের তত্ত্বাবধায়িকা মাদাম্ রোজ. চেঁচিয়ে উঠলেন, 'সিলাঁস্ সিলাঁস্—মঁ্যসিয়ো ভেল্‌রিক্ আসছেন। ভিড়-করা পুরুষ-মেয়েরা দু'পাশে সরে রাস্তা করে দিলো, আগত প্রফেসার ভেল্‌রিক্‌কে। তিনি গম্ভীরভাবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এত গোলমাল কিসের ?'

ফ্লোরিয়ান ও আদেলিতা ঝগড়া থামিয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, তাদের দেখিয়ে স্বল্প কথায় তাঁকে জানানো হলো যে তারাই এই অস্বাভাবিক গোলমালের জন্য দায়ী। তিনি তাদের সদর দরজা দেখিয়ে বললেন, 'বেরিয়ে যাও এখনি কর্ক্যারা, এ কি মোমার্ত-এর খুনে গলি পেয়েছ ?'

তারপর মাদাম্ রোজ.কে উদ্দেশ্য করে বললেন, 'এ সব ছুটকো বাজারে মডেলদের যেন আর আতলিয়েতে ঢুকতে না দেওয়া হয়।'

প্রফেসার ভেল্‌রিকের কথায় ফ্লোরিয়ানের রোষ আরও উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল, কিন্তু

তার উত্তাপ পেল কেবল আদেলিতা। সে প্রায় তাকে কাঁধের ওপর ফেলে বলতে বলতে চলল, 'শয়তানী, তোর জিব কেটে দেবো, যাতে আর কোনোদিন না বলতে পারিস, তোর সন্তানরা কোন পিতার জিম্বায় থাকবে।'

আমরা সকলেই মনঃক্ষুণ্ন হলাম। যে আশা ও উদ্যম নিয়ে আরম্ভ করেছিলাম আদেলিতার মূর্তি,তাকে অসমাপ্ত ও ব্যাহত করে সে চলে গেলো। আমরা সকলেই ভাবলাম, বেচারা ডাগারম্যান বোধহয় তার বিচ্ছেদে মুষড়ে পড়বে। কিন্তু সে হঠাৎ সারা আতলিয়েকে অট্টহাস্যে কাঁপিয়ে দিলো। হাসির গমক থামলে সে বলল, 'আমাদের ভেনাস গড়া শেষ হলো না, কিন্তু নানেৎ যে আমাকে ধমকে শাসিয়ে কর্তৃত্ব ফলায়, এই উপলক্ষ্যে তার প্রতিকারের একটা পথ আজ জানলাম।'

* * *

মডেলদের সম্বন্ধে যে চলিত ধারণা আছে, আমারও তাই ছিল—তারা সমাজ-বর্জিত অখ্যাত শ্রেণী থেকে আসে শিল্পকর্মশালায়, অর্থলুব্ধ হয়ে। তাদের মধ্যেও যে বিভিন্ন শ্রেণীর, রুচির ও কৃষ্টির তফাৎ আছে তা আতলিয়েতে যোগদান করবার আগে আমার ধারণা ছিল না।

যাদের উদ্দেশ্যে প্রফেসার ভেল্‌রিক্ 'ছুটকো' মডেল বলে তাঁর বিরাগ প্রকাশ করলেন, তাদের মধ্যেই দেখা যায় জিপ্‌সি, রাস্তার বারাঙ্গনা, উঞ্ছবৃত্তিজীবী ট্রাম্প ও রেফিউজি—যারা অন্য উপায়ে অর্থ উপার্জনে অক্ষম হওয়ায় সুযোগ পেলে হয় মডেল। কিন্তু বেশীর ভাগ আতলিয়ে ও শিল্পীদের ব্যক্তিগত কর্মশালায় পেশাদারী মডেলরাই কাজ পেয়ে থাকে। এদের অনেকে মডেল হয়েছে বোধহয় প্রথমে অর্থ উপার্জনের উদ্দেশ্যে, কিন্তু পরে শিল্পসৃষ্টির মজায় মজে আতলিয়ের আবহাওয়া ও রূপচর্চার আনন্দটাই তাদের জীবনে বেশী প্রাধান্য এনে দিয়েছে। অনেকে শিল্পীর সান্নিধ্যে এসে তার অনুরাগে হয়েছে মডেল।

চতুর্দশ শতাব্দীর ফ্রা ফিলিপো লিপ্পি ও নান্ বুত্তির মতো প্রেমাভিনয় আজও চলেছে ইয়োরোপে এবং ভবিষ্যতেও চলবে।

ফ্রান্সের কোনো অখ্যাত গ্রাম থেকে তরুণী সুজান ভালাদঁ ভাগ্যান্বেষণে শহরে এসে পড়েছিল সার্কাসের ট্রাপিজ. খেলোয়াড় হিসাবে, কেবল দৈবক্রমে মাটিতে পড়ে ভগ্নাঙ্গ হওয়ায় ভালাদঁ সে পেশা ছেড়ে হলো মডেল। তাও অর্থের কারণে নয়, কোনো এক শিল্পীর প্রেমে পড়ে। তারপর তার আদলকে নিয়ে শিল্প-রচনায় উৎসুক হলো প্রায় ডজন খানেক উনবিংশ শতাব্দীর মুখ্য শিল্প-রথী। পিসারো রেনোয়া, দ্যোগারও নাম সেই তালিকায় দেখা যায়।

তরুণী ভালাদঁর হলো সন্তান এবং কোন শিল্পী যে তার পিতা তা কেউ জানে না। শিল্পী উত্রিল্লো তাকে পুত্র বলে গ্রহণ করায়, সে আজ মরিস উত্রিল্লো নামে পৃথিবী-বিখ্যাত শিল্পী।

ভালাদঁ শুধু শিল্পীদের মডেল হয়েই জীবন কাটাননি। তাদের দেখাদেখি তিনিও

করেছিলেন শিল্পের প্রচেষ্টা এবং তাঁর করা ছবি আজ পারীর বিখ্যাত আধুনিক শিল্পসংগ্রহশালা মুজে দার মদার্ন-এর একটি বিশেষ কক্ষে অন্যান্য বিখ্যাত শিল্পীদের কাজের মহলে দক্ষতার সঙ্গে পড়শী হয়েছে। ভালার্দ ছন্নছাড়া, মদ্যপ ও অর্ধোন্মত্ত মরিস্‌কে ঘরে তালাবদ্ধ করে শিল্পে নিযুক্ত না করলে আজ জগৎ পেত না এই শিল্পীর দান।

পিতৃদত্ত সামান্য ধন নিয়ে পোলিশ মহিলা জেন্‌ভিয়েভ সোফি ব্রেজ.কা এলেন বৃটেনে লেখাপড়া করতে। তিনিই কেবল দেখলেন ভাগ্যভ্রষ্ট ফরাসী যুবক আঁরি গোদিয়ের-এর মধ্যে বিরাট শিল্পীর উন্মেষ। তিনি একাধারে মাতা, সঙ্গিনী, পেট্রোন, প্রণয়িনী ও মডেল হয়ে চাইলেন যাতে শিল্পী গোদিয়ের-এর শিল্পসাধনা হয় সম্পূর্ণ। গোদিয়ের প্রেমে কিংবা কৃতজ্ঞতায় নিল ব্রেজ.কার নাম নিজের নামের সঙ্গে জড়িয়ে। সে যদি অকালে নিজ দেশপ্রেমে মেতে প্রথম মহাযুদ্ধে মাত্র তেইশ বছর বয়সে প্রাণ না হারাত, তা হলে জগৎ আজ পেত বিংশ শতাব্দীর এক সেরা শিল্পীর সম্পূর্ণ দান। ব্রেজ.কা তার প্রতিভা ঠিকই ধরে ছিলেন।

গোদিয়ের-এর মধ্যে যে শিল্পী ছিল তার বিরহে কিংবা প্রণয়ীর বিচ্ছেদে পাগল হয়ে উন্মাদাশ্রমে আমৃত্যু জীবন কাটালেন ব্রেজ.কা। কিন্তু যে কয়েকটি মূর্তি ও ছবি গোদিয়ের-এর নাম বহন করেছে, সেগুলি চিরকাল কায়ার সঙ্গে ছায়ার মতো ব্রেজ.কারও নাম বহন করবে।

কত শিল্পীর স্ত্রী, স্বামীর পেশাকে ভালোবেসে অসঙ্কোচে হয়েছেন তাঁর মডেল। আবার কত মহাশিল্পী মডেলকে ভালোবেসে করেছেন গৃহিণী। রুবেন্‌স-এর দুই স্ত্রী, রেমব্রাণ্ট-এর সাসকিয়া ও হেন্‌ড্রিখিয়ে তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত। অনেক দুঃস্থ ছাত্রছাত্রীও মডেল হয়ে রোজগার করে তাদের পড়াশুনার খরচ জুগিয়ে নেয়। বিশেষ করে যারা বিদেশী তাদের পক্ষে এত সহজে অন্য কোনো কাজ পাওয়া সম্ভব নয়। কারণ অন্য সব পেশায় বিদেশীদের সরকারী অনুমতি লাগে এবং সে অনুমতি পেতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়।

বহু শিল্পীর দৃষ্টান্তে দেখা যায় যে, তাদের মনের শিল্পাদর্শকে জাগায় মডেল বিশেষের শরীর ও রূপের ধাঁচ। অনেক সময় পুরনো শিল্পীর নাম-না-লেখা ছবিতে তাঁর প্রিয় মডেলের আদর্শের সাদৃশ্য দেখে ধরে ফেলা যায়, সেটি কার হাতের কাজ। আতলিয়েতে কতবার প্রফেসার ও শিক্ষার্থীদের শুনেছি কোনো মডেলকে দেখিয়ে বলতে —রুবেন্‌স, অ্যাংগ্‌র বা ভাস্কর মাইয়ল-এর টাইপ।

মাইয়ল যখন তাঁর আদৃতা মডেল 'দীনা'র সন্ধান পান, তখন তাঁকে লেখেন, 'মাদ্‌ম্যয়জে.ল, শুনলাম তুমি না-কি একটি মাইয়ল এর ভাস্কর্য। যদি তাই হও, তা হলে আমার আতলিয়েতে এসে ভাস্কর্য রচনায় সাহায্য করলে বিশেষ সুখী হব।' তিনি আমৃত্যু এই দীনাকে সামনে রেখে গড়েছিলেন তাঁর সেরা ভাস্কর্যগুলি এবং তার আদলে গড়া একটি বিরাট টরসো-র ওপর সারা জীবন কাজ করেও তিনি মনে

করেননি যে, তাঁর চোখে উদ্ভাসিত দানার গঠনের সবটা রূপ তিনি দিতে পেরে-ছিলেন এই মূর্তিতে।

পেশাদারী মডেল ছাড়াও অনেকে শিল্পীর শিল্পসৃষ্টি প্রত্যক্ষ করার কৌতূহল নিয়ে আসেন শখের মডেল হতে। শিল্প-ইতিহাসে এর দৃষ্টান্ত আছে প্রচুর।

একবার সুবিখ্যাত ভাস্কর এপ্‌স্টাইন এক প্রৌঢ়ার নগ্না মূর্তির ভাস্কর্য দেখিয়ে আমায় বললেন, "জানো এ কে ?"

"না" বলায় বললেন, "একদিন এই মহিলাটি আমার স্টুডিয়োতে উপস্থিত হয়ে জানালেন, তিনি রাজকুমারী ব্র্যাগানজ়া এবং তাঁর একটি নগ্ন মূর্তি গড়তে অনুরোধ করলেন। তিনি বললেন, 'তোমার করা ভাস্কর্য কেনবার সামর্থ্য আমার বর্তমানে নেই। কিন্তু আমার অনেক দিনের ইচ্ছে যে, নিজের চেহারার আদলে তোমার গড়া ভাস্কর্য কেমন হয় দেখব।' ভাবলাম সে পাগল এবং কোনো অজুহাতে তাকে বিদায় করলাম, কিন্তু বারবার সে আসতে লাগল। খোঁজ নিয়ে জানলাম, সত্যিই মহিলাটির জন্ম শেষ পর্তুগীজ রাজার পরিবারে। কি জানি, কেমন তার প্রতি একটা মায়া হলো এবং গড়লাম এই বিগলিতা বিশীর্ণা প্রৌঢ়ার দেহ। মনে করলাম, মস্তিষ্কের বিকৃতিতে সে বোধহয় এখনও মনে করে নিজেকে সুগঠিত দেহ সুন্দরী যুবতী এবং আমার করা তার বর্তমান রূপ দেখে হয়ত স্তম্ভিত ও ব্যথিত হবে। কিন্তু সে নিজেই বলল, 'মনে ভেবো না যে, আমার জরাময় দেহের কুরূপ সম্বন্ধে আমি অচেতন। কিন্তু জানো, আমি এক সময় ছিলাম স্বরূপা সুন্দরী। সে সময় এ রকম করে যেচে মডেল হতে চাইলে, তোমরা—শিল্পীরা আমায় পাবার জন্যে লাগিয়ে দিতে লড়াই। কিন্তু কেবল যৌবনের জোয়ারকে মূর্ত করে কেন হবে সেরা ভাস্কর ? তুমি যদি জীবনের অপরাহ্ণের ক্ষীণ স্রোত ছবিতে জাগিয়ে তুলতে পার, চলে-যাওয়া সে ভরা-জোয়ারের স্মৃতি, তবেই তোমাকে বলব, কৃতী শিল্পী'…।"

এপ্‌স্টাইন আমায় বললেন, "ভালো করে দেখো, সত্যিই লোলচর্মের রেখা ধরে ফুটে উঠবে তোমার চোখের সামনে উন্নতবক্ষা ক্ষীণকটি যৌবনগর্বিতার ছবি।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "রাজকুমারী ব্রাগানজ়া এখনও কি আসেন মূর্তি দেখতে আপনার স্টুডিয়োতে ?"

এপ্‌স্টাইন বললেন, "না। এই মূর্তিটা শেষ হবার কয়েক সপ্তাহ পরেই তিনি একটা উঁচু বাড়ির ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়ে আত্মহত্যা করেন।"

* * *

মডেলদের মধ্যে রাশিয়ান ইয়ানিনার একটু স্বাতন্ত্র্য ছিল। প্রথমত অন্যান্য স্লাভ মেয়েদের মতো সে মেদবহুল প্রশস্তবক্ষা ও জঘনা ছিল না। তাদের মতো ছিল না তার পদদ্বয় ভাঁজা মুগুরের মতো। তাদের যেমন চৌকশ মুখে মোটা নাক ও ঠোঁট দেখা যায়, ইয়ানিনার মুখ ছিল তার ঠিক বিপরীত। অণ্ডাকৃতি মিহি মুখশ্রীতে ছিল সূক্ষ্ম নাসাপুটে সাজানো সোজা নাক, জলজলে ভাসা দুটো কালো কালো চোখ,

আর ছোট বিম্বোষ্ঠ অধরে মানানো বক্র। এই সুশ্রী মুখমণ্ডলকে সগর্বে উন্নত রাখত তার মৃণালগ্রীবা। আর তার নীচে যেমন আমাদের চোখ নামত, দেখতাম তার নাতিপ্রশস্ত পীনোন্নত স্তনশোভিত বক্ষ, কৃশোদর, সুপুষ্ট ও মসৃণ শ্রোণীদেশ এবং তার ভারবহনকারী সুগঠিত ক্রমদীর্ঘ পদযুগল।

সে না-কি ছিল কাউন্ট-কন্যা। রাশিয়ান বিপ্লবে বিতাড়িতা হয়ে এখন হয়েছে পারীর শিল্পশালার মডেল। এক সময়ে খ্যাতনামা শিল্পীরা নিযুক্ত হতো তার শিল্প-শিক্ষকের কাজে, আর এখন সে হয়ে গেছে শিল্প-অধ্যাপক ও শিক্ষার্থীর শিল্প সাধনার উপলক্ষ্য মাত্র। তার স্বভাবজাত আভিজাত্যকে অন্য মডেলরা সমীহ করে তফাতে চলত। যখন সে বুলভার মোঁপারনাস দিয়ে হেঁটে চলত, পাশের কাফেতে বসা শিল্পীরা দাঁড়িয়ে তাকে অভিবাদন জানাত। এমন কি প্রফেসার ভেল্‌রিক্‌ও আতলিয়েতে তাকে ভঙ্গির নির্দেশ দিতেন বেশ সম্মান-সহকারে।

একদিন সে খুব উৎফুল্ল হয়ে এল আতলিয়েতে। বলল, 'তোমরা আমাকে ফেলিসিতাসিয়ঁ[1] জানাও, কারণ আমি কন্‌জ়.রভেতোয়ার-এর[2] শেষ পরীক্ষায় কৃতকার্য হয়েছি।'

জিজ্ঞাসা করে জানলাম যে, সে কন্‌জ়.রভেতোযার-এর খরচ চালিয়েছে মডেলের পারিশ্রমিক দিয়ে। ক্ষুণ্ণ হলাম সবাই, যখন সে বলল যে, তাকে আর মডেল হিসাবে পাব না। আমাদের যেন একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যে বলল, 'অবশ্য এত পরিশ্রমের পর যদি অপেরায় গাইবার সুযোগ না পেয়ে আমাকে কাফের গায়িকা হতে হয় তা হলে ফিরে আসব আবার তোমাদের মধ্যে।' তারপর সে আমাদের সকলকে অনুরোধ করল কোনো কাফেতে গিয়ে তার ভবিষ্যৎ শুভকামনা করে আমরা তার সঙ্গে কিছু পান করি।

গেলাম তার সঙ্গে মোঁপারনাস-এর একটি অতি সাধারণ কাফেতে। এর এক দিকে রেস্তরাঁ সেখানে মধ্যাহ্নভোজন ও রাতের আহারে বেশী লোক সমাগম হয়। বাকি অংশে দিবারাত্র লোক আসে, কফি খায়, বা মদিরা পান করে খোশগল্প জমাতে। দু'এক কোণে ছবি ও রঙ-বেরঙের বাতি-দেওয়া জুয়াখেলার বাক্স। তাতে পয়সা ফেলে স্প্রিং-এর ঘায়ে বল গড়িয়ে হাজার বা দশ হাজার নম্বরগুলি ছুঁয়ে, পূর্বে অপারগ লোকেদের দেওয়া জমা পয়সা তোলবার চেষ্টা করে চলে অনেকে। কেউ বাজি মাত করলেই ক্রিং করে ঘণ্টা বেজে ওঠে। উপস্থিত সকলের একটু টনক নড়ে বাক্স ও খেলোয়াড়ের প্রতি। গারসঁ এসে চাবি খুলে দেয় বাক্সর আধারে জমা-পয়সার থোক। আবার চলে নতুন উত্তমে বাজি-জেতা খেলোয়াড়ের স্প্রিং ও বলের ঠোকাঠুকি। আমরা সদলবলে হৈচৈ করে কাফেতে বসলাম যেন ইয়ানিনার বাজি জেতার উপলক্ষে।

১। শুভকামনা [] ২। শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতশিক্ষালয়

ইয়ানিনা ও এইলাস

আমাদের গল্প বেশ জমে গেলো। এমন কি কাফের অধিকারিণী মাদাম্‌ও এসে আমাদের আসরে ভিড়ে গেলেন। ইয়ানিনা বলে চলেছে—

'জানো, এটি অতি সাধারণ কাফে অনভিজ্ঞের কাছে, কিন্তু বিশ বছর আগে যাদের সঙ্গে এই কাফের যোগাযোগ ছিল তারাই জানে, শিল্প-ইতিহাসের কয়েকটি পাতা এখানে লেখা হয়ে গেছে। এইখানেই এসে বসে থাকত মদিগ্‌লিয়ানি। নিঃস্ব সে, ক্ষুধার তাড়নায় মাদাম্‌কে অনুনয় করত এক বাটি স্যুপ বা এক টুক্‌রো রুটি মাংস দিতে, এই দয়া-দাক্ষিণ্যের প্রতিদানে শিল্পী মাদাম্‌কে দিত মাঝে মাঝে তার দু'একটি স্কেচ বা ছবি। কিন্তু সেগুলিকে মাদাম্‌ অখ্যাত শিল্পীর কৃতজ্ঞতার স্মারক—কাগজ ও ক্যান্‌ভ্যাস-এর অতিরিক্ত মূল্যবান কিছু নয় ভেবে একটি কাবার্ড-এ রেখে দিত। তার উদ্দেশ্য ছিল যে অনেক স্কেচ আর ছবি জমা হলে, একদিন সের-দরে সেগুলোকে পুরনো কাগজ বিক্রেতার কাছে বিক্রি করে দেবে।

'অনাহার-পীড়িত শিল্পী মদিগ্‌লিয়ানির ক্রমে হলো যক্ষ্মা এবং অকালে হলো তাঁর মৃত্যু। কিন্তু জীবিতকালে যে মদিগ্‌লিয়ানির কেউ সমাদর করেনি, কেউ দেয়নি তাঁর শিল্পের মূল্য, তাঁর জীবনান্তে হঠাৎ সাড়া পড়ে গেলো সারা শিক্ষিত শিল্পরসিক মহলে, তার এই অকালমৃত্যুতে উঠল হাহাকার। তাঁর শব-শোভাযাত্রার পিছনে চলল মাইলের অধিক দীর্ঘ পারীর নাগরিকরা। তার মধ্যে শোকাবনত মস্তকে চলেছিলেন পিকাসো, বোনার্‌, ব্রাঙ্কুসি প্রভৃতি পৃথিবীবিখ্যাত শিল্পীরা। খবরের কাগজে বড় বড় অক্ষরে প্রকাশিত হলো তাঁর মৃত্যুর শোকোচ্ছ্বাস, তাঁর প্রতিভা ও জীবনকাহিনী।

'মদিগ্‌লিয়ানির ছবি নিয়ে ক্রেতা-বিক্রেতাদের মধ্যে পড়ে গেলো কাড়াকাড়ি এবং জীবিতকালে যাঁর ছবির জন্য অনেকেই দিতে চায়নি এক কানাকড়ি, তাদেরই হাত বদলে সেই ছবিরই মূল্য উঠতে লাগল ক্রমপর্যায়ে বিরাট অঙ্কে।

'সেই সব পড়ে দেখে কাফের মাদাম্‌ ভাবলেন, তিনি আজ অতুল সম্পদের অধিকারিণী, কারণ তাঁর কাবার্ড ভরে আছে মদিগ্‌লিয়ানির দেওয়া কত ছবি ও স্কেচ। সেগুলিকে বিক্রি করলে তাঁর যে অর্থ লাভ হবে তা শিল্পী মদিগ্‌লিয়ানি যদি পরিণত বয়স পর্যন্ত বেঁচে চর্ব্যচুষ্য খেয়ে যেতেন, তা হলেও তার খরচ এইসব ছবির মূল্যের এক-দশমাংশও হতো না। কাবার্ড-এর ওপর রাখত রেস্তরাঁর পরিচারিকারা আহারান্তে উচ্ছিষ্ট প্লেটের সারি। কাঠের ফাটল বেয়ে নামত স্যুপ ও খাদ্যের তরল চোয়ানি। মাদাম্‌ শিল্পীর কাছ থেকে স্কেচ বা ছবি পেলেই কাবার্ড-এর দরজা একটু ফাঁক করে সেগুলিকে ভিতরে ফেলে দিতেন। তারপর কোনোদিনই সেগুলির ওপর দৃষ্টিপাত পর্যন্ত করেননি। স্যুপ ও খাদ্যের রসসিক্ত সেইসব স্কেচ ও ক্যান্‌ভ্যাস-এর

তাড়া মজে হয়েছিল মূষিকের মুখরোচক খাদ্য। যেখানে মাদাম্ আশা করেছিলেন দেখবেন বহু দিনের সঞ্চিত শিল্পসম্পদের রাশি যেন সোনার বুলিয়ান-এ রূপান্তরিত হয়ে আছে, সেখানে দেখা গেলো কেবল মূষিকভুক্তাবশিষ্ট কাগজ ও ক্যান্‌ভাস-এর স্তূপীকৃত টুক্‌রোগুলি।

'নৈরাশ্য যেন সজোরে একটা চপেটাঘাত করে মাদাম্‌কে বসিয়ে দিলো। তিনি ডুকরে কেঁদে উঠলেন। ছিঁড়তে লাগলেন চুল ও মাথা কুটলেন মাটিতে। চারপাশ থেকে সবাই এল তাঁকে শান্ত করতে এই ভেবে যে, মাদামের শিল্পী মদিগ্‌লিয়ানির প্রতি ছিল অসীম মায়া ও স্নেহ এবং তাঁর বিয়োগে তিনি এখন শোকে মুহ্যমান হয়েছেন। কয়েক জন কাফের পরিচারিকা ছাড়া কেউ জানল না মাদাম্ কাতর হয়েছেন কিসের বিয়োগে।'

বর্তমান কাফের মাদাম্ জিজ্ঞাসা করলেন ইয়ানিনাকে, 'সে কাবার্ডটি কোন জায়গায় ছিল?' কারণ মদিগ্‌লিয়ানির সময় থেকে কাফেটির স্বত্বাধিকার বদল হয়েছে কয়েক বার এবং তিনি এ সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না।

ইয়ানিনা বলল, 'আমি কি করে বলব? কারণ যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন আমার বয়স সাত বছর মাত্র। এ কাহিনী আমি শুনেছি আমার পিতা কাউণ্টের কাছে। তিনি স্বদেশ-বিতাড়িত হয়ে কপর্দকশূন্য অবস্থায় পারীতে এসে কাজ নিয়েছিলেন এই কাফেতে।'

আমাদের অলক্ষ্যে এতক্ষণ শ্মশ্রুগুম্ফবিনিন্দিত মুখ, উস্কখুস্ক কেশ ও বেশবিশিষ্ট একটি যুবক, ইয়ানিনার একটি স্কেচ করতে ব্যস্ত ছিল। তার চেহারার একটা অক্ষম আদলে কাগজ ভরে তার সামনে রেখে সে বলল, 'মাদ্‌ময়াজেল, আমার ছবিটা কিনে নাও। বলা যায় না ভালো করে রেখে দিলে দু'দশ বছরে মদিগ্‌লিয়ানির মতো এ অনেক মূল্যবান হতে পারে।'

ইয়ানিনার সঙ্গী আর এক ভদ্রলোক, কাগজে ঐ যুবকের একটি ব্যঙ্গচিত্র এঁকে তাকে দিয়ে বললেন, 'এই নাও তোমার পারিশ্রমিক। এটা রেখে দিও। হয়ত সময়ে এর মূল্যে যে পয়সা পাবে তাতে তোমার ক্ষুন্নিবৃত্তির একটা মহা উপায় হয়ে যাবে!'

যুবকটি রেগে বলল, 'ও, বুঝিনি যে, তোমরা আতলিয়ের লোক। তোমাদের মধ্যে নানান দেশীয়দের দেখে মনে হয়েছিল যে, তোমরা ট্যুরিষ্ট।' তারপর ইয়ানিনার হাত থেকে স্কেচখানা এক রকম ছিনিয়ে নিয়ে বিড়বিড় করে বকতে বকতে সে চলে গেলো।

যে ভদ্রলোক ব্যঙ্গচিত্রটি এঁকেছিল ইয়ানিনা তাকে কপট ভর্ৎসনা করে বলল, 'মিরকো, তুমি অত্যন্ত ইতর। না হয় কয়েক ফ্রাঙ্ক দিয়ে বেচারীকে একটু সাহায্যই করতে! তার দারিদ্র্যকে এমন উপহাসের কি প্রয়োজন ছিল?'

মিরকো বলল, 'সে শুধু ছবিটি এঁকে ভিক্ষা চাইলে দিতাম। কিন্তু নিজেকে

মদিগ্লিয়ানির সমান তুলনা করবার স্পর্ধা দেখানোতে তাকে সাজা দেবার লোভ সামলাতে পারিনি।'

মিরকো প্রাচ্য ইয়োরোপের একটি দেশের লোক। পারীতে সরকারী বৃত্তি পেয়ে এসেছে চিত্রাঙ্কনের অভিজ্ঞতা পেতে। তার সঙ্গে আলাপ হওয়ার দু'একদিন পরে সে আমাকে একটি আন্তর্জাতিক যুব সম্মেলনের ক্লাবে নিমন্ত্রণ করল, সেখানে তার নিজের দেশের অনেকগুলি ছাত্র ছিল এবং তারা প্রায় সকলেই সরকারীবৃত্তিধারী। মিরকো তাদের একজনের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিতে সে মুষ্টিবদ্ধ হাত ওপরে তুলে কমিউনিস্ট প্রথায় আমায় অভিবাদন জানাল।

আমি 'আঁশাতে' বলে ভারতীয় প্রথায় নমস্কার করলে সে বলল, "ম্যঁসিয়ো, তুমি দেখছি কমিউনিস্ট-বিরোধী।"

বললাম, "না ম্যঁসিয়ো, আমি কারুরই বিরোধী নই। আমাদের মধ্যে হাত উঁচু কি হাতজোড় করে অভিবাদন করার পার্থক্য থাকলেও এর উদ্দেশ্যে আশা করি কোনো গরমিল নেই।"

সে বলল, "মিরকো আমাকে জানিয়েছে যে, তুমি ভাস্কর ও চিত্রশিল্পী, এবং পারীতে লেখক ও শিল্পীরা সকলেই কমিউনিস্ট। যদিও সব কমিউনিস্ট এখানে লেখক ও শিল্পী হয় না।" —বলে একটা মৌলিক রহস্য করে ফেলেছে ভেবে খুব হেসে নিল। হাসি থামলে বলল, "অবশ্য মিরকোর বন্ধুরা সকলে যে কমিউনিস্ট নয় তা আমার জানা উচিত ছিল। বন্ধু মিরকোর মাঝে মাঝে চেপে যায় বুর্জোয়া খেয়াল। এই দেখো না, একটা হোয়াইট রাশিয়ান মেয়ের প্রেমে পড়ে সে হাবুডুবু খাচ্ছে। যাইহোক, তুমি যে কমিউনিস্ট নও তা বুঝেছি। এখন তুমি কোন রাজনৈতিক দলভুক্ত তা জানাও।"

আমার মনে পড়ল আতলিয়েতে প্রথম পরিচয়ে, সিত্রিনোভিচও প্রশ্ন করেছিল, আমি কমিউনিস্ট, স্যোসালিস্ট বা ফ্যাসিষ্ট কি-না? কিন্তু আমি এর কোনোটাই নয় বলায় হতভম্ব হয়ে সে জিজ্ঞাসা করেছিল, আমি কোন গ্রহ থেকে খসে পড়লাম এই পৃথিবীতে! যেন এর বাইরে কেউ থাকতে পারে তা তাঁর ধারণার অতীত।

মিরকোর বন্ধুকে বললাম, "আমি মনুষ্য সমাজের অন্তর্ভুক্ত এবং আশা করি সে বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ নেই।"

সে বলল, "তোমার কথাবার্তা ও রাজনৈতিক ধারণার আভাস দেখে মনে হচ্ছে, তুমি কুল্যাক-সম্ভূত। শুনেছি তোমাদের দেশে ইংরাজরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য তাদের খুব তোয়াজ করে থাকে। তোমরা রেখেছ প্রোলেতারিয়াৎদের ক্রীতদাস করে। শোনা যায়, তোমাদের শ্রেণীর লোকেরা চাকরদের গোড়ালির বন্ধন কেটে দেয়, যাতে তারা দৌড়ে পালাতে না পারে।"

হেসে বললাম, "ম্যঁসিয়ো, কুল্যাকদের প্রতি তীব্র বিদ্বেষে দেখছি ঐতিহাসিক সত্যকে পর্যন্ত ভুলে গিয়েছেন। আমরা চাকর রাখি ঠিকই, কিন্তু তারা ক্রীতদাস

নয়, আর গোড়ালির বন্ধন কাটার উদ্যোক্তারা ছিলেন হয়ত তোমারই পূর্বপুরুষদের কেউ, যদি তাঁদের কেউ আমেরিকায় গিয়ে থাকেন সেট্‌লার হয়ে। আমেরিকান সেট্‌লাররা এই কাজে দড় ছিলেন —নিগ্রো ক্রীতদাসদের অধীন ও বন্দী রাখতে। আমি কুল্যাক-সম্ভূত কি-না বলতে পারি না, তবে পৈত্রিক ভিটে একটা আছে, এবং সাধারণ মজুরের মতোই খেটে দিন চালাই। এতে আমি তোমার রাজনৈতিক মতে মানুষের কোন পর্যায়ে পড়ব সেটা তুমিই জানো।"

মিরকো আমাকে একটু দূরে টেনে নিয়ে চাপা গলায় বলল, "এই্‌লাস-এর কথায় কান দিও না, বা কিছু মনে করো না। ও ঐ রকম উৎকট অন্ধভাবে সাম্যবাদী।"

এইলাস চেঁচিয়ে উঠল, "খবর্দার মিরকো, ওকে তুমি তোমার রাজনৈতিক ভ্রান্তি দিও না। ও আমার শিকার। এমন একটা পিওর ডেকাডেন্ট মাল পেয়েছি, ওর শুদ্ধিকরণ (purification) একটা চমৎকার এক্সপেরিমেণ্ট হবে।"

সে ফের শুরু করল, "মার্কসের মতে, যে শ্রেণী যত বেশী ডেকাডেণ্ট, বিশুদ্ধি-করণের সুযোগ পেলে ধাপে ধাপে এগিয়ে যায় সে তত বেশী দ্রুত। ম্যঁসিয়ো নিশ্চয়ই জানো, মানবসমাজে আছে কাপিতালিস্ত, বুর্জোয়া, পেতিবুর্জোয়া ও প্রোলে-তারিয়াৎ শ্রেণী। এই প্রোলেতারিয়াৎরা ক্যাপিতালিস্তদের দেশে ধনীদের দ্বারা শোষিত ও পীড়িত হয়ে পিষে মরছে। এদের উদ্ধার করতে হবে। ওপরে এনে এদের হাতে তুলে দিতে হবে ন্যায্য পাওনা রুটি।"

বললাম, "ম্যঁসিয়ো আমি তোমার সঙ্গে একমত যে, দেশের লোকের ও সর-কারের কর্তব্য, যাতে প্রত্যেকের পরিধেয়, অন্ন ও আশ্রয়ের সংস্থান হয়। কিন্তু মানুষের আকাঙ্ক্ষা ও উচ্চাভিলাষ কেবল কি রুটি-প্রাপ্তির সংগ্রাম ও জয়ে সীমাবদ্ধ থাকবে? যে রুটি পায় না তার জীবন কি একেবারে নিষ্ফল? বহু শিল্পী, লেখক, কবি ও দার্শনিকরা ভোগ করেছিলেন অসীম দারিদ্র্যের তাড়না এবং তাঁদের অনাহারগ্রস্ত জীবন, মানব-ইতিহাসে রেখে গেছে লজ্জা ও কলঙ্কের ছাপ। কিন্তু আমার মনে হয় এই দারিদ্র্য ও দুঃখভোগ সত্ত্বেও, সৃষ্টির আনন্দের ক্ষণগুলিতে হয়ত পার্থিব নিঃস্বতার আঘাত দাগ বসাতে পারেনি তাঁদের মনে ও দেহে।"

এইলাসের উত্তর এল যেন স্টেন্‌গানের গুলি-বৃষ্টি, "আরে তাদের পেট যদি ভরা থাকত তা হলে তারা যে শিল্প ও সাহিত্যের সম্পদ এনে দিত তার তুলনায়, তাদের দেওয়া দান অতি ক্ষুদ্র ও নগণ্য। তাছাড়া তারা তো কেবল বুর্জোয়া ও কাপিতালিস্তদের দাসত্ব করায়, সৃষ্টি করেছে তাদেরই তাঁবেদারী-মোহাচ্ছন্ন শিল্প। শিল্প-সাহিত্যকে এই কাপিতালিস্ত ও বুর্জোয়া-সেবী ভ্রান্তি ও মোহ থেকে উদ্ধার করবার জন্যই আমাদের বর্তমান সংগ্রাম।"

বললাম, "যারা শিল্প ও সাহিত্যের সমঝদার, তারা তো এই দানকেই দেখে মহান্ ও সম্পূর্ণ। এরই রসে রাঙানো তাদের মনের কোনো অংশটা যে খালি তা তো মনে হয় না। আর এই সংগ্রামেই তো জন্ম হচ্ছে মহান্ শিল্প ও সাহিত্যের।

যখন সবাই ন্যায্য পাওনা রুটি পেয়ে যাবে তখন সংগ্রামের কারণ শেষ হয়ে যাওয়ায়, বলবার আর বোধহয় কিছু থাকবে না এবং পরিপূর্ণ উদর আনবে সর্বজনীন ঘুম, মানসিক আলস্য ও নিষ্ক্রিয়তা।"

সে বলল, "এ সব শিল্পরসের অধিকারী কেবল একটি ছোট সমঝদারের সমষ্টি। আমরা এরই বিরুদ্ধে লড়াই করে সুবিধাভোগীদের নিপাত করে এমন শিল্প ও সাহিত্যের জন্মের সুযোগ এনে দেবো, যা আনন্দ দেবে প্রত্যেকটি 'কামারাদ্‌কে'।"

বললাম, "ম্যঁসিয়ো আমার মোহাচ্ছন্ন মস্তিষ্ক বলে শিল্প ও সাহিত্যে ক্রমোত্তর উচ্চাঙ্গের সন্ধানে নতুনতর কলা ও কাহিনীর সৃষ্টি এবং তার স্রষ্টা ও রসগ্রাহীর সংখ্যা যত চেষ্টাই করো না থেকে যাবে সীমিত। তোমার ভাবধারায় তৈরী শিল্প ও সাহিত্যিকদের রচনা প্রকাশ মাত্রেই সর্বজনগ্রাহ্য হয়ে, তোমার কথায় প্রোলে-তারিয়াৎ কৃষ্টির আদর্শ রূপায়ণ হবে কিন্তু তাতে উচ্চাঙ্গ ও অভিনব কথাটা কেটে বাদ দিতে হবে। তোমরা তো পিকাসোকে কমিউনিস্টদের বন্ধু বলে খুব খাতির করো কিন্তু তাঁর রচনা তো বহুজনগ্রাহ্য নয় কাজেই তার শিল্পকে তোমার নবতন্ত্রের রাষ্ট্রে স্থান দেবে কি ?"

সে বলল, "পিকাসোর কাজ আমরা রেখে দেবো সংগ্রহশালায়, ঘুণ-ধরা ক্যাপি-তালিস্ত রাষ্ট্র-উদ্ভূত অপকৃষ্টির চরম নিদর্শন হিসাবে। পিকাসো তার কাজে দেখাচ্ছেন ঐতিহাসিক সত্যকে। তাঁর রচনাগুলিতে ফুটে উঠেছে ভ্রান্ত রাষ্ট্রনীতিতে পরিচালিত সমাজের পচনশীল ও গলিত রূপ।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "পিকাসোকে তার শিল্পের এই অপূর্ব ব্যাখ্যা কেউ জানিয়েছে কি-না এবং তিনি এ মতকে সমর্থন করেন কি-না।"

সে বলল, "তাঁকে জিজ্ঞাসা করার প্রয়োজন কি। তিনি যে ডেকাডেন্স-প্রসূত, তাঁর মোহবিস্তৃত জালের বাইরে যে জ্ঞানের পথ তৈরী হচ্ছে তা তিনি দেখতে পাবেন কি-না সন্দেহ।"

বললাম, "একই মস্তিষ্ক কমিউনিজমকে বুঝে পছন্দ করবে, অথচ শিল্প প্রকাশের বেলায় তাকে আড়াল করে ডেকাডেন্টের পচনক্রিয়ার রূপ দেখাতেই কেবল মত্ত থাকবে এ কি যুক্তিসম্মত ব্যাখ্যা ? অবশ্য পিকাসোর চিত্রকে নিয়ে যতগুলি ব্যাখ্যা শুনেছি তার কোনোটার খুব পরিষ্কার ও বোধগম্য ভাষা নয়। অনেক সময়ে ব্যাখ্যা-কারীরা তাঁর রচনাকে উপলব্ধি করেছেন কি-না সে বিষয়ে বেশ সন্দেহ হয়। মনে পড়ে একবার পিকাসো-বিশেষজ্ঞ এক শিল্প-সমালোচককে প্রাইভেট কালেক্শনের একটি অপরিচিত পিকাসো-চিত্রের প্রতিলিপি দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলাম, এ ছবি তাঁর কেমন লাগে। তাঁর স্বাক্ষরটিকে ঢেকে রেখে জানতে চেয়েছিলাম পিকাসোকে কতখানি চিনতে পারেন নাম না দেখে। তিনি বললেন, এটি পিকাসোর কোনো নকলকারী অপারগ শিল্পীর অক্ষম শিল্পপ্রচেষ্টা। ছবিটির রঙের ও অবয়ব সমন্বয়ের শত ত্রুটি দেখিয়ে তার শ্রাদ্ধ করে যখন তিনি আপন শিল্পজ্ঞানের কসরতে উৎফুল্ল

তখন তাঁকে পিকাসোর স্বাক্ষরটি দেখালাম। ইন্ধনে ঘৃত নিক্ষেপে আগুন যেমন সহসা লেলিহান হয়ে ওঠে, তিনি একযোগে, শ্লেষের খরতা আক্রোশের দহন ঘৃণার বিষকে উদ্গার করে বললেন, 'ম্ঁ্যসিয়ো এটি অতি নিম্নস্তরের উপহাস' তারপর একটি দৃষ্টির স্ফুলিঙ্গ আমার ওপর নিক্ষেপ করে নিষ্ক্রান্ত হলেন। পিকাসোর চিত্র সম্বন্ধে একটি চলিত অভিমত হচ্ছে যে, তিনি আজকের জগতের কপট রসজ্ঞদের উপহাস করবার জন্যে এই আপাত-গূঢ় চিন্তামূলক দুর্জ্ঞেয় শিল্পসৃষ্টির ছলনা করছেন। বোধহয় একদিন তিনি এই মূঢ়দের ধৃষ্টতার উপযুক্ত পুরস্কার দেবেন তাদের জানিয়ে যে, এ পর্যন্ত তারা তাঁর যে ছবি থেকে আবিষ্কার করেছে যে-সব সাধারণের অবোধ্য নিগূঢ় অর্থ সেগুলি আসলে অর্থহীন নক্শার হিজিবিজি মাত্র। অবশ্য তখন তাঁর এই মত প্রকাশে হয়ত তাঁকে পাগল সাব্যস্ত করে গারদে পাঠিয়ে দেবে।"

এইলাস বলল, "আচ্ছা আমার মত না হয় তোমার পছন্দসই হলো না, তোমার নিশ্চয়ই পিকাসো সম্বন্ধে একটা অভিমত আছে, সেটা আমাকে শুনিয়ে দাও, তুলনা করে দেখি কোনটা গ্রহণযোগ্য।"

বললাম, "পিকাসোর সঠিক ধারণা ও সার্থকতা হবে আজ নয়, সময়ের পরি-প্রেক্ষিতে আগামী দিনে যখন তাঁর শিল্পের সামনে পড়ে যাবে অনেকখানি জমি যেখানে দাঁড়িয়ে দূরে থেকে কেবল নজরে পড়বে তাঁর রচনাসম্ভারের সারাংশটুকু। আমার ভাস্কর-বন্ধু সেবাস্তিয়াঁ তাঁর সম্বন্ধে একটা ঘটনা সে দিন বলল যার থেকে পিকাসোর সত্য স্বরূপের খানিকটা আভাস যেন পাওয়া যায়।"

"সেবাস্তিয়াঁ দক্ষিণ ফ্রান্সে এক বন্ধুর বাড়িতে থাকাকালীন পিকাসো সেখানে এসে হলেন অতিথি। সকালে প্রাতরাশের টেবিলে কফি পাত্রে ভরবার আগে পিকাসো পেয়ালাটা নিয়ে হেলিয়ে কাত করে, উল্টে নানাভাবে ছেলেখেলা কর-ছিলেন হঠাৎ উঠে নিয়ে এলেন একতাড়া ড্রয়িং কাগজ এবং আঁকতে শুরু করলেন পেয়ালাটা। প্রথম স্কেচে পেয়ালাটার ঠিক স্বরূপ ধরা পড়ল কিন্তু যেমন তিনি আরও শীটের পর শীটে নতুন নতুন নক্শা করতে লাগলেন পেয়ালার বাস্তব রূপ ক্রমান্বয়ে বদলাতে লাগল। শেষে সেটা যেন মানবীয় সত্তা পেতে আরম্ভ করল। তার পরিবর্তিত আকৃতিতে উঁকি মারতে লাগল মানুষের মুখ, ফুটে উঠল নারীর একটি সুপুষ্ট পয়োধর ও উরুস্থান ও তার কেন্দ্রে একটি অনিমীলিত চোখের বিস্তার; দেখাল সেটা যেন মুখব্যাদান করে কফি পানার্থে উদ্গ্রীব। এরপর তিনি সব ড্রয়িংগুলিকে তাল পাকিয়ে ফেলে দিয়ে কফি পানে রত হলেন।

"সেবাস্তিয়াঁ অবাক হয়ে লক্ষ্য করছিল পিকাসোর এই শিল্প-ব্যায়াম। তার মনে হলো যেমন অনেক মানুষ মস্তিষ্কের কোনো স্থান আল্গা হওয়ায় ক্রম-চলমান ও বিবর্তিত মনের চিন্তাধারাকে অবিরাম মুখে বলে চলে তিনি যেন তাদেরই মতো মুখে না বলে তা চিত্রের রূপে প্রকাশ করে গেলেন।

"পেয়ালাটার আকৃতি ও তার ওপরে আলো ও ছায়ার খেলা তাঁর মনে

এনেছিল এক শিল্পধারণা এবং তাকে রূপ দিয়ে সে ধারণাকে পূর্ণ করতে না করতে তাঁর মন ছুটেছিল আরও কত স্মৃতির খাতায় জমা নানা মানুষ, তাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও রঙ-বেরঙের কুহেলিকার হট্টগোলের পিছনে। এই জন্যই বোধহয় তাঁর রচনা-গুলিতে দেখা যায় না, দীর্ঘচিন্তা ও বিচারনিয়ন্ত্রিত শৃঙ্খলাবদ্ধ রূপ। প্রায় অসংলগ্ন, স্রোতে-ভাসা খড়কুটো যেমন কিনারায় ভেসে জড়ো হয় তেমনি তাঁর মনে, না-থেমে যাওয়া নানা ছাপের অসঙ্কোচ ভিড, আর তারাই তাঁর ছবিতে সহজেই আত্মপ্রকাশ করে থাকে।”

“কেউ কেউ হয়ত বলবে যে, এ ব্যাখ্যা একটু নুনজল সমেত গিলে ফেলা সহজ কিন্তু তোমার পিকাসো সম্বন্ধে অভিমত কারুর গলা দিয়ে নামবে কি-না যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

“বহু শতাব্দী ধরে ইয়োরোপীয় শিল্পীরা তাঁদের দৃষ্টিকে বাস্তব বাহ্যরূপের খাঁচায় বেঁধে তারই আনন্দে ভুলে গিয়েছিলেন মনের রাজ্যের মুক্ত সীমাহীন —ইচ্ছামতো সঙ্কুচিত ও সম্প্রসারিত করা চলে এমন বন, প্রান্তর ও প্রাঙ্গণকে ; সোনা রুপো হীরে মাণিক্যের ফুলপাতা-ভরা গাছকে , অভিনব মানুষ ও জীবকুলকে, যাদের কোনোদিন চর্মচক্ষে দেখতে পাওয়া যাবে না পৃথিবীতে। বিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে বাহ্যদৃষ্টির চশমা যেন ভেঙে যাওয়ায়, শিল্পীরা উদ্দাম পাড়ি দিয়েছেন সেই মনের মুক্ত জগতে এবং বাস্তব জগৎ যেন সরে গেছে বহু দূরে ও দৃষ্টির বাইরে। এই পথে অভিযাত্রী শিল্পীদের রথের পুরোভাগে চড়ে বসেছেন পিকাসো। তাঁর পিছনে তাঁর আবিষ্কৃত যে কল্পনা পড়ে রইল তাকে মনে ধরতে ও ছুঁতে হলে, সামনে দেখা বাস্তবের অতি নির্দিষ্ট আকারগুলিকে ভুলে অন্তরের বিস্তারে খেয়ালের ঘোড়ায় চড়ে তাঁরই পথে কদম চালিয়ে দিতে হবে।”

এইলাস বলল, “তোমার পিকাসো সম্বন্ধে প্রত্যেকটা কথাই প্রমাণ করছে যে, তিনি পচনশীল ডেকাডেণ্টের প্রডুক্সিয়ঁ (production)। প্রত্যেক শিল্পীর কর্তব্য হচ্ছে সমাজকে উন্নতির পথে উদ্বুদ্ধ করবার মতো শিল্পের রূপ-প্রচেষ্টা। তুমি কি বলো যে, যারা আজকের রাষ্ট্রে নীচুতলায় বাস করে তাদের জীবনে শিল্পের স্থান নেই বা তাদের উন্নততর শিল্পবোধকে জাগ্রত করাবার প্রয়োজন নেই ?”

বললাম, “বন্ধু, তোমার নিজের মতকেই সমর্থন করে পূর্বেই বলেছি এই নব-তন্ত্রের শিল্পপ্রচেষ্টায় ‘উন্নততর’ কথাটা আজকের মাপকাঠিতে ব্যবহার করা চলবে না।”

সে বললে, “তা হলে তোমার এই আইভরি টাওয়ারের অধিবাসী শিল্পীদের বাঁচিয়ে রাখতে কাপিতালিস্ত ফ্যাসিষ্টদের সমর্থন করে চালাবে নীচুতলার লোকদের প্রতি অত্যাচার লুণ্ঠন ও অবিচার ?”

বললাম, “না বন্ধু, আমি সমাজের ও রাষ্ট্রের কোনো অবিচারী ও অত্যাচারীকে সমর্থন করি না। কিন্তু এও আমি মানতে রাজী নই যে, তোমার ভাগ-করা শ্রেণীর

একটি বাদে আর বাকি ক'টায় কেবল আছে অত্যাচারী ও লুণ্ঠনকারীরা। যাদের তুমি বলো আজকের সমাজে নীচুতলার লোক, তাদের মধ্যে শিল্পবোধ জাগানো বা তাদের শিল্পরসের অংশীদার করা, তা কি বাকি স্তরের লোকগুলিকে জাহান্নামে না পাঠিয়ে সম্ভব হবে না? আমি তোমার সঙ্গে সম্পূর্ণ একমত যে, তাদের সকলের সঙ্গে সমান সৌন্দর্যভোগের অধিকার ও সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু তার জন্য বর্তমান রাষ্ট্রবিধির উৎখাতের চেষ্টার চেয়ে কার্যকরী উপায় হচ্ছে প্রত্যেক নগরে সাধারণ শিল্পসংগ্রহশালার ব্যবস্থা ও প্রত্যেক বিদ্যায়তনে শিল্প-দর্শন ও উপলব্ধির সুযোগ ও শিক্ষার ব্যবস্থা। তুমি এটা স্বীকার করতে বাধ্য যে, ফ্রান্সে এ সম্বন্ধে লোকেরা বেশী সুযোগ পাওয়ায় এ দেশে শিল্পের রসগ্রাহীর সংখ্যা সর্বস্তরে এমন কি শ্রমিক চাষীদের মধ্যেও অন্যান্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী।"

এইলাস আমার বক্তব্যকে উড়িয়ে দিয়ে জানাল যে, কাপিতালিস্ত ও বুর্জোয়ারা জন্মগত স্বার্থপর এক্সপ্লয়টার। তারা নীচুতলার মানুষকে কোনোদিন নিজেদের সুখ-ভোগের ও বিদ্যার এক রত্তিও ভাগ দেবে না। উচ্চাঙ্গ শিল্পের রসাস্বাদন কেবল তাদের শ্রেণীর মধ্যেই রেখে দেবে।

বললাম, "তোমার মতবাদে এইবার গোলমাল এসে যাচ্ছে ভ্রাতা। সাধারণগ্রাহ্য অথচ উচ্চতর শিল্প এ তোমার নবতন্ত্রী দেশেও হওয়া কঠিন। আরও বলি যে, তোমার এই ব্যাপক কয়টি শ্রেণীবিভাগে বেশ কিছু খুঁত রয়ে গেছে। কারণ দেশ অনুযায়ী ধনী ও দরিদ্রের স্তরে মনোবৃত্তিতে ও আচরণে বেশ কিছু তফাৎ দেখা যায়। আমাদের দেশে এক শ্রেণীর লোক আছে, তারা রুটি পাবার জন্যে লড়াই করে না, তাকে ত্যাগ করার জন্যে তৈরী করে তাদের দেহ ও মনকে। তাদের অস্তিত্ব হয়ত রুটি-সন্ধানী লোকসমুদ্রে খুঁজে দেখতে গেলে লাগে দূরবীণ, কিন্তু তাদের আদর্শ ও বাণী যেন বহু বাহু বিস্তার করে জনগণকে বেষ্টন করে আছে। তাদের অনেকে নিজের সুখ ও পার্থিব সম্পদকে ত্যাগ করে জনসেবায় আত্মনিয়োগ করেছে। তুমি বোধহয় রামকৃষ্ণ মিশনের নাম শোনোনি, এর প্রতিষ্ঠাতা স্বামী বিবেকানন্দের দেওয়া 'বহু রূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর' নীতিকে মুখ্য করে সংসারত্যাগী সন্ন্যাসীরা প্রতিষ্ঠা করেছেন শিক্ষায়তন, হাসপাতাল, দাতব্য চিকিৎসালয়, পাঠাগার, পল্লী-উন্নয়ন, ধর্মপুস্তক-প্রকাশ প্রভৃতি মানব-কল্যাণের প্রতিষ্ঠানগুলি। তোমার রাজনৈতিক বিচারে কোন তালিকায় তাঁদের ফেলবে?"

সে বলল, "তারা প্যারাসাইট ও এক্সপ্লয়টার—অনধিকার চর্চা করছে। তাদের পরোপকারের অছিলায় ধর্মভণ্ডামীর প্রচার চেষ্টার জন্য, সত্বর তাদের নিপাতের ব্যবস্থা করা উচিত। তবে সে ব্যবস্থা করার আগে তাদের এই সঙ্ঘকে সাম্যবাদ প্রচারের কেন্দ্রে পরিণত করা যায় কি-না তার একটা পরীক্ষা করা যেতে পারে। তোমার কথায় মনে হচ্ছে, এই ধর্মান্ধদের খানিকটা সংগঠন করবার সামর্থ্য আছে।

তাদের প্রচারের দ্বারা প্রোলেতারিয়াৎ উন্নয়নে রাষ্ট্রীয় কর্তব্য কি, তা ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন এবং তাদের মধ্যে দু'একজন যারা উচিত-রাষ্ট্রবিধির জ্ঞানে সহজে সচেতন হতে পারে তাদের সেভাবে তৈরী করে, বাকি জ্ঞানহীনগুলোকে তাদের জিম্মায় মানুষ করবার ব্যবস্থা করতে হবে।"

হেসে বললাম, "কি প্রচার করে, ও কি বলে, তুমি ভাঙবে তাঁদের বিশ্বাস ও সৎকর্মের ধারণা? পরের মঙ্গলে সর্বত্যাগী তাঁরা, কোন যুক্তি দিয়ে প্রলুব্ধ করবে তাঁদের, তোমার সাম্যবাদ গ্রহণ করতে? তাঁরা প্যারাসাইট হলেন কি করে? তাঁরা তো কেবল ধনীর অর্থ সংগ্রহ করে বিলিয়ে দিচ্ছেন গরীবদের হাতে, তাদের জীবন উন্নয়নে।"

সে উত্তেজিত হয়ে বলল, "আমি বলি, এটা তাদের অনধিকার চর্চা। এ কাজ করার অধিকার একমাত্র রাষ্ট্রনিয়ন্তা দলের, ভগবান-বেচা লোকেদের নয়, এরা সব ভগবানে-বিশ্বাসী লোকদের ধর্মের নেশায় বিহ্বল করে সফল করছে নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি।"

বুঝলাম এইলাসের ধারণায়, তার মত ও যুক্তি ছাড়া আর কোনো পথ প্রণালী শোনবার বা গ্রহণ করবার উপযুক্ত নয়।

তবুও বললাম, "আমি সে-ভগবানে বিশ্বাস করি না, যাকে প্রার্থনার ঘুষ দিয়ে সুখ-সুবিধা পাওয়ার চেষ্টা করা যেতে পাবে। কিন্তু অশ্রদ্ধাও করি না, যারা এই-ভাবে ভগবানে বিশ্বাস করে, মানুষের সেবায় আত্মনিয়োগ করে। ভগবানই বলো, আর মার্কসের রাষ্ট্রনীতিই বলো, আপন জীবন নিয়ন্ত্রণে সহায়তা করে দৃঢ় বিশ্বাস, যার ওপর নির্ভর করে বিনা বিচার ও প্রশ্নে গ্রহণ করা যেতে পারে কতকগুলি নীতিকে, জীবনসমস্যার প্রয়োজনে একান্ত উপায় হিসাবে। তাই হয়ে যায় সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে কখনও বা স্বর্গীয় অনুপ্রেরণায় উদ্ভাসিত ভগবানের বাণী, দার্শনিকের গভীর চিন্তা, বিচার ও মীমাংসাপ্রসূত সিদ্ধান্ত, রাষ্ট্র পরিচালনার দক্ষ নেতার অনুশাসন বাণী। অনেক যুগ ধরেই মানুষ জেনে ফেলেছে মঙ্গল ও অমঙ্গলের স্বরূপকে। সত্য ও মিথ্যার প্রভেদ, ন্যায় ও অন্যায়ের উপলব্ধি, কেবল ব্যবহারিক জগতে তার সঠিক নিয়ন্ত্রণের চেষ্টায় যুগে যুগে সৃষ্টি হয়েছে ধর্মের বাঁধন ও রাষ্ট্রের নিয়ম। প্রত্যেক রাষ্ট্রনীতির বা সমাজনীতির উদ্ভবে প্রথম উদ্দেশ্য ছিল সমাজ ও সাধারণের মঙ্গল কিন্তু ব্যক্তিগত ও সমাজগত আত্মাভিমান ও স্বার্থ সাধারণের মঙ্গলার্থে উচিত নীতি ও পথকে করে দিলো বিকৃত। কি করলে সকলের মঙ্গল ও শান্তি হবে তা বোধহয় বলা খুব কঠিন নয়, কেবল তার কার্যকরী প্রয়োগপন্থা খুঁজতেই ধর্ম ও রাষ্ট্রনীতি উঠছে ও নামছে যুগে যুগে। বর্তমানের সাম্যবাদ সেই তরঙ্গভঙ্গেরই একটা ঢেউ এবং এটাকে শেষ ও একমাত্র সম্পূর্ণ ও বিশুদ্ধ পথ বলে মেনে নেওয়া যাবে কি-না, মানবসমাজে এর ব্যবহারের মেয়াদই তার প্রমাণ দেবে। আমার মনে হয়, মানব-সমাজের মনের হাসি ও কান্না, রাগ, দ্বেষ-ঈর্ষা ও প্রতিহিংসা, প্রেম ও বিরহ প্রভৃতি

আদিম অনুভূতিগুলির বিশেষ পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত আদর্শ সমাজ বা রাষ্ট্রের বন্ধনে কিছু না কিছু ফাঁক থেকে যাবেই। সমাজ ও রাষ্ট্রে যাতে বিশৃঙ্খলতা না আসে তার জন্য অতীত ও বর্তমানের চেয়েও উন্নততর পথ মানুষ অবশ্য খুঁজতেই থাকবে এবং এ বিষয়ে তোমার ও আমার মধ্যে কোনো মতদ্বৈধ থাকতে পারে না।"

এইলাস যেন আমার সব কথা ভালো করে শুনল না। তার জবাব এল, "যখন দেখলেই এ সব ধর্ম কিংবা রাজনৈতিক পন্থায় সন্তোষজনক রাষ্ট্র বা সমাজ গড়ে উঠল না এত যুগ ধরে, তখন সেগুলোকে অপ্রয়োজনীয় বলে ফেলে দেওয়া উচিত। যখন মূল খুঁটিতেই ঘুণ ধরে, কুটিরের চালে নতুন খড় দিয়ে লাভ কি? তাকে ভেঙে ফেলে নতুন করে গড়া উচিত দৃঢ় ভিত্তি ও শক্তিময় খুঁটিতে ভর করা নতুন আশ্রয়।"

আমি বললাম, "তোমার পথ গ্রহণ করলে, ইতিহাস বলে আর কিছু থাকবে না। ধ্বংস-হস্তের মার্জনায় অতীতের কৃষ্টি ও জীবনের স্মৃতির যা-কিছু অস্তিত্ব আছে তাকে ঘুণ-ধরা বলে সম্পূর্ণ অবলুপ্ত করেই কি নতুনের বোধন হওয়া উচিত?"

তার মতে শুনলাম যে, যাকে আমরা জানি ইতিহাস হিসাবে তার কিছুটা ছেঁটে বাদ দিয়ে বদলে কিছু আধুনিক মতবাদের প্রলেপ দিয়ে নতুন না করে নিলে সাম্যবাদী সমাজে তা গ্রহণীয় নয়।

ইতিমধ্যেই ইয়ানিনা আসায়, আমাদের আলোচনাকে ঐখানেই ইতি করতে হলো। সে বলল, "কি এইলাস, তোমার রাজনৈতিক তর্কজালে এ বেচারীর মাথা বিগ্‌ড়ে দেবার চেষ্টায় আছ? মিরকো আমাকে এইমাত্র জানাল, তুমি না-কি ওকে বলেছ, ওদের সেণ্ট আর ইয়োগীদের সব লিকুইডেট করা উচিত। তুমি তো স্টেট-এর লিডারসিপ চাও। এই ভারতীয় সাধুদের লিকুইডেট করবার পন্থা না খুঁজে তোমার উচিত ওদেশে গিয়ে তাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করা। ভেবে দেখো, সুবিধা হবে যৌবনকে বহুকাল ধরে রাখতে, আগুন খেতে পারবে জলের মতো, মাটিতে কবরস্থ হলেও এক মাস পরে মাটি ফুঁড়ে উঠে আসতে পারবে—সুখশয্যায় একরাত সুনিদ্রা দিয়ে আসার মতো। তারপরে বিষ এ্যাসিড, ভাঙা কাঁচ, পেরেক খেতে পারবে মিঠাই খাওয়ার মতো সহজে কিংবা বিনা আহারেও বিষাক্ত সরীসৃপের সান্নিধ্যে কয়েক সপ্তাহ কাটিয়ে দেওয়া তোমার পক্ষে ছেলেখেলা হবে।"

এইলাস একেই বিরক্ত হয়েছিল, বেশ-জমে-ওঠা বাক্যালাপে বাধা পাওয়ায়, তার এই বক্রোক্তিতে আরও ক্ষিপ্ত হয়ে সে বলল, "কুল্যাক-এর মেয়ের আর কত বুদ্ধিই বা হবে। চিরকালই তো তোমরা গরীব শ্রমিক ও চাষীদের রক্ত শুষে অলস বেলা কাটিয়েছ, এই সব গাঁজাখুরি গল্প করে।"

বড় আহত হলো ইয়ানিনা। তাকে এত তীব্র আক্রমণের কোনো কারণই দেখলাম না। সে ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করে বেশ হাল্‌কাভাবে হেসে আমায় বললে, "তোমাদের দেশে সকলেই তো একটু-আধটু ইয়োগী। তুমি ওকে সম্মোহন করে, ওর সপ্তমে চড়া মেজাজটা একটু নামিয়ে দিতে পার না?"

তাকে জানালাম, "আমাদের সাধুরা ইয়োগ করলেও, তাদের উদ্দেশ্য নয় এই রকম ভেল্‌কি দেখিয়ে বেড়ানো।"

সে জিজ্ঞাসা করল, "তবে তারা করে কি ?"

এইলাস বলল, "আমার বন্ধু এইমাত্র জানালেন, তারা আগে করত ধর্মের ভণ্ডামী, আর এখন তারা লোকসেবার অছিলায় রাষ্ট্র শাসনের খেলার অভিনয় করছেন।"

ইয়ানিনা তার মন্তব্যকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বলল, "তোমাদের ইয়োগীদের সম্বন্ধে ভালো করে জানবার আমার অনেক দিনের ইচ্ছা, তুমি নিশ্চয়ই তাদের সংস্পর্শে এসেছ ? আমাকে বলবে তাদের কথা ?"

বললাম, "মাদ্‌ম্যয়জে.ল, জীবনে একটি ইয়োগীর কথাই আমার বিশেষ করে মনে আছে। ঘটনাটা ঘটেছিল এইভাবে—

...কৈশোর থেকে যৌবনে আসার মাঝপথে আমাদের মনে ঘটে যায় একটা বিভ্রাট। রাজপুত্তুর রাজকন্যার সাততলা প্রাসাদের আনাচে কানাচে খুঁজত যে মন, ঘুমন্ত রাজপুরীকে জাগাবার সোনার কাঠিটিকে, কিংবা পাতালের গোপন কুঠুরী আবিষ্কার করে দৈত্যদানোর প্রাণ-রাখা শুকপাখীর গলা টিপে, বন্দী রাজকুমারীকে মুক্তি দেওয়ার বাহাদুরী, সেই মিঠে স্বপ্নগুলিকে খানখান করে আসে বাস্তবের বার্তা। এই সময় আমাদের কারোর বা মন হয়ে যায় উদাস, কারোর বা তিক্ত ও ক্ষিপ্ত। কৈশোর ও যৌবনের এই সন্ধিক্ষণে পৌছে আমি উদাসীন হয়ে একবার চলে গিয়েছিলাম দক্ষিণ ভারতে মাইশোরের রামকৃষ্ণ মিশনে। এই আশ্রমে আমার কাজ ছিল আগন্তুক অতিথিদের সুখ সুবিধার তত্ত্বাবধান।

তখন শীতকাল। স্থানটি অধিত্যকার উচ্চতায় বেশ কিছু ঠাণ্ডা। আশ্রমে একদিন সন্ধ্যাবেলায় প্রাঙ্গণ শুভ উচ্চারণে মন্দ্রিত করে উপস্থিত হলেন এক সাধু। প্রায় ছ' ফুটের ওপর লম্বা এক বিরাট পুরুষ। সম্পূর্ণ নগ্ন দেহে পরিধানের বালাই ছিল না। কেবল একটি ব্যাঘ্রচর্ম বাঁ-কাঁধ থেকে সামনে ঝোলানো থাকায় লজ্জা নিবারণ হচ্ছিল। কারণ দিগম্বর সাধুজী যে লজ্জা ও শরমের বহু উর্ধ্বে পৌছেছেন তাতে আর কোনো সন্দেহ ছিল না। তিনি অনুমতি চাইলেন আমাদের আশ্রমে তিনটি দিন কাটাবার। আমাদের আশ্রমের অধিনায়ক স্বামীজীকে সাধুজীর উপস্থিতি সংবাদ দিলে, তিনি নির্দেশ দিলেন যে, অতিথিদের থাকবার একটি ঘর পরিষ্কার করে তাঁকে থাকতে দেওয়া হোক। সাধুজীকে ঘরের কথা বলতেই তিনি জানালেন যে, তাঁর কোনো সাধারণ আবাসগৃহ আশ্রয়ের প্রয়োজন নেই। উন্মুক্ত আকাশই তাঁর আবাসের আচ্ছাদন। সামনে প্রাঙ্গণে একটি নাগকেশর গাছের তলা দেখিয়ে বললেন, 'ঐখানেই তিনরাত্রি আমাকে থাকতে দিলে আমি খুব খুশী হব।'

স্বামীজীকে এ সংবাদ দিলে তিনি বিরক্ত হয়ে বললেন, 'আচ্ছা বিপদ! এখন তাঁকে দিতে হবে আধভজন কম্বল এবং তাঁর সামনে এক বিরাট অগ্নিকুণ্ড জালাবারও

ব্যবস্থা করতে হবে।' সাধুজীকে এ বিষয়ে জানাতেই শশব্যস্তে আমাদের নিরস্ত করলেন তাঁর সুখ সুবিধার ব্যবস্থায় অযথা উদ্ব্যস্ত হতে। কারণ তাঁর কম্বল কিংবা আগুনের কোনো প্রয়োজন নেই। আহারের কথায় জানালেন যে, সে রাত্রে তারও প্রয়োজন নেই কারণ তিনি একাহারী, দ্বিপ্রহরের পূর্বেই তাঁর দৈনিক একান্নভোজন সম্পন্ন হয়ে গেছে। এইবার আশ্রমের স্বামীজী বেরিয়ে এলেন সাধুজীকে স্বাগত জানাতে। আশ্রমের দাক্ষিণ্য ও আতিথেয়তার সুবিধা নিয়ে বহু ভণ্ড সাধুই মাঝে মাঝে আশ্রমে থাকার চেষ্টা করত। স্বামীজী প্রথমে ভেবেছিলেন, ইনি বোধহয় তাদেরই একজন। স্বামীজী ও সাধুজীর স্বাগত পরিচয় হলো শুদ্ধ সংস্কৃতে। যদিও স্বামীজী সংস্কৃতে নাম-করা পণ্ডিত, তবুও সাধুজীর ভাষা ও শাস্ত্রজ্ঞানের কাছে তিনি প্রতিহত হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে সাধুজীর পরিচর্যায় আমি হাজির হলে তিনি অনুরোধ করলেন, তাঁকে যদি আমি শহরটি দেখিয়ে দি'। পথে চলতে আমাকে সাধুজী প্রশ্ন করলেন, 'তোমার এই অল্প বয়স, এই বৈরাগীদের মাঝে এসে তুমি কি করছ?' বললাম, 'হঠাৎ মনে কিছু আর ভালো লাগল না, তাই চলে এসেছি এদের মধ্যে। এদের জীবনধারাকেই মনে হয় সবচেয়ে শ্রেয়।'

সাধুজী নিষেধের তর্জনী নেড়ে বললেন, 'কখনও এ কাজ করো না। তুমি কি জানো, তোমার আশ্রমের অধিবাসীরা কেন সাধু হয়েছে?' আমার উত্তরের অপেক্ষা না করেই বললেন, 'কারণ এরা সাংসারিক জীবনে ঘা খেয়ে, পরাস্ত হয়ে হয়েছে বৈরাগী। তুমি তো বালক মাত্র। সংসারের কোনো অভিজ্ঞতাই তোমার হয়নি। তবে তুমি কেন শখ করে এদের মধ্যে আসবে? গেরুয়া দেখেই মনে করো না, এদের মনে আছে কোনো রঙ, বে-রঙা জীবন এদের সব সুরহীন ও বিস্বাদ।'

সাধুজীকে জিজ্ঞাসা করলাম, তবে তিনি কেন সাধু হয়েছেন?

বললেন, 'ভেইয়া সংসারে হার মেনে দুঃখ পেয়ে।'

জিজ্ঞাসা করলাম, 'তা হলে আপনিও কি এখন এদেরই মতো বে-রঙা সুরহীন ও বিস্বাদ?'

সাধুজী বললেন, 'না, তা ঠিক নয়। বৈরাগ্য নেওয়ার পর অনেক বছরই ঐ অবস্থায় ছিলাম। কিন্তু ক্রমে দেখতে পেলাম, জগতের চারদিকে রঙের ছড়াছড়ি, শুনতে পেলাম বহুবিধ সুর, আস্বাদন করলাম বহু মিঠে স্বাদ। তারপর এই দেহের খোলটা সেই রূপ, শব্দ ও স্বাদের রত্ন দিয়ে ভরতে শুরু করেছি।'

বললাম, 'এরাও যে সে রঙ, সে সুর ও মিঠে স্বাদের সন্ধান পায়নি, তা আপনি জানলেন কেমন করে?'

তিনি বললেন, 'একটা রঙিন কাপড়ের আড়াল দিয়ে ওরা সে সবের থেকে নিজেদের তফাৎ করে রেখেছে। ওদের জীবনের যে উদ্দেশ্য তাকে অর্জন করতে গেরুয়া ও সাদা কাপড়ের তফাৎ করবার দরকার হয় না। তুই যদি সমাজ সেবাই

করতে চাস তো, বাড়ি ফিরে যা। আর যতক্ষণ সংসার তোকে মেরে ঘায়েল করে না দেয়, কাজ করে যা আপন মনে। জানিস, একটা টক আমের আঁটি যদি সার-ওলা জমিতে পুঁতে গাছ বানাস, তাতে বড় বড় শাঁসাল সুপুষ্ট ফল হলেও কেউ তা খেতে চাইবে না। কিন্তু মিঠে আমের আঁটির গাছ, সারহীন জমিতে পড়ে অনাদরে বর্দ্ধিত হলেও যখন ফলাবে ফল, ছোট হলেও লোকে আসবে লুট করে নিতে। আমেরই মতো যদি তোর আঁটিতে টক থাকে, তা হলে এই সাধুদের মধ্যে থাকলেও তুই হবি না মিষ্টি, উল্টে তোর সঙ্গ পেয়ে এদের কেউ কেউ টকে যেতে পারে। আর তুই যদি মিঠে আঁটিরই আদমি হোস, তা হলে তুই যেখানে যেমন করেই থাকিস, সবাই পাবে তোর মিষ্টত্ব।' বেশ লাগল তাঁর কথাগুলি। সাধুজী চলে যাবার পরের দিন, আশ্রমের স্বামীজীকে বিদায় জানিয়ে আমিও ফিরে গেলাম বাড়িতে। তারপর এমন কোনো সাধুসঙ্গ লাভ জীবনে ঘটেনি, যা আমার মনে এমনভাবে দাগ বসাতে পেরেছে। তিনি আমাকে ইয়োগ করতে বলেননি যৌবনকে দীর্ঘকাল ধরে রাখবার উদ্দেশ্যে, অথবা আগুন, বিষ, কাঁচ ও পেরেক খাওয়ার অমানুষিক ক্ষমতা অর্জনের পথও বলেননি। শুধু বলেছিলেন —জীবনের সবচেয়ে বড় কাজ, সাচ্চা ও ভালো হওয়া।……

এইলাস একটা বিদ্রূপসূচক শব্দ করে বলল, "যত সব বুজরুকি। এই অমানুষিক ক্ষমতা সমাজে অর্জনের প্রয়োজন হলে আমাদের সাইন্স শিগ্‌গিরই এর সহজ উপায় আবিষ্কার করে দেবে।"

বললাম, "কামারাদ্, সবই পারবে হয়ত সাইন্সের দ্বারায় আয়ত্ত করতে কিন্তু টক আঁটির গাছে মিষ্টি আম ফলাতে পারবে কি-না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। তবে এক হতে পারে যে সাইন্সের সাহায্যে আমাদের মিষ্টিকে ভালো-লাগা বদলিয়ে হয়ত টকেব অনুরক্ত করতে পার।"

ইয়ানিনা যাবাব জন্যে উঠে পড়ায় আমরা সকলে বিদায় নিলাম সে দিনের মতো। রাস্তায় যেতে যেতে ইয়ানিনা বলল, "তোমাব কাছে আশা করেছিলাম, ইয়োগীদের অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প শুনব, কিন্তু তুমি যেন চার্চ-এর পুলপিট দেখিয়ে আমাদের নিরাশ করে দিলে। আর সবচেযে খারাপ লাগল যে, এইলাস এখন দয়া, মায়া ও সহানুভূতিহীন এক ম্যানিফেষ্টোতে পরিণত হয়েছে।"

স্টেফান

এই ছাত্রদলের মধ্যে সবচেয়ে চুপচাপ থাকত স্টেফান। অথচ তাদের মধ্যে সত্যিকারের প্রোলেতারিয়েতের দাবীর সে-ই ছিল একমাত্র অধিকারী। তার জন্ম এক পাদুকা-নির্মাতার পরিবারে। স্কুলে পড়াশুনায় উচ্চস্থান পাওয়ায় সরকারী বৃত্তি

দিয়ে তাকে পারীতে পাঠানো হয়েছে এঞ্জিনিয়ারিং শিখবার জন্য। স্কুলে পড়ার সময় তার পিতাকে জুতো তৈরীর কাজে সাহায্য করার ব্যাপারেও স্টেফান বেশ নিপুণ ছিল। একদিন তাকে প্রশ্ন করলাম, "যখন অন্যেরা তার শ্রেণীর দাবি জানিয়ে লম্বা বক্তৃতা দেয়, সে কেন তার মতামত না জানিয়ে চুপ করে শুনে যায়।"

সে বলল, "দেখ আমি পাদুকা-নির্মাতার সন্তান। সরকার আমার প্রতিভা দেখে বৃত্তি দিয়ে এখানে পাঠিয়েছে উচ্চশিক্ষা লাভের জন্যে। আমি কোন মুখে তাকে জাহান্নামে পাঠাবার প্রস্তাবকে সমর্থন করব? এইলাস বলে যে, আমাদের শ্রেণীর প্রত্যেক ছেলেকে এই সুযোগ দেওয়া হোক। আমি স্বীকার করি যে, সকল শ্রমিক সন্তানের বিদ্যাশিক্ষার সমান অধিকার ও সুযোগ দেওয়া উচিত। কিন্তু বিশেষ প্রতিভাবানকে পরিপূর্ণতা অর্জন করতে বৃত্তি দেওয়া উচিত কেবল তার যোগ্য অধিকারীকে —সে সাম্যবাদী রাষ্ট্রেই হোক বা সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রেই হোক। এইলাস গলাবাজি করে আমাদের বিশ্বাস করাতে চায় যে, শ্রেণীহীন শ্রমিকদের এক সুখের রাষ্ট্র গড়তে সে তার জীবন উৎসর্গ করেছে কিন্তু এই আপাতবিশুদ্ধ সাম্যবাদীদের মধ্যে আমরা দেখতে পাই আপন অভিসন্ধিতে ব্যর্থ স্বার্থান্বেষীদের ছদ্মবেশ। এদের মুখ থেকে শুনতে পাবে যে মিড্‌ল-ক্লাস থেকে তৈরী হয় রেভলিউশনের নেতারা। কাজেই এইলাস বা তার শ্রেণীর লোকেরা ধরে নেয় যে এই নবতন্ত্রের যজ্ঞে তারাই নিয়মক্রমে স্বনির্বাচিত পুরোহিত।

"আমি সাম্যবাদকে স্বীকার করি কিন্তু এই মোড়লদের দেওয়া ব্যাখ্যাকে সব সময় গ্রহণ করতে পারি না। আমার মনে হয় খ্রাইষ্ট কেবল এইটে বলতে চেয়েছিলেন যে, সকলে মানবসমাজে সদিচ্ছা ও সৎ আচরণে প্রবৃত্ত হোক। কিন্তু তাঁর উপদেশ-অবলম্বীরা আপন মত ও পথের ভেজাল মিশিয়ে গীর্জা বানিয়ে লোকের সামনে তুলে ধরেছে চিরস্বর্গবাসেব সুখস্বপ্নের এক মরীচিকা এবং তাই দিয়ে কত শতাব্দী ধরে ভুলিয়েছে কত কোটি কোটি লোকদের এবং এখনও ভোলাচ্ছে। নবরাষ্ট্রবোধনের সুযোগ পেয়ে বহুজন সেজেছেন সাম্যবাদের খ্রাইষ্ট এবং তাঁরা সশিষ্য শ্রমিকদের সুখরাজ্যের এক স্বপ্ন দেখিয়ে চান যাতে আমরা তাঁদের কথামতো বসি ও দাঁড়াই। এইলাস বলে, শ্রেণীহীন শ্রমিকরাষ্ট্রের কথা কিন্তু তার কথামতো শ্রেণীহীন রাষ্ট্র হওয়া অসম্ভব। কারণ রাষ্ট্র পরিচালনায় প্রয়োজন শাসন-নিয়ন্তা ও শাসন-নিয়ন্ত্রিতদের বিশেষ স্তর এবং সেই স্তরভেদে উদ্ভব হবে বিভিন্ন শ্রেণীর। তার নামে ও ব্যবহারে হয়ত কিছুটা পার্থক্য থাকতে পারে কিন্তু শ্রেণী বহুলতা সমাজে থাকবেই।

"আর সে যে বলে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির স্বত্বাধিকারী-প্রবৃত্তিকে নাশ করতে হবে তাও অসম্ভব চেষ্টা, কারণ একজনের অধিকারের যে প্রবৃত্তি বহুজন অধিকারী হলেও ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেকে নিজেকে অংশভাগী মনে করবে। কাজেই আপন অধিকারের পরিমাপ হয়ত কমবেশী হতে পারে কিন্তু ধনসম্পদ করায়ত্ত করার প্রবৃত্তি স্বতঃজাত,

তাকে বদলাতে গেলে আমাদের মানব প্রকৃতিকে অন্য রকম করতে হবে। যারা শ্রেণীহীন রাষ্ট্রের বিজ্ঞাপন দেয় বা সম্পত্তি নিরভিলাষী নাগরিকের গুণকীর্তন করে তাদেরই মধ্যে আমি দেখতে পাই প্রচ্ছন্ন শ্রেণীর দাবি ও গুপ্ত স্বত্বাধিকারীর লালসা।

"এইলাসকেই ধরো না কেন। সে এসেছে পেতি-বুর্জোয়া পরিবার থেকে। সে এক সর্দারি ছাড়া অন্য পেশা নিতে প্রস্তুত হবে কি! সে বেছে নিয়েছে এমন কাজ যাতে তার শারীরিক শ্রম-প্রয়োজনকারী কর্মের প্রয়োজন না হয়। আমাদের মধ্যে কেবল একজনকে জানি, যে এই নবরাষ্ট্রের বোধনে যে কোনো কাজ করতে প্রস্তুত এবং যে কোনো কঠোর পরীক্ষার সম্মুখীন হতে ভয় পায় না, এমন কি প্রয়োজন হলে মৃত্যুকেও একপাত্র মদিরা পানের মতো সহজে বরণ করে নেবে, যদি তা তার জীবনাদর্শের পরিপূর্ণতায় প্রয়োজন হয়। সে হচ্ছে মিরকো। কিন্তু তার মতো আদর্শবান কর্মে দৃঢ়কল্প কর্মীদের গলা টিপে সরিয়ে দেয় নেতৃত্বস্থানাভিলাষী শাসকের প্রচ্ছন্ন পদপ্রার্থীরা।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "সে কি এইলাসের পার্টি সম্বন্ধে একনিষ্ঠতায় সন্দেহ করে বা তাকে কি সে মনে করে না সত্যিকারের সাম্যবাদপন্থী?"

সে বলল, "এইলাসের পার্টি বা সাম্যবাদের অনুরাগে কোনো খাদ বা ভেজাল নেই কিন্তু কি উদ্দেশ্যে পার্টিকে সংগঠিত করা হয়েছে এবং তার ভাবাদর্শ ও প্রণালীতে কোনো ত্রুটি থেকে গেছে কি-না তার বিচার এবং প্রয়োজনানুসারে তার নীতির পরিবর্তনের কথায় এইলাসের মতো অন্ধ ডক্ট্রিনেয়াররা মাথা ঘামায় না বা প্রশ্ন করে না। আজ সমাজে ও রাষ্ট্রে যে ডেকাডেন্সের থিসিস উপস্থিত হয়েছে তার ফলে এর পরিবর্তনের জন্য যে অ্যান্টিথিসিসের উদ্ভব হওয়া উচিত তার প্রতীক এরা নয়। এরা আর এক সুবিধাবাদী ধ্বংসের জন্যে প্রস্তুত কিন্তু গড়বার দায়িত্ব বা ক্ষমতা এদের নেই।

"এদের মধ্যে পার্টির সংগ্রামে বাঁচা-মরার পিছনে উঁকি মারে অভিলাষ, যেভাবে মরলে এদের নাম লেখা থাকবে শহীদদের তালিকার সর্বোচ্চে আর বেঁচে থাকলে এরা পাবে রাষ্ট্রের ভাগ্যনিয়ন্তাদের আসন। এদের মধ্যে অনেকেই পিতামাতা বা স্টেটের দেওয়া সহজলভ্য টাকায় হয়েছে আর্ম-চেয়ার পলিটিশিয়ান। জীবনে দারিদ্র্য দুঃখের সম্মুখীন এরা হয়নি যেভাবে আমরা—শ্রমিকশ্রেণী, তার পীড়ন সহ্য করে থাকি। দায়িত্বহীন ছাত্রজীবনে পলিটিক্স এদের একটা অ্যাডভেন্চার মাত্র। এদের পার্টির অধিবেশন যেন সিনেমা বা কাফেতে গিয়ে চিত্তবিনোদনের মতো। এরা যদি সত্যিকারের অ্যান্টিথিসিসের অঙ্গ হয় তা হলে এদের উচিত বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে সজাগ হয়ে সংগ্রামের জন্য নিজেদের প্রস্তুত রাখা এবং অযথা বাক্য ব্যয় না করে যতদূর সাধ্য নিজেদের স্ব-স্ব বিদ্যায় নিপুণ হওয়া যাতে আজকের অর্জিত জ্ঞান আগামী দিনের নতুন রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার কাজে লাগে।

"আদর্শ প্রোলেতারিয়েৎ-রাষ্ট্র তখনই সম্পূর্ণ হবে যখন এইসব বুর্জোয়া-প্রসূত নেতৃবর্গকে সরিয়ে আমাদের শ্রেণীর লোকেরা রাষ্ট্র পরিচালনার ভার নিয়ে নেবে। শ্রমিক রাষ্ট্রের স্বপ্নকে বাস্তবে পরিপূর্ণ করতে হলে শুধুই যে কাপিতালিস্তদের লিকুইডেট করার প্রয়োজন তা নয়, বুর্জোয়া ও পেতি-বুর্জোয়াদেরও শেষ করে দিতে হবে। এইলাস যেমন বলে, কাঁটা-জঙ্গল কেটে সাফ করার মতো তাদের সমাজ থেকে নির্মূল কবতে হবে। তবে আমার ও এইলাসের এই লিকুইডেশনের পন্থায় বেশ কিছু মতদ্বৈধ আছে। তার লিকুইডেশনের ধারায় শুধু যে পরধন-শোষক, শ্রমিক-উৎপীড়ক ও তাদের ন্যায্য পারিশ্রমিক অপহরণকারীরা বিনষ্ট হবে তা নয় সেইসঙ্গে ঐ শ্রেণীতে জন্মে ও বর্ধিত হয়েও যারা উচিত কর্ম ও কর্তব্যে পরাঙ্মুখ নয় এমন বহুজনও বিনষ্ট হবে। আলস্যে ও সম্পদে বদ্ধিতদের জোর করে শ্রমিকজীবন অবলম্বন করানো যেতে পারে না কারণ তারা হবে অকেজো শ্রমিক। কাজেই সব চেয়ে ভালো পন্থা হচ্ছে যে, যেমন তাদের প্রাসাদ ও সুখ-ঐশ্বর্যের নিদর্শনগুলিকে আমরা রেখে দিতে চাই মিউজিয়াম করে, তেমনি এদেরও —বেঁচে থাকতে পারে এমন সঙ্গতি দিয়ে, বিগত ঘুণ-ধরা ডেকাডেণ্ট রাষ্ট্রের দ্রষ্টব্য হিসাবে আমৃত্যু স্বতন্ত্র রেখে দেওয়া চলবে। এদের অপ্রাপ্তবয়স্ক বংশধরদের শ্রমিক শ্রেণীতে এনে বিলুপ্ত করে দিতে হবে এদের পূর্ব অস্তিত্বকে।"

বললাম,"অর্থাৎ বয়স্কদের জন্য কনসেনট্রেশন ক্যাম্প ও ছোটদের জন্য কারখানার ব্যবস্থা হবে।"

সে বলল, "তা তুমি এ প্রস্তাবকে যে আখ্যাই দাও এদের সম্পূর্ণ বিলুপ্ত না করলে শ্রমিকদের হিতকারী রাষ্ট্র গড়ে উঠবে না। আমি দেখেছি এদের অনেকে আপন দুর্বুদ্ধিতে সব সম্পদ হারিয়ে যখন নিঃস্ব হয়ে পড়ে তখন এদের চেতনা হয় এবং দেখতে পায়, ঐশ্বর্যে আলস্যময় জীবনের অসারতা। আমার পিতার তৈরী জুতোর পুবনো ক্রেতা ছিল এক কাউণ্ট। এককালে হয়ত তাঁর মতো সম্ভ্রান্তের জুতো-তৈরী কর্মশালায় পদার্পণ স্বপ্নাতীত ব্যাপার ছিল। কিন্তু কয়েক পুরুষ ধরে অপব্যয়ে ধনসম্পদ বঞ্চিত হয়ে কেবলমাত্র পৈতৃক আবাস ও পদবীর অধিকারী কাউণ্টকে পয়সার হিসাব রেখে চলতে গিয়ে, পূর্ব আদব-কায়দাকে ছোট করে ফেলতে হয়েছিল। তাঁর স্ত্রী একবার ভিয়েনায় গিয়ে কোনো ধনী ব্যবসাদারের সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতিয়ে স্বামীর কাছে আর ফিরে আসেননি। বেচারা কাউণ্ট আমাদের কাজের ঘরে বসে আমার পিতার সঙ্গে পারিবারিক সব কথা স্বচ্ছন্দে বলে যেতেন যেন তিনি ও আমার পিতা সমাজের সমান স্তরের লোক।

"কাউণ্ট পিতাকে অনেক সময় বলতেন, 'কারেল, তোমার গৃহিণীভাগ্য ও সুখের পরিবার দেখে আমার ঈর্ষা হয়। আমি এত অক্ষম না হয়ে যদি তোমার মতো নিপুণ জুতোর মিস্ত্রী হতাম তা হলে আমার জীবন হয়ত তোমারই মতো সুখ ও শান্তিময় হতো।' কাউণ্টের একটি মাত্র আট বছর বয়সের ছেলে ছিল তাঁর নয়নের মণি।

একবার তাকে আমাদের কর্মশালায় এনে পিতাকে বায়না দিলেন তার জন্ম একজোড়া রাইডিং বুট তৈরীর।

"তিনি অবশ্য জানতেন তাঁর পূর্বপুরুষের বাছাই-ঘোড়াভরা আস্তাবল এখন শূন্য এবং তহবিলের ক্রম-সঙ্কুচিত অবস্থায় তাঁর একমাত্র বংশধরের অন্নসংস্থান ছাড়া শিকার বা অন্য শৌখীন-খরচ করবার সঙ্গতি থাকবে না। কিন্তু ঘোড়ায় চড়বার সুযোগ হোক বা না হোক, পোশাক পরিচ্ছদে খানিকটা আভিজাত্য তো বজায় রাখতে হবে! কাউন্ট-পুত্রকে আমার পিতা আপন পুত্রের মতো স্নেহ করতেন। তাঁর সকল নৈপুণ্য দিয়ে তৈরী করলেন একজোড়া অপূর্ব রাইডিং বুট। বুট তৈরীর খবর পাঠানো হলেও কাউন্ট আমাদের কর্মশালায় এলেন না বহুকাল। তাঁর কোনো সংবাদ না পেয়ে শেষে আমার পিতা নিজে একদিন নিয়ে গেলেন জুতোজোড়া কাউণ্টের বাড়িতে। কাউণ্টের সঙ্গে দেখা হতে তিনি তাঁর বিশীর্ণ ও বেদনাকাতর মুখ দেখে আতঙ্কিত হয়ে ভাবলেন, কাউন্ট আবার কোনো চরম দুর্গতির কবলে পড়েছেন।

"পিতার হাতে বুটজোড়া দেখে শোকরুদ্ধ স্বরে তিনি বললেন, 'বন্ধু, আমার পিটারকে ঐ জুতো পরাতে হলে তোমাকে স্বর্গ পর্যন্ত দৌড়তে হবে। তোমার মতো সজ্জন ব্যক্তি স্বর্গে যাবে নিশ্চয়ই কিন্তু দেবদূতেরা মর্তের ঐ বুট সমেত তোমায় সেখানে প্রবেশ করতে দেবে কি-না সন্দেহ।' পিটারের মৃত্যুর সঙ্গে কাউণ্টের প্রায় মৃত্যুতুল্য অবস্থা হয়েছিল এবং এই ঘটনা মর্মাঘাত করে আমার পিতাকেও করেছিল মুহ্যমান। কাউন্ট বহু চেষ্টা করেও পিতাকে বুটের দাম গ্রহণ করাতে পারেননি।

"আমাদের কর্মশালার জানালার আলসেতে সে বুটজোড়া রাখা আছে, গীর্জার কুলুঙ্গিতে রাখা সেণ্টদের মূর্তির মতো। রোজ সকালে আমার পিতা নিজ হাতে সেটিকে পালিশ দিয়ে পরিষ্কার করে তোলেন—কাঁচের মতো মসৃণ ও উজ্জ্বল। বাগানের ফুল এনে বুটজোড়াকে ফুলদানি করে সাজিয়ে দেন প্রত্যহ।"

স্টেফান ও মিরকো

ক্লাবের বাইরে স্বল্পভাষী স্টেফানের সঙ্গে একবার কথা আরম্ভ হলে যেন সদাপ্রবাহিত উৎসধারার মতো তার কাহিনীগুলি বেরিয়ে আসত। সে বলত, "কর্মজীবনে নিষ্ঠাই সবচেয়ে বড় জিনিস। যা কিছু সফল করে তুলতে চাও, তার পিছনে নিষ্ঠাকে না ঢাললে, সাফল্যের কোনো সম্ভাবনা নেই। নিষ্ঠাকে জীবনে আনতে হলে চাই সঙ্কল্প আর এই সঙ্কল্পের যাচাই হয় শ্রম ও দুঃখকষ্টের সহনশীলতায়।"

এ বিষয়ে সে একদিন বলল, "জানো, আমি এ নিষ্ঠাকে দেখেছি আমার পিতার কর্মে। প্রত্যেকটি জুতোকে তিনি যে-রকম প্রাণ ঢেলে গড়তেন তাতে মনে হতো

যেন সেগুলি তৈরী হলে জীবন্ত হয়ে তাঁর হাত থেকে বেরিয়ে আপনা থেকে চলতে শুরু করবে।

"তুমি হাসছ, কিন্তু আমি মনে করি তোমরা একটা ভাস্কর্য গড়ায় যতখানি নিষ্ঠা দিয়ে থাকো, আমার পিতা জুতো তৈরীতে প্রায় ততখানিই নিষ্ঠা ঢেলে দিতেন। তিনি বলতেন, মানুষের মতো জুতোরও জীবনী লেখা যায়। মানুষের পদাশ্রিত হলেই জুতো হয় জীবিত এবং মানুষেরই মতো চলে তার সুখ-দুঃখের জীবন। প্রাণবায়ু বেরিয়ে গেলে আমাদের শরীরের যে অবস্থা, শেষবারের মতো মানুষের পদ-বিচ্ছিন্ন হলে, জুতোরও সেই অবস্থা।

"এই জুতোগুলি কেউ বা আসে সৌভাগ্য নিয়ে কেউ আসে মন্দ ভাগ্য নিয়ে। শ্রমিক, চাষী ও ফিরিওয়ালা জুতো কিনবে বেশ মজবুত দেখে এবং তারপর থেকেই শুরু হয়ে যাবে সে জুতোর দুর্ভাগ্য। জলে কাদায় বালিতে পাথরে সেই যে তার মস্‌মস করে ঘর্ষণ ও মর্দন আরম্ভ হলো, তার আর বিশ্রাম হবে না —যতদিন না তাকে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া হচ্ছে। কিন্তু তার আগে তার ধূলায় ধূসবিত দেহে উঠবে অনেক তালির অপমান।

"ধনীর পায়ের জুতো, দোকান ছাড়লেই শুরু করে আনন্দের জীবন। প্রচুর বিরামের মাঝে মাঝে মখমল-গালিচার সঙ্গে মাখামাখি করে গর্বে হয় ভরপুর। শৌখীন মহিলার পায়ের জুতোর যত সোহাগ আর সম্মান, তত স্বল্পস্থায়ী তার এই সৌভাগ্যের জীবন কারণ একটু জৌলুষ কমলেই তাকে আশ্রয় নিতে হবে পরি-চারিকার চরণে। তখন না থাকবে তার আগের যত্ন ও আদর না থাকবে সে অলস-চরণের সুখস্পর্শ। তার বুক দলতে থাকবে কড়া-পড়া ভারী পায়ের কর্ত্রীর আজ্ঞা-বহনকারীণীর অবিরাম পদক্ষেপ।"

আমি অবাক হয়ে শুনছি স্টেফানের কথা। সে ইঞ্জিনিয়ারিং পড়লেও তার মনকে আচ্ছন্ন করে আছে তার বংশগত পেশা, আর এ সব কথা বিনা দ্বিধায় সে বোধহয় স্বদেশী বন্ধুদের বলবার সুযোগ পায়নি।

সে বলে চলেছে, "শহরতলীতে আমাদের বাড়ি। আমরা গরীব হলেও আমাদের সংসারে অভিযোগ আর ঈর্ষার কথা শুনতে পাবে না। আমার পিতা একবার বলেছিলেন যে, এক ধনীর কর্মচারী জুতো কিনতে এসে তার মনিবের দুর্ভাবনা ও দুর্ভোগের যা লম্বা ফর্দ দিলো তাতে মনে হয়, আমরা গরীব হলেও তার চেয়ে অনেক সুখে আছি। আনন্দ ও সুখ জীবনে টাকার অঙ্কে মাপা যায় না।

"আমরা সন্ধ্যেবেলায় যে যার কাজ সেরে যখন নৈশাহারে বসতাম, আমার পিতা বাড়ির তৈরী গরম মোটা রুটির টুকরো ছুরি দিয়ে কেটে সকলের হাতে দিতেন। তারপর সুপ প্লেটে পড়লেই, তিনি চোখ বুঁজে স্বল্প কথায় ঈশ্বরকে আমাদের এই আহার্য অর্জনের উপায় দেবার প্রার্থনা ও প্রণতি জানাতেন। তারপরে আমরা সব হুস্‌হাস করে খেতে শুরু করতাম। খাওয়ার শেষে শীতের দিনে আগুনের

ধারে বসে কে কত মজার গল্প ও ঘটনা বলে বাহাদুরি পেতে পারে আমাদের মধ্যে তার যেন প্রতিযোগিতা শুরু হয়ে যেত।

"আমার একটি ছোট ভগ্নী ছিল, সে যখন কয়েক দিনের অসুখে মারা গেলো, তার শোকে আমাদের বুক ফেটে যেত, মনে হতো যেন আমরাও শীঘ্রই তার সঙ্গী হব। আমার পিতার নয়নের মণি ছিল সে, কিন্তু আশ্চর্য তিনি কোনো অনুযোগ না করে আমার মাকে নিয়ে যেতেন গীর্জায়। তার স্মরণে দুটি মোমবাতি জ্বালিয়ে প্রার্থনা করে যখন ঘরে ফিরতেন, তাঁদের মুখ দেখে বুঝতাম যে, এই তীব্র শোক ও বেদনার কিছুটা লাঘব হয়েছে। আমি নতুন জগতের দীক্ষায় মানুষ, আমার মনে ভগবানে বিশ্বাস নেই। গীর্জায় প্রার্থনা আমার কাছে বুজরুকি। কিন্তু এই বুজরুকিতেই তো আমার বয়োবৃদ্ধরা শোকে পাচ্ছেন শান্তি। আমাকে শোক লাঘবের অন্য পন্থা খুঁজতে হবে, আমার সহ্যশক্তিতে আমার ব্যক্তিত্বে। যদিও জানি প্রার্থনা দিয়ে নিজেকে আমরা ছলনা করে থাকি তবুও সেই ছলনা অন্তত হৃদয়ের বেদনাকে খানিকটা লঘু করে দিতে পারে। কাজেই ছলনায় শোকের লাঘব আর তার ত্যাগে শোকের তীব্র বেদনাকে জয় করবার অক্ষম প্রচেষ্টার মধ্যে কোনটা যে বেশী গ্রহণীয় সেটা বলা শক্ত।

"আমাদের পাড়ার শ্রমিকদের নিরভিমানী গৃহগুলিতে আধুনিক সভ্যতার সুখ-সুবিধার কোনো উপাদান নেই। দারিদ্র্যময় এই গৃহগুলির গ্রামের প্রত্যেকটি লোকের মতো, একটা বিশেষ পরিচয় আছে —যাকে রাতের অন্ধকারে আকাশের গায়ে-পড়া কালো স্লিলুয়েট-এ চেনা যায়। আগামী দিনে আমারা যখন গড়ব নতুন রাষ্ট্র তখন এই ডেকাডেণ্ট সভ্যতার নিদর্শনগুলি মুছে যাবে। নতুন ইমারত উঠবে শ্রমিক চাষীদের জন্যে বিজ্ঞানসম্মতভাবে আধুনিক আবিষ্কারের সুখ-সুবিধার আওতায় ভরা। সেখানে ব্যক্তিগত রুচির জন্য বিশেষ ঢঙয়ে গড়া বাড়ি থাকবে কি-না সন্দেহ। এক ধাঁচে সারি সারি বাড়ির মধ্যে বিশেষ পরিচয় কেবল থাকবে একটা নম্বরে। ঠিক এমনি ভাবেই হয়ত, আজ যাদের গ্রামের জ্যেঠা খুড়ো বলে জানি, যাদের ছেঁড়া কোট আর ঝোলা পাতলুনের নক্শা দেখে দূর থেকে চিনতে পারি, তারাও সব হারিয়ে যাবে টেঁকসই শ্রমিক-চাষীদের স্মার্ট ইউনিফর্মে।"

তাকে বললাম, "স্টেফান, তুমি প্রলেতারিয়েৎ পরিবার থেকে এলেও তোমার মনোভাব অত্যন্ত রিঅ্যাকশনারি মনে হচ্ছে।"

সে বললে, "তা আমি জানি। একটা ডেকাডেণ্ট ও ক্যাপিতালিস্ত সমাজের অংশ আমি, শ্রমিক হলেও। তাই আমার পক্ষে রিঅ্যাকশনারি ধারণা কিছু অসঙ্গত নয়। আমি চাই নতুন রাষ্ট্র, তার জন্যে আমি প্রাণ দিতে প্রস্তুত। কিন্তু সত্যি বলতে কি ডেকাডেন্সের এই চিহ্নগুলিকে আমি ভুলতে পারব না। আমার পরে যারা আসবে নতুন সমাজে ও রাষ্ট্রে জন্ম নিয়ে, এ সব ব্যাপারগুলি তাদের জানা না থাকায়, তারা এগুলির অভাব কোনোদিন অনুভব করবে না। তোমাকে আমার

অনুরোধ যে, তুমি এইলাস বা অন্য কাউকে এই কাহিনীগুলির কিছু বলো না, যারা ক্যাপিতালিস্ত বা বুর্জোয়া থেকে কমিউনিস্ট হয়েছে, তাদের রিঅ্যাকশনারি হওয়া স্বাভাবিক বলে পদস্খলনে তারা ক্ষমা পায় কিন্তু প্রলেতারিয়েৎ কমিউনিস্টের যদি হয় অধঃপতন তা হলে তার ক্ষমা নেই এবং সে পাবে চরম দণ্ড।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "সে কোন সাহসে আমায় বিশ্বাস করে বলল এ কথাগুলি।"

সে বলল, "সব বলবার কথা বুকে জমে যখন আমাদের প্রায় শ্বাসরোধের মতো অবস্থা হয়, তখন বিশ্বাস করে কাউকে বলে ফেলি। এ সাধারণ ভুল সকলেরই হয়ে থাকে। নিজের মনের কথা যদি অযোগ্যকে বিশ্বাস করে বলে ফেলি, তখনই আমরা পড়ে যাই লিকুইডেশানের তালিকায়। প্রত্যেকটি জিনিসের জন্মের সঙ্গে জড়িত আছে ক্লেশ ও সংগ্রাম। স্তোসালিজমের পরিপূর্ণভাবে জন্ম হতে প্রয়োজন হবে বহু কষ্টের ও সংগ্রামের, প্রচুর অদল বদল ও ভালোমন্দ যাচাই-এর। তবেই প্রতিষ্ঠা হবে আগামী দিনের আদর্শ রাষ্ট্রের।

"এইলাসের মতো লোকেরাই মনে করে, গরম গরম বক্তৃতা দিয়ে নরম মনের লোকদের নিজ-মতবাদে বিশ্বাস করিয়ে, নিজের মতো করে তাদের চালিয়ে, ছলে-বলে-কৌশলে এনে দেবে আদর্শ স্তোসালিস্ট রাষ্ট্র। যেন গাছ থেকে পেড়ে দেওয়া একটি পরিপক্ক আপেলের মতো, লোকের হাতে তুলে দেবে তার এই অপূর্ব সৃষ্টি। কিন্তু এইসব গরম কথায় ও আস্ফালনে যে-সব লোকের মনে টোল পর্যন্ত পড়ে না, তারাই কেবল জানে কত সময় কত সংগ্রাম ও কত আহুতি লাগবে এই স্তোসা-লিজমের প্রতিষ্ঠায়। এই অভিযানের যোগ্য নায়ক হচ্ছে মিরকোর মতো লোকেরা।

"তুমি বোধহয় জানো না, মিরকো ছিল আমাদের লীডার। তার অধিনায়কত্বে পার্টিতে আমরা নির্ভয়ে জানাতে পারতাম স্ব-স্ব মতামত, তাকে প্রতিবাদ করবার সুযোগ সে দিত এবং আলোচনার পর আমরা সকলে একটা সর্ববাদী-সম্মত সিদ্ধান্তে আসতে পারতাম। তারপর এল এইলাস, আইন পড়ার বৃত্তি নিয়ে এখানে। দেশে ছিল সে মিরকোর প্রাণের বন্ধু। ইয়ানিনা, মিরকো আর এইলাসের মাঝে পড়ায় সে বন্ধুত্বে চিড় খেলো।

"ইয়ানিনার প্রথম পরিচয় হয় এইলাসের সঙ্গে এবং একদিন সে ক্লাবের সকলের সঙ্গে ইয়ানিনার পরিচয় করিয়ে দেবার জন্যে এসে বললে, 'বন্ধুরা, ইয়ানিনা আমার সঙ্গিনী কিন্তু তোমাদের আমার জানিয়ে দেওয়া উচিত যে, সে এক দেশদ্রোহী পলাতক হোয়াইট রাশিয়ান কাউন্টের মেয়ে। আমার পার্টি যদি তার সঙ্গে বন্ধুত্ব অনুমোদন না করে তা হলে আমাদের সম্পর্ককে এখুনি শেষ করে দেবো। অবমানিতা ও রুষ্টা ইয়ানিনা চলে যাচ্ছিল কিন্তু মিরকো ছুটে তার পথ রোধ করে বলেছিল—'মাদ্‌ম্যয়জে.ল, তুমি একজনের অভদ্রতার কালি আমাদের সকলের মুখে লাগিয়ে দিয়ে চলে যাবে, এ আমি সহ্য করব না। বন্ধু এইলাসের জানা উচিত, জন্মগতভাবে

কেউ কুলাক, প্রলেতারিয়েৎ বা বুর্জোয়া হয় না। তাদের বিশিষ্ট পরিচয় হয় মনোবৃত্তিতে, আচারে ও ব্যবহারে। আমাদের পার্টি কারো ব্যক্তিগত বন্ধুত্বের ওপর খোদকারি করে না। পার্টির সদস্যের ব্যক্তিগত উপযুক্ত বন্ধু নির্বাচন, তার একারই দায়িত্ব। আমরা স্যোসালিজমের বিরুদ্ধবাদী দলকে তফাতে রাখবার চেষ্টা করব। কিন্তু সে দলভুক্ত কেউ যদি আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়, তাকে আমরা সামাজিক শিষ্টাচার দেখাতে কুণ্ঠিত হব না। ব্যক্তিগতভাবে কাউকে রাজনৈতিক কারণে এই রকম রূঢ় ব্যবহার দেখানো অত্যন্ত অশোভন। মাদ্‌ম্যয়জে.ল আমি সকলের তরফ থেকে এইলাসের এই দুর্ব্যবহারের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করছি।'

"সেই থেকে ইয়ানিনা মিরকোর অনুরক্তা হয়ে পড়ল এবং এইলাস সুযোগ পেলেই মিরকোকে, নরমপন্থী, দোমনা, বুর্জোয়া-ঘেঁষা ইত্যাদি বলে মিটিংয়ে আক্রমণ শুরু করল। শেষে কতকগুলি মিথ্যা অভিযোগ তৈরী করে দেশের মূল পার্টির নির্দেশে এখানকার লীডারশিপ থেকে মিরকোর অপসারণের ব্যবস্থা করল এবং এইলাস নিজে হলো লীডার। মিরকো এখনও নির্ভয়ে বলে চলে তার মতামত।

"এইলাস অবশ্য সেটা মোটেই পছন্দ করে না। আমাকে একদিন বলেছিল যে, মিরকোর উপস্থিতিতে আমাদের পার্টির সলিডারিটি ভেঙে যাওয়ার সম্ভাবনা। সে নিজে সরে না গেলে উপায়ান্তরে তাকে সরিয়ে ফেলার ব্যবস্থা করতে হবে। মিরকোর ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে আমার বেশ ভয় হয়। তাকে একবার এ কথা বলায় সে হেসে উড়িয়ে দিলো আমার সাবধানবাণী। বলল, 'তা কি করে সম্ভব? এইলাস আমার আবাল্য বন্ধু।' আমি একদিন ইয়ানিনার কথা তুলে এইলাসকে বললাম, আচ্ছা, তুমিও তো এসেছ পেতি-বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে, কাজেই তোমার সততা ও স্যোসালিজমে বিশ্বাসের দৃঢ়তা সম্বন্ধে অন্যেরাও তো সন্দেহ করতে পারে এবং যদি প্রশ্ন করে তো কি জবাব দেবে?

"সে একটা উপেক্ষার হাসি হেসে বলল, আরে এ অতিশয় সোজা। তুমি বই পড়লে দেখবে যে, সাম্যবাদী বিপ্লবের নেতারা সব আসে এবং তৈরী হয় পেতি বুর্জোয়া শ্রেণী থেকে। তারাই চাষী ও শ্রমিকদের দলকে সজাগ করে দেয় তাদের ন্যায্য দাবি কতটা এবং কোথায়, সে সম্পর্কে। আমি আমার কাজেই প্রমাণ করে দেবো স্যোসালিজমের প্রতি আমার অবিচলিত একনিষ্ঠতা, এ ধরনের প্রশ্ন ও সন্দেহ আসবে কেবল মিরকোর মতো পথভ্রষ্ট স্যোসালিস্টদের সম্বন্ধে।

"তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, সে মিরকোর বন্ধু হয়ে কেন মিথ্যা অভিযোগে তাকে পার্টির লীডারশিপ থেকে সরাল। সে বলল, এ তো মিথ্যা অভিযোগ নয়, পার্টির স্বার্থে সত্য উপায়। পার্টিকে বাঁচিয়ে রাখতে যে কোনো উপায়ই নৈতিক ও সত্য। ব্যক্তিগতভাবে আমি এখনও মিরকোর পরম বন্ধু এবং আমি জানি যে, সে অতিশয় সৎ ও সজ্জন ব্যক্তি। কিন্তু পার্টির প্রয়োজনের পক্ষে মিরকো একেবারেই অপদার্থ। একবার ইচ্ছা হলো তাকে জিজ্ঞাসা করি যে, পার্টি কি উদ্দেশ্যে তৈরী হয়েছে এবং

তাতে কি ব্যক্তিগত সততা, বন্ধুত্ব, প্রেম বা ভালোবাসার কোনো স্থান বা মূল্য নেই ? কিন্তু এইলাসের জবাব সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ না থাকায় চুপ করে গেলাম।

"মিরকোকে প্রকারান্তরে জানাবার চেষ্টা করেছিলাম, এইলাসের তার প্রতি বিদ্বেষ কত তীব্র, কিন্তু মিরকো সে কথায় কান দিলো না। সে একদিন বলল, দেখো, কমিউনিজম আইডিয়া হিসাবে এক জিনিস আর তাকে কার্যকরী করতে যে উপায়ের দরকার সে আর এক জিনিস। ব্যক্তিগতভাবে আমি যদি চেয়ে থাকি আমার চিন্তার ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা, মনের মতো সহধর্মিণী, যাকে নিয়ে বাঁধব আবশ্যকের অনতিরিক্ত ঘর এবং আমাদের সন্তান সন্ততিদের গড়ে তুলব সমাজের ও রাষ্ট্রের উপযুক্ত অধিবাসী করে একেই সফল করে তুলবার জন্য চাইব কমিউনিজম —কিন্তু সেটা আমার একার সুযোগ ও সুবিধার জন্য নয়, আমার এই অভিলাষকে পরিপূর্ণ দেখতে চাইব আমার চারপাশের আর সকলের মধ্যে, তা হলে আমার এই অভিলাষ কি অন্যায় দাবি ? এই বিশ্বাসকে বাস্তবে পরিপূর্ণ করতে সংগ্রামের প্রয়োজন হবে কিন্তু তার বোধন শুরু না হতেই 'যুদ্ধং দেহি'-র ভাব দেখিয়ে কি লাভ ? মানব সমাজের মঙ্গলার্থে যারা নিজেদের উৎসর্গ করেছে তাদের প্রত্যেকের সঙ্কল্পকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এমন কি দেখতে হবে অবচেতনায় নিজেদের ব্যক্তিগত স্বার্থ কোথাও কোনোমতে তাদের লক্ষ্যপথের মোড় ঘুরিয়ে দিচ্ছে কি-না। তারপর একটা আফসোসের দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলে বলল, কি জানি, এইলাস বোধহয় ঠিকই বলে যে, আমার মধ্যে খানিকটা আছে বুর্জোয়াজি। আমার ডাচ পেন্টিং ভালো লাগে, অত্যন্ত ভোগবিলাসের ছবি সে সব। গোয়েথে আর য্যুগো পড়ে আমার আনন্দ হয় কিন্তু পার্টি সমর্থিত লেখক তাঁরা নন। আর মোৎসার্তের সংগীত শুনতে আমি পাগল কিন্তু তাঁর সৃষ্ট সুরধারা কেবল রাজদরবারে অভিজাত শ্রেণীর রুচি সেবার্থে রচিত বলে আমি পার্টি থেকে পাই গালাগালি। আমার চলে যেতে ইচ্ছে করে এমন কোনো স্থানে যেখানে নেই শ্রেণী, নেই জাত, যেমন পশুরা দল বেঁধে থাকে একসঙ্গে প্রকৃতি তাদের এক ছাঁচে ঢেলেছে বলে। আমি থাকতে চাই সেই রকম মানুষের সমাজে।"

স্টেফান যা ভয় করেছিল শেষে তাই ঘটল। এইলাস মিরকোর নামে জাল কাগজপত্র ও মিথ্যা অভিযোগ পৌঁছে দিলো দেশের সরকারের কাছে।

মিরকোর কাছে এল সরকারী নির্দেশ যে, রাষ্ট্রবিরোধী কার্যে সে লিপ্ত থাকায় তার বৃত্তি বন্ধ করা হয়েছে এবং ফরাসী সরকারকে অনুরোধ করা হয়েছে যাতে মিরকোকে তিন দিনের মধ্যে তার স্বদেশের সীমানায় পৌঁছে দেওয়া হয়। তার এই ভাগ্য বিপর্যয়ে আমরা সকলেই বিশেষভাবে দুঃখিত হলাম।

সে আমাদের সকলকে ডেকে বলল, "আমার যা জিনিসপত্র আছে সেগুলি তোমরা যে দামে খুশী নিয়ে নাও আর যদি কেনবার সঙ্গতি না থাকে তা হলে উপহার হিসাবে নিয়ে যাও, যা তোমাদের প্রয়োজন।"

সকলেই আপন আপন সামর্থ্য মতো অর্থ দিয়ে কিনে নিল টাইপরাইটার, ক্যামেরা, রঙ, তুলি, ইজে.ল, ক্যানভাস, কাগজ ও ফ্রেম। সে এমন কি তার বাড়তি জামা কাপড়ও বেচে দিলো নামমাত্র মূল্যে। তারপর চলে যাবার দিন আমাদের নিমন্ত্রণ করল তার সঙ্গে রেস্তরাঁতে ডিনার খাবার জন্যে।

সে এভাবে কষ্টলব্ধ অর্থ অপব্যয় করছে বলে আমরা যে যার আহারের দাম দিতে চেষ্টা করলে মিরকো ভীষণ আপত্তি করে বলল, "তোমরা যদি সত্যি আমাকে ভালোবেসে থাকো তা হলে আমাকে এ ভোজ দেওয়ার আনন্দ থেকে বঞ্চিত করো না। কয়েকটা ফ্রাঙ্ক বাঁচানোর চেয়ে তোমাদের খাইয়ে যে তৃপ্তি পেলাম সেইটে হবে আমার যাত্রার সবচেয়ে বড় পাথেয়।"

রেস্তরাঁ থেকে সে আমাদের নিয়ে গেলো ছাত্রপল্লীর একটি সিনেমায় এবং জোর করে আমাদের সকলের প্রবেশমূল্য নিজেই দিলো।

এই আসন্ন বিদায়-ভোজে ইয়ানিনার অনুপস্থিতি সকলের কাছে বেখাপ্পা ঠেকলেও কারণ জিজ্ঞাসা করতে আমাদেব দ্বিধা হচ্ছিল।

শেষে একজন মিরকোকে প্রশ্ন করতে সে বলল, 'যতক্ষণ তোমাদের সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন না হচ্ছি আমি আমার চারপাশে হাসিমুখ দেখতে চাই, ইয়ানিনা এখানে উপস্থিত থাকলে তা সম্ভব হতো না। আমি অপেরার দু'খানা টিকিট কিনে এইলাসকে অনেক অনুরোধ করে পাঠিয়েছি তাদের দু'জনকে গীতাভিনয় দেখতে। সে এখনও ঠিক জানে না যে আমি চলে যাচ্ছি এবং আশা করি এইলাস তাকে আমার অনুরোধ উপেক্ষা করে বলে দেবে না আমার এই গোপন প্রস্থানের কথা।'

পরের দিন ভোরেই তাকে রওনা হতে হবে।

সিনেমা থেকে প্রায় রাত একটায় বেরিয়ে আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম। দৃঢ় আলিঙ্গন ও শেষ করমর্দনের সময় সকলের চোখ ছল্‌ছলে হয়ে উঠেছিল। দূরে অপস্রিয়মান মিরকোকে আকাশে হাত তুলিয়ে আবার যখন কয়েক জন চেঁচিয়ে উঠল 'অবুভোয়ার' বলে, কণ্ঠস্বরে কৃত্রিম আনন্দোচ্ছ্বাস আনবার চেষ্টায় সে আওয়াজ রুদ্ধ আর্তনাদের মতো শোনাল।

সকাল তখন সাতটাও বাজেনি। ঘুমের ঘোরে শুনছি কোন সুদূর থেকে কে আমায় ডাকছে। হঠাৎ জেগে উঠে শুনলাম স্টেফানের গলা আর দরজায় টোকা দেওয়ার চাপা আওয়াজ।

ধড়মড়িয়ে বিছানা ছেড়ে দরজা খুলতেই সে বলল, "কাপড় পরে শিগ্‌গির চলো আমার সঙ্গে যদি মিরকোকে শেষ দেখতে চাও।"

বললাম, "কাল তো তার কাছ থেকে আমরা সবাই বিদায় নিলাম। সে কি এখনও যায়নি!"

স্টেফান অশ্রুভরা চোখে ধরা-গলায় জানাল, "সে আমাদের ঠকিয়েছে। জানো তো তার আর আমার কামরা পাশাপাশি। ভোর তিনটের সময়ে তার ঘর থেকে

একটা ভীষণ বিস্ফোরণের আওয়াজে আমি জেগে উঠে তার দরজায় অনেক ধাক্কা দিয়ে সাড়া না পেয়ে কাঁসিয়ার্জকে ডেকে আনি। সে আর আমি তার নাম ডেকে কোনো উত্তর না পেয়ে পুলিশ ডাকি এবং তারা এসে দরজা খুলতে দেখি মিরকো নিজের মাথায় পিস্তলের গুলি মেরে আত্মহত্যা করেছে।"

চললাম তার সঙ্গে গরীব বস্তির এক নগণ্য হোটেলে। পথে স্টেফান-এর কাছে শুনলাম যে, আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তারা হোটেলে পৌঁছালে সে সিঁড়ি দিয়ে উঠবার সময় বলে, 'স্টেফান, দেশের সরকারের কাছে আমি আজ দেশদ্রোহী আর পার্টির কাছে আমি অবিশ্বাসভাজন ও ভ্রষ্টকর্মী। আমার চলার পথের সামনে উঠে গেছে পাঁচিল আর পাশে ও পেছনে পড়ে গেছে কাঁটাবেড়া এবং আমার দাঁড়িয়ে থাকবার ঠাঁইটুকুও নেই। একেই বলে পারফেক্ট লিকুইডেশন।' তারপর শুভরাত্রি জানিয়ে আমার করমর্দন করে নিজের ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দেয়।

আমরা হোটেলে পৌঁছে দেখি বিরাট ভিড়। আত্মঘাতীর মৃতদেহ দেখবার জন্য জীবিতদের কি আকুল আগ্রহ! দরজায় পুলিশ আমাদের ঢুকতে দেখে খুব রূঢ় ভাষায় সরে যেতে বলল। তারপর স্টেফানকে চিনতে পেরে বলল, 'তুমি ভিতরে এস কিন্তু ও আসতে পারবে না।' সে পুলিশকে জানাল, মিরকোকে শেষ যারা জীবিত দেখেছে আমি তাদের একজন। তদন্তের সময় সাক্ষী দিতে আমার যদি আপত্তি না থাকে তা হলে নাম ঠিকানা লিখে ভিতরে যেতে পারি বলায় নাম লিখে চললাম চারতলার এ্যাটিক্ কামরাগুলির অভিমুখে।

মিরকোর ঘরে ছোট স্কাইলাইটের একমাত্র জানালা দিয়ে আলো তখনও আসেনি। কম জোরের একটা বাল্‌ব থেকে যেটুকু রশ্মি তার ওপর পড়েছিল তাতে দেখাল যেন মিরকো ফুতোইয়ে বসে ঘুমোচ্ছে।

স্টেফান ঘরের মধ্যে যে পুলিশ কর্মচারী উপস্থিত ছিল তাকে কি বলতে সে তার টর্চ ফোকাস করে মিরকোর দেহের ওপর ফেলল। দেখলাম কাত হয়ে পড়া তার মাথার ডান কানের ওপরে একটা বীভৎস ক্ষত, এবং সেখান থেকে রক্তস্রোত কান গাল গলা বেয়ে শার্ট ও জামাকে রঞ্জিত করে মেঝেতে লিনোলিয়ামের ওপর পড়ে চাপ বেঁধে গেছে। তার আধবোজা চোখ আর হাঁ-করা মুখে যেন লেগেছিল একটা ব্যঙ্গভরা হাসি।

আমরা বেরিয়ে আসবার সময় স্টেফান বলে উঠল, স্ট্যুপিড —স্ট্যুপিড। কিসের অথবা কার উদ্দেশে তার এই খেদোক্তি জিজ্ঞাসা করিনি।

সমস্ত জগৎটাকেই তখন আমারও মনে হচ্ছিল স্টুপিড।

সেন সংলাপ

মিরকোর যেমন সকলকে কাছে টানবার আকর্ষণী শক্তি ছিল বন্ধু সেনের মধ্যেও দেখেছিলাম মানুষকে নিকটে আনবার সেই অদ্ভুত অভিব্যক্তি। মনে পড়ে কত আশা নিয়ে গিয়েছিলাম প্রথমবার লণ্ডনে। পকেটে ছিল পাঁচ পাউণ্ড আর এক আমেরিকান ডাক্তার বন্ধুর কাছে গচ্ছিত কয়েকটি ছবি, যা সে বিক্রী করে টাকা পাঠিয়ে দেবে —তারই প্রত্যাশায়।

ডাঃ. রাধাকৃষ্ণণের কাছ থেকে নিয়েছিলাম গুরুদেব রবীন্দ্রনাথের খবর দিয়ে স্যার উইলিয়াম রোদেন্‌স্টাইনের নামে একখানি পরিচয়পত্র। ভেবেছিলাম সেই চিঠিতেই আমার সব আকাঙ্ক্ষার সুরাহা হয়ে যাবে। তিনি ছিলেন লণ্ডনের রয়াল কলেজ অফ আর্টস্‌-এর অধ্যক্ষ এবং তাঁর আরও বিশেষ পরিচয় ছিল, ভারতভক্ত ও ভারতীয়দের বন্ধু বলে। পয়সা বাঁচাতে পদব্রজে যাত্রা শুরু করেছিলাম তাঁর ঠিকানায় পৌঁছানোর উদ্দেশ্যে। যদিও জানতাম না কত দূরে সে বাড়ি। অনেক হেঁটে ক্লান্ত হয়ে পথের ধারে বসে পড়ায় আজও মনে আছে দয়ালু এক ট্রাক-ড্রাইভার গাড়ি থামিয়ে কোথায় যেতে চাই জিজ্ঞাসা করে তার বাহনে আমায় পৌঁছে দিয়েছিল স্যার উইলিয়ামের বাড়িতে।

প্রায় পৌনে এক ঘণ্টা অপেক্ষা করার পর অধ্যক্ষ মহাশয়ের দর্শনলাভ হলো। তিনি বললেন, "দেখো, আমি রয়াল কলেজের অধ্যক্ষের পদ থেকে এখন রিটায়ার করেছি কাজেই তোমাকে আমি কোনো সাহায্য করতে পারব না।"

বুঝলাম, আমি ভারতীয় শিল্পী ও তাঁর দর্শনপ্রার্থী লেখায় তিনি ধরে নিয়েছিলেন যে আমি তাঁর সাহায্য-প্রত্যাশী। যদিও তাঁর সঙ্গে দেখা করার মূল উদ্দেশ্য ছিল সেটাই, স্যার উইলিয়াম নিজে থেকে তা আন্দাজ করে বিনা আলাপে এমন নিরাশ করে দেওয়ায় আমি ক্ষুব্ধ হলাম এবং বললাম, "মহাশয়, আপনার সাহায্য চাই এ কথা তো বলিনি। শুনেছিলাম, আপনি ভারতবন্ধু এবং ডাঃ. রাধাকৃষ্ণণ আমার মারফৎ কবিগুরু রবীন্দ্রনাথের সুসংবাদ পাঠিয়েছেন, তাই এসেছি আপনাকে দেখতে ও সে সংবাদ দিতে।" এই কথা বলতেই তাঁর ব্যবহার ও কথার সুর বদলে গেলো। যেন আমি হয়ে গেলাম তাঁর বহু পরিচিত পুরনো বন্ধু।

আমার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "এস হে এস, ভিতরের কামরায় চলো, চা খাও। বলো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কেমন আছেন? তাঁর সঙ্গে শেষ কবে তোমার দেখা হয়েছে?" ......ইত্যাদি।

তাঁর এই আপ্যায়ন বেশ কৃত্রিম লাগল। ভাবলাম কলকাতার চোরাবাজারে কিনে ধোলাই করা পুরনো স্যুট আর চাঁদনী চকে সওদা করা সস্তার শার্ট ও টাই পরা এই অধম শিল্পী স্যার উইলিয়ামের ড্রয়িং রুমকে অশুচি করতে চলল।

রবীন্দ্রনাথের নামোল্লেখে শুধু যে শুদ্ধিলাভ হলো তা নয় চা-ও পাওয়া গেলো। কিন্তু অনেক চিনি ঢেলেও স্বাদে তিক্ততা দূর করা গেলো না। তাঁকে অভিবাদন জানিয়ে বিদায় নিলাম। পকেট থেকে ডাঃ. রাধাকৃষ্ণণের লিখিত পরিচয়পত্র তাঁকে আর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করিনি।

ইণ্ডিয়ান স্টুডেণ্টস ইউনিয়ানে ডাঃ. বীরেশ গুহর সঙ্গে আলাপ হয়েছিল। আমি লণ্ডনে কাউকে চিনি না বলায় তিনি একদিন আমাকে নিয়ে গেলেন লিটল রাসেল স্ট্রীটে একটি বইয়ের দোকানে। দোকানটির নাম ছিল 'বিবলিওফিল' এবং মালিকের সঙ্গে পরিচয় হলো। তার নাম ডাঃ. শশধর সিংহ।

আগের দিন আমার আমেরিকান ডাক্তার বন্ধুর প্রেরিত ছবি বিক্রীর দরুণ একশো বিশ পাউণ্ড পেয়ে ঠিক করেছি শিগ্‌গির পারীতে যাব। কারণ লণ্ডনে মিউজিয়াম ও আর্ট গ্যালারি দেখা ছাড়া শিল্প-শিক্ষালাভের কোনো সুযোগ ও সুবিধা পাইনি।

ডাঃ. সিংহ জিজ্ঞাসা করলেন, আমি পারীতে কাউকে চিনি কি-না এবং 'না' বলায় তিনি বললেন, "একটু অপেক্ষা করুন, এখুনি এক ভদ্রলোক আসছেন তিনি পারীতে প্রায়ই যান, আপনাকে অনেক খোঁজখবর দিতে পারবেন।"

কিছুক্ষণ পরেই মাঝারি সাইজের এক বাঙালী ভদ্রলোক আসতে ডাঃ. সিংহ পরিচয় করিয়ে দিলেন, "ইনি সেনগুপ্ত, এখানে সংক্ষেপে সবাই এঁকে ডাকে শুধু সেন বলে।"

ভদ্রলোকের ব্যাকব্রাশ-করা ঘন কালো চুলের তরঙ্গ, সমান ও মসৃণ কপাল, সোজা ক্লাসিকাল টাইপের নাক এবং সব মিলিয়ে বেশ মানানসই মুখ দেখলে প্রথম দৃষ্টিতে মনে হবে যে, এক সুপুরুষ যুবক ছাড়া আর তাঁর কোনো বিশেষত্ব নেই। কিন্তু তাঁর গাঢ় ওয়াইন রঙের চোখের দিকে চাইলে উপলব্ধি হতো যে ঐ গভীর ও দূরপ্রসারী দৃষ্টির পথ ধরে স্পর্শ করা যায় একটি তেজ ও প্রভাময় স্ফুলিঙ্গের উত্তাপকে। তিনি নিভে যাওয়া পাইপে নিষ্ফল টান দিয়ে, তাম্রকূটের ভস্মপূর্ণ আধারটি নেড়েচেড়ে যখন নিশ্চিত হলেন যে, তার থেকে মৌতাতের আদৌ আর সম্ভাবনা নেই তখন আরম্ভ করলেন আমার সঙ্গে পরিচয়। "পারীতে কোথায় উঠবেন কিছু ঠিক করেছেন।" "না" বলায় বললেন, "ফরাসী ভাষা কিছুটা জানেন নিশ্চয়ই।" জানালাম, "না মশাই, কেবল 'উই' আর 'নো' ছাড়া ফরাসী শব্দ জানি না।"

স্তম্ভিত হয়ে সেন বললেন, "মশাই, ও দেশে এ রকম বেপরোয়াভাবে গেলে মারা পড়বেন। আপনাকে দু'একজন বাঙালী ছাত্রের নাম ও ঠিকানা দিচ্ছি। এরা আপনাকে অনেক সাহায্য করতে পারবে" —বলে খবরের কাগজের সাদা মার্জিন ছিঁড়ে তাইতে লিখে দিলেন তাদের নামধাম। যদি কোনো মুস্কিলে পড়ি তা হলে তিনি দিন দশেকের মধ্যে পারীতে আসছেন এবং আমার সব হাঙ্গামা মিটিয়ে দেবার চেষ্টা করবেন বলে প্রতিশ্রুতি দিলেন।

সেখান থেকে বিদায় নিয়ে আবিষ্কার করলাম যে, সেন অন্যের নাম ঠিকানা দিয়েছেন, কিন্তু পারীতে তিনি নিজে কোথায় থাকেন বা থাকবেন তার কোনো উল্লেখ নেই। যাদের তিনি নাম ঠিকানা দিয়েছিলেন পারীতে পৌঁছে ভাষা না জানায় তাঁদের খুঁজে বের করা বেশ দুরূহ হয়েছিল এবং তাঁদের বাড়ি পৌঁছেও কোনো সুবিধা হয়নি কারণ তাঁরা সে সময়ে পারীর বাইরে কোথায় সফরে বেরিয়েছিলেন। লাটিন কোয়ার্টারসে আধ ঘণ্টা রাস্তায় ইংরাজী বোঝে এমন লোকের খোঁজ করে শেষে একটি ইন্দোনেশিয়ান ছাত্রের সাহায্যে থাকবার জায়গার ব্যবস্থা করতে পেরেছিলাম।

ও দেশে পথযাত্রায় পথিককে রক্ষা করেন সেণ্ট ক্রিস্টোফার। ভাষা না জানা বিদেশীকে হদিশ দেবার কোনো সেণ্ট আছেন কি-না জানি না। জানলে নিশ্চয়ই তাঁর কৃপা পাওয়ার জন্যে প্রার্থনা করতাম। ভাষা না জানলেও প্রথম কয়েক দিন অঙ্গ ও মুখভঙ্গির সাহায্যে নক্শা এঁকে কাজ চালিয়ে নিলাম। পরে সেনের দেওয়া ঠিকানায় ভদ্রলোক দুটির সাক্ষাতে ও পরিচয়ে পথে চলার মতো কয়েকটি ফরাসী শব্দ আয়ত্ত করে ভর্তি হয়ে গেলাম আকাদেমী গ্রাঁদ শমিয়ের-এ।

দেশ থেকে ফ্রান্স ও ফরাসী জাত সম্বন্ধে বই ও প্রবন্ধ পড়ে যে ধারণা নিয়ে এসেছিলাম এখন সাক্ষাৎ পরিচয়ে সেই মনে-আঁকা ছবির রূপ পরিবর্তন হতে লাগল। ছাত্র ছাড়াও ব্যবসাদার, ট্যুরিষ্ট, অ্যাডভেন্চারের কিংবা সরকারী কাজে আগত ভারতবাসীদের চোখে ফ্রান্সের পরিচয় হয় ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এবং এই বিভিন্ন পেশা ও স্তরের লোকেরা দেশে প্রচার করে তাদের ধরে নেওয়া দেশটার রূপ ও চরিত্র। এদের আনা এই ছেঁড়া টুক্রো ও অনেক ক্ষেত্রে বিকৃত অভিজ্ঞতাকে অসাবধানী অনেক ভারতবাসী যাচাই করতে গিয়ে হয়েছে অপদস্থ এবং দিয়েছে ভারতবর্ষের নামে অপবাদ।

পারীতে এক মহিলা ছিলেন খুব ভারত-ভক্ত। এঁর গৃহে আতিথ্যলাভ করেছিলেন ফ্রান্সে আগত বিখ্যাত বা নগণ্য প্রায় সকল ভারতবাসীরা।

যে কোনো ভারতীয় পারীতে এসেছে শুনলেই তাকে তিনি লাঞ্চ বা ডিনারে ডাকতেন। এ যেন ছিল তাঁর ব্রত। এমন সজ্জন মহিলার আতিথেয়তার প্রতিদান দিয়েছিলেন একটি ভারতবাসী অত্যন্ত গর্হিত ও কদর্য ব্যবহারে। কিন্তু তবুও ভারতের প্রতি তাঁর অনুরাগ ও আস্থা একটুও কমেনি।

ঘটনাটি ঘটেছিল একজন পাঞ্জাবীকে নিয়ে। ইনি ছিলেন লাহোরের অধ্যাপক, পারীতে এসেছিলেন পড়াশুনা করতে।

পারী থেকে প্রত্যাগত তাঁর কোনো বন্ধু ফরাসী মহিলাদের চরিত্র সম্বন্ধে এই অভিমত দিয়েছিলেন যে, তাঁদের কাউকে একটু উপরোধ করলেই নিকটতম সঙ্গসুখ লাভ করা যায়। আর যদি কোনো মহিলা, পুরুষকে নিমন্ত্রণে আহ্বান করেন তা হলে সেটাকে একটা মধুর মিলন অভিলাষের স্পষ্ট সঙ্কেত বলে ধরা উচিত।

ভদ্রমহিলার দুর্ভাগ্য যে, এই ভদ্রলোকের সঙ্গে আরও যে দু'একজন ভারতীয় ছাত্রদের ডিনারে ডেকেছিলেন তাঁরা অন্যত্র কাজ থাকায় নিমন্ত্রণে যেতে পারেনি। অধ্যাপক মাদাম্-এর বাড়িতে কেবল তাঁরা দু'জন ডিনার খাচ্ছেন দেখে ধরে নিয়েছিলেন যে, আহারের পর দক্ষিণাটাও পেয়ে যাবেন তাঁর সঙ্গে প্রেম-লীলায়। আহারান্তে টেবিলের এপারে ওপারে বসে কফি পান ও বাক্যালাপ অধ্যাপকের মনের মতো হচ্ছিল না। তাই তিনি প্রস্তাব করলেন, তাঁরা মুখোমুখি না হয়ে পাশাপাশি একদিকে বসে আলাপ করলে ভালো হয়।

ভদ্রতার খাতিরে মাদাম্ এতে আপত্তি করেননি। এই বন্দোবস্তকে মহিলাটি এত সহজে মেনে নিলেন অতএব অধ্যাপকের শৌখীন অভিলাষে তাঁর আপত্তি নেই ভেবে এই পঞ্চনদবাসী পাশে এসেই ভাল্লুকের মতো তাঁকে আক্রমণ শুরু করলেন। সচকিতা ও ভীতা মাদাম্ তাকে নিরস্ত করবার চেষ্টা করলে অধ্যাপক বললেন, 'মাদাম্ আপনি যদি অনভিজ্ঞা তরুণী হতেন তা হলে আপনার এই কপট ব্রীড়ার খেলা বেশ মানানসই হতো। কিন্তু আপনার সে বয়স যখন পার হয়ে গেছে তখন এই মিথ্যা শিক্ষানবিসির ছলনা করে সময় নষ্টের প্রয়োজন কি।'

বিপন্না মাদাম্ তখন অন্য ঘরে পাঠরত তাঁর কিশোর পুত্রের নাম ধরে তারস্বরে চিৎকার আরম্ভ করে দিয়েছেন। ছেলেটি দৌড়ে ঘরে আসতে অধ্যাপক বুঝলেন তাঁর বন্ধুর বলা ফরাসিনীদের চারিত্রিক থিসিসে বেশ কিছু প্রমাদ রয়ে গেছে। তিনি মানে মানে সেখান থেকে লগুড়াহত কুকুরের মতো তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন।

* * *

পানথেওঁর পেছনে কৈয়ে দেজ-এতুদিয়ঁ। সাঁ জে.নভিয়েভ ছিল ছাত্রদের বেশ সস্তার রেস্তরাঁ। এইখানে একদিন খেতে গিয়ে দেখি কিউতে দাঁড়িয়ে সেন মাঝে মাঝে তামাকবিহীন পাইপে সোঁ-সোঁ টান দিয়ে মার্ক টাইম করছেন। আমায় দেখে বললেন,"কি মশাই, তা হলে এসে পড়েছেন পারীতে। পথঘাট বেশ চিনে ফেলেছেন দেখছি। আশা করি কোনো মুস্কিলে পড়েননি।"

দু'জনে ট্রেতে খাদ্যাদি সংগ্রহ করে টেবিলে খেতে বসলাম।

পয়সা বাঁচাতে এক বেলা এই রেস্তরাঁয় খেয়ে নৈশাহারের ব্যবস্থা নিজেই করতাম ডিম, রুটি, কলা আর ক্রীম কিনে। ফরাসী রুটি সাধারণত হয় প্রায় দেড় কি দুই ইঞ্চি মোটা এবং লাঠির মতো হাত দুয়েক লম্বা। তাজা অবস্থায় এই রুটি খেতে বেশ মচ্‌মচে ও মুখরোচক। এর পুরো সাইজকে বলে 'বাগেত' এবং আধ বাগেতের কম রুটি কেনা যায় না। আমার পক্ষে একবারে আধ 'বাগেত' রুটি খাওয়া সম্ভব ছিল না অথচ সকালের রেখে-দেওয়া এই রুটি বিকেলে শুকিয়ে চামড়ার মতো হয়ে অখাদ্য হয়ে যেত।

ভাবতাম, আর যদি কেউ আমার মতো দৈন্যে থাকে তা হলে এভাবে রোজ রুটি অপচয় না করে তার সঙ্গে হয়ত এই আধ 'বাগেত' রুটিকে ভাগাভাগি করে

এই অপব্যয়কে বাঁচানো যেত। কিন্তু আধ 'বাগেত' রুটির অংশীদার লোককে কোথায় খোঁজা যায় এবং জিজ্ঞাসাই বা করি কেমন করে।

কৈয়েতে ছেলেরা ও মেয়েরা খাওয়ার উদ্বৃত্ত রুটিকে টুক্‌রো করে একে ওকে ছুঁড়ে মেরে খেলা করছিল।

হঠাৎ চুপ করে রুটির অপব্যবহারকে দেখতে না পেরে সেনকে বললাম, "এরা জানে না অভাব-পীড়িত লোকের কাছে এই টুক্‌রো রুটির মূল্য কত। আধ 'বাগেত' রুটি কিনতে যার মনিব্যাগ আড়ষ্ট হয়ে যায় তার মনে হবে, এ তো রুটির টুক্‌রো নিয়ে এরা খেলছে না, এ তার দৃষ্টিতে হয়ে উঠবে যেন জীবন্ত দেহের টুক্‌রো।"

বিস্ফারিত চোখে সেন একটু ইতস্তত করে বললেন, "আমি সিকি 'বাগেত'-এর বেশী রুটি খেতে পারি না, আর বাকিটা রোজ নষ্ট হয়। আপনারও বোধহয় সেই দশা। আপনি যদি দ্বিধা বোধ না করেন তা হলে আমরা এই আধ 'বাগেত'কে ভাগ করে খেতে পারি।"

আমরা ঠিক করলাম আমাদের নৈশাহারের একসঙ্গে ব্যবস্থা করব। কাজেই সেনের সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব ও সান্নিধ্য শুরু হয় ঐ আধ 'বাগেত' ফরাসী রুটিকে উপলক্ষ্য করে।

সেন থাকতেন পাঁচতলার ছোট্ট একটি এ্যাটিক্‌ ঘরে। এ ঘরের দেওয়াল দেখা যেত না কারণ এর চার পাশে জমি থেকে ছাদ পর্যন্ত বহু সারি বই থাক দিয়ে রাখা ছিল। শুধু তাই নয় এই থাক করে রাখা বইয়ের রাশির অতিরিক্ত সংগ্রহ দড়ির শিকেয় বাঁধা অবস্থায় ছাত থেকে এখানে ওখানে ঝোলানো থাকত।

অপরিচিত কেউ প্রথমে সেই ঘরে ঢুকলে মনে করত কোনো পাগল এই ঘরের বাসিন্দা। এখানে একটা স্পিরিট ল্যাম্প জেলে দুটি ডিম সিদ্ধ করে তার সঙ্গে মরশুমী স্ট্রবেরী কি সুপক্ব কদলী ও ক্রীম সহযোগে হতো আমাদের নৈশাহার। তারপর বেশ ঘটা করে সেন তৈরী করতেন কফি। মাঝে মাঝে আরও মিতব্যয়িতা করতে আমরা শুধু চীজ-রুটিতেই কাজ চালিয়ে দিতাম।

সেন খাওয়ার সময় রহস্য করে বলতেন, "খান মশাই, ভালো করে খান, ধরে নিন না আমরা যেন মাক্সিমের মতো দুর্মূল্য রেস্তরাঁয় বসে লাংগুস্ত আ লা ক্রীম ও গ্লাস নেপোলেয়ঁ খাচ্ছি, তা হলে আমাদের মিতাহার আর ধনীর এইসব বিখ্যাত রেস্তরাঁর রাজোচিত আহারে কোনো বিশেষ তফাত বোঝা যাবে না।"

সর্‌বনে, ক্লাবে বা কাফেতে ছাত্রছাত্রী সম্মেলনে স্বল্পভাষী সেনকে নিয়ে কাড়াকাড়ি পড়ত মেয়ে মহলে। আমাদের দৃষ্টিতে আরও ভারতীয় ছাত্র ছিল যাদের সেনের চেয়ে সুশ্রী বলা যেত কিন্তু মেয়েরা তাদের দিকে ফিরেও চাইত না। আজকালকার তরুণীকুল-সম্মোহনকারী ক্রুনার গায়কের উপস্থিতির মতো সেনের আবির্ভাব মেয়েদের হৃদ্‌চাঞ্চল্যের বেশ একটা কারণ ঘটাত।

একবার সেনের সঙ্গমোহিত একটি মেয়েকে জিজ্ঞাসা করলাম, সেনের এই

আকর্ষণের কারণ কি ? সে বলল, "এ কি কথায় বলে বোঝানো যায় ! রসনা-তৃপ্তিকর মিঠাই দেখলে সুখাদ্য-বিলাসীর জিহ্বা বাসনায় হয় আপনা থেকে লালাসক্ত তেমনি সেনকে দেখলে আমাদের মন ওর দিকে ছুটতে থাকে।"

তাদের এই পক্ষপাতিত্ব ও অনুরাগের আধিক্য অন্য যে কোনো পুরুষকে হয়ত করে তুলত আপন প্রভাব সম্বন্ধে সচেতন ও দাম্ভিক কিন্তু সেন এদের আদরের আতিশয্যকে মোটেই আমল দিতেন না। তিনি বলতেন, 'মশাই, এই ডাকিনী-গুলোকে আপনারা দু' একজন মিতালি করে আমার কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে গেলে বিশেষ বাধিত হব।' কিন্তু কার কথা তারা শুনবে !

একবার সেন-অনুরক্তা একটি মেয়ে এক কাফেতে ভারতীয় ছাত্রদের সম্মেলনে সেন আসছেন শুনে সর্বাঙ্গে কালো রঙ মেখে উপস্থিত হলো। প্রথমে তার এই রূপান্তরে তাকে চিনতেই পারিনি। এই সঙ সাজবার কারণ জিজ্ঞাসা করলে সে জানাল যে, শ্বেতাঙ্গিনী বলে বোধহয় সেনের তাকে পছন্দ হয় না। তাই সে এসেছে ভারতীয় মেয়েদের মতো কালো রঙ মেখে যদি এখন তাঁর তাকে পছন্দ হয়।

সে আমাদের জিজ্ঞাসা করল, ভারতীয় মেয়েদের মতো তাকে সুন্দরী দেখাচ্ছে কি-না ? বেচারী জানত না যে, আমাদের এই বাদামী কি কালো রঙকে একটু ফ্যাকাশে করবার প্রয়াসে আমাদের দেশে গাত্রচর্মে কত ক্রীম, খড়ি ও পাউডার দিয়ে ঘসা-মাজা চলে।

মেয়েটির চিবুকের নীচে দু' জায়গায় রঙ না লাগায় শ্বেতকুষ্ঠের মতো দেখাচ্ছিল। আমরা তাকে আয়নায় সেটা দেখিয়ে দিতে সে অপ্রস্তুত হয়ে হাত ধোবার কামরায় গিয়ে সব রঙ ধুয়ে এল। এবং তারপর কাঁদতে আরম্ভ করল এই বলে যে, তার সব সজ্জা ও আয়োজন বৃথা হলো। এখন তার এই সাদা রঙ দেখে সেন আর ফিরেও চাইবে না।

এমন সময় বন্ধুবর এসে হাজির হলেন। তাঁকে আমরা মেয়েটির কাণ্ড-কারখানা বলতে তিনি হাসতে আরম্ভ করলেন এবং আমারও সে হাসিতে যোগ দিলাম। ক্রুদ্ধা ও রোদনবিহ্বলা মেয়েটি আমাদের মুণ্ডপাতের শপথ করে কাফে পরিত্যাগ করল।

অবিচলিত সেন নির্বাপিত পাইপে কয়েকটা টান দিয়ে পরিবেশকের উদ্দেশ্যে হাঁক দিলেন, 'গাঁরস এ্যা কাফে ক্রেম্ সিল ভু প্লে।'

* * *

অন্যান্য ভারতীয় ছাত্রদের অনেকে আমাকে সাবধান করে দিয়েছিল, 'মশাই বেশী মিশবেন না সেনের সঙ্গে কারণ ও দাগী লোক। দেশে ছিল সাংঘাতিক রকমের টেরোরিষ্ট, অনেক বছর জেল খেটেছে এবং এখন এখানে ও মার্কামারা কমিউনিস্ট। এই সে দিন ফরাসী সরকার দু'জন ভারতীয় সাংবাদিককে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে দেশত্যাগ করে চলে যেতে হুকুম দিলো কারণ তারা ছিল কমিউনিস্ট। কিছু বলা

যায় না, কোনোদিন সেনকেও যদি তাড়ায় তা হলে আপনাকেও ওর সঙ্গে ভাগতে হবে।'

সেনের সঙ্গে আমার কথা হতো শিল্প-সাহিত্য সম্বন্ধে কিন্তু তাঁর বিপ্লবী জীবন সংক্রান্ত কোনো কথা আমরা আলোচনা করিনি। আর আমিও ঠিক করেছিলাম যে তিনি নিজে থেকে ও বিষয়ে কিছু না বললে আমার কৌতূহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করাটা অত্যন্ত অশোভন হবে। একদিন লাঞ্চের সময় তিনি বললেন, "আজ রুটি নষ্ট হবে, নৈশাহার আপনাকে একলা করতে হবে। আমি যাচ্ছি পার্টির এক বিরাট সম্মেলন হবে সেইখানে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "পার্টির সভ্য ছাড়া বাইরের লোক এই সম্মেলনে যেতে পারে কি-না।"

তিনি বিস্মিত হয়ে বললেন, "আপনি যেতে চান না-কি! জানেন না আমি দাগী বিপ্লবী এবং আপনি যে আমার সঙ্গে ডিনার খান এইটেই যথেষ্ট বিপদের কথা। এরপর আবার আমাদের পার্টির অধিবেশনে যদি যাতায়াত শুরু করেন তা হলে সেধে বিপদ ডেকে আনা হবে।"

বললাম, "মশাই সে ভয় যদি থাকত তা হলে আমাদের একসঙ্গে খাওয়া অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যেত। আপনার সম্বন্ধে অনেকেই আমাকে সাবধান করে দিয়েছে। যদিও তারা আপনার কীর্তি-কাহিনী আমাকে সবিস্তারে জানিয়েছে তবু আরও খবর জানবার জন্যে আমাকে প্রায়ই ধড়পাকড় করে। আমি যদি বলি যে, আপনার অতীত জীবন বা আপনার রাজনৈতিক কার্যকলাপ সম্বন্ধে আমরা কোনো আলোচনা করি না এ তারা বিশ্বাসই করতে চায় না।"

তিনি বললেন, "সে আমি জানি। আমাদের দেশের লোকেরা পরের ঘরের হাঁড়ির খবর বের করতে যেমন উদ্‌গ্রীব এমন আর অন্য কোনো দেশের লোকেরা হয় না। ওরা আপনাকে আমার সম্বন্ধে কি যে বলেছে জানি না তবে তার কতটা সত্যি সে আপনাকে একদিন আমার পুরনো দিনের কথা বললে বুঝে নিতে পারবেন। বড়াই করবার মতো কিছু হয়নি আমার জীবনে। দেশে একটা জাগরণ এসেছে এবং সেই ইতিহাসে আমি একটা অক্ষর মাত্র।"

তারপর একদিন শুনলাম তাঁর ইতিবৃত্ত। "মশাই দক্ষিণেশ্বরের মামলার কথা নিশ্চয়ই শুনেছেন। বোমাগুলি আমিই নিয়ে গিয়েছিলাম স্যুটকেসে ভরে। আর আধ ঘণ্টা ওখান থেকে সরতে দেরি করলে পুলিশে আমাকেও জালে ফেলত।"

বললাম, "দক্ষিণেশ্বরের বোমা তো অনেক দূরের লাফ। তার আগে কি ঘটনা-চক্রে আপনি এ রকম একটা জলন্ত বিপ্লবী হলেন সেটা বলায় আপত্তি আছে কি?"

"না" —বলে তিনি শুরু করলেন, "আমি তখন খুব ছোট, বয়স দশ কি এগারো হবে। বিক্রমপুরে নিজেদের গ্রামে সোনারঙ-এ গিয়েছি। হঠাৎ একদিন আমাদের বাড়ি পুলিশে ঘেরাও করে খানাতল্লাসী আরম্ভ করল। শুনলাম, আমার সম্পর্কিত

এক কাকা ও দাদাকে তারা ধরতে এসেছে। সর্বদাই শুনেছি যে চোর বদমাশদের পুলিশে ধরে। আপনজনের মধ্যে এমন লোক আছে এবং তাদের ধরতে এরা এসেছে মনে করে নিজের ওপর বেশ একটা ধিক্কার এল।

"কাকা ও দাদা পুলিশ আসছে আগেই খবর পেয়ে উধাও হয়েছিলেন। পুলিশ বাড়ির আর সকলের ওপর খানিকটা তর্জন-গর্জন ও গালি বর্ষণ করে নিষ্ফল হয়ে ফিরে গেলো। অবাক হয়ে শুনলাম যে, বাড়ির লোকেরা কাকা ও দাদাকে পুলিশে ধরতে পারেনি বলে খুব তারিফ করছে ওঁদের উপস্থিত বুদ্ধির।

"যখন বললাম, পুলিশে ধরতে আসে এমন অপরাধীরদের সম্বন্ধে কি করে তাঁরা এ ধরনের নির্লজ্জ প্রশংসা করতে পারেন, বাড়ির সবাই তখন আমায় বুঝিয়ে দিলেন যে, তাঁরা চোর বদমাশ বলে পুলিশে তাঁদের ধরতে আসেনি। ওঁরা বিপ্লবী, দেশের স্বাধীনতার জন্যে লড়াই করছেন ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। মোটামুটি বুঝলাম ব্যাপারটিকে। সেই থেকে আমার মনে দুটি কথা চিহ্নিত হয়ে গেলো বিপ্লব ও স্বাধীনতা।"

বিপ্লবী সেন

প্রথম বিশ্ব মহাযুদ্ধের পরেই বাংলাদেশে যে সব ছেলেমেয়েদের শুরু হয়েছিল বাল্য ও যৌবন, ভারতে স্বাধীনতার সংগ্রাম প্রচেষ্টা তাদের জীবনে জাগিয়েছিল নতুন প্রেরণা ও উদ্দীপনা। এঁদের অনেকে এই আন্দোলনে ঘোরতর সক্রিয় কর্মী হয়ে পেয়েছিলেন কারাবাস অসীম নির্যাতন ও চরম দণ্ড। অন্যেরা কার্যত এই অভিযানে ঝাঁপিয়ে না পড়লেও একেবারে নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে থাকতে পারেননি।

আপাতদৃষ্টিতে আজকে হয়ত অনেকের মনে হবে যে, ভারতে স্বাধীনতার পূর্ণ প্রতিষ্ঠায় কংগ্রেস ও গান্ধিজীর অহিংস ও অসহযোগ পন্থাই এর সাফল্যের জন্য সম্পূর্ণ দায়ী। সন্ত্রাসবাদকে নৈতিক কারণে অন্যায় পথ ভাবলেও এর প্রতিক্রিয়া যে ভারতের ভূতপূর্ব শাসকশক্তির ভিত্তিকে প্রচণ্ড ঘা দিয়ে আলগা করে দিয়েছিল তার প্রমাণ যদি আজকেও আমাদের সামনে স্পষ্ট না হয়ে থাকে তবে ভবিষ্যতে জাতীয় সংগ্রামের সঠিক ইতিহাস বড় বড় হরফে লিখে জানাবে স্বাধীনতার প্রতিষ্ঠায় কতখানি দান এই পথ বেয়ে এসেছিল।

এটাও ঠিক যে ভারতের বাইরে ইয়োরোপ ও অন্যান্য দেশে প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের সুনিয়ন্ত্রিত আন্দোলন তদানীন্তন ব্রিটিশ রাষ্ট্র অধিনায়কদের মনে এ দেশের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে বেশ একটা সুস্পষ্ট ছাপ লাগিয়েছিল। এই দুটি কারণ ব্যতিরেকে ভারতের স্বাধীনতা অর্জনের দিন পিছিয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল।

সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের সূত্রপাতের প্রাক্কালে স্বাধীনতাকামী বাঙালী

নওজোয়ানদের একটা বিশিষ্ট অবদান দিকে দিকে দেখা যেত 'দাদা' রূপে। এমনি দাদার সম্মোহনে কৃষ্ণনগর শহরে স্কুল-কলেজে পড়া ছেলেরা ভিড়েছিল তাঁর চারপাশে। ইনি ছিলেন শহীদ অনন্তহরি মিত্র। সাদাসিধে ধরনের এই স্পষ্টভাষী দাদাটির সান্নিধ্যে এসেছিলেন সেন।

সেনের পিতা ছিলেন এ্যাসিস্ট্যাণ্ট সার্জন। হুগলী থেকে বদলী হয়ে কৃষ্ণনগরে এসেছিলেন।

যুগান্তর সমিতির দলভুক্ত অনন্তহরি তখন এই শহরে স্কুল কলেজের ছেলেদের নিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন নৈশ-বিদ্যালয়, দরিদ্র-ভাণ্ডার, সংকার-সমিতি, আখড়া, লাইব্রেরী ইত্যাদি।

গান্ধিজী যুযুধান সন্ত্রাসবাদী সব সমিতিগুলিকে অনুরোধ করেছিলেন যে, যদি তারা তাদের উগ্র নীতিকে বন্ধ রেখে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনকে সাহায্য করে তা হলে এক বছরের মধ্যে তিনি স্বরাজ এনে দেবেন।

এই সমিতিগুলির প্রতিশ্রুত এক বছরের নিক্রিয় আবহাওয়ায় অহিংস আন্দোলন পুরো মাত্রায় চালিয়ে গান্ধিজী এক বছরে স্বরাজ আনতে অপারগ তো হলেন বটেই উল্টে তিনি বছর শেষ হলে বন্দী হয়ে গেলেন কারাবাসে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁকে দেওয়া চুক্তি শেষ হওয়ায় সন্ত্রাসবাদ আবার পুরোদমে চালু হয়ে গেলো।

স্বামী বিবেকানন্দের নৈতিক আদর্শ সামনে রেখে যে সব ছেলেদের এতদিন অনন্তহরি নিরীহভাবে সমাজসেবায় নিযুক্ত রেখেছিলেন এইবার তাদের কানে শুনিয়ে দিলেন সংগ্রামের মন্ত্র। তাদের সামনে তুলে ধরলেন দেশী-বিদেশী বিখ্যাত বিপ্লবীদের অগ্নিময় জীবনাদর্শ। তারা এইবার পড়তে লাগল ভারতের ধর্মকাহিনী নয়, শহীদ বিপ্লবীদের জীবনচরিত। সংগ্রামে দৃঢ়কল্প ও নির্ভরশীল কয়েকটি তাঁর অনুচর তাঁর কাছে চাইল অস্ত্রের সন্ধান। তিনি বললেন, বিনা টাকায় অস্ত্রের সংস্থান কি করে হবে অতএব টাকার যোগাড় দেখো।

তারা বলল, ডাকাতি করে টাকার যোগাড় করবে।

কিন্তু অনন্তদার তাতেও আপত্তি।

তিনি বললেন, পরের ধন কেড়ে নেবার আগে নিজের যা আছে তাই দান করার পর তোমরা এই উপায় অবলম্বনের যোগ্য অধিকারী হবে।

এ যেন অনাথপিণ্ডদ চাচ্ছেন শ্রেষ্ঠ ভিক্ষা।

তাঁর নির্দেশকে শিরোধার্য করে সেন আরম্ভ করলেন টিউশানি এবং পুরো রোজগারের দশ টাকা মাসে মাসে দিতে লাগলেন সমিতিকে। নিজের ঘরে করলেন প্রথম ডাকাতি এবং সংঘে এনে দিলেন বাক্স ভেঙে চুরি করা নিজের মায়ের গলার সোনার হার।

এই প্রথম দীক্ষা সম্পূর্ণ হলে তিনি পেলেন একটি রিভলবার। তারপর চলল নদীর ওপারে গোপনে লক্ষ্যভেদের অভ্যাস। সে সময় নবদ্বীপে ডাক যেত ঘোড়ার

গাড়িতে কৃষ্ণনগর হয়ে। একদিন রাত্রে কয়েক জন আটক করল সেই গাড়ি রাস্তায়। ডাকের রক্ষী হাতে গুলি লেগে জখম হলো। তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলো। পরের দিন সকালে সেনের পিতা যখন অস্ত্রোপচার করে বিদ্ধ গুলি বের করছিলেন আততায়ী সেন এই রক্ষীর সামনে দাঁড়িয়ে থাকলেও সে তাঁকে চিনতে পারেনি। ধরা পড়ে গেলো কয়েক জন গুণ্ডা ও নিরপরাধরা।

পুলিশ ভাবতেই পারেনি যে এর সঙ্গে কোনো রাজনৈতিক যোগাযোগ আছে। তবে সন্ত্রাসবাদে দীক্ষিতদের মধ্যে খুব অল্প কয়েক জনই বেশী দিন পুলিশের কৃপাদৃষ্টি এড়িয়ে চলতে সক্ষম হয়েছিলেন। এই ধরপাকড়ে পুলিশের কর্মনৈপুণ্যই পুরোপুরি দায়ী ছিল না। সন্ত্রাসবাদ আমাদের দেশে দুর্বল স্নায়ু, সনাতন ধর্মাবলম্বী এবং ইংরাজ সম্রাটের বিশ্বস্ত ও অনুগত প্রজাবর্গের অনেককে ভীত ও মর্মাহত করায় তাঁরা সন্দেহভাজন কাউকে দেখলেই পুলিশে খবর দেওয়া তাঁদের কর্তব্য বলে মনে করতেন এবং এঁদের নজর এড়িয়ে কাজ করা বিপ্লবীদের সব সময় সম্ভব হয়নি।

পুলিশের বিস্তৃত জালে সন্দেহের কারণে সেন একদিন ধরা পড়ে গেলেন। কিন্তু বাস্তব প্রমাণের অভাবে তাঁকে প্রথম শিলচর ও পরে ফরিদপুর জেলে অন্তরীণ রাখা হয়। ১৯২৭ সালে জেল থেকে বি. এ. পরীক্ষা দিয়ে কৃতকার্য হয়ে সেন পিতাব ও কৃষ্ণনগর কলেজের প্রিন্সিপালের সাহায্যে নানা চেষ্টায় বিলেতে সিভিল সার্ভিস পড়ার ও পরীক্ষা দেবার অনুমতি পেয়ে সাগর পাড়ি দিলেন।

ব্রিটিশ সরকার ভাবল দুশমনের বুঝি এতদিনে সুমতি হলো। সেন তখন রোমান্টিক স্বপ্ন দেখছেন যে, সিভিল সার্ভিস পেয়ে তিনি সুভাষ বোসের মতো তাকে প্রত্যাখ্যান করে আর একটি বঙ্গ-সন্তানের দৃঢ় চরিত্রের উদাহরণ দেখাবেন। কিন্তু তাঁর এ আশা পূর্ণ হলো না। কারণ প্রথমবার পরীক্ষায় অকৃতকার্য হয়ে দ্বিতীয়বার তিনি যখন আবার প্রস্তুত হয়েছেন তখন তাঁকে সংক্ষেপে জানিয়ে দেওয়া হলো যে, পরীক্ষার্থীদের সম্বন্ধে নিয়মের ছয় নম্বর আইন অনুযায়ী তিনি এই পরীক্ষার অযোগ্য পাত্র প্রমাণিত হয়েছেন। ছয় নম্বর আইনে লেখা ছিল —bad character।

ক্ষুব্ধ ও রুষ্ট সেন ঠিক করলেন যে, ছয় নম্বরের আইনে তাঁর যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে তাকে কাজে পরিণত করতে হবে। ইতিমধ্যে বার্লিন থেকে তাঁর কাছে ঘন ঘন আমন্ত্রণ আসছিল দুটি নাম-করা ভারতীয় বিপ্লবীর কাছ থেকে।

নলিনী গুপ্ত ও সৌম্যেন ঠাকুরের সঙ্গে তাঁর কলকাতার বোমার মাল-মসলা সরবরাহে আলাপ-পরিচয় আগেই হয়েছিল। এখন তাঁরা বার্লিনে বসে ব্রিটিশ সামরিক শক্তির সঙ্গে একটি বোঝাপড়া করবার প্রচেষ্টায় উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহের আয়োজনে ব্যস্ত ছিলেন।

বার্লিনে পৌঁছে এঁদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করে সেন জানলেন যে, এক জার্মান অস্ত্র ব্যবসায়ীর সঙ্গে ব্যবস্থা করা হয়েছে যে, তিনি ধারে ভারতে অস্ত্র রপ্তানি করবেন এবং দেশ স্বাধীন হওয়ার পর তাঁর ঋণ শোধের ব্যবস্থা করা হবে। নমুনা হিসাবে

এঁরা সেনের হাতে ছোট চ্যাপ্টা ধরনের দুটি রিভলবার দিয়ে অনুরোধ করলেন, যে করেই হোক ঐ অস্ত্র দুটি দেশে বিপ্লবীদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে।

নমুনা দুটিকে ওভারকোটের পকেটে ফেলে সেন চললেন লণ্ডনে। ট্রেন জার্মান ও ফরাসী সীমান্তে থামলে ফরাসী কাস্টম অফিসার তাঁর ছোট স্যুটকেসটা পরীক্ষা না করেই খড়ির দাগ মেরে ছাড়পত্র দিলো। সেন ভাবলেন একটা বিরাট সমস্যার নিষ্পত্তি হলো। কিন্তু পরক্ষণেই সিকিউরিটি পুলিশের একদল এসে তাঁর কামরা ঘিরে ফেলল এবং তাদের অফিসার খানাতল্লাশি করতে ওভারকোটের পকেট থেকে বেরুল অতি নিরীহ চেহারার রিভলবার দুটি।

সেন গ্রেপ্তার হয়ে স্টেশনে তাদের অফিসে গেলেন কিন্তু অফিসারটি জেরা করার চেয়ে যেন সহানুভূতি-ভরা উপদেশ দিতে আরম্ভ করলেন। বললেন, 'তোমরা কেন এই বৃথা চেষ্টা করছ, কারণ কয়েকটা রিভলবার দেশে চালান করে ইংরেজের বিরাট সামরিক শক্তিকে তোমরা হটাতে সক্ষম হবে এ ভাবাই বাতুলতা। তাছাড়া তোমাদের মধ্যেই রয়েছে তোমাদের জাতভাই বিশ্বাসঘাতকেরা। তুমি যে মালসুদ্ধ ধরা পড়লে এ তাদেরই বিশ্বাসঘাতকতায়। ফরাসী জাতির ভারতীয় বিপ্লবীদের প্রতি কোনো বিদ্বেষ নেই। তাই যদিও আইনত তোমাকে এই অপরাধের জন্য জেলে পাঠানো উচিত কিন্তু আমি তোমায় ছেড়ে দিচ্ছি। ব্রিটেনের বন্দরে পৌঁছালে ইংরেজ পুলিশ তোমার যথাযথ ব্যবস্থার জন্যে তৈরী হয়ে আছে।' এই বলে অফিসারটি সেনের রিভলবার দুটি বাজেয়াপ্ত করে ট্রেনে উঠবার হুকুম দিলেন।

ব্রিটিশ বন্দরে পৌঁছাতেই পুলিশ সেনের পাসপোর্টটি কেড়ে নিল, কিন্তু গ্রেপ্তার করল না। তাঁর বুঝতে বাকি রইল না যে, এখন তারা তাঁকে নজরে রেখে জানতে চাইবে তাঁর সহকর্মী আর কেউ এই কাজে লিপ্ত আছে কি-না!

লণ্ডনে সেনের সঙ্গে গুহ নামে এক বাঙালী ভদ্রলোকের আলাপ হয়েছিল। তিনি প্রায় প্রতিদিন সন্ধ্যায় সেনের ঘরে এসে গল্প করে অনেক রাতে বাড়ি ফিরতেন। সেন মাঝে মাঝে গুহকে খিচুড়ি রান্না করে খাওয়াতেন। বন্ধুমহলে তাঁর রান্নার খুব প্রশংসা ছিল। গুহ ছিলেন রীতিমতো মদ্যপ। একদিন বেশ মত্ত অবস্থায় সেনের কামরায় উপস্থিত হয়ে দারুণভাবে কাঁদতে শুরু করে দিলেন। হতবাক সেন ভাবলেন, ভদ্রলোক নেশার ঘোরে এমন কান্না-পাগল হয়ে পড়েছেন।

তাঁর কান্নার বেগ কিছুটা প্রশমিত হলে তিনি সেনকে বললেন, 'আপনি আমাকে এ ভাবে ছেলেমানুষের মতো কাঁদতে দেখে নিশ্চয়ই খুব আশ্চর্য হয়েছেন!'

সেন জানালেন, মানুষ মনে কষ্ট পেলে কেঁদে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। কেবল তিনি কামনা করেন যে-কারণে তাঁর মনোবেদনা হয়েছে তার থেকে অব্যাহতি পেয়ে তিনি যেন শান্তি লাভ করেন।

ভদ্রলোক তখন কান্নার উচ্ছ্বাস আরও বাড়িয়ে বললেন, 'আজ আপনার কাছে একটা দারুণ অপরাধের স্বীকারোক্তি করতে এসেছি কিন্তু কাপুরুষ আমি, এখনও

বলবার সাহস পাচ্ছি না বলেই কেঁদে ঢাকবার চেষ্টা করছি আমার অক্ষমতাকে।' আরও অনেক ভনিতা করার পর ভদ্রলোক যে কাহিনী সেনকে শোনালেন তাতে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। গুহ দেশে বোমার কেসে জড়িত কয়েক জন কর্মীদের জানতেন এবং পুলিশ সে খবর পেয়ে নানা প্রলোভন ও ভয় দেখিয়ে তাঁর কাছ থেকে তাদের নাম-ঠিকানা জেনে গ্রেপ্তার করে ফেলে। এই সৎকার্যের জন্য সরকার থেকে ব্যবস্থা করে গুহকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় বিলেতে এবং তাদের সুপারিশে তিনি রোলস্‌রয়েস-এর কারখানায় মোটর ইঞ্জিনিয়ারিং শেখবার সুযোগ পান। এর আগে আর কোনো ভারতবাসীর ভাগ্যে এত দুর্লভ সুযোগ জোটেনি।

কর্মীদের পুলিশে ধরিয়ে দেওয়ার পর তিনি দেশে থাকলে অপর কর্মীরা যে তাঁর পঞ্চত্বের ব্যবস্থা সুচারু রূপে সম্পন্ন করত সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ ছিল না।

গুহ অবশ্য পুলিশের কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি পেয়েছিলেন যে, ভবিষ্যতে তাঁকে এ ধরনের ফেউ-এব কাজে আব ডাকা হবে না। কিন্তু লণ্ডনে আসতেই স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ডে একদিন গুহর ডাক পড়ল এবং তাঁকে বলা হলো —একটি ভারতীয় ছাত্রের গতিবিধি সম্বন্ধে নজর রেখে তাঁকে বরাবর পুলিশে খবর জানাতে হবে।

তিনি তাদের পূর্ব-প্রতিশ্রুতির কথা উল্লেখ করলে তারা বলল, এ তো কিছু শক্ত বা বিপজ্জনক কাজ নয়। তাঁকে যেমন করে হোক সেনের বন্ধু হতে হবে এবং তার সঙ্গে যতদূর সম্ভব সাহচর্য বজায় রেখে প্রতিদিন রাতে বাড়ি ফেরার পথে পুলিশের অফিসে গিয়ে কেবল মুখে বলে আসতে হবে কথোপকথনের মোটামুটি ভাষ্য ও অতিথি কেউ এসে থাকলে তাঁদের নাম ও পরিচয়।

সেনের আর একটা কাজ ছিল, ভারতে নিষিদ্ধ এমন বহু রাষ্ট্রবিপ্লবী ও রাজনৈতিক বই, সাধারণ পত্রিকা বা রোমাঞ্চক কাহিনীমূলক বইয়ের মলাটে ঢেকে দেশের গণ্যমান্য লোকেদের নাম দিয়ে পাঠিয়ে দেওয়া। বাক্স-ভরা এই বইগুলি নেহরু, ডাঃ. রাধাকৃষ্ণণ, মালবিয়া, ডাঃ. বিধান রায় প্রভৃতির নামে পাঠালেও পৌঁছে যেত ঠিক দেশের গুপ্ত সমিতির সদস্যদের হাতে। গুহ একদিন দেখেছিলেন সেনের ঘরে এমনি একটি পাঠাবার জন্য তৈরী বাক্স। তারপর সেন যতগুলি বাক্স ভারতে পাঠিয়েছিলেন গুহের কাছেই জানলেন যে, সেগুলি গন্তব্যস্থানে পৌঁছায়নি।

তিনি সেনকে বললেন, 'এইভাবে গত ন' মাস আপনার বন্ধুত্ব ও আতিথ্য গ্রহণ করে প্রতিদিন দেশদ্রোহিতা বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। এখন আপনার সামনে আমি দাঁড়িয়েছি উপযুক্ত শাস্তি পাবার জন্যে প্রস্তুত হয়ে।'

এ রকমের নিকৃষ্ট বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় মেলে বইয়ের পাতায়। বাস্তবে তার সম্মুখীন হয়ে সেনের মনে হলো, যেন এক বীভৎস জানোয়ার তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে ধুঁকছে। তিনি শুধু বলতে পারলেন, 'মশাই, অনুগ্রহ করে এখন আমার ঘর ছেড়ে বাড়ি যান।'

গুহ জিজ্ঞাসা করলেন, বোধহয় তিনি আর সেনের কাছে আসতে পারবেন না?

সেন বললেন, 'না, তা কেন? আপনি যেমন আসছিলেন তেমনি আসুন। স্কটল্যাণ্ড ইয়ার্ড থেকে এই কাজের জন্যে আপনাকে যে ইনাম দেওয়া হয় তার থেকে আপনাকে বঞ্চিত করতে চাই না। আর তাছাড়া আপনি না এলে আমার অন্য বন্ধুদেরও হয়ত আমি সন্দেহ করতে আরম্ভ করব যে, তাদের মধ্যেও রয়ে গেছে আপনার মতো মনোবৃত্তিসম্পন্ন লোক। তাই সন্দেহটা আবদ্ধ থাক একজনেরই ওপর।'

যে জাতীয়-সংগ্রামের অভিযান দেশে চলছিল তারই তরঙ্গ প্রবাসী ভারতীয় ছাত্রদের মধ্যে এনেছিল নব আশার বার্তা, উদ্যম ও সঙ্কল্প। আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক গোষ্ঠীর সান্নিধ্যে এসে তাঁরা গড়েছিলেন শৃঙ্খলাবদ্ধ ও সর্বাঙ্গীণ রাষ্ট্রীয় পরিস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন এক বিরাট ছাত্রসমাজ। সাকলাৎওয়ালা প্রমুখ স্বরাজ্য সংগ্রামের অগ্রদূতেরা প্রবাসী ছাত্রদের সামনে তুলে ধরেছিলেন একটা পরিস্ফুট রাজনৈতিক চিন্তা ও আদর্শ।

১৯০০ সন থেকে ১৯৩৬ সন পর্যন্ত ভারতীয় সাম্যবাদী ছাত্র সমিতি সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেনের ভারত-শাসন প্রণালীর ওপর অবিরত তীব্র আক্রমণ চালিয়ে যায়। এই সময় লণ্ডনে ইণ্ডিয়ান প্রোগ্রেসিভ রাইটার্স অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়। ডাঃ. মুলুকরাজ আনন্দ হন তার সেক্রেটারি। বেন্ ব্রাড্‌লে, হাচিনসন ও ফিলিপ প্রাট্-এর মতো মীরাট ষড়যন্ত্রের কমিউনিস্ট অধিনায়করা প্রথমে আন্তর্জাতিক অধিবেশনে ভারতীয় ছাত্রদের হাতে সম্পূর্ণ নেতৃত্ব ছাড়তে প্রস্তুত ছিলেন না। পরিশেষে স্বাবলম্বী হয়ে ভারতীয় ছাত্ররা নিজেরা দল সংগঠন করেন এবং ঠিক হয় যে পারী শহরে তাঁরা কার্যপরিচালনার কেন্দ্র স্থাপন করবেন।

লণ্ডনে সেন আধবেলা ডাঃ. সিংহের বইয়ের দোকানে কাজ করতেন। এখানে বই বেচা ও পড়া দু' কাজই একসঙ্গে হতো। আধবেলা ইণ্ডিয়া-অফিস লাইব্রেরীতে গবেষণামূলক পড়াশুনা করে ও বাকি সময়টা রাজনৈতিক কাজে তিনি ব্যস্ত থাকতেন। এখন তিনি লণ্ডনের পাট উঠিয়ে পারীতে এসেছেন নতুন কেন্দ্রের কাজে।

পারীতে সেনের কয়েক জন বন্ধু তাঁকে একবার জানাল যে, পলাতক মানবেন্দ্র রায় দেশে ফিরতে চান এবং তাঁর জন্যে একটা পাসপোর্টের ব্যবস্থা করতে হবে। অর্থাৎ অন্য কারুর পাসপোর্ট নিয়ে জাল মানুষ সেজে দেশে ঢোকবার চেষ্টা করতে হবে। সেন তখন লুব্ধ পকেটমারের মতো ওৎ পেতে থাকতেন কার কাছ থেকে এই অমূল্য ছাড়পত্রটি হস্তগত করা যায়। তাও আবার এমন লোকের পাসপোর্ট হওয়া চাই, যার সঙ্গে জাল অধিকারীর খানিকটা সাদৃশ্য থাকে।

উপায় মিলল এক রকম অপ্রত্যাশিতভাবে। সেন লণ্ডন থেকে আগত একজন ভারতীয় ও আরও কয়েক জন ছাত্রের সঙ্গে গিয়েছিলেন ভের্সায়সাই দেখতে। সেখানে একটি কাফেতে ভারতীয় ছাত্রটি বাথরুমে যাবার সময় সেনকে তার রেন

কোটটা রাখতে বললে। বেশ নিপুণ পকেটমারের মতো কোটের পকেটগুলি হাতড়াতে সেন পেয়ে গেলেন ভদ্রলোকের পাসপোর্টখানা। কোন এক ওজর দেখিয়ে অপর একজনের জিম্মায় কোটটি দিয়ে সেন তখন ছুটেছেন পারীর গাড়ি ধরতে।

সেই পাসপোর্ট নিয়ে মানবেন্দ্র রায় ফেরেন ভারতে এবং প্রায় দেড় বছর পরে যখন তিনি ধরা পড়েন তখনও সেই পাসপোর্টের অধিকারীর নামেই তিনি পরিচিত।

সেনকে একদিন প্রশ্ন করলাম, "তিনি কেন আমাকে তাঁর দলে টানবার কোনো চেষ্টা করেন না যেমন তাঁকে তাঁর সহকর্মীরা টেনে নিয়েছিল?"

তার উত্তর এল, "আমাকে কেউ তো টানেনি। রাজনৈতিক পরিস্থিতি আমার মনকে তৈরী করেছিল এবং এইভাবে যাদের মন হয়েছিল সজাগ তারা নানা যোগা-যোগে জোট বেঁধেছিল, কারণ তাদের উদ্দেশ্যটা ছিল একই ধরনের। আপনি শিল্পী আপনি থাকবেন শিল্পের কেন্দ্রে শিল্পীদের সঙ্গে। আপনাকে একটা বিপ্লবী বা সোলজারে পরিণত করা মানে দেশের ক্ষতি করা। স্বাধীনতা আনব আমরা লড়াই করে, কিন্তু তার প্রতিষ্ঠায় গড়বার কাজে প্রয়োজন হবে শিল্পী, সাহিত্যিক, বৈজ্ঞানিকদের। আমাদের বন্ধুত্ব ও দেশাত্মবোধটা থাক একত্র, কিন্তু আমাদের কর্মক্ষেত্রকে রেখে দেবো স্বতন্ত্র।"

এরপর মাসের পর মাস কেটে গেলো সেনের সান্নিধ্যে। কিন্তু আমাদের শিল্প ও সাহিত্য ছাড়া রাজনৈতিক প্রসঙ্গের আলোচনা আর হয়নি।

ম্যাজেভিয়েস্কী

ফৈয়ে জেন্‌ভিয়েভে প্রতিদিন দুপুর ও সন্ধ্যার সময় স্বল্পমূল্যে ক্ষুধা নিবারণের জন্য যে আন্তর্জাতিক ছাত্রছাত্রীর ভিড় লেগে যেত তার মধ্যে সাদা, কালো, বাদামী, হলদে মানুষের ভেদাভেদের বালাই ছিল না। হৃদ্যতা-ভরা করমর্দন অচেনাকে এই মিলন-মন্দিরে চেনা করে দিত বিনা আড়ম্বরে এবং দু' এক দিনের আলাপের পরেই 'মা ভিয়ো' কি 'মা ভিয়েই' বলে নিকট-বন্ধুত্বের সম্বোধন এনে দিত মিত্রতার সান্নিধ্য।

স্লাভ জাতির সব ক'টি বিশেষণকে চেহারা ও আচরণে পরিস্ফুট করে এই ফৈয়েতে আসতেন ব্রনিস্‌লাভ ম্যাজেভিয়েস্কী। তাঁকে সকলের সঙ্গে বন্ধুত্ব করতে বেশ ব্যগ্র দেখা যেত। কিন্তু অপর পক্ষ তাঁর অগ্রসরের আভাস পেলেই কোনো অছিলায় সরে পড়বার চেষ্টা করত। এই ভদ্রলোক আন্তর্জাতিক আদর্শ ছাত্র সম্মেলনে কি কারণে যেন অপাংক্তেয় —তার কারণ, প্রথমে বুঝিনি।

একদিন তিনি আমাকে, "আমি ম্যাজেভিয়েস্কী, আপনি নিশ্চয়ই ভারতীয়।

আপনার নাম বললে বাধিত হব" —বলে করমর্দনের জন্ম হাত বাড়ালেন। আলাপের পর তিনি আমার পাশে বসে প্রশ্নের পর প্রশ্ন আরম্ভ করলেন। সেগুলি তুবড়ি বিস্ফোরণের বেগে আসতে লাগল এবং ততোধিক বেগে আসতে লাগল সদা লালাসিক্ত মুখের ছিটেফোঁটা। দূরত্ব বজায় রেখে নিজেকে সেই মুখনিঃসৃত বৃষ্টি থেকে বাঁচাবার চেষ্টাও বৃথা। কারণ প্রশ্নের গুরুত্ব ও আগ্রহকে জোরালো করতে তিনি ঝুঁকে পড়ে আরও কাছে মুখ নিয়ে আসেন। শুধু তাই নয়, সেই মুখবিবর থেকে একটা দুঃসহ গন্ধ আসছিল, সেটা ফরাসী সুরার স্থায়ী খোসবু কিংবা হ্যালিটোসিস নির্ণয় করার আগে তার গ্যাসে দম বন্ধ হবার উপক্রম।

এ অভিজ্ঞতা অবশ্য আমাদের দেশে খুব সাধারণভাবে হয়ে থাকে। সাধারণত এই দুর্গন্ধ-ভরা মুখের অধিকারীরা অন্যে সেই দুঃসহ গ্যাসের পরিধির মধ্যে পড়ে কষ্ট পাচ্ছেন কি-না, সে বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে থাকেন —নিজের নাসিকা সেই গন্ধে অভিভূত হয় না বলে।

ও দেশে শারীরিক কোনো ত্রুটির কথা কাউকে ব্যক্তিগতভাবে জানানো অসৌজন্য। তবুও ম্যাজেভিয়েস্কীকে অনুরোধ করলাম যে, যদি তিনি আমাদের পরিচয়কে দীর্ঘায়ু করতে চান, তা হলে তাঁকে কথা বলার সময় মুখ দূরে রেখে একটা ব্যবধান বজায় রাখতে হবে। তিনি তো প্রথমে এই আকস্মিক রূঢ়তায় থ' হয়ে গেলেন।

পরে হেসে বললেন, "জানো হে, তোমার মতো এমন স্পষ্টবাদী লোকের সঙ্গে আমার আগে আলাপ হয়নি। এখন আমি বুঝি, কি জন্যে সবাই আমায় এড়িয়ে যেতে চায়।" কিন্তু ম্যাজেভিয়েস্কীর এই একটি ত্রুটিকে শুধু যে লোকে এড়াবার চেষ্টা করত তা নয়। তাঁর সঙ্গে বিভিন্ন ইয়োরোপীয় ভাষার বেশ কতকগুলি অভিধান থাকত এবং নানান ভাষাভাষী ছাত্রছাত্রীদের সঙ্গে তিনি তাদের ভাষায় আলাপের চেষ্টা করতেন। কথার মাঝখানে হঠাৎ তিনি চেঁচিয়ে 'এঁ্যা মম সিল্ ভুপ্লে' বলে তাঁদের থামিয়ে না-বোঝা কথার অর্থ অভিধান খুলে দেখে নিয়ে তারপর শব্দটিকে দু'তিন বার আবৃত্তি করে বলতেন 'কন্তিনিউয়ে' অর্থাৎ এখন বলে যাও। এরই জন্যে ছাত্রছাত্রী মহলে তাঁর নামকরণ হয়েছিল 'মঁ্যসিয়ো লো ডিকস্‌নেয়ার।' ভদ্রলোকের আরও একটি দুর্বলতা ছিল, সুন্দরী ছাত্রী বা যুবতী দেখলে তার সঙ্গে আলাপের চেষ্টা। তিনি ফ্রান্সের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দু'একটি ডক্টরেট উপাধি অর্জন করেছেন এবং পারীর ফাকুলতে দু দ্রোয়ায় তিনি 'ইকনমিক পলিতিক' সম্বন্ধে গবেষণা করে আর একটি ডক্টরেট অর্জনের ব্যবস্থা করছিলেন।

তাঁর নিমন্ত্রণে একদিন ছ' তলার ওপরে চিলে কোঠায় অ্যাটিক্ ঘরে গিয়ে প্রথমে নজরে পড়ল দিভানের পাশের দেওয়ালে লাগানো অসংখ্য কিশোরী ও যুবতীদের ফটোগ্রাফ। জিজ্ঞাসা করা অনুচিত, তবুও শুধালাম যে, বন্ধুবরের কোনোদিন এদের তাঁর হারেমে রাখবার ইচ্ছা আছে কি-না?

তিনি বললেন, "এদের অনেককেই আমি চিনি না। রাস্তায় দেখা হলে তাঁদের রূপে মুগ্ধ হয়ে আমি শুধু একটি ফোটো তোলবার অনুমতি ভিক্ষা করে এই সংগ্রহকে তৈরী করেছি।" তারপরে তিনি এই ছায়াগুলির অধিকারিণীরা কে কোন দেশীয় তার পরিচয় দিতে লাগলেন।

ঘরের এক কোণে ছিল একটি বেহালা এবং স্ট্যাণ্ডের ওপর রাখা মিউজিক স্কোরের কয়েকটি শীট্। কাছে গিয়ে দেখলাম, সেটি মোৎসার্ত-এর 'ভায়েলিন কনচারতো'।

তিনি দুটি বিরাট পোর্সেলিনের বাটিতে গরম জল ঢেলে ঝাঁজরা-করা বড় মাদুলির মতো চেনে-বাঁধা একটি অ্যালুমিনিয়ামের আধারে চা ভরে সেটা জলে ডুবিয়ে ডুবিয়ে নেড়ে চায়ের সুরুয়া বানিয়ে তাতে আধখানা পাতিলেবুর রস নিংড়ে বললেন, "চিনি সংযোগের প্রয়োজন বোধ করলে, নিজেই নিও।" কাছে একটি কাগজের বাক্সয় মিনিয়েচার সাইজের ফরাসী চিনির ইঁট পাঁজার মতো সাজানো ছিল। তারই গোটা কয়েক মিশিয়ে কোনোমতে ঐ চা পান করা গেলো।

আলাপ ঘনীভূত হলে জানলাম, ম্যাজেভিয়েস্কী হচ্ছেন উৎকট রকমের জ্ঞানপিপাসু।

ইয়োরোপে, বিশেষ করে ফ্রান্সে এক ধরনের বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তেবাসীর সাক্ষাৎ মেলে। এঁরা বিদ্যায়তনে প্রবেশের পর থেকেই গবেষণায় এমন মেতে যান যে, বাইরের সমাজের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ছোট হতে হতে তার থেকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন। বিদ্যায়তনের পরিধির মধ্যেই তাঁরা স্বাচ্ছন্দ্য অনুভব করেন, আর বাইরে এলেই তাঁদের ভাবে, আচরণে, মনে হয় যেন বাড়ির ইঁট-কাটরার ভিড়ে তাঁরা নিজেদের হারিয়ে ফেলেছেন এবং সব সময়েই অন্য পেশার লোকেদের আলাপ পরিচয়ের হিংস্র আক্রমণ থেকে নিজেদের বাঁচাবার প্রাণপণ চেষ্টা করে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। একটি গবেষণা বা থিসিস্ শেষ হওয়ার আগে বিদ্যায়তন ছেড়ে যাবার ভয়ে তাঁরা আর একটি গবেষণা বা থিসিস লেখার ব্যবস্থা করে ফেলেন। যদি বিদ্যায়তনে অধ্যাপনার কাজ জোটে তা হলে তো তাঁদের সর্বোদ্ধার হয়ে যায়, তা হলে কোনো-না-কোনো অছিলায় তাঁরা থেকে যান আজীবন বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে।

বুঝলাম, মাজেভিয়েস্কী এরই একটি বিশিষ্ট উদাহরণ। সামান্য মাত্র বৃত্তি পেয়ে রাতে কোনো ব্যবসায়ীর অনুবাদকের কাজ করে কোনো মতে তাঁর বাসস্থান ও আহারের সংস্থান হয়ে যায়। একদিকে যেমন তাঁর সাহিত্য ও সংগীত সম্বন্ধে গভীর জ্ঞান, অপরদিকে তাঁর তেমনি ছিল মেয়েদের ব্যাপারে পাগলামি। এ যেন সম্পূর্ণ দুই ভিন্ন ব্যক্তির এক অদ্ভুতভাবে পরিস্ফুট ডাইকোটমি। তিনি যে এত ইয়োরোপীয় ভাষা কেবল অভিধানের সাহায্যে এবং প্রশ্নোত্তরকারী লোকেদের বিরক্তি কুড়িয়ে আয়ত্ত করেছিলেন তার মূলে ছিল সেই ভাষাভাষী মেয়েদের সঙ্গে আলাপ হলে তাদের মাতৃভাষায় মধুর সম্ভাষণ অকৃত্রিমভাবে করতে পারবেন বলে।

তাঁর কথার বিষয়বস্তু ঘুরে-ফিরে গিয়ে শেষ পর্যন্ত মেয়েদের শারীরিক রূপ ও চরিত্র সম্বন্ধে আলোচনায় দাঁড়াত।

একদিন মাজেভিয়েস্কীর সঙ্গে এক সংগীতালয়ে যেতে মেট্রো ট্রেনে উঠতেই তিনি বললেন, "এ কামরায় যাব না, অন্য কামরাতে চলো।" সে কামরায় অনেক আসন খালি থাকা সত্ত্বেও তিনি জিদ করে উঠলেন অন্য কামরায়। সেটায় ছিল ভীষণ ভিড়। এই অদ্ভুত আচরণের কারণ জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন, "ও কামরায় দেখলাম একটিও মহিলা নেই। একটিও মহিলার মুখ যে যানবাহনে দেখা যায় না, তাতে চড়ে গেলে আমার মনে হয় যেন আমি শবদেহবাহী গাড়িতে বসে আছি। এর চেয়ে ভিড়ে-ভরা গাড়িতে দাঁড়িয়ে যাওয়া অনেক ভালো, কারণ মেয়ে যাত্রীদের সুন্দর মুখগুলি ফুল দেখার মতো নিরীক্ষণ করে যাত্রার বিরক্তি ও ক্লেশকে ভুলে থাকা যায়।"

তাঁর এ সব উক্তি শুনে মনে হবে যেন তিনি একটি উৎকট রকমের ডন্ জুয়ান। কিন্তু বাস্তবে তিনি মেয়েদের সান্নিধ্যে রীতিমতো লাজুক হয়ে সামাজিক শিষ্টাচারের একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাতেন এবং সাহস করে বড জোর তাদের সুশ্রী ও সুসজ্জার দু'একটা মামুলী প্রশংসাবাদ ছাডা আর বিশেষ কিছু রোমান্টিক কথা বলতে অক্ষম ছিলেন। তখন তাঁর আচরণ দেখে মনে হতো না যে, রোমান্স-সন্ধানী যুবকের প্রেমসঞ্চারী অগ্রসর ; এ যেন, কোনো বাৎসল্য-স্নেহে অভিভূত খুড়ো কি জ্যেঠার, ভাইঝির কাছে কুশলাদি সংবাদ নেওয়া।

তখন নভেম্বরের শেষ। সিতে ইউনিভারসিটিতে এক সংগীতানুষ্ঠানে যেতে আমি ও ম্যাজেভিয়েস্কী মোপারনাসে মিলিত হয়ে পদব্রজে যাত্রা শুরু করেছি। সেই বিশাল চওড়া বুলভার আর তার অতি প্রশস্ত ফুটপাথে অনেক পথচারীর ভিড়কেও বেশ পাতলা দেখাচ্ছে। হঠাৎ আমাদের সামনে ছেঁড়া পোশাক-পরা একটি বৃদ্ধা অতি সংকোচে হাত চিতিয়ে আমার অচেনা ভাষায় কি একটা বললে। তার পোশাকের কাটছাট ফরাসীনীদের অঙ্গবস্ত্রের ঢঙ থেকে যে বেশ অন্য রকমের তা এক পলকের দৃষ্টিতেই বোঝা যাচ্ছিল। ফরাসী দেশে ভিখারীর হাত পেতে ভিক্ষে চাওয়াটা খুব বিরল ছিল। কিন্তু এই বৃদ্ধাটিকে সেই জাতীয় ভিখারী বলে মনে হলো না। ম্যাজেভিয়েস্কী তার ভাষাতেই কি একটা বলতে সে তাঁর হাত ধরে হাউহাউ করে কেঁদে ফেলল।

বন্ধু সংক্ষেপে জানালেন, যে মহিলাটি অন্তর্বিপ্লবে বিধ্বস্ত স্পেন থেকে পলাতকের গড্ডলিকাকে অন্ধভাবে অনুসরণ করে এসে পড়েছেন এই বিলাস ও সুখানন্দে আপ্লুত পারী নগরীতে। ফরাসী ভাষা না জানায় দিশেহারা মহিলা দু'দিন যাবৎ না পেয়েছেন আহার্য, না পেয়েছেন আশ্রয়। ভিক্ষায় অনভ্যস্তা তিনি, আনাড়ির মতো হাত পাতায় পথচারীদের করুণা জাগাতে অক্ষম হয়েছেন এবং ফরাসী ভাষা না জানায়, কাউকে জানাতে পারেননি তাঁর দুর্দশার কথা।

বৃদ্ধাকে আমরা একটি কাফেতে বসিয়ে খাদ্যের ব্যবস্থা করলাম। খাওয়ার শেষে যখন তাঁকে কফি দেওয়া হলো তিনি কাপটি অতি সন্তর্পণে নাকের কাছে তুলে তার তীব্র গন্ধকে বেশ একটা দীর্ঘ আঘ্রাণ করে চোখ বুঁজে বললেন, 'আঃ! কাফে।' যেন কত দিনের আকাঙ্ক্ষার দুষ্প্রাপ্য পানীয় আজ তাঁর হস্তগত হয়েছে এবং ধীরে ধীরে বিন্দু বিন্দু করে সেই অমৃত পানীয়ের আস্বাদনকে যত দীর্ঘজীবী করা যায় তার চেষ্টা করতে লাগলেন।

ম্যাজেভিয়েস্কী ভাঙা স্প্যানিশ ভাষায় তার সঙ্গে আলাপ করে জানালেন যে, বার্সিলোনায় বোমা বর্ষণের পর শহর ও শহরতলীর লোকেরা ভয়বিহ্বল হয়ে পালাতে শুরু করে এবং তাদের লক্ষ্য ছিল ফরাসী সীমান্ত। একটা বিরাট বিভীষিকার সামনে থেকে পালিয়ে যাওয়াই ছিল তাদের প্রথম প্রচেষ্টা। প্রথমে একটা বিশৃঙ্খল সন্ত্রস্ত জনসমষ্টি পথে চলতে ঘটনাচক্রে নিয়ন্ত্রিত হয়ে এসেছিল সীমান্ত অতিক্রম করে ফ্রান্সে কিন্তু রাজধানী পর্যন্ত পৌঁছাতে আবার সে জমাট-বাঁধা রেফেউজির দলে ধরেছিল ভাঙন। সেই ভাঙনের একটা টুক্‌রো ছিল এই বৃদ্ধা। এক বিভীষিকার কবাল গ্রাস থেকে পালিয়ে এসে আর এক ভয়ঙ্করের সামনে [illegible]।

স্প্যানিশ রেফিউজি

পারী নগরীর রাস্তায় কুড়িয়ে পাওয়া এই রেফিউজি বৃদ্ধাকে কেবল সামান্য আহার্য দিয়ে পুনরায় তাকে অনিশ্চিত ভাগ্যের অন্ধকার পথে ঠেলে দিতে আমাদের হৃদয়ে কেমন একটা মোচড় দিতে লাগল। তাকে বাঁচাতে হলে চাই আশ্রয়, চাই আহার্য, চাই মানবীয় সহানুভূতি। আমরা তাকে নিয়ে গেলাম পুলিশ থানায় যদি সেখান থেকে সাহায্যের কোনো কিনারা পাওয়া যায়। কিন্তু সেখানে গিয়ে আমরা খুব ধমক খেলাম। আমাদের বলা হলো বিদেশী ছাত্র এ রকম পলিটিক্‌স-এ মাতামাতি করলে এ দেশ থেকে তারা আমাদের তাড়িয়ে দিতে বাধ্য হবে। আমরা বললাম, 'একজন দুঃস্থা রেফিউজির আশ্রয়ের সন্ধানের সঙ্গে পলিটিক্‌স-এর কি সম্বন্ধ?'

কোতোয়ালির কর্তা জবাব দিলেন, 'সব স্প্যানিশ রেফিউজিরা 'সাল্ কমিউনিস্ত' অর্থাৎ অতিশয় বদলোক।

দু'একজন দর্শক যাঁরা আমাদের বিশেষ দ্রষ্টব্য হিসাবে দেখে বুঝবার চেষ্টা করছিলেন আমরা কোতোয়ালিতে চীরবসনা এক বৃদ্ধাকে নিয়ে কি নালিশ করতে এসেছি, তাঁদের একজন বললেন জুভিসির কাছে প্যাভিয়ঁ ব্লো-তে তিনি অনেক স্প্যানিশ রেফিউজির সমাবেশ দেখেছেন। সেখানে বোধহয় বৃদ্ধার একটা ঠাঁই মিলতে পারে।

আমরা ঠিক করলাম সে রাতের মতো এক হোটেলে মহিলাটির থাকার ব্যবস্থা করে পরের দিন তাকে প্যাভিয়ঁ রোতে পৌঁছে দেবো।

রিপাব্লিকান স্প্যানিশ সরকার ও ফ্রাঙ্কোর ফ্যাসিষ্ট দলকে নিয়ে যে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয় তাতে হিটলার ও মুসোলিনী অস্ত্র-শস্ত্র, সৈন্য, বিমান ও বোমাবর্ষণের দ্বারা স্পেনকে বিধ্বস্ত করলেও বৃটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশের তদানীন্তন শান্তিবাদী নিয়ন্তরা নিরপেক্ষ দর্শক হয়ে এই ধ্বংসনীতির সমর্থন করেন না বলে তাঁরা দু'একটি ভদ্রোচিত মৃদু আপত্তি করেছিলেন মাত্র। ইতিহাসে ফরাসী বিপ্লব রিপাব্লিকের জন্ম দিয়ে জগতে স্বাধীনতাবাদী জনগণের মনে এনেছে একটা স্থায়ী আকর্ষণ। তাই যে কোনো রিপাব্লিক পীড়িত হলে সহানুভূতির জন্য সকলে মুখ তুলে চায় ফ্রান্সের দিকে।

তদানীন্তন ফরাসী সরকার স্পেনের এই পীড়ন সম্বন্ধে একেবারে যে নির্বিকার নন, তাই দেখাতে, পলাতক রেফিউজিদের বিনা বাধায় সীমান্ত অতিক্রম করে ফ্রান্সে আসতে বাধা দেননি। তাদের জন্যে সীমান্ত খুলে দেওয়ার মাহাত্ম্যটুকু সংবাদ-পত্রের প্রশস্তিতে বেশ ভালো করে প্রচার করা হয়েছিল। কিন্তু এ ছাড়া স্প্যানিশ রেফিউজিরা ফরাসী সরকার থেকে কোনো সাহায্য পায়নি।

সোভিয়েট রাশিয়ার বাইরে, জগতের সব দেশের মধ্যে তখন কমিউনিস্টদের সংখ্যা ফ্রান্সে ছিল সর্বাধিক এবং ফরাসী রাষ্ট্রীয় শক্তির তাকে বিধ্বস্ত করার মতো সামর্থ্য না থাকায়, ফরাসী বামপন্থীদের সংখ্যা ক্রমান্বয়ে বেড়ে উঠছিল। প্রকাশ্যভাবে না করলেও পরোক্ষভাবে ফরাসী রাষ্ট্রনিয়ন্তারা তাদের এই অগ্রগতিকে খর্ব করার যথাসাধ্য চেষ্টা করেছিল।

পলাতক স্প্যানিশদের ধরে নেওয়া হয়েছিল রিপাব্লিকান সরকারের পক্ষপাতী অর্থাৎ বামপন্থী। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে ফরাসী সরকার এই স্প্যানিশ রেফিউজিদের ক্যাম্পে গণ্ডীর মধ্যে আটকে নিয়ম জারী করে তাদের গতিবিধিকে নিয়ন্ত্রিত করল অর্থাৎ প্রচ্ছন্নভাবে তাদের কয়েদ করে রাখল। জায়গায় জায়গায় রেফিউজিরা একজোট হলেই পুলিশের লোক এসে সেগুলি যে রেফিউজি ক্যাম্প এই ঘোষণা সরকারীভাবে করে দিত। এই হতভাগ্যদের থাকবার ও খাওয়ার সাধ্যমতো আয়োজন কেবল বামপন্থী নাগরিক ও কমিউনিস্ট পার্টির সভ্যদের কাছ থেকেই এসেছিল।

ডিসেম্বর মাসের শেষ। গৃহযুদ্ধে ক্ষতবিক্ষত স্পেনের লক্ষ লক্ষ সর্বহারা নারী, শিশু ও ভগ্নাঙ্গ-পীড়িত —অসহায় পুরুষ ফ্রান্সের মাটিতে আশ্রয় পাবার জন্য সীমান্তে ভিড় করছে। অতি ভাগ্যবানদের ভিতরে প্রবেশের অনুমতি বিদেশী মাটিতে মুমূর্ষু প্রাণের শেষ শিখাটুকু ধরে রাখবার আশাবর্তিকাকে আবার জ্বালিয়ে দিয়েছে। হায়, বর্তমান ইয়োরোপীয় দেশ ও জাতির আশ্রয়, তার আশ্বাস ও মানবতার বাণী! ভারতীয় ছাত্রদের হিতৈষিণী মাদাম্ মোর‍্যাঁ একদিন বললেন, 'স্পেনের রেফিউজি

ছেলেমেয়েরা সঁ্যা মারত্যাঁর রঙ্গমঞ্চে একটি নৃত্যগীতানুষ্ঠান করেছে, দেখে এস কর, তুমি শিল্পী, শিল্পের অনেক খোরাক পাবে।' যাবার জন্য উদ্যোগী হতে কয়েক জন বন্ধুকেও সঙ্গী পাওয়া গেলো। আমাদের মধ্যে প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন আমার একটি পোলিস বন্ধু। ইনি ইতিমধ্যেই কয়েকবার সেখানে গিয়ে অনুষ্ঠানের কর্তাদের সঙ্গে বেশ ভাব জমিয়ে ফেলেছেন শুনলাম। এই অনুষ্ঠানার্জিত অর্থে একটি রেফিউজি দলের অন্নসংস্থান হয়। অনুষ্ঠান আরম্ভ হওয়ার আগে স্প্যানিস অর্কেষ্ট্রা বাজতে লাগল। বাজনার সুরে মনে হলো যেন আমাদের দেশের সঙ্গে কোথায় যেন একটা সংযোগ আছে। সুরটি বড় করুণ, উচ্চ স্বরগ্রামকে স্পর্শ করে যেন বলতে চাইছে—আমরা কাপুরুষের মতো কাঁদি না, আবার নেমে এসে বিনিয়ে উঠে সর্বহারার ব্যথাকে গুমরে-মুচড়ে রঙ্গালয়ের মঞ্চে, আসনে, দর্শকদের মনে, হৃদয়ে আবেগের বন্যা বইয়ে দিচ্ছে। নাচ ও গান বাদ দিয়ে স্পেনের জাতীয় জীবনকে কল্পনা করা যায় না। গীটার-এর জন্মভূমি স্পেনে, যখন জিপ্‌সি ছেলে সুরের তরঙ্গে নিজেকে ডুবিয়ে দেয়, তন্বী, সুঠামা সুন্দরী মেয়ের দেহবল্লরী ঘিরে সেই সুরতরঙ্গ নৃত্যের লীলাভঙ্গে আছড়ে পড়ে তাকে চমকিয়ে দেয়। দীর্ঘকাল মুরদের শাসানাধীন থাকায় ইয়োরোপের অন্যান্য দেশ থেকে এখানে প্রাচ্য জীবনের বেশ ছাপ রয়ে গিয়েছে। বাংলার মাঝির একটানা ভাটিয়ালী সুর, মরুভূমির বেদুইন ছেলের বাঁশীর লম্বা একঘেয়ে তান এদের সংগীতে বেজে উঠে মনকে উদাস করে দেয়। এরা সব নাচ পাগল। রাস্তায়, ঘাটে, যেখানেই ছেলেমেয়েরা জড় হয়, অমনি শুরু করে দেয় পল্লীনৃত্য।

পর্দা উঠতে একদল ছোট ছেলেমেয়ে, রঙিন ফুলদার ঘাঘরা, ওড়না করে মাথায় বাঁধা রঙিন রুমাল, ছেলেদের ঢিলে হাতওয়ালা শার্ট, কোমরে জড়ানো লাল কাপড়, মোজা ও প্যাণ্টের সন্ধিস্থলে রঙিন ফিতের বাহারী ফাঁস ইত্যাদির বিচিত্র তাদের দেশীয় পোশাকে মঙ্গলাচরণের মতো গান গেয়ে নাচলে। তাদের নাচের ভঙ্গি, হাতের মুদ্রা ভারতীয় নাচের কথা স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল। এরপরে একটি বছর সাতেকের মেয়ে হাতে ভায়লেট ফুলের তোড়ায় ভরা সাজি নিয়ে একটি গান গাইলে। গানের ধুয়ায় শেষ কথাটি 'স্তেনরিতা', ভারী মিষ্টি করে টান দিচ্ছিল আর মাঝে মাঝে একটি ফুলের তোড়া দর্শকদের মধ্যে ছুঁড়ে দিচ্ছিল। এরপর একটি ছোট ছেলে ও একটি ছোট মেয়ে কাস্তানিয়েৎ (কাষ্ঠনির্মিত করবাদ্য) বাজিয়ে নাচ দেখিয়ে সকলকে চমৎকৃত করলে। জিপ্‌সিদের পোশাকে একটি সুন্দরী মেয়ে একা নানা মুদ্রাভঙ্গি সহকারে নাচলে। তার সুন্দর কোঁকড়া চুলগুলি মাথার লীলাভঙ্গে দুলে বেশ একটা মোহের সৃষ্টি করছিল। হঠাৎ বাজনার সুর বদলে গেলো। সংগীতের ছন্দ যেন রঙ্গালয়ের মধ্যে আবদ্ধ থাকতে চাইছে না। ছন্দের সতেজ মাত্রার তাল যেন সৈন্যদের কুচকাওয়াজ করবার সঙ্কেত। রঙ্গমঞ্চের ক্ষীণ লাল আলোয় ঈষৎ অস্পষ্ট একটি মেয়ের নৃত্যগতি চঞ্চল হয়ে উঠল। এ যেন নদীর সুললিত বীচিমালার মৃদু কম্পন নয়, সাগরবিক্ষুব্ধ ভীম তরঙ্গের প্রলয়োচ্ছ্বাস। স্পেনের রণক্ষেত্রের

প্রাণকে যেন রূপ দিয়ে দেখাতে চায় তার ভয়ঙ্কর বীভৎসতাকে। প্রাণে প্রাণে তার স্বরূপ উপলব্ধি করেছে বলেই হয়ত তার প্রকাশ এমন স্পষ্ট করে তুললে তার নাচে। নানা রকম পল্লীনৃত্য ও গীত, একা, যুগ্ম বা বহুজনে ছেলেমেয়েরা নাচলে, গাইলে। স্পেনের প্রত্যেকটি প্রদেশের পোশাকে, নাচে, গানে ও ভাষায় বৈশিষ্ট্য আছে। আন্দালুসিয়ার জিপ্‌সি মেয়ের বেশভূষা, মহিমান্বিত নৃত্যভঙ্গিমা ও আবেগভরা সুর যে আবহাওয়ার সৃষ্টি করে তা যেন মর্তের নয়। ক্যাস্তিলিয়া, আরাগন, কাতালন, গ্যালিথিয়া, বাস্ক প্রভৃতি স্থানের প্রত্যেকটি বিশিষ্ট নৃত্য ও সংগীত দেখে মুগ্ধ হলাম। অনুষ্ঠান শেষ হলে সবাই বাড়ি ফিরলাম। কিন্তু কানে বাজতে লাগল তখনও সেই সংগীত ও কাস্তানিয়েতের অনুরণন, চোখে ভাসতে লাগল তাদের লীলায়িত ভঙ্গিমার বিচিত্র বিলাস। তাদের স্মৃতিকে একেবারে মন থেকে তাড়িয়ে দিতে পারলাম না। পথে পোলিস বন্ধুকে বললাম, "এ উচ্ছ্বাস হয়ত এদের হৃদয় থেকে বেরুচ্ছে না। কারণ আজ তাদের আনন্দের কি-ই বা আছে? গৃহহারা, আত্মীয়-স্বজনহীন, পরদেশে ভিক্ষান্নপ্রত্যাশী এরা যে বাহ্য আনন্দটুকু আমাদের দেখালে এ তো সম্পূর্ণভাবে অকৃত্রিম হতে পারে না। আমি এদের বর্তমান প্রকৃত অবস্থা দেখতে উৎসুক —পারবে আমাকে দেখাতে?"

বন্ধু বললেন, "এ রকম একটি দল নয়, শত শত ক্ষুদ্র রেফিউজি দল ফ্রান্সের চারদিকে, আকাশের আচ্ছাদন তলে ভূমিশয্যায় শাক-পাতা খেয়ে কোনো মতে বেঁচে আছে। যদি দেখতে চাও তো চলো আমার সঙ্গে কাল একটি গ্রামে রেফিউজিদের পাড়ায়।"

পরের দিন ভোর সাতটায় গার্ দ্য লিয়ঁ স্টেশনে বন্ধুর কথামতো হাজির হলাম। আমরা পারী থেকে কুড়ি কিলোমিটার দূরে ওবোন বলে একটি ছোট জায়গায় নামলাম। বন্ধু জানালেন, এক চাষী ভদ্রলোক (চাষীকে ভদ্রলোক বলা অনেকের হয়ত অসঙ্গত ঠেকবে, কিন্তু শুধু ও দেশ বলে নয়, চাষীরা মনে হয় সর্বত্রই ভদ্র) তাঁকে ঠিকানা দিয়ে বলেছেন এখানে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। তিনিই আমাদের রেফিউজি ক্যাম্পে নিয়ে যাবেন। রাস্তায় একটি কাফেতে জলযোগ সেরে কাফের কর্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করা হলো, 'শ্যোম্যা ভেয়ার্ত (সবুজ পথ) কোথায়?' উপস্থিত সকলেই মুখ চাওয়া-চাওয়ি করে বললে, এ নামের রাস্তা তাঁরা কেউ কোনোদিন শোনেনি। পথে যাকেই জিজ্ঞাসা করি —ঐ একই উত্তর আসে। শেষে এক বৃদ্ধকে জিজ্ঞাসা করতেই তার পুরু কাঁচের চশমাটা নাকের ডগায় নামিয়ে ঘোলাটে চোখ যতদূর সম্ভব তীক্ষ্ণ করে আমাদের দিকে তাকিয়ে বললে, 'ঠিকানা তোমাদের দিলে কে?' নাম বলায় বৃদ্ধ বললে, 'একটি রাস্তার ঐ নাম ছিল ত্রিশ বছর আগে, এখন তার নাম অন্য।' আমরা তো প্রায় রিপভ্যান উইঙ্কলের অবস্থায় পড়লাম। এমন সময় যাকে নিয়ে এত কাণ্ড তিনি সশরীরে হাজির হলেন। আমরা এঁকেই খুঁজছি শুনে বৃদ্ধ বললে, 'ভুল ঠিকানা দিয়েছিলে কেন হে ছোকরা?' ভদ্রলোক

অতি বিনীতভাবে বললেন, 'আজ্ঞে, ভুল বলিনি প্রায় তিন চার পুরুষ ধরে ঐ নামের ঠিকানা চলে আসছে। বাবার আমলেও ঐ নাম আমরা শুনেছি।' ব্যাপারটায় বেশ একটু হেসে নেওয়া গেলো। ভদ্রলোক প্রথমে তাঁর বাড়ি নিয়ে গিয়ে আমাদের তাঁর ক্ষেত, খামার, হাঁস, মুরগী, গরু-বাছুর, শুয়োর —সব দেখালেন। তাঁর স্ত্রী সব্জিবাগানে কাজ করছিলেন, আমাদের দেখে ছুটে এসে অভিবাদন জানালেন। তাঁর মেয়েটি আমার হাতে একটি টান দিয়ে বললে, "এই, তুমি এঁ্যাদু (হিন্দু) ? তোমাদের দেশে মুরগী পাওয়া যায় ?" 'হ্যাঁ', বলায় বললে, "এই রকমই ?" বললাম, "না, এর চেয়ে অনেক বড়।" সে তখনই তার দু'হাত যতদূর সম্ভব প্রসারিত করে উপস্থিত আর সকলকে ভারতীয় মুরগীর বপুর পরিমাণটা বোঝাতে ব্যস্ত হয়ে উঠল।

চমৎকার জীবন এ দেশী চাষীদের। সমবায় পদ্ধতিতে এদের জীবন ও সমাজ চলে বলে এদের দুঃখকষ্ট বিশেষ নেই। তিন-চার জন মিলে যুক্তভাবে এরা নিজেদের জমিগুলি চাষ করে। সমবায়ভাবে টাকা দিয়ে ট্রাক্টর কেনে, বসত বাড়ি গড়ে। তারপর ফসল হলে জমির মাপ হিসেবে ভাগ করে নিজেদের মধ্যে টাকা বা ফসলের ভাগ নেয়। বহু স্থানে আইন বাঁচিয়ে এই চাষীরা রেফিউজিদের যতদূর সম্ভব সাহায্য করেছে। যে দেশেরই লোক হোক, বিদেশীদের এরা ভালোবাসতে চায়, বুঝতে চেষ্টা করে।

ভদ্রলোক তাঁর ভাইয়ের মোটরটি ধার নিয়ে আমাদের রেফিউজি ক্যাম্পে নিয়ে চললেন। পথে প্রকাণ্ড একটি বন দেখতে পাওয়া গেলো, তার নাম 'পেতি পারিজিয়াঁ।' প্রায় পাঁচ কিলোমিটার পরে আমরা একটি উঁচু পাহাড়ের মতো জায়গায় এসে পড়লাম। স্থানটির মাঝখানে চারদিকে সুন্দর বাগান দিয়ে ঘেরা একটি প্রকাণ্ড প্রাসাদ দেখা গেলো, আমাদের পথপ্রদর্শক ভদ্রলোক বললেন, এইখানে রেফিউজিরা থাকে। আমরা ভিতরে যেতেই একদল ছোট ছেলেমেয়ে এসে আমাদের ঘিরে ধরল। এর মধ্যে আমি যে বিশেষ আলোচনার বস্তু হয়ে পড়েছি তা বুঝলাম আমার ওপর তাদের ঘনঘন দৃষ্টিপাতে ও নিজেদের মধ্যে তর্কাতর্কিতে। আমি ভারতীয় জানিয়ে তাদের সন্দেহভঞ্জন করে দিলাম। বয়সে একটু বড় কয়েকটি ছেলেমেয়ে ভাঙা-ভাঙা ফরাসীতে বললে, 'তুমি তো আমাদের জাতভাই।' আমি তো অবাক! ছেলেমেয়েগুলি বললে, তারা জিপ্‌সি (বেদে), স্প্যানিস ভাষায় বলে 'খিতানো।' এদের নাচগান স্পেনে সবাই খুব তারিফ করে থাকে। এখন আমি কেমন করে তাদের জাতভাই হলাম জিজ্ঞাসা করায় তারা বলল, তাদের পূর্বপুরুষরা ভারত থেকে স্পেনে এসেছিল। এর মধ্যে ঐতিহাসিক সত্য আমরা ভাবতেই পারি না। তবে এটা ঠিক, শুধু এরা বলে নয়, গোটা স্প্যানিস জাতটার সঙ্গে আমাদের বহু মিল আছে। এদের সংগীতে একটি সুরের নাম "হিন্দুস্থান' —শুনতে অবিকল আমাদের ভৈরবী সুরের মতো। তাদের মতে এ

সুরটিরও আগমন ভারত থেকে। এই ক্যাম্পে দুই থেকে পনেরো বছর বয়সের দু'শো জন ছেলেমেয়ে রয়েছে। একজন প্রৌঢ়া স্প্যানিস নার্স এদের দেখাশুনা করেন। ছেলেমেয়েদের সকলের পরনে জীর্ণ পুরাতন পোশাক। একেবারে শিশুরা কটিবস্ত্র-খণ্ডমাত্র সম্বল করে আছে। এই সব ছেলেমেয়ের বাপ-মা ভাই-বোনরা কোথায় ছড়িয়ে আছে তার ঠিক নেই। তারা বেঁচে আছে কি-না বা আবার তাদের সঙ্গে দেখা হবে কি-না তারও ঠিক নেই।

একটি দু'বছর বয়েসের ছোট মেয়েকে দেখলাম সকলের কোলে ঘুরে বেড়াচ্ছে। শুনলাম, বার্সিলোনায় যখন বোমা বর্ষণ হচ্ছিল তখন একদল রেফিউজি পালাবার সময় কান্নার শব্দ শুনে দেখে—এই মেয়েটিকে বুকে আঁকড়ে একটি মুণ্ডহীন মায়ের দেহ পড়ে রয়েছে। শবদেহটি তখনও উষ্ণ ছিল, হাতের স্নেহবন্ধন তখনও শিথিল হয়নি। আশ্চর্য! এই মেয়েটির গায়ে কিন্তু একটুও আঁচড় লাগেনি। মা তার দেহ আড়াল করে সন্তানকে শেষবার রক্ষা করে গিয়েছে। এদের দুঃখের তীব্রতা কান্নাকে অতি সামান্য তুচ্ছ করে দিয়েছে, চোখের জলকে শুকিয়ে শেষ করে দিয়েছে। হয়ত তাই ছোট মেয়েটি আর কাঁদে না। স্পেনের রাজনৈতিক বিপর্যয় শিশুটিকে পর্যন্ত তার অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করে দিয়েছে। সৈন্যদের চেয়েও যেন তারা বেশী শৃঙ্খলাবদ্ধ ও নিয়মতান্ত্রিক হয়ে পড়েছে। তারা প্রত্যেকেই একটা না একটা কাজ করতে ব্যস্ত এবং ব্যগ্র। তারা যেন একটি বিরাট যন্ত্রের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশের সমষ্টি। ওপরের একটি ঘরে হল্যাণ্ডের পতাকা এবং তার তলায় একটি ফুলের তোড়া সযত্নে কে রেখে দিয়েছে। কৌতূহল হলো জানতে—কি ব্যাপার! জিজ্ঞাসা করতে নার্স মহিলাটি বললেন, 'এ প্রাসাদটি এক রাজকুমারীর। তিনি রেফিউজি ছেলেমেয়েদের এখানে থাকবার অনুমতি দিয়েছেন এবং ডাচ গভরমেণ্ট এদের খাওয়া ও অন্যান্য খরচের জন্য টাকা দিচ্ছেন। তাই ছেলেমেয়েরা ডাচ জাতীয় পতাকাকে সম্মান দেখিয়ে তাদের কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছে।' অনেক ঘরের দেওয়ালে ছেলেরা কাগজে রঙিন পেন্সিলে আঁকা ডাচ পতাকা টাঙিয়ে তলায় লিখেছে, ডাচ জাতি দীর্ঘজীবী হোক, ঈশ্বর তাদের মঙ্গল করুন, ইত্যাদি। মহিলাটি আরও বললেন, "ফরাসী গভরমেণ্ট আমাদের ফ্রান্সে প্রবেশের অনুমতিটুকু দিয়ে জগতে মানবতার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ যশোলাভ করেছেন। কিন্তু আমাদের প্রধান সমস্যা—আশ্রয় ও আহার, তাঁদের কাছে পেলাম না। অন্যে সে ব্যবস্থা করছে এও বোধহয় তাঁদের সহ্য হচ্ছে না, তাই দু'বেলা স্থানীয় পুলিশের লোক এসে শিশু-গুলিকে এখান থেকে চলে যাবার তাগিদের হুমকি দেখায়।"

আশ্চর্য হলাম! সংস্কৃতি ও সভ্যতায় এত বড় ফরাসী জাতির এই অমানুষী ক্ষুদ্রতা ও নিষ্ঠুরতা দেখে। আমরা আসায়, ছেলেমেয়েরা তাদের নৈমিত্তিক কাজ থেকে একঘণ্টা ছুটি পেল। আমায় তারা ধরল ভারতীয় গান শোনাতে হবে। বললাম, 'গাইতে পারি না।' তখন তারা বলল, 'একটা কবিতা বলো।' অনেক ভেবে

রবীন্দ্রনাথের "তুমি নব নব রূপে এস প্রাণে" কবিতাটি আবৃত্তি করলাম। ওদের ভাষাতেও "গানে, প্রাণে"-র মতো শেষে স্বরবর্ণের লম্বা টান থাকায় ওদের কবিতাটি বোধহয় বেশ ভালো লেগেছিল। কারণ ওরা অনেকেই এই কথাগুলি অনুকরণ করে পরস্পর বলাবলি করছিল —কথাগুলি ভাই কি সুন্দর! তারপর আমাদের খুশী করতে ওরা নাচলে, গাইলে, আবৃত্তি করলে। কেন জানি না, আমার বন্ধুর চেয়ে আমার সঙ্গে ওরা বেশী আপনার জনের মতো ব্যবহার করছিল। নানা কথার ফাঁকে নার্স বললেন, 'মনে করো না, আমরা এই ছেলেমেয়েগুলির শুধু প্রাণটুকু বাঁচিয়ে রাখার প্রত্যাশী মাত্র। এদের আমরা এমন শিক্ষা দিয়ে মানুষ করে তুলব যাতে এরা বড হয়ে এদের বাপ মা ভাই বোনদের প্রতি, দেশের প্রতি অন্যায়ের প্রতিশোধ নেয় এবং রিপাব্লিককে ফের ফিরিয়ে নিয়ে আসে। এরা এখন স্পেনকে আবার নতুন করে গডবে, নিজেরা কাটাকাটি করে স্প্যানিস জাত যে কালি নিজ অঙ্গে মেখেছে সে কালিমা ও গ্লানির তিলমাত্র তার মধ্যে থাকবে না।'

সে দিনের সেই পবিচয়টুকু ওখানেই শেষ করে ফেলতে কুণ্ঠিত হয়েছিলাম। পরে বহুবার ওখানে যাতায়াত সূত্রে হৃদয় এক মমতার বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে গিয়েছিল। ছেলেমেয়েরা ইতিমধ্যে স্তেনর (মহাশয়) পর্যায় ছেড়ে আমাকে তাদের এর্য়ারমানোর (ভাই) পর্যায়ভুক্ত করে নিয়েছিল। কয়েকটা মাস আপ্রাণ চেষ্টার পর ফরাসী ও স্পেন গভরমেণ্ট থেকে ছেলেমেয়েগুলিকে তাদের স্বদেশে পাঠাবার ব্যবস্থা করা হলো। যে দিন তারা চলে গেলো, সকলেই ছলছল চোখে বললে, "আদেয়স্ এর্য়ারমানো কর (বিদায়, ভাই কর)।" একটি ছোট মেয়ে দুটি হাত ধরে আধ-আধ কথায় বললে, "এস্পেরো কে ভোল্ভেরা প্রোন্তো, (আশা করি যে, শীঘ্র তুমি আবার আসবে) —আস্তা লা ভিস্তা, (বিদায়, যে পর্যন্ত আবার দেখা না হচ্ছে)।"

অদৃষ্ট হয়ত অলক্ষ্যে হাসল।

* * *

প্যাভিয়ঁ ব্লো-র ক্যাম্পে ছিল মাদ্রিদ ও বার্সিলোনা শহরের অপেরা ও সংগীতালয়ের কয়েক জন সুর-সঙ্গতকারীরা। এদের প্রযোজনায় ক্যাম্পের কিশোর ও কিশোরীদের নিয়ে তৈরী হয়েছিল স্পেনের পল্লীনৃত্য-সংগীতের একটি দল। তারা জুনেস দাস্প্যান নাম দিয়ে ফ্রান্সের শহরে গ্রামে নেচে গেয়ে ক্যাম্পের অন্তর্ভুক্ত রেফিউজিদের অন্নবস্ত্র সংস্থানের কিছুটা ব্যবস্থা করতে পেরেছিল।

ম্যাজেভিয়েস্কী ও আমি রেফিউজি-রিলিফ ভলেন্টিয়ারদের দলভুক্ত হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরে এদের খাদ্য বস্ত্রাদির ব্যবস্থার চেষ্টা করতাম। ক্যাম্পে এতগুলি মেয়েদের সমাগম ম্যাজেভিয়েস্কীর ক্যামেরাকে ব্যস্ত রাখত। আমি আমার সাধ্যমতো প্লাম, আপেল বা পেয়ারা কিনে থলে ভরে যেতাম ক্যাম্পে এবং এই ফলের অংশ প্রত্যেক ক্যাম্পবাসীর হাতে কিছু-না-কিছু পড়ত। ম্যাজেভিয়েস্কী নজরে-পড়া কোনো মেয়ের

পক্ষপাতিত্ব করে আনতেন রঙিন রুমাল, আতর এবং এর ফলে আর সকলে ঈর্ষান্বিতা হয়ে বেশ বিরূপ হতো। এই সব মেয়েরা একে একে ম্যাজেভিয়েস্কীর দেওয়া জিনিস দু'একবার গ্রহণ করার পর অপরের বিরক্তিভাজন হবার ভয়ে, তারা যে তাঁর অনুরাগী নয়, তাই স্পষ্টভাবে দেখাতে তাঁর প্রতি তাচ্ছিল্য প্রদর্শন করত।

ভলেন্‌টিয়ারদের মধ্যে আর কেউ এই রকম বিশিষ্টভাবে একজনকে বন্ধুত্ব বা স্নেহের ভাগ দিয়ে অন্যদের ঈর্ষান্বিত করে তোলেনি। আমরা ক্যাম্পে পৌঁছালেই, ছেলেমেয়েদের মধ্যে হৈ-চৈ পড়ে যেত। তারা সব আমাদের ঘিরে গলা কাঁধ ধরে ঝুলে চিৎকার করত, 'ওরে, এরা সব এসে গেছে।' তারপর হাত পেতে বসে যেত, যা এনেছি তা পাবার প্রত্যাশী হয়ে।

একদিন ম্যাজেভিযেস্কী আমাদেব একলা পেয়ে বললেন, "জানি না, তোমরা কি যাদুতে এদের সব বশ করে ফেলেছ—আমাকে শিখিয়ে দাও। সকলেই তোমাদের অনুগত থাক, আমি চাই কেবল একজনেরই বন্ধুত্ব বা স্নেহ।" আমরা তাঁকে বলে বোঝাতে পারলাম না যে, তাঁর দৃষ্টি নিয়ে আমরা কোনোদিন চাইনি এই রেফিউজিদেব প্রতি স্নেহ বা ভালোবাসার প্রতিদান। ঘটনাচক্রে হতভাগ্য এদের হৃদয়কে ভাগবাটরা করবার প্রবৃত্তি দেখানো অত্যন্ত অস্বাভাবিক ও অশোভন।

রেফিউজি ক্যাম্পের বাইরে একটি জিপ্‌সির দল ক্যারাভ্যান নিয়ে যুদ্ধ-ক্ষুব্ধ স্পেন থেকে পালিয়ে আড্ডা নিয়েছিল। তারা রেফিউজি বলে নিজেদের গণ্য করেনি এবং তা কাউকে ভাবতেও দেয়নি। তারা স্প্যানিশ জিপ্‌সি হলেও ক্যারাভ্যানই ছিল তাদের প্রকৃত দেশ। স্থায়ী বাসিন্দাদের রাজনৈতিক কোনো ব্যাপারে তাদের আকর্ষণ ছিল না, কারণ তাদের জীবনে গণতন্ত্র ইত্যাদি রাষ্ট্রীয় সত্তার কোনো অর্থই নেই। শ্রেণীগত একটা নীতি ও আচারের খসড়াকে অবলম্বন করে চলে যায় জিপ্‌সি-দের সমাজ ও জীবন। এদের কিশোরী যুবতীরা পথচারীদের হাত দেখে ভাগ্য-গণনা করে বা নাচ দেখিয়ে, গান গেয়ে রোজগারের উপায় দেখে। যুবকেরা কাফের সামনে বাজনা বাজিয়ে বা সামাজিক সম্মেলনে মেয়েদের নাচে-গানে সঙ্গত করে পারিশ্রমিক পাবার চেষ্টা করে। উপায়ান্তরে হয়ে যায় মুটে-মজুর। প্রৌঢ়া বা বৃদ্ধারা ক্যারাভ্যানের দৈনন্দিন গোছগাছ বা রন্ধনে ব্যস্ত থাকে। প্রৌঢ় বা বৃদ্ধরা কেবল খোসগল্প বা ধূমপানে সময় কাটিয়ে দেয়।

পথেঘাটে লোকের অলক্ষ্যে জিনিসপত্র হস্তান্তর করা এদের কাছে চুরি নয়। ভগবানের দেওয়া জিনিস যে নিয়ে নিতে পারে বিনা গোলমালে, সেইটাই হয়ে যায় তার ন্যায্য পাওনা। আমি বহু চেষ্টা করে চুরি করা পাপ এ কথা কোনোমতে তাদের বোঝাতে পারেনি। তারা বলত, 'ও পাপ করে কেবল সমাজের স্থায়ী বাসিন্দারা।'

এদের দলপতি খুয়ান্‌-এর ছিল ক্যারাভ্যানে একাধিপত্য। যুবকদের মধ্যে আংখোলা ছিল সবচেয়ে অলস ও দুর্দান্ত প্রকৃতির। য়োগা জিপ্‌ছিপে ছিল তার

চেহারা এবং একটি চোখ কানা। কিশোর বয়সে কে না-কি তার স্নেহমুগ্ধা মেয়ের মুখের দিকে তাকানোর স্পর্ধা দেখানোতে তার সঙ্গে লড়াই হয়ে যায় এবং এই ভালোবাসার একনিষ্ঠতার পরাকাষ্ঠার প্রতীক রয়ে গেছে প্রতিদ্বন্দ্বীর ছুরির ঘায়ে হারানো একটি চোখ।

খুয়ান্ এবং ক্যারাভ্যানের আর সকলের সঙ্গে আমার খুব ভাব হয়ে গেলো। এরা বলত যদি কোনো দেশকে এদের পিতৃভূমি বলে স্বীকার করতে হয়, তা হলে সে দেশ হবে হিন্দুস্থান। কারণ এদের দৃঢ় বিশ্বাস এইখান থেকেই ঘর-বিবাগী হবার কোনো প্রেরণায় এদের পূর্বপুরুষরা বেরিয়ে পড়েছিলেন দিকে দিকে বাঁধা-ধরা দেশ ও জাতির গণ্ডী-মুক্ত হয়ে বেঁচে থাকতে। তাই কোন সুদূরের বিস্মৃত টানে আমি হয়ে গেলাম তাদের ভাই।

রাতে গলে-ধ্বসে-যাওয়া আলু পেঁয়াজের স্যুপে রুটি ভিজিয়ে নৈশাহার শেষ করে যখন তারা গীটারের তন্ত্রীতে ছোট সুরের গৌরচন্দ্রিকা তুলত —মনে হতো যেন সাহানা, আশাবরী, গান্ধার কি ভৈরবী সুর আত্মপ্রকাশের একটা ইশারা করে পিছিয়ে গেলো; যেন চেনা কোনো অবগুণ্ঠনবতীর কাপড় সরে জানা-মুখের একটা ঝলক অন্তর্হিত হয়ে গেলো আরও বড় ঘোমটার অন্তরালে। আসরের চারপাশে গোল হয়ে বসা দ্রষ্টা ও শ্রোতাদের দল মাঝে মাঝে চেঁচিয়ে ওঠে 'ওলে, ওলে।' হঠাৎ দু' একটি মেয়ে মাঝখানের জমিতে লাফিয়ে পড়ে কোমরে হাত রেখে চরণাঘাতে জাগিয়ে তোলে নৃত্যের ছন্দ। হাততালি আর গীটারের সুর-সঙ্গতে সর্পিণীর মতো দুলতে থাকে তাদের দেহবল্লরী কখনও বা বেগে ঘুরতে ঘুরতে তারা যেন হয়ে যায় ঘূর্ণি বায়ু। উত্তেজিত দ্রষ্টার দল থেকে কেউ কেউ তাদের মধ্যে পড়ে নৃত্যের সেই উদ্দাম তালে মেতে যায়। যখন মনে হয় মেয়েরা নাচের তালে ছিটকে পড়ে যাচ্ছে, সঙ্গী যুবকের অঙ্গ-ভঙ্গিমায় কোন অদৃশ্য অবলম্বন যেন তাদের লুফে ধরে আবার মাটিতে নামিয়ে দাঁড় করিয়ে দিচ্ছে। তাদের গলায় বাঁধা রেশমী রুমালের দোদুল্যমান কোণগুলো আশপাশের নিবু-নিবু অগ্নিকুণ্ডের শিখার মতো আবছা আকাশের গায়ে জ্বলে ওঠে। এ যেন প্রায়-নির্বাপিত বিরাট ইন্ধনে কোনো অদৃশ্য দৈত্য ফুঁ দিয়ে আগুনের ফুলকি ছড়ায় দিকে দিকে।

খুয়ান্ একদিন রহস্য করে বলল, "আমাদের এই ক্যারাভ্যানের অধিনায়কত্ব এই ইণ্ডিও ভাইয়ের হাতে তুলে দিলে বেশ হয়।"

আংখেলো শুনে তার ধারালো ছুরিখানা দু' একবার হাতে শানিয়ে নিয়ে বলল, "এই ক্যাম্পে সেই হবে দলপতি যার এই অধিকার রাখবার মতো হিম্মৎ আছে।"

হেসে বললাম, "ব্যস্ত হতে হবে না আংখেলো, আমি তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে রাজী নই। হাজার চেষ্টা করলেও আমি জিপ্‌সি হতে পারব না। এমন কি, তোমাদের পূর্বপুরুষের দোহাই দিয়েও।"

এক বৃদ্ধা বিদ্রূপ করে আংখেলোকে বলল, 'কি আমার দলপতি রে! কুঁড়ের সর্দার। কেবল বসে বসে আমাদের কষ্টলব্ধ আহার্য ধ্বংস করতে মজবুত। এ পর্যন্ত একদিন এক টুকরো মাংস আনবার মুরোদ হয়নি —পুরো একটা হাঁস বা মুরগী তো দূরের কথা।'

সে উত্তর দিলো, 'দলপতি যদি সাধারণের মতো কাজ করতে থাকে তা হলে অন্যের সঙ্গে দলপতির তফাৎ কোথায়? আর সকলের সঙ্গে সমান কাজ করলে, অন্যে তাকে সমীহ করবে কেন? আমার কোনো মুরোদ নেই বলছ? ইচ্ছে করলে মুরগী বা হাঁস কেন, একটা বড বলদ পর্যন্ত এনে দিতে পারি।'

সে দিন সন্ধ্যায় তাদের ক্যাম্পে একটা হৈ-চৈ ব্যাপার শুরু হলো। কারণ পড়ন্ত বিকেলে আংখেলো এনে হাজির করেছে বিরাট হৃষ্টপুষ্ট একটি গাভী। বয়োজ্যেষ্ঠরা সমস্বরে ভৎর্সনা ও গালিবর্ষণ করছিল। গাভী তো তারা কেটে খেতে পারে না, কোন বুদ্ধিতে এত বড অকেজো জানোয়ার ধরে নিয়ে এসেছে।

আংখেলো তখন সকলের কান ফাটিয়ে বোঝাচ্ছিল, বাজেয়াপ্ত করার সময় তার কি আর দেখবার সময় ছিল সেটা গাভী না বলদ। তারা অনুযোগ করেছিল যে, সে কিছু আনতে পারে না তাই সে প্রমাণ করেছে, তার পক্ষে একটা বড জানোয়ার সকলের অলক্ষ্যে ক্যাম্পে নিয়ে আসা কিছুমাত্র শক্ত নয়। সকলে রায় দিলো, তাকে এখুনি যেখান থেকে গাভীটি এনেছে সেখানে গিয়ে ছেড়ে দিতে হবে। কারণ যদি কোনোক্রমে পুলিশ খোঁজ করে গরুটিকে ক্যাম্পে দেখতে পায় তা হলে চুরির দায়ে হারাবে তাদের সব সম্পত্তি এবং সবাই পচবে জেলে। আংখেলো বলল, 'আর রাস্তায় আমায় মালসমেত ধরলে তারা বুঝি খাতির করে খেতাব দেবে?'

খুয়ান্ বলে উঠল, 'কানা সঙ-এর আর কত বুদ্ধি হবে। মগজে যদি কিছু সার থাকত তা হলে নিজে থেকেই ঠিক করত যে গরুটিকে সোজা নিয়ে যাওয়া উচিত থানায় এবং সেখানে এটা বোঝানো খুব শক্ত হবে না, যে কাদের হারানো গরু থানার জিম্মায় সে পৌঁছে দিচ্ছে। কে জানে গরুর মালিক হয়ত তাকে কিছু বক-শিশও দিয়ে দিতে পারে।' আংখেলোর কোনো আপত্তি টিঁকল না। তাকে যেতেই হলো গরুটিকে নিয়ে নিকটবর্তী থানায়।

* * *

রেফিউজি ক্যাম্পে ভলেন্টিয়ার ছাড়া গ্রামের অনেক মেয়ে পুরুষরা আসত তাদের সাহায্য করতে। একদিন দেখি সম্পূর্ণ অচেনা একটি যুবক ক্যাম্পের মাঠে বসে আর সবাই তাকে একটু বিশেষ সম্মান ও খাতির দেখাচ্ছে।

সকলে তাকে আমার সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিয়ে বলল, 'ইনি সেইনব্ বেলুস। ইণ্টারন্যাশনাল বিগ্রেডে থেকে ফ্যালাঞ্জিস্টদের সঙ্গে লড়াই করেছেন এবং ধরা পড়ে ফ্রাঙ্কোর জেলে মৃত্যুদণ্ডের আসামী হয়ে আট মাস কাটিয়ে কোন অজ্ঞাত কারণে ছাড়া পেয়ে এইখানে পৌঁছেছেন।'

ভদ্রলোক ইংরাজী জানায় আমাদের অসঙ্কোচে কথা বলার সুযোগ হলো। কারণ সেখানে আর কেউ ইংরাজী জানত না বা বুঝত না। তিনি আমাকে প্রশ্ন করলেন, আমি স্পানিশ সরকারের পক্ষাবলম্বী ভলেন্‌টিয়ার কি-না।

বললাম, "না মশাই। আমি রাজনৈতিক পার্টির পক্ষপাতিত্ব দেখাতে এ কাজে নামিনি। দুঃস্থের দুর্গতি কিছুটা লাঘব-প্রচেষ্টা ছাড়া আমার আর কোনো উদ্দেশ্য নেই।"

তিনি জানালেন যে, স্পেনের রিপাব্‌লিকান সরকারের পক্ষ নিয়ে কয়েক জন বন্ধুর সঙ্গে লড়াইয়ে নেমেছিলেন। তাঁদের ধারণায় আদর্শ ও উন্নত একটি রাষ্ট্রের প্রতি বিরাট অন্যায়ের দলনকে প্রতিহত করতে অগ্রসর হওয়া ছিল তাঁদের নৈতিক কর্তব্য। ফ্রাঙ্কোর সৈন্যদের হাতে বন্দী হলে মৃত্যুদণ্ডের আসামী করে তাঁকে আট মাস বন্দী রাখা হয়েছিল। একই দশাগ্রস্ত রিপাব্‌লিকান সৈন্যদলের উচ্চপদস্থ কর্মচারীর অনেকে এই বন্দীশালায় জমা হয়েছিলেন। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে তিনি দেখলেন যে, এক স্বপক্ষের জোর গলায় গুণকীর্তন ছাড়া নৈতিক আদর্শ বলতে তাদের আর কিছু ছিল না। শত্রুপক্ষের কারাধ্যক্ষকে সিগারেট রেশনের ঘুষ দিয়ে তাদের মধ্যে মদ ও অন্যান্য শৌখীন অভিলাষের আমদানী চলত এবং এর জন্য কোনোদিন তাদের বিবেকবুদ্ধিতে লেশমাত্র দ্বিধা বোধ হয়নি। অর্থের বিনিময়ে প্রাণরক্ষার ঘৃণিত উৎকোচ ব্যবস্থায় এই আদর্শবাদী রিপাব্‌লিকানদের যে তৎপরতা দেখা যেত তাতে ইণ্টারন্যাশনাল ব্রিগেডভুক্ত ভলেন্‌টিয়াররা স্তম্ভিত হয়ে অনুশোচনা করতেন —যে কেন তাঁরা এই চরিত্রহীন লোকগুলোকে বাঁচাতে নিজেদের জীবন বিপন্ন করেছেন।

ঐ একই কারাগারে মৃত্যুদণ্ডে দণ্ডিত একটি ষোলো কি সতেরো বছরের ছেলে ছিল। তার কোনো অপরাধ ছিল না। পলায়মান শত্রুদের পিছু ধাওয়া করে তাদের হদিশ না পেয়ে ফ্রাঙ্কোর সৈন্যরা এই ছেলেটিকে ধরে নিয়ে আসে এবং তাকে ধমকায় শত্রুপক্ষের খবর দেবার জন্যে। বেচারী কিছু না জানলেও ধরে নেওয়া হয়েছিল যে, শত্রুপক্ষের সংবাদ সে গোপন করছে। অতএব তাকে দেওয়া হলো মৃত্যুদণ্ড। কারাধ্যক্ষ উপযুক্ত অর্থের উৎকোচ পেলে তাকে ছেড়ে দেবে বলায় ছেলেটির আত্মীয়স্বজন বহু কষ্টে অর্থ সংগ্রহ করে তার কাছে পাঠিয়ে দেয়। কিন্তু তার মৃত্যুদণ্ডের জন্য যে দিন ধার্য ছিল, সেই দিন সকালে বন্দীশালার সামনে তাকে গুলি করে নিধন-কার্য শেষ করা হলো। বেচারী শেষ পর্যন্ত নির্দোষ বলে প্রাণভিক্ষা চেয়ে যখন দেখেছিল, তারা তার অনুনয় শুনবে না তখন সে বেশ সাহসের সঙ্গে সম্মুখীন হয়েছিল বাগিয়ে-ধরা রাইফেলের সম্মুখে। কোন এক পাশবিক আনন্দকে চরিতার্থ করতে সব কয়েদীরা যাতে এই নিষ্ঠুর হত্যাকাণ্ড দেখতে পায়, তার যথাযথ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। ক্ষুব্ধ রুষ্ট এই বেলজিয়ান ভদ্রলোক কারাধ্যক্ষকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'তোমার চাওয়া উৎকোচের অর্থ দিয়েও কেন এই নির্দোষ

তরুণটির প্রাণরক্ষা হলো না। তোমাদের বিবেকে প্রতিশ্রুতির কি কোনো মূল্য নেই এবং অর্থলোলুপতায় মানবধর্মের সবটাই কি তোমরা বিসর্জন দিয়েছ?'

কারাধ্যক্ষ বেশ নির্বিকারভাবে বলল, 'ওকে মুক্তি দিতাম ঠিকই এবং ওর বদলে এক বৃদ্ধ বন্দীকে বধ করার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কিন্তু সে ওর চেয়ে অনেক বেশী অর্থের উৎকোচ আমাদের দিয়েছে, কাজেই কি কারণ দিয়ে তাকে যমালয়ে পাঠাই বলো। ওপর থেকে হুকুম এসেছিল যে ঐ দিন প্রত্যুষে ছ' জন আসামীর জীবনপাত হওয়া চাই এবং সকলে যাতে এই নিধন-কার্য দেখতে পায় তারও নির্দেশ ছিল—এতে রিপাব্লিকান পার্টির পক্ষপাতী লোকেদের মনে ত্রাসের সঞ্চারে তাদের শুধরানোর একটা মোক্ষম চিকিৎসা হয়ে যাবে।'

রিপাব্লিকান সৈন্যদলভুক্ত কয়েদীরা অনেকে তাঁকে এইভাবে কারাধ্যক্ষের সঙ্গে বচসা করতে দেখে বেলজিয়ান ভদ্রলোককে ধরে একপাশে নিয়ে গিয়ে বলল, 'আরে তুমি একটা নিরপরাধ যুবককে মারা হয়েছে বলে এত বিচলিত হচ্ছ কেন? যুদ্ধের সময় এ রকম হত্যাকাণ্ড হওয়া স্বাভাবিক।'

তিনি বললেন, 'যুদ্ধ হচ্ছে বলে উৎকোচ-গ্রহণ, প্রতিশ্রুতি-ভঙ্গ ও নিরপরাধের নিধনকে বিনা আপত্তিতে মেনে নিতে হবে? জানি না, তোমাদের দেশের লোকদের কি করে এমন পাষণ্ডদের প্রতি বিশ্বাস ও সহানুভূতি থাকতে পারে।'

তারা জবাব দিলো, 'তুমি যে দেশ থেকে এসেছ, সেখানের লোকেরা অত্যন্ত জড় ও নির্বিবাদী। তাই তোমরা বিপ্লবের স্বরূপকে ভালো করে জানো না। স্পেনে কোনো কারণকে উপলক্ষ্য করে জীবন দেওয়া বা নেওয়ায় কোনো লজিক দেখাবার প্রয়োজন হয় না। আজ যদি আমরা হতাম বিজেতা আর এরা থাকত আমাদের কয়েদী তা হলে আমরা আরও বেশী করে হত্যার ব্যবস্থা করতাম এবং আরও নৃশংসভাবে—যাতে এদের পক্ষের আর কেউ কোনোদিন মাথা তুলে না দাঁড়াতে পারে।'

এই কথা শুনে তিনি যে আদর্শের প্রেরণায় স্পেনে এসেছিলেন জীবন দিয়ে তার প্রতিষ্ঠা করতে, তা ভেঙে খান্‌খান হয়ে গেলো। তিনি বললেন, "জানো, আজ আমি এই নির্মম সত্য উপলব্ধি করেছি—একটা জাতি যখন অধঃপাতে যায় তখন তার মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বী দলের নামের সঙ্গে যে কোনো উচ্চাদর্শকে জড়িয়ে নিলেও যুযুধান সেই দলগুলির উদ্দেশ্যে কোনো তফাৎ থাকে না। সাধারণ অধঃপতনের মাত্রা তাদের সকলের মধ্যে সমানভাবে দেখা যায়। তাই জানি, রিপাব্লিকান পার্টি বা ফ্রাঙ্কের ফ্যালান্‌জিষ্ট—যারাই স্পেনের নিয়ন্তা হোক, ফল হবে একই। কোন ভাগ্যের জোরে জানি না, আমি ও আমার এগারো জন প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত বন্ধুদের ফ্রাঙ্কোর কবল থেকে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। মিথ্যা আদর্শের মরীচিকায় শুধু শুধু আমাদের জীবনপাত হয়নি বলে আজ আমি নিজেকে মনে করি ধন্য।"

বললাম, "এত সুন্দর নাচে-গানে-ভরা যে জাতির প্রাণ তা কি করে এত কলঙ্ক-

প্রবণ ও নিষ্ঠুর হয়? ইনকুইজিশন থেকে আরম্ভ করে নৃশংসতার প্রবাহ যেন স্পেনে থামতেই চায় না।”

তিনি বললেন, “নিষ্ঠুরতাকে আমি জাতিগত প্রকৃতির একটা অঙ্গ বলে স্বীকার করতে না চাইলেও বাস্তবে বোধহয় সেটা সত্য। সাধারণত অভাবেই স্বভাব নষ্ট হয়ে থাকে। একটা দেশ থেকে অভাব তুলে নাও, উৎপীড়নও উঠে যাবে। আর অভাব তো কেবল মানুষেরই তৈরী না, প্রকৃতিও কোনো কোনো দেশে দানের প্রাচুর্যে অধিবাসীদের জীবনকে ভরিয়ে দেয় সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যে, আবার কোথাও নির্জলা নিষ্ফলা হয়ে সেখানকার বাসিন্দাদের স্বভাবকে করে দেয় রুক্ষ ও নীরস। স্পেনের নাচ গান যদি ভালো করে দেখো শোনো তা হলে বুঝবে তার আপাত আনন্দ-উচ্ছ্বাসের নীচে যেন নিপীড়িতের আর্তনাদ আছড়ে পড়ছে। এ সব দেশে কথার মাত্রায় ঈশ্বরের নাম স্মরণ যখন লোকে করে তাই শুনলেই জাতিগত প্রকৃতির একটা ধাঁচ বুঝতে পারবে। যখন জার্মান বলে ‘মাইন্ গট্’ কি ইংরাজ বলে ‘মাই গড’ সেটা শুনে মনে হয় তারা কোনো বিচারককে সাক্ষী মানছে আর ফরাসীর বলা ‘ম্য দিয়ো’ শুনে অনেক সময়ে ভুল হয়ে যায় যে বলছে, ‘ম্য ভিয়ো’। কিন্তু যখন স্প্যানিয়ার্ডরা বলে ‘মাদ্রে দিয়স্’ তখন ঐ কথাটুকুর টানে মনে হয় তার অন্তরাত্মা চেঁচাচ্ছে ‘হে মাতঃ দেবতা, আমাদের ত্রাণ করো, ত্রাণ করো’। তাই বলি বন্ধু, যদি সাধারণ মানবধর্মের প্রেরণায় আজ তুমি এই রেফিউজিদের ক্লেশ মোচনের প্রচেষ্টায় এদের মধ্যে এসে থাকো, তবে সেই প্রেরণাকে জাজ্বল্যমান করে রেখে দাও। কিন্তু সাবধান, এদের বাক্যজালে জড়িও না নিজেকে —এদের রাজনৈতিক ন্যায় ও অন্যায় বিচারে, সমর্থনে ও তার বাস্তব পরীক্ষায়। অধঃপাতিত জাতির বহু প্রায়শ্চিত্তের পর আসতে পারে হয়ত আবার মানবধর্মে বিশ্বাস এবং সেই জাতিকে বাঁচতে হলে আবার একদিন না একদিন নিতে হবে এরই আশ্রয়। আমরা অপেক্ষা করব সে দিনের জন্য এবং সেই ক্ষণ এলে পরে আমরা উজাড় করে দেবো আমাদের সব কিছু —আমাদের আদর্শকে সফল করতে এবং তার প্রতিষ্ঠার ভিত্তিকে দৃঢ় ও স্থায়ী করতে।”

প্রফেসর ভেল্‌রিক্

আতলিয়েতে শুক্রবার একটি মহাদিন। এই দিন আসেন প্রফেসর ভেল্‌রিক্, সকলের কাজ দেখে সমালোচনা ও মন্তব্য করতে।

সে দিন আমরা জানি, সকাল ঠিক সওয়া ন’টায় দরজাটা খুলবে একটুখানি এবং আওয়াজ আসবে ‘বঁজুর মেদাম্, বঁজুর মেসিয়ে’। বহুবচনে সকলকে প্রভাত-সম্ভাষণ জানিয়ে হঠাৎ তিনি ঢুকে পড়বেন এবং সকলের চোখে পড়বে ব্রাউন টুইডের

স্যুট ও কোটের পরিপাটি সজ্জায় মাঝারি সাইজের একটি লোক—যাঁর কেয়ারি-করা গোঁফদাড়ি, উন্নত নাসা, ললাট ও দুটি জলজ্বলে স্বচ্ছ নীলাভ ধূসর চোখ মিলিয়ে প্রশান্ত একটি মুখ। এই চোখের চাউনিতে দেখা যেত কৌতূহল, উপেক্ষা, জিজ্ঞাসা, সহানুভূতি, বুদ্ধির জৌলুষ আর অপরিমিত স্নেহ। কিন্তু কোনোদিন দেখিনি সেই চোখে রাগের আগুন বা ঘৃণার অঙ্গার।

ফরাসীদের স্বভাবজাত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের দোলানি, বলায় যে ভঙ্গি, প্রফেসর তেলরিক্ সেইভাবে কথা বললেও তাঁর বলার একটা বিশেষত্ব ছিল। মনে হতো তিনি যেন আমাদের আতলিয়েকে করে দিয়েছেন এক রঙ্গমঞ্চ আর সেখানে আমরা এক একটি অভিনেতা নায়কের হাতের একটি ভঙ্গিমায় হয়ে গেছি মূক ও স্তব্ধ।

একজনের-করা মাটির মূর্তির সামনে তিনি যেই দাঁড়ালেন সকলেই অমনি তাঁর চারপাশে ঘিরে দাঁড়াল। শ্রবণোৎসুক সকলের মুখ ফিরল তাঁর দিকে। মডেল থেৃানের দিকে হাত ঘুরিয়ে তিনি বললেন, 'মাদম্যয়জে.ল পোজে. ভু সিল্ ভু প্লে (অনুগ্রহ করে ভঙ্গিতে দাঁড়ান)।' কিন্তু মডেলকে ফের দাঁড়াতে বলার সে কি ভঙ্গিমা। মনে হলো 'গুণো'র ফাউষ্ট অভিনয়ে মেফিষ্টোফেলিস হস্ত সঞ্চালনে আজ্ঞা দিলো নর্তক ও নর্তকীদের নৃত্যরঙ্গে উৎসবারম্ভের। কেবল তফাৎ এই, আজ্ঞাকারীর মেফিষ্টোফেলিসের আদেশের প্রাবল্য থাকলেও ব্যক্তিটি পিশাচপতি নয়। তিনি যেন ক্রাইষ্টের এপসল্স্দের একজন—ধর্মকথার গৌরচন্দ্রিকায় বলছেন সকলকে আসন নিতে। শুনছি তাঁর কথা, 'বাহবা বেশ করেছ। কিন্তু তোমার মূর্তির রঙ ঠিক হয়নি।' ভাস্কর্যের মূর্তির রঙ। শ্বেত পাথরের সাদা, ব্রোঞ্জের কালচে তামা আর মাটির ধোঁয়াটে কালো রঙ, তা তো পরিষ্কার দেখা যায়। কিন্তু প্রফেসার এই এক-রঙা মূর্তিতে দেখাতে বলছেন, ব্লণ্ড ব্রুনেট ও নিগ্রোর অঙ্গ-বর্ণের তারতম্য! বোঝালেন তিনি, এই এক-রঙা মাটি, পাথর বা ধাতুতে ভাস্কর দেখাতে পারে সব রঙ যদি তার মন আর চোখ কেবল গঠনের প্রতি নিবিষ্ট না হয়। মূর্তির গায়ে গঠন-কৌশলে, আলোকের আচ্ছাদনে, শোষণে ও বিচ্ছুরণে, ছায়ার সঙ্গে কানামাছি খেলিয়ে ভাস্কর ধরে ফেলে সব ক'টা রঙ। এই রঙের খেলা দেখাতে জানত গ্রীসের ভাস্কররা। যাদের দেবদেবীরা দৌড়ঝাঁপ করত ব্যায়াম-শালায় বা স্নানাগারে। তাই তাদের করা পাথরের বা ব্রোঞ্জের মূর্তি চোখের সামনে সজীব হয়ে ওঠে। এক-রঙা বস্তুর ওপর চড়ে যায় সুস্থ দেহের রক্তিমা, দুলে ওঠে অঙ্গপ্রত্যঙ্গে জীবনের স্পন্দন। রোমানদের না ছিল উন্মুক্ত ব্যায়ামশালা বা সর্বজনীন স্নানাগার, যেখানে হতে পারত সুগঠিত নগ্নদেহের সমারোহ। তারা তাই এই সজীব নগ্নতার প্রদর্শনীকে মনে করত অশ্লীলতা। তাই তাদের রূপকারদের রচনায় সাহায্যে দাঁড়াত না নগ্ন জীবন্ত মানুষ। গ্রীসীয় ভাস্কর্যের নগ্নমূর্তি সহায়তা করত রোমক ভাস্করদের মূর্তি গঠনে। তাই তারা পেল শুধু পাথর আর ব্রোঞ্জ। উঁবে

গেলো তাদের-করা মূর্তি থেকে জীবন ও সজীব ত্বকের উষ্ণতা। মানুষের আদল নিয়ে দাঁড়িয়ে রইল নীরেট পাথরগুলি ও ধাতুময় অবয়ব।

প্রফেসার ভেলুরিকের প্রশংসায় মন ভরে গেছে গর্বে, প্রাণ ভরেছে সাফল্যে। হঠাৎ বেজে উঠল বেসুর —রঙ তো বেশ, কিন্তু তোমার মূর্তি দাঁড়িয়েছে বেসামাল। নিলেন তিনি একটি ছুরি। তার তীক্ষ্ণ ফলা কেটে চলল মূর্তির মাঝ দিয়ে —যেখানে হওয়া উচিত ছিল সঙ্গতির মধ্যরেখা। কাঁধটি মাপের অধিক হওয়ায় তাঁর হাতের ছুরি কেটে চলল কাঁধ আর হাত। এইভাবে যখন তাঁর বক্তব্য হলো শেষ —পড়ে রইল মূর্তির ছিন্ন অঙ্গাবশেষের স্তূপ আর যে গড়েছিল সেই মূর্তি তার পুঞ্জীভূত হতাশা।

সপ্তাহের পর সপ্তাহ ধরে আমরা মাটি দিয়ে গড়ে চলি, মডেলকে সামনে রেখে মূর্তি। আর যখন সে মূর্তি হয় পরিপূর্ণ, প্রফেসার ভেলুরিক্ এসে প্রথমেই দেন কিছু কৃতিত্বের প্রশংসা এবং পরে অসংখ্য ভ্রান্তির খেদ। মূর্তিকে ভেঙে মাটির স্তূপে পরিণত করে বলতেন তিনি, 'ফের শুরু করো। এর পরে ঠিক মতো গড়তে পারবে।'

মোলায়েম সেই উপদেশ যেন বলির মহিষের গলায় সাদরে ঘি মালিশ। এই-ভাবে ভেঙেছেন তিনি আমার তিন চারটি মূর্তি। এর পরের মূর্তিটি পেল ভুলের দীর্ঘ তালিকার চেয়ে সাফল্যের বহু প্রশস্তি। কিন্তু সেটাও তাঁর আক্রমণ থেকে অব্যাহতি পেল না। খুব রাগ হলো। বলে ফেললাম, "ম্যঁসিয়ো ম্যঁ প্রফেসর, আজকে আপনার আতলিয়েতে বলা-কওয়া শেষ হলে আপনার সঙ্গে দেখা করে ক'টা প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করতে পারি কি?" আমার গলার আওয়াজে হয়ত ছিল খানিকটা রাগ ও ক্ষোভের সুর তাই একটু ইতস্তত করে শান্তস্বরে বললেন, "নিশ্চয়ই।"

সিঁয়াসের শেষে গেলাম তাঁর ঘরে। তিনি সাদরে বললেন, "বসো।"

বললাম, "না, আমার যা বক্তব্য তা দাঁড়িয়েই বলতে চাই। ম্যঁসিয়ো ভেলুরিক্ আপনিও একদিন আমাদের মতো ছাত্র ছিলেন কিন্তু আমি বিশ্বাস করতে পারি না যে, আপনার শিক্ষক আপনার মতো নির্মমভাবে ভাঙতেন তাঁর ছাত্রদের প্রাণভরে গড়া কাজ। তা যদি হতো তা হলে আপনি জানতেন আমাদের নৈরাশ্য ও ক্ষোভ এবং যদিও আমাদের হৃদয় দিয়ে গড়া এই মূর্তিগুলি ভাস্কর্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শন নয় তবুও এগুলিকে ভাঙতে আপনার হাত হয়ত ইতস্তত করত। ভুলভ্রান্তি থাকলেও আমাদের মূর্তিগুলিকে বাঁচিয়ে রাখায় আপনার আপত্তি কিসের?" এক নিশ্বাসে কথাগুলি বলে ফেললাম এবং তাঁর ভর্ৎসনার অপেক্ষমান হয়ে চাইলাম তাঁর দিকে। দেখলাম তিনি হাসছেন। ভাবলাম এ বুঝি বিদ্রূপের হাসি।

হাসি থামিয়ে হঠাৎ গম্ভীর হয়ে তিনি বললেন, "ঠিকই বলেছ, আমার যিনি প্রফেসার ছিলেন তিনি আমার ছাত্রজীবনের কাজগুলিকে এমন করে ভাঙেননি। কিন্তু আমার এমন দুর্ভাগ্য যে তাঁর কাছ থেকে আমি এ অনুগ্রহে বঞ্চিত হয়েছি।

ভাবছ, আমি বাজে বকছি। মনে রেখ, এই প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে জড়িত ফ্রান্সের বিরাট ভাস্কর-রথীরা। বিশ্ববিশ্রুত ভাস্কর রোদ্যাঁর শিষ্য বিখ্যাত বুর্দেল প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এই একাডেমী। সেই বিশ্ববরেণ্য শিল্পী বুর্দেলের ছাত্র আমি, আর তোমরা হচ্ছ আমার ছাত্র। আমার আকাঙ্ক্ষা যে, তোমরা সকলেই হবে বিখ্যাত ও শ্রেষ্ঠ ভাস্কর। কিন্তু বড় হওয়ার দায়িত্ব অনেক। লব্ধপ্রতিষ্ঠ হলেই আর তোমার নিজের বলতে কিছু থাকবে না, গুণমুগ্ধ জনে টেনে আনবে তোমার গোপন ও অগোপনকে। তোমার সাফল্য-ভরা কাজের পাশে দাঁড় করিয়ে দেবে তোমার বাঁচিয়ে-রাখা অপরিণত অসম্পূর্ণ কাজগুলি। তখন তুমি অপ্রস্তুত ও লাঞ্ছিত হবে। তাই আমি তোমার এই ভ্রান্তি-ভরা মূর্তিগুলিকে ভেঙে ভবিষ্যতের লজ্জা থেকে তোমাদের বাঁচিয়ে রাখবার প্রয়াস করছি মাত্র।"

ঘাড় হেঁট করে চলে এলাম আতলিয়েতে, কৌতূহলী সকলের দৃষ্টি আমার প্রতি। কিন্তু তারা কেউ জানল না যে, প্রফেসার ভেল্‌রিক্ ঐ এক কথায় করে দিয়েছেন আমার অভিযোগের চূড়ান্ত নিষ্পত্তি।

প্রফেসার ভেল্‌রিক্, তিনি 'লিজিওঁদোনর' সম্মানে ভূষিত হওয়ায় যে তাঁর চালচলনে একটা সম্ভ্রান্তের বৈশিষ্ট্য এসেছিল, তা নয়। তাঁকে দেখলে বেশ বোঝা যেত যে, তিনি একটা বিশেষ আভিজাত্যের ছাপ নিয়ে জন্মেছিলেন। মডেলকে উদ্দেশ্য করে যখন তিনি কিছু বলতেন, তখন মনে হতো যে তিনি যেন একটা সাধারণ নগ্না নারীকে সম্বোধন করছেন না, মডেল যেন বেদীতে আসীনা দেবী আর তিনি রূপার্চনার পুরোহিত। এ শুধু আতলিয়েতে নয়, কাফেতে বসে থাকা-কালীন তাঁকে কতবার উঠে দাঁড়িয়ে অভিবাদন করতে দেখেছি পথচারিণী কোনো চেনা মডেলকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে।

ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অনেকে তাঁর এই ব্যবহারকে শিষ্টাচারের আধিক্য বলে ঠাট্টা করতে শুনেছি। কিন্তু আমি জানতাম ঐ আদব ছাড়া যে শিষ্টাচার অন্য প্রকার হতে পারে এ জ্ঞান তাঁর ছিল না।

মনে পড়ে, যুদ্ধারম্ভে যখন গিয়েছিলাম তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিতে, তিনি আমার দুটি হাত ধরে আমার চোখের ওপর তাঁর স্থির দৃষ্টি ফেলে সেই অভিনয়ের ভঙ্গিমায় বললেন, "বন্ধু, তুমি নিজের দেশে ফিরছ, তোমাকে এখানে থাকতে বলার দাবি আমার নেই। ফ্রান্স আজ বিপন্না। জানি না, ফ্রান্স এই মহাসংগ্রামের পর বেঁচে থাকবে কি-না। কিন্তু তুমি যেখানেই যাও, নিয়ে যেও সঙ্গে করে ফ্রান্সের খানিকটা প্রতীক। ভুলে যেও না, রোদ্যাঁ ছিলেন এক বিরাট ভাস্কর। তাঁর শিষ্য বুর্দেল ছিলেন তাঁরই সমান মহান্ শিল্পী। আমার ছাত্র হিসাবে তুমি তাঁর প্রশিষ্য। ভুলো না বন্ধু তোমার প্রফেসার ভেল্‌রিক্‌কে, তাঁর গুরু এবং বুর্দেলের শিক্ষক রোদ্যাঁকে। অমর্যাদা করো না আমাদের শিক্ষার ও ফ্রান্সের ঐতিহ্যের। বলো না বিদায় —আমি এখনি উঠে ফিরে দাঁড়াব, তুমি নিঃশব্দে চলে যেও।"

১৯৪৪ সনে অনেক ঘুরে কোনো শিল্পী বন্ধুর পাঠিয়ে দেওয়া ফরাসী সংবাদপত্রের একটি কাটিং হাতে পৌঁছাল। তাতে লেখা ছিল—'যুদ্ধবিধ্বস্ত ফ্রান্সের দুঃখে মর্মাহত ভেল্‌রিক্ অকালে কয়েক দিনের রোগে ইহলোক পরিত্যাগ করেছেন।'

*　　　*　　　*

মার্থের মডেলিং স্ট্যাণ্ড ঠিক আমার পাশেই। পরের শুক্রবার যখন প্রফেসার ভেল্‌রিক্ এলেন এবং তার তৈরী মূর্তির বিশ্লেষণ আরম্ভ করলেন, মার্থ তাঁর হাত থেকে ছুরিটা নিয়ে বললে, 'ম্যঁসিয়ো ভেল্‌রিক্, আপনি মূর্তিটার ভুল বলে যান আর আমি যেখানে যেটা কেটে ফেলা প্রয়োজন তা কাটতে শুরু করি।'

তিনি আঙুল দিয়ে যেমন ভুল দেখাতে লাগলেন মার্থও যেন বেশ তৃপ্তির সঙ্গে মূর্তির সেই অংশগুলিকে কাটতে লাগল এবং প্রফেসারের বলা শেষ হলে যখন পড়ে রইল ভাঙা মূর্তির মাটির স্তূপ—গুলি করে মারা প্রাণদণ্ডিতকে যেমন শেষ গুলির 'কুন্ত গ্রাস' দেওয়া হয় তেমনি ছুরিটা সে সজোরে সে স্তূপে হাতল পর্যন্ত মেরে বসিয়ে আমার দিকে তাকিয়ে হো-হো করে হেসে উঠল।

পৈশাচিক সে হাসি। মনে হলো, সে জেনে ফেলেছিল ম্যঁসিয়ো ভেল্‌রিকের সঙ্গে আমার রাগের অভিনয়টুকু এবং তারই একটা পরিহাস সে এই সুযোগে করে নিল।

সবাই যখন চলে গেছে সে আর আমি একা রয়ে গেছি। মার্থ বলল, "ওহে অভিমানী, মূর্তিটা আমি ঐভাবে কাটলাম তোমাকে আঘাত দিতে নয়, প্রফেসারের যুক্তিটাকে একটু ঘুলিয়ে দিতে।

আমি তার হেঁয়ালি ঠিক বুঝলাম না।

সে আমাকে বলল, "তোমার দগ্ধ মরমের জ্বালাকে যদি শান্ত করতে চাও তো চলো আমার সঙ্গে স্যাল প্লেইয়েল-এ। আমার কাছে দু'খানা বিনি পয়সার টিকিট আছে। চলো, বাখ-এর কোরাল শুনে আসি।"

আমাকে ইতস্তত করতে দেখে বললে, "ও, ভুলে গেছি, তোমাদের সেই পোঁ-ধরা প্রাচ্য সংগীত শুনে অভ্যেস, আমাদের সংগীতের ঝঞ্ঝা-রবে তোমাদের কানের পাতলা পর্দা হয়ত ছিঁড়ে যেতে পারে।"

ভাবলাম স্রষ্টা মার্থের জিবটা ভুলে দিয়েছে। ওটা ওর হাতের ছুরিখানা হলে ঠিক হতো। তার নিমন্ত্রণ না নেওয়ায় আরও অপদস্থ হতে পারি ভেবে বললাম, "না মাদ্‌ম্যয়জেল, আমাদের কানের পর্দাটা পাতলা নয়—মোলায়েম, যার ওপর সুর লুটোপুটি খেতে হোঁচট খেয়ে পড়ে যায় না। তোমাদের কানের পর্দা মনে হয় অনেক গভীর খাদ আর চড়াইয়ে ভরা। সেখানে সুর ছুটোছুটি করে পড়ে খায় আছাড় ডিগবাজী আর করে আর্তনাদ।" হঠাৎ দু'জনেই বুঝলাম এ নিয়ে বেশী বচসা করলে হয়ে যাবে রাগ ও ঝগড়া। কাজেই এইখানেই সন্ধি করে আমরা চললাম স্যাল প্লেইয়েলে।

সিঁড়ি বেয়ে ভেসটিবিউলের মধ্যে দিয়ে চলেছে শ্রাবকের দল, বেশীর ভাগই কালো সান্ধ্যসজ্জায় ফিটফাট। নিজের টুইড জ্যাকেট ও ধূসর ট্রাউজারের দিকে তাকিয়ে প্রায় অপ্রস্তুত মনে করার আগেই মার্থ বললে, "ভয় নেই হে। আমরা বসব গ্যালারিতে। সেখানে টুইড জ্যাকেট কারও আভিজাত্যের স্নায়ুতে ঘা দিয়ে পক্ষাঘাতের সৃষ্টি করবে না।"

স্যাল প্লেইয়েল পারীর সব চেয়ে সেরা সংগীত-ভবন। বিখ্যাত সংগীত-স্বরবিদ হাইডেনের ছাত্র ইগনাৎস জোজেফ প্লেলইয়স ছিলেন অস্ট্রিয়ার এক কম্পোজার। তিনি পারীতে এসে বসবাস করেন এবং বিখ্যাত সংগীতকারদের রচনা ছাপিয়ে ও পিয়ানো বাজানোর শিক্ষকতা করে বেশ সুনাম অর্জন করেছিলেন। আজও তাঁর প্রতিষ্ঠিত পিয়ানো তৈরীর বিপণি পারীতে বর্তমান। তাঁরই নাম বহন করে আসছে এই সুবিখ্যাত সুর-মন্দির যেখানে কত খ্যাতনামা ও সেরা সুরকুশলীদের সংগীত সুরবাদ্যের সঙ্গতে প্রীত ও মুগ্ধ শ্রোতাদের করতালি ধ্বনি এর দেওয়ালগুলিতে আছড়ে শিল্পীপ্রাণে তুলেছে আনন্দের জোয়ার।

সিঁড়ি ভেঙে কয়েক তলা উঠে যখন গ্যালারিতে আমাদের আসন নিয়ে নীচে সংগীত-মঞ্চের দিকে তাকালাম তখন দূরত্বের ব্যবধানে ও পারিপার্শ্বিকে কেবল বাদ্য-করদের টাক-মাথা ও ঝক্‌ঝকে ভায়োলিন, চেলো, ভিয়োলো, ফ্লুট ও ক্লাভি-কর্ড-এর হাইলাইট সবচেয়ে স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। উজ্জ্বল, মসৃণ বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে সামঞ্জস্য রাখতে যেন দেখা যায় বেশীর ভাগই বাদ্যকরদের কেশবিহীন মসৃণ মস্তক। যন্ত্রশিল্পীরা স্ব-স্ব যন্ত্রকে টুং, টাং, পিপ্, পোঁ, ভোঁ প্রভৃতি শব্দে সুরস্থ করছিলেন এবং তার সঙ্গে জনতার গুঞ্জন-ধ্বনি মিশে আসন্ন সংগীত-সম্ভাবনার এক আবেশ চারদিকে ছড়িয়ে দিচ্ছিল।

হঠাৎ রঙ্গমঞ্চে কার আগমনে করতালি বেজে উঠল। আস্তে, আমার কানে কানে মার্থ বলল, উনি হলেন শ্রেফ দ্য অর্কেস্ত্র অর্থাৎ বাদ্যকারদের মুখ্য। তার-পরেই এলেন কন্‌ডাক্টর—বাদ্যবাদনের অধিনায়ক। আবার করতালি-ধ্বনির একটা উচ্ছ্বাস উঠল।

বাদ্যবাদনের অধিনায়ক একবার শ্রোতাদের দিকে ফিরে আবক্ষ মাথা নীচে ঝাঁকিয়ে সকলকে অভিবাদনান্তে ফিরে দাঁড়ালেন মঞ্চের বাদ্যকারদের দিকে। তাঁর হাত দু'খানা উঁচু হতেই সমস্ত হলটা মুহূর্তে নিস্তব্ধ হয়ে গেলো এবং তাঁর মৃদু হস্তসঞ্চালনের সঙ্গে সঙ্গে কোথা হতে যেন ধীরে ভেসে এল সংগীতের ঝর্ণাধারা।

প্রথমার্ধের প্রোগ্রামে ছিল বাথ-এর ফিউগ রচনা।

কনট্রাপানটিভ বাদ্য-সংগীতকে ভালো করে বুঝে উপভোগ করতে গেলে কিছুকাল এই ধরনের রচনা শুনে শুনে কানকে অভ্যস্ত করা প্রয়োজন। অনভ্যস্ত আমার পক্ষে এই প্রথম ফিউগ রচনা কানের সঙ্গে লাগালো বিবাদ। মনে হলো বহুবিধ যন্ত্রের বেখাপ্পা আওয়াজ অযথা দৌড়-ঝাঁপ করে একটা সুরের হট্টগোল লাগিয়েছে। অথচ

মনে মাঝে মাঝে এই শব্দের জঙ্গল বদলে হয়ে যাচ্ছিল সাজানো সুরের উত্থান। প্রথমার্ধের প্রোগ্রামান্তে বিরাম শুরু হলে মার্থ জিজ্ঞাসা করলে, "কি হে এ মিউজিক সহ্য হচ্ছে, না কানে চোট লেগে আহত হলে ?"

সত্যি না বলে উত্তর দিলাম, "না, না, আমার খুব ভালো লাগছে।"

কিন্তু মার্থকে সত্য বা মিথ্যে কোনোটা বলে রক্ষা পাওয়া মুস্কিল।

সে বললে, "কি ভালো লাগল, কেন ভালো লাগল বলো।"

বলতে হলো মামুলি কথা, "চিনি খেয়ে মিষ্টি লাগলে ভাষায় কি বোঝাতে পারা যায় মিষ্টি লাগা কি ?"

কিন্তু তাকে কি অত সহজে নিরস্ত করা যায় ?

তার জবাব এল, "বেশ তো, মিষ্টি না হয় নাই বোঝাতে পারলে কিন্তু চিনি কি বস্তু, তার রঙ কেমন, চেহারা কেমন, সেটা তো বলতে পার।"

বললাম, "কনসার্ট শেষ হলে বলব, আমার বাখ কেমন লাগল।"

অপরার্ধের প্রোগ্রামে ছিল বাখ-এর প্রসিদ্ধ ব্রাণ্ডেনবার্গ কন্‌চারতোর একটি রচনা।

এইবার এই সংগীত-ধারায় বেজে উঠল আমার কানে অশ্রুতপূর্ব এক অপূর্ব সুরের ছন্দ। ভায়োলিন সুরের পদগুলিকে যেন জমাট জিনিসের মতো একের ওপরে অন্যকে সাজিয়ে তৈরি করতে লাগল সংগীতের ইমারত এবং সুরের সোপান বেয়ে অনায়াসে সেই ইমারতের ওপরতলা ও নীচতলায় কান আনাগোনা করতে লাগল।

প্রোগ্রাম শেষ হলে উত্তেজিত করতালির ফলে গরম আরক্ত হাতে মার্থের কর-মর্দনে বিদায় নিলাম এবং তাকে বললাম, "জানতে চেয়েছিলে বাখ শুনে কি রকম লাগল ? তোমার বাখ সুরের স্তবকের ওপর স্তবক দিয়ে গড়েছিলেন তাঁর সুর মন্দির আর আমি আমার সবখানি দিয়ে যেন সেই মন্দিরের সব ক'টি ধাপে চড়ে নৃত্য করে এলাম।"

সে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, "তোমাদের সুর-বোধ সম্বন্ধে যে ব্যঙ্গোক্তি করেছিলাম তার জন্যে ক্ষমা চাচ্ছি। তুমি নিশ্চয়ই বাখ আগে শুনেছিলে এবং তাঁর সংগীত সম্বন্ধে বেশ কিছু জানো।"

বললাম, "না মাদ্‌ময়াজেল, বাখ-এর সঙ্গে পরিচয় এই প্রথম। তাঁর সম্বন্ধে জানবার যথেষ্ট আগ্রহ আছে। কোনোদিন সময় করে যদি বলো, তা হলে বিশেষ কৃতজ্ঞতার সঙ্গে শুনব।"

বাখ-এর সুরসংগীত ও মার্থ

একদিন দুপুরবেলা একাদেমীর কাজ শেষ করে আমি ও মার্থ গিয়ে বসলাম লুক্-সাম্বুর উদ্যানে। সেখানে যাবার পথে ন' ইঞ্চি 'তারতিন' রুটির মাঝখানে হ্যাম্-ভরা বড় স্যাণ্ডুইচ কিনে নিয়েছিলাম মধ্যাহ্ন ভোজনের জন্যে। আমি স্যাণ্ডুইচ খেয়ে যাচ্ছি আর মার্থ বলে চলেছে বাখ-এর কথা।

"সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইয়োরোপের সংগীত-নায়ক বাখ-এর জীবন-চরিত উপন্যাসের মতো অসামান্য বা চমক-দেওয়া কোনো ঘটনাপূর্ণ ছিল না। বাখ-এর পাঁচ পুরুষ চর্চা করে গিয়েছিলেন সংগীত।

"ছোটবেলায় বাপ-মা হারিয়ে অষ্টম সন্তান জোহান সেবাস্তিয়ান বাখ, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জোয়ান ক্রিষ্টফ এর কাছে মানুষ হয়েছিলেন এবং তাঁরই কাছে হয়েছিল তাঁর সংগীতের বর্ণপরিচয় শিক্ষা। সংগীতশিক্ষায় অদম্য অনুরাগ শুরু হয়েছিল তাঁর শৈশব থেকেই। যেখান থেকে সম্ভব তিনি সংগ্রহ করতেন সংগীতের স্বরলিপি। তাঁর ভ্রাতার সযত্নে তালাবদ্ধ সংগীতের স্বরলিপি, তিনি রাত্তিরে কৌশলে চাবি খুলে নকল করে আবার সকলের অগোচরে কাবার্ডে যেমন রাখা থাকত তেমনি রেখে দিতেন এবং বহু মাসের অধ্যবসায় সহকারে সেই স্বরলিপির সবটাই গুপ্তভাবে নকল করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

"তখনকার দিনে প্রসিদ্ধ সংগীত-নায়কদের বাদ্যবাদন শুনবার জন্য তিনি পদ-ব্রজে চলে যেতেন বহু ক্রোশ দূরের শহরে ও গ্রামে। একবার হ্যাম্বুর্গে বিখ্যাত সুরশিল্পী রেইন্‌কেন সেণ্ট ক্যাথারিন গীর্জায় অর্গান বাজাচ্ছেন শুনে তিনি পদব্রজে চলে গেলেন তিরিশ মাইল অতিক্রম করে সেখানে। পথে ক্ষুধায় কাতর হয়ে তিনি এক হোটেলের সামনে বিশ্রাম করতে বসলেন। হঠাৎ ওপরের এক জানালা খুলে হয়ত তাঁকে ক্ষুধার্ত দেখে, কে ফেলে দিলো তাঁর সামনে দুটি মাছের মুড়ো। নিরভিমানী বাখ মুড়ো দুটো কুড়িয়ে নিয়ে খেতে গিয়ে বিস্ময়ে আবিষ্কার করলেন যে, প্রতিটি মুড়োর মধ্যে আছে একটি করে স্বর্ণমুদ্রা।

"বাখ-এর সংগীত-জীবন শুরু হয় গীর্জার কোয়ার গীতকারী কিশোরদের একজন গায়ক হিসাবে। তাই তাঁর রচিত গীর্জার হিম্‌টিউন-ভরা কোরাল 'পারতিতা'তে যে স্তোত্র গীতের পবিত্রতা ও মূর্চ্ছনা অনুভব করা যায় তা অন্য কোনো সংগীত-রচয়িতার রচনায় উপলব্ধি করা যায় না। পরে কৈশোর শেষে যৌবনের প্রারম্ভে যখন বাখ-এর কণ্ঠস্বরের পরিবর্তন হলো তখন তাঁকে কোয়ার ছেড়ে খুঁজতে হলো অন্যপথ। তখনকার যুগে ইয়োরোপে ছোট বড় ডিউক ও প্রিন্সের ছড়াছড়ি। তাঁদের দরবারে তাঁদের খেয়াল চরিতার্থ করতে নিযুক্ত হতো কবি, সাহিত্যিক, নাট্যকার ও সংগীত-রচয়িতার দল। বাখও ভাগ্যক্রমে নিযুক্ত হলেন 'ভেইমারের'

একটি গীর্জার অর্গানিষ্ট ও কোয়ার-মাষ্টার। বাথ-এর অর্গানের প্রতি একটি স্বভাবজাত আকর্ষণ ছিল। কান্‌তাতা তোকাতা ও ফিউগ ধরনের প্রায় তিনশত যে রচনা জগৎকে তিনি দিয়েছেন, তার শুরু ঐ গীর্জার অর্গানের সুযোগ পাওয়া থেকেই।

"তখনকার দিনের শাসকদের সমাজে দরবারী কবি, সংগীতজ্ঞের সম্মান বাটলার ও সহিসদের সমান ছিল। তাঁদেরও পরতে হতো চাকরের উর্দি। স্বাধীনচেতা বাথ তাদের এই বিনয়হীনতা ও ধৃষ্টতায় অনেক মনোকষ্ট পেয়েছিলেন। তিনি ক্রমে ভেইমার ছেড়ে ক্যাৎন্‌-এর শাসকদের দরবারে হাজির হন। এইখানে অবস্থানকালে বাথ রচনা করেন কয়েকটি অপূর্ব অর্কেষ্ট্রাল সংগীত ও ভায়োলিন কন্‌চার্‌তো।

"বাথ-এর চিরকালের অভ্যাস নানা শহরে গ্রামে সংগীতবেত্তা ও সংগীত রচয়িতার সন্ধানে ভ্রমণ। এমনি এক যাত্রার পথে পরিচয় হলো ব্রাণ্ডেনবার্গের সংগীত-রসিক প্রিন্স মার্কগ্রাফ-এর সঙ্গে। তিনি বহু সুর-সংগীত রচয়িতাকে তাঁর জন্যে নতুন সংগীত রচনার অনুজ্ঞা দিতেন এবং বাথ পেলেন তাঁর জন্যে কন্‌চারতো রচনার আমন্ত্রণ। তিনি প্রিন্সের জন্য যে ছয়টি কন্‌চারতো রচনা করে তাঁকে অতি বিনয় সহকারে উৎসর্গ করে পাঠিয়েছিলেন 'সেগুলিই আজ বিখ্যাত ব্রাণ্ডেনবার্গ কন্‌চার্‌তো নামে সংগীতবেত্তাদের মহলে অতি পরিচিত।

"প্রিন্স মার্কগ্রাফ বাথ-এর অমর রচনার জন্য কি পুরস্কার দিয়েছিলেন তা জানা নেই, কিন্তু প্রিন্সের মৃত্যুর পর তাঁর সংগ্রহের তালিকা যখন করা হয় তখন তাঁর নাম পর্যন্ত উল্লেখ না থাকায় বাথ-এর অমূল্য রচনার স্বরলিপি অন্যান্য রচনার সঙ্গে একজোট করে তার এক একটির যে মূল্য ধার্য করা হয় সেটা আট ফ্রাঙ্কেরও কম (পাঁচ আনা)। কাল তো শুনলে ঐ ব্রাণ্ডেনবার্গ কন্‌চারতোর একটি। সমস্ত অর্কেষ্ট্রা যেন সুরের এক বন্যাউদ্যান রচনা করল। যার শত শত প্রস্ফুটিত ফুলে ভায়োলিন যেন প্রজাপতির মতো উড়ে উড়ে সেই ফুলগুলি থেকে মধু আহরণ করে আমাদের কর্ণকুহর অমৃতে ভরে দিলো। অর্কেষ্ট্রার হৃদয় কোন যন্ত্র দিয়ে তৈরী জানো?"

আমি 'না' বলায়, মার্থ বলল, "ভায়োলিন। এই যন্ত্র যেমন করে আমাদের অন্তরে ভাবের বন্যা বইয়ে দিতে পারে এবং এমন অন্তরঙ্গ কথা জানাতে পারে তেমন আর কোনো যন্ত্রের দ্বারা সম্ভব হয় না।"

বললাম, "মার্থ, আতলিয়েতে আরও তো অনেকে সংগীত সম্বন্ধে আলোচনা করে, কনসার্ট শুনতে যায় কিন্তু তারা তো তোমার মতো এমন সুর-পাগল নয়। তুমি কোথা থেকে পেলে এই সুরের নেশা?"

সে চোখ দুটো বুঁজিয়ে চুপ করে রইল এবং খানিকক্ষণ পরে বলতে শুরু করল ধীরে ধীরে—যেন হঠাৎ সময়ের পুকুরে ডুব দিয়ে উঠিয়ে নিয়ে এল কত দিনের তলিয়ে যাওয়া হারানো জিনিস।

"আমি যখন খুব ছোট, আমরা থাকতাম একটা ছোট রেল স্টেশনের কটেজে।

আমার পিতা ছিলেন সেই স্টেশনের সিগ্‌নালার। সারাদিন ও সন্ধ্যের কাজের পর আর সকলে যখন ডিনার শেষে কাফেতে গিয়ে তাস দাবা খেলত, আমার পিতা তখন খাবার পরে বের করতেন তাঁর বহু পুরনো সঙ্গী একটি ভায়োলিন। তাঁর বাজনা ছিল একঘেয়ে কতকগুলো গ্রাম্য সুর কিন্তু আমার মনে হতো সেগুলি যেন তাঁর সারা দিনের ক্লান্তিভরা কাজে যে পুঞ্জীভূত বেদনা তারই কথা বলত বিনিয়ে বিনিয়ে। একদিন আমার পিতা অনেক রাত পর্যন্ত ফেরেননি। গভীর রাতে কয়েক জন স্টেশনের কর্মচারী বসবার ঘরে উৎকণ্ঠিতা প্রতীক্ষমানা মাকে এসে কি বলল, তখনি একটা বুকভাঙা আর্তনাদ শুনলাম। মনে হলো, সেটা যেন আমার মায়ের গলার আওয়াজ নয়, ঐ কোণে-রাখা ভায়োলিনটা কেসের মধ্যে থেকে চিরে বের করল ঐ শব্দটা! কাজের শেষে আমার ক্লান্ত পিতা লাইন পেরিয়ে বাড়ি আসতে লক্ষ্য করেননি আগত ট্রেন। বোধহয় জানতেও পারেননি, তাঁর শরীরটা কখন দু'ভাগে কেটে গেলো। তারপর যেমন ভোরের জমাট কুয়াশাখণ্ডের মধ্যে পড়লে হাতড়াতে হাতড়াতে তার বাইরে এসে নজরে পড়ে চেনা পথ ও পরিচিত নিশানা, তেমনি বিগতের সৎকার ও তার গণ্ডগোল কেটে গেলে আমার চোখ পড়ল ঐ ভায়োলিন-কেসটার ওপর। কেসটা খুলে বের করলাম ভায়োলিনখানা, ছড়ি দিয়ে দিলাম কয়েকটি টান তারগুলির ওপর কিন্তু বেরুল একটা খস্‌খসে বিকৃত আওয়াজ —যেন আমার পিতার ভৎর্সনা। তারপর বহু আয়াসে গ্রামের শিক্ষকের কাছে হাতেখড়ি করে ক্রমে শিখলাম ভায়োলিন থেকে সঠিক সুর বাজাতে। পারীতে যখন মা এল কাজের খোঁজে এবং হলো কঁ্যাসিয়ারজ,আমি অনেক অনুরোধে মাকে রাজী করিয়ে ভর্তি হলাম কন্‌জারভেতোয়রে। আমার পিতা চলে গেছেন কিন্তু যখনি বাজাই ভায়োলিনটা, মনে হয় যেন আমার পিতার হৃদয় আমার হৃদয়ে এসে মিশে গেছে। আমার মা-ও স্তব্ধ হয়ে শোনে। সেও বোধহয় ঐ ভায়োলিনের সুরের পথ ধরে চলে যায় আমার পিতার সান্নিধ্যে।"

বললাম, "মার্থ, যদি ধৃষ্টতা না মনে করো তোমায় অনুরোধ করতে পারি কি যে, একদিন তোমার ভায়োলিন বাজনা শুনতে দেবে?"

সে হঠাৎ উঠে পড়ে বলল, "চলো আতলিয়েতে ফিরবার সময় অনেক ক্ষণ হয়ে গিয়েছে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "সে আমার প্রশ্নে রাগ করেছে কি-না।"

উত্তর এল, "না রাগ করিনি। আমি ভায়োলিন বাজানো অনেক বছর হলো ছেড়ে দিয়েছি।"

কারণ জানতে চাইলে সে বলল, "গাব্রিয়েল আমার ভায়োলিনটাকে দেখতে পারত না। শেষে দাঁড়াল —হয় ভায়োলিন, নয় তাকে ছাড়তে হয়। তাই দিলাম ভায়োলিনকে ছেড়ে।" তার কথা এক বিরাট হেঁয়ালি হয়ে দাঁড়াল কিন্তু আর প্রশ্ন করলে সে রুষ্ট হবে ভেবে আর কিছু জানবার চেষ্টা করলাম না।

এরপর একদিন আমরা পরস্পরকে স্তেন নদীর ধারে বেড়াবার আমন্ত্রণ করলাম। নদীর দু'ধারে উঁচু পাথরের বাঁধের ওপর চলে গেছে ছোট ছোট টিনের বাক্সের সারি। তার মধ্যে আছে পুরনো, নতুন, খ্যাত কিংবা দুর্লভ বই, ছবি, প্রিন্ট, সুরকারদের স্বরলিপি, পুরাতন ঐতিহাসিক মুদ্রা, অস্ত্রশস্ত্র, পোর্সেলিনের প্লেট ও ফুলদানী, ব্রোঞ্জ ও ক্যামিও আরও কত কি।

কত ভাগ্যবান রত্নসন্ধানী এই টিনের বাক্স থেকে খুঁজে পেয়েছে অমূল্য রতন। এই সে দিন একজন পঞ্চাশ টাকার মতো ফ্রাঙ্কে ছবি কিনে আবিষ্কার করল যে, সে শিল্পী মুরিলোর একটি বহুমূল্য চিত্রের অধিকারী এবং প্রায় দু'লক্ষ টাকার মতো ফ্রাঙ্ক মুনাফা পেল সেটা বিক্রী করে। মার্থের ও আমার একটি প্রিন্ট কিনবার মতো অর্থসামর্থ্য নেই, তাই ভাগ্যের বাজারে দু'চার পয়সা ফেলে এ্যান্টিক কেনা-বেচার জুয়া খেলতে পারি না। আমরা অপরের কেনাবেচা দেখি আর ভাবি, এই অগণিত সওদাকারীদের লব্ধ জাঙ্কের স্তূপে কোথায় লুকিয়ে আছে অমূল্য রত্ন, যা হঠাৎ আত্মপ্রকাশ করে দর্শকদের চোখে তাক লাগিয়ে দেবে!

চার পাঁচটি টিনের বাক্সের ব্যবধানে ছোট স্টুল বা চেয়ারে বসে বিক্রেতারা সিগারেট খেয়ে যাচ্ছে। দর্শকদের প্রতি মাঝে মাঝে পড়ে তাদের অলস দৃষ্টি। তাদের আপাদমস্তক দেখে যেন আঁচ করে নেয় কার পকেটে আছে পয়সা এবং কিনবার আগ্রহ। কেউ কোনো পণ্যের দাম জানতে চাইলে অত্যন্ত নিরসাক্ত ভাবে তা বলে। তাদের ঐ নিস্পৃহতার ভাব চলে যায়, যেই কেউ কিছু কিনব বলে পকেটে দেয় হাত। অদৃশ্য কোন স্প্রিং তাদের সর্বাঙ্গ চাঙ্গা করে দেয় এবং হাত মাথা ও জিহ্বার সঞ্চালন একসঙ্গে হয় ক্ষিপ্র। এই রকম ভাবে জীবনের অভিনয় আমরা দেখছি শরতের ঠাণ্ডা দিনে। মেঘে ঢাকা দিনের শেষ কি আরম্ভ বোঝা যায় কেবল ঘড়ির কাঁটা দেখে। নদীর দু' কিনারায় সারি সারি প্লেন গাছের লালচে সোনালী পাতায় সবুজের আভাস কমে গেছে আর সেগুলি ঝরে পড়ছে বাতাসের একটু কাঁপন লাগলেই। চওড়া যে রাস্তা নদীর কিনারা বেয়ে চলেছে তার এক-দিকে এই গাছের থামে ভর-করা সোনালী পাতার আচ্ছাদন। অন্যদিকে পাঁচ ছ' তলা বাড়ির সারি এবং মাঝে মাঝে তার জমাটকে তফাৎ করে বড় ফাটলের মতো গাঢ় রঙ-এর রাস্তাগুলি। সেগুলি দৃষ্টিকে বেশীদূর অগ্রসর হতে দেয় না; আরও ধূসর কালো বাড়ির ঠেলাঠেলির মধ্যে লুকিয়ে যায় তাদের স্রোত।

একটি বেঞ্চির ওপরে জমা শুকনো পাতার রাশি সরিয়ে মার্থ আর আমি বসে গেলাম শহরের হট্টগোল দেখতে আর শুনতে।

সে বললে, "তোমাকে একটা কথা অনেক দিন থেকে জিজ্ঞাসা করব ভেবেছি কিন্তু প্রশ্নটা করা উচিত হবে কি-না জানি না।"

বললাম, "মাদ্‌ময়জেল, ওটা শিগ্‌গির বলে মাথা ঠাণ্ডা করে ফেলো। উচিত অনুচিতের বোঝাপড়া পরে করা যাবে।"

সে জিজ্ঞাসা করল, "দেখো তোমায় আমি পরিচয়ের প্রথমে বলেছিলাম যে, আমাদের সম্পর্ক পরিচিতের গণ্ডীর মধ্যে রেখে দিতে হবে এবং সে গণ্ডীকে অতিক্রম করার চেষ্টা যদি কোনোদিন করো তা হলে আমাদের বন্ধুত্বের হবে ঐখানেই সমাপ্তি। ঐখানেই আমি পূর্ণচ্ছেদ টেনে দেবো বলায়, তুমি বলেছিলে যে, তোমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের পরিচিতের গণ্ডী পেরিয়ে নিকট-সম্পর্কের কোনো সম্ভাবনা হয় না —এটা কি সত্যি ?"

বললাম, "মার্থ, তোমার একটু আশ্চর্য লেগেছে, কিন্তু কথাটা সত্যি, আমাদের দেশে ছেলেমেয়েদের মধ্যে থাকে একটা বেড়া, যাকে কেউ যদি টপ্‌কে যাবার চেষ্টা করে অমনি সমাজে পড়ে যায় হৈ-চৈ। তোমাদের দেশে এই যে মেয়েপুরুষের স্বচ্ছন্দ খোলাখুলি মেলামেশা এ আমাদের দেশে আসতে অনেক দেরি। তবে এ যে আসবে, তার আভাস দেখা দিচ্ছে একটু আধটু। তোমার সঙ্গে যেমন দিনের পর দিন কথা বলি, বেড়াই, তাতে আমাদের সম্পর্ক যে কেবল পরিচিতের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ, এটা আমাদের সমাজে ঘটলে লোকেরা কেউ বিশ্বাস করবে না। সেখানে মেয়েপুরুষের সান্নিধ্যের পরিণতির একটা বদ্ধ ধারণা আছে, যার ফলে বয়সের তারতম্য থাক বা না থাক, একজন পুরুষকে কোনো মেয়ের সঙ্গে তিনবার ঘুরতে দেখলেই পড়ে যাবে কানাকানি এবং লোকে মনে করে নেবে তাদের মধ্যে নরনারীর আদিম নৈকট্য ঘটেছে। নরনারীর সাহচর্য আমাদের সমাজে নিছক বন্ধুত্ব কেউ কল্পনা করতে পারে না। কারণ সেখানে জেণ্ডারকে ভুলবার মতো ক্ষমতা সমাজ দেয় না। এটা যেমন অস্বাস্থ্যকর ধারণা বলে মনে করি —তেমনি তোমাদের সমাজে যে অবাধ দৈহিক মিলনকে একটা ডিনার খাওয়ার মতো সহজ করে নেয়, তাও আমার ভালো লাগে না।

"ধরো, সে-দিন পিট্‌কিন, ডাগারম্যান ও নানেৎকে নিয়ে যে ঘটনাটা ঘটল। নানেৎ ডাগারম্যানের বান্ধবী এবং আজ কতকাল ধরে পিট্‌কিনও ডাগারম্যানের বিশেষ বন্ধু। ডাগারম্যান মাত্র চারদিনের জন্য পারীর বাইরে গিয়েছিল কিন্তু একদিন আগেই ফিরে পিট্‌কিনের সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে আবিষ্কার করল, নানেৎ শয্যায় পিট্‌কিনের আলিঙ্গনবদ্ধা। সে প্রায় পিট্‌কিনকে হত্যা করত, নানেৎ দু'জনের মধ্যে না দাঁড়ালে। কিন্তু নানেতের এই ব্যবহারের কৈফিয়ৎ হচ্ছে যে, নানেৎ ডাগারম্যানকে সত্যিকার ভালোবাসে আর পিট্‌কিন তার বন্ধু বলে, তাকেও ভালো লাগে। একলা নিঃসঙ্গ লাগছিল তার, তাই সে পিট্‌কিনের সঙ্গে করেছে একটু মিতালী। কিন্তু তাই বলে কি তার ডাগারম্যানের প্রতি ভালোবাসা ক্ষয়ে গেছে? ছেলেমানুষের মতো সে এই নিয়ে কেন একটা সিন্‌ করল ?

"এই অবাধ স্বচ্ছন্দ দেহ দেওয়া-নেওয়াকে তোমাদের অনেকে বলেন, এ্যাডভান্সড মনের পরিচয়জ্ঞাপক। কিন্তু আমার মনে হয় যে, এই সোজা বিলি-করা প্রণয়ে নেই ভিত্তি নেই গভীরতা।"

মার্থ চোখ বড় বড় করে বলল, "তা হলে তোমাদের মেয়েপুরুষে কোনোদিন বন্ধুত্ব হয় না? হয় না প্রেম, হয় কেবল বিবাহ?"

বললাম, "বিবাহ বাদে মেয়েপুরুষে আমাদের সমাজে বন্ধুত্ব হওয়া দুর্লভ। কারণ তা চাইলেও সমাজ তা সহজে ঘটতে দেবে না। আর বিবাহের বাইরে প্রেম যে একেবারে হয় না তা নয়, তবে তা ঘটে থাকে অন্তরালে অগোচরে, চুরি করে ফল খাওয়ার মতো এবং এ ভাবে প্রণয়াসক্তরা মনে করে যে, তারা ভালোবেসে করেছে পাপ।"

মার্থ বললে, "কিন্তু তোমাদের দেশের ছেলেরা তো এখানে বেশ প্রেমে পড়ছে এবং আমাদের ছেলেদের মতো বেশ অবাধে সব কিছু করে যায়। আর আমাব মনে হয় না তাদের ধরন-ধারণ দেখে যে, তারা পাপ করে অনুতপ্ত।"

বললাম, "মাদম্যয়জে.ল্, তাদের বদ্ধ মনটা হঠাৎ তোমাদের সমাজের এত খোলা আবহাওয়ায় এসে একটু উন্মত্ত হয়ে যায় কিন্তু এরা দেশে ফিরলেই এখানের অতি-বিস্তৃত মনের জালকে গুটিয়ে একটা শক্ত গ্রন্থি দিয়ে তুলে ফেলে স্মৃতির তাকে। বাস্তবে এরা হয়ে যায় চলমান সমাজের একটি অংশ। এদেরই অনেকে আবার দেশে ফিরে সমাজ-ধর্মের ঢাক বাজিয়ে শাসায়, যদি কেউ সাহস করে পড়ে প্রেমে এবং ধরা পড়ে যায় এদের নজরে।"

সে বলল, "মানলাম তোমার কথা, কিন্তু তোমার দেশের ছেলেরা তো অনেকেই এ দেশের মেয়েদের বিবাহ করে ভারতে নিয়ে গেছে। তারা কি সমাজের ঐ ব্যবস্থাই মেনে নেয় এবং তোমাদের সমাজও কি তাদের গ্রহণ করে?"

বললাম, "সমাজ কেন তাদের গ্রহণ করবে না মাদম্যয়জে.ল্, বিবাহ করলেই পূর্বপ্রণয়ের সকল পাপ থেকে হয়ে যায় আমাদের সমাজে মুক্তি। অবশ্য এই বিবাহের ফল যে সর্বদাই শুভ হয়, তা নয়। তোমাদের সমাজ ও জীবনধারা আমাদের জাতীয় জীবন থেকে ভিন্ন। তাই তোমাদের আমাদের দেশে ঘর-সংসার করতে গেলে—হয় নিজের দেশীয় সত্তাকে একেবারে ভুলে বিলিয়ে দিতে হবে আপনাকে—পতির সমাজের রীতিতে ও ধর্মে। না হলে করে নিতে হবে ছোট একটা তোমাদের দেশীয় সমাজের কাঠামো—যার মধ্যে পতিদেবতা তাঁর সমাজ ও স্বজাতিদের পরিত্যাগ করে পত্নীর বানানো খাঁচায় বাস করবেন। বহুক্ষেত্রে দুইয়ের ব্যতিক্রম হলে হয় দ্বন্দ্ব ও তার শেষ পরিণতি সেপারেশন ও ডিভোর্স। আমাদের দেশের ছেলেরা, এ সম্বন্ধে একেবারেই অচেতন নয়, যখন তারা এ দেশে প্রেমে পড়ে বা বিবাহ করে। বেশীর ভাগই তারা এটাকে গ্রহণ করে তোমাদের পোশাক পরার মতো। দেশে ফিরলেই কাপড় বদলানোর মতো বদলে ফেলে রুচি ও আচরণ। অনেকে বিবাহ পর্যন্ত করে পত্নীত্যাগী হয়ে দেশে ফিরছে।

"সে-দিন শুনলাম আমার এক বন্ধুর মুখে একটি ঘটনা। তিনি লুক্সাম্বুর বাগানে একটি বেঞ্চে বসে রোদ পোয়াচ্ছিলেন। তাঁর পাশে বসে একটি ফরাসী

মহিলা উলের পুলোভার বুনছিলেন আর সামনের বালি-ভরা চত্বরে খেলা করছিল একটি বছর আড়াই কি তিনের মেয়ে। ফরাসীনীর দেহের রঙ সাধারণ শ্বেতকায়ের চেয়েও সাদা আর চুল ফ্যাকাসে সোনালী হয়ে প্রায় ব্লণ্ডের পর্যায়ে পড়েছে। চোখ দুটি গভীর নীল। কিন্তু শিশুটির রঙ প্রায় বাদামী আখরোটের মতো, কৃষ্ণকালো চোখ। বন্ধু ভাবলেন, অন্য কারো মেয়ে মহিলাটির সঙ্গে বেড়াতে এসেছে। ভদ্রমহিলা কয়েক বার পরিচয়-উৎসুক দু'একটা দৃষ্টি বন্ধুর দিকে ফেলে আরম্ভ করলেন, 'বেশ দিনটা না? আপনি ভারতীয়?' ...ইত্যাদি আলাপ করার ছকে ফেলা কথা। তারপর বললেন, 'আমার স্বামীও ভারতীয় আর এটি আমাদেরই কন্যা। এই য়্যাগেৎ ...ম'াসিয়োকে বঁজুঁর বলো।' বন্ধু জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার স্বামী কি করেন?' তিনি জবাব দিলেন, 'ডাক্তার। কিন্তু এখন তিনি ভারতে।' তারপর মহিলাটির চোখে জল এল। তিনি বলে চললেন, 'য়্যাগেৎ ভূমিষ্ঠ হবার আগেই তাঁকে দেশে ফিরতে হলো। বলেছিলেন, দু'মাসের মধ্যেই আমাকে সেখানে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করবেন কিন্তু আজ প্রায় তিন বছর হলো ঐ একই জবাব আসছে —এখনও তিনি পাথেয় সংস্থান করে উঠতে পারেননি। তা-ছাড়া ওদেশী সমাজে আমাকে গ্রহণ করার ছাড়পত্রও তো পেতে সময় লাগবে। কিন্তু তাঁর শেষ চিঠি আমার সব আশাকে নির্মূল করে দিয়েছে। তিনি লিখেছেন, —তোমাকে যখন বিবাহ করি সে সময়ে আমাদের দেশের সমাজধর্মের নিয়মে ডাক্তারদের বিবাহে নিষেধ ছিল। ভেবেছিলাম, আধুনিক পরিবর্তনের দ্রুততালে হবে এই নিয়মের শেষ এবং তোমাকে গৃহে বরণ করে ধন্য হব। কিন্তু দুঃখের কথা এই যে, সে নিয়ম এখনও এখানকার সমাজে বিশেষ বলবান, তোমাকে ও য়্যাগেৎ-কে কাছে পাবার জন্য আমার বুক ভেঙে যাচ্ছে, কিন্তু আমি নিরুপায়।' —তারপর মহিলাটি বন্ধুকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আচ্ছা, তোমাদের দেশের ধর্মের এই বীভৎস ও নির্মম নিয়মের কোনোদিন কি সংস্কার হবে না?' বন্ধু বললেন, 'তিনি এ নিয়ম সম্বন্ধে কিছু জানেন না, কারণ এ নিয়ম ভারতের সর্বত্র সর্বজনের নয়। তিনি ভারতের যে অঞ্চল থেকে এসেছেন সেখানে কেউ এই বর্বর প্রথার কথা জানে না।' তিনি উঠে গেলেন বেঞ্চি থেকে ভদ্র সম্ভাষণ জানিয়ে এবং মনে মনে —যে পাষণ্ড ব্যক্তিটি, এই নীচ প্রতারণা করেছে, তার মুণ্ডপাত করতে করতে।"

মার্থ বললে, "তা হলে কি লোকটা মিথ্যা বলে প্রবঞ্চনা করেছে, আর এ রকম নিয়ম তোমাদের দেশে নেই?"

বললাম, "মাদ্‌ম্যয়জে.ল্, তাকে একটা বিশ্বাসযোগ্য কিছু বলে এই মহিলাটির পাণিগ্রহণের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি পেতে হবে, তাই সে ধর্মের দোহাই দিয়ে ঠকিয়েছে তাঁকে।"

দেশী-বিদেশী প্রেমের খসড়া

"আমাদের দেশের ছেলেরা এ দেশে প্রেম করে বিবাহ করে, কেউ বা করে বন্ধুত্ব। কিন্তু দু'একজন আবার এমনও আছে যারা এর কোনোটাই করে না—কারণ আমাদের সমাজের আবহাওয়া তাদের গায়ের থেকে নামতে চায় না। অথচ এ দেশী বাতাসও ফাঁকে ফাঁকে ফুৎকার দিয়ে তাদের মনটা দেয় গুলিয়ে।

"আমাদের জানা একটি ছেলে ছিল এই রকমের। তার কৈশোর ও যৌবনের প্রারম্ভ কেটেছে সংযম ও স্বামী বিবেকানন্দের নীতির আদর্শে। পড়াশুনায় ভালো ছেলে, এখানে এল থিসিস লিখতে, কিন্তু তোমাদের রাস্তায়, বাগানে, কাফে ও কলেজে—সর্বত্র ছেলেমেয়েদের অবাধ প্রেমাভিনয় দেখে হলো তার চিত্ত চঞ্চল। এল বাসনা। একদিকে তার মনের একটা অংশ যেমন সাগ্রহে চায় সঙ্গিনীর সাহচর্য, অন্য অংশ কর্তব্য-কঠোর সংযমের যষ্টি উত্তোলন করে তাকে শাসায় সংযত হতে। তার আর থিসিস লিখতে মন বসে না। অন্য সঙ্গীদের সঙ্গে মিশতে বা কথা বলতে তার হতে লাগল সঙ্কোচ, পাছে কেউ তার মনের এই অতি গোপন বাসনা ও আলোড়ন জেনে ফেলে। সে কোনো মেয়ের সঙ্গে আলাপ জমাতে পারে না কারণ তার মনে সন্দেহ হয় যে, আলাপ ঘনিষ্ঠ হলে সে হয়ত আকাঙ্ক্ষা করবে তার দেহের স্পর্শের। তার কাছে এরা সব শুদ্ধা নারী, সে কোন সাহসে আনবে তাদের দেহে কলুষ। শেষে বাসনার তাড়না ও যুক্তি দুটোর মধ্যে সন্ধি করার কোনো উপায় না দেখে সোজা সে চলে গেলো একদিন—বহুজনসেবিকার পণ্যশালায়, ভাড়া করা পীরিতের সন্ধানে।

"নিয়মাভ্যস্ত সে, তাই তার এই বাসনার পরিণতিও পড়ে গেলো বাঁধাধরা নিয়মচক্রের খাদে। প্রতি বুধবার সন্ধ্যাবেলায় সে কেমন আড়ষ্ট ও শঙ্কিত হয়ে যেত, কারণ সেইদিন তার ধার্য ছিল দেহবিপণীর আমন্ত্রণ রক্ষার জন্য। বেশ বোঝা যেত, সে সারা সন্ধ্যা নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত ভাঙত তার ধৈর্যের বাঁধ। মদ্যপ যেমন প্রকৃতিস্থ অবস্থায় মদ্য স্পর্শ করবে না বলে শপথ করে পরে ধাবিত হয় পানশালার দিকে আরও উত্তেজিত হয়ে—সেও প্রায় সেইভাবে যেত প্রতিবার, না যাবার শপথ করে—দেহের সাড়াকে ক্রীত মাংসপিণ্ডের ক্ষণস্পর্শে স্তিমিত করে দেবার উদ্দেশ্যে। সকলেই জানত তার এই দুর্বলতা। যখন সাহস করে একজন জিজ্ঞাসা করল, সে কেন বান্ধবীর সঙ্গে সুযোগ না নিয়ে ঐ বহুজনের ভোগালয়ে যায়?

"তার উত্তর এল যে, মনের সঙ্গে লড়াই করে হেরে সে যদি পাঁকেই নামল, তবে সে পঙ্কিলতা তার একারই থাক। শুদ্ধা ভদ্র যুবতী বা নারীকে কলুষিত করতে সে প্রস্তুত নয়। যারা দেহের পণ্য বেচে তাদের সংস্পর্শে তার কোনো গ্লানির

কারণ নেই। কারণ তারা কেউই নিষ্কলুষ নয়। দেশে ফিরে সে নিশ্চয়ই এতদিনে বিবাহ করে ঘর-সংসার পেতেছে এবং বোধহয় মনে করে, যারা বিদেশে বান্ধবী নিয়ে মাতামাতি করত তাদের চেয়ে সে চরিত্রবান ও নিষ্পাপ।

"বিবাহের বাইরে নারীর সাহচর্যের যে অন্তরায় আমাদের মনে, তাকে তোমরা ইন্‌হিবিসান বলে বিদ্রূপ করতে পার কিন্তু আমরা এখানে অস্বাভাবিক সংস্কারহীন ভাব দেখিয়ে যতই আস্ফালন করি না কেন, স্বদেশের সামাজিক প্রভাবকে সম্পূর্ণ উড়িয়ে দিতে পারি না। এইজন্য অনেক ভারতীয় ছাত্র মনকে সংযত রেখে কোনো নারীর হস্ত স্পর্শ পর্যন্ত না করে, আপন ধারণায় নিষ্কলুষ হয়ে দেশে ফিরেছে। এই মনোবৃত্তি কেবল আমাদের দেশের লোকদেরই মধ্যে বলবৎ দেখা যায়।"

মার্থ হেসে বলল, "তা হলে তোমাদের দেশের লোকেরা প্রেম কি তা জানে না —এটাই ধরে নেব।"

বললাম, "না মাদ্‌ময়জেল, এটা তুমি ঠিক বললে না। আমাদের দেশের লোকে প্রেম করে, কেবল তার ধারণা ও রীতি অন্যতর। তোমাদের দেশে কি এখনও রোমিও জুলিয়েটের মতো বাস্তবে প্রেমাভিনয় দেখো? তার স্থান এখন কেবল রঙ্গমঞ্চে, অলীক কাহিনীতে মনোরঞ্জক মাত্র। বাস্তবে ঐ প্রেমাভিনয় দেখলে বলবে এ 'কাফ্‌লাভ'-এর চেয়েও ছেলেমানুষী। কিন্তু আজকের দিনেও আমাদের দেশে ঐ ধরনের প্রেমের দৃষ্টান্ত অবিরল নয়। আমার মনে আছে, কলেজে পড়তে এক সহপাঠী একদিন এসে বলল, তার মাতুলপুত্র আত্মহত্যা করেছে। সে যে তরুণীকে ভালোবাসত তার সঙ্গে বিবাহ হবার কোনো সম্ভাবনা ছিল না তা জেনেও তারা পরস্পর গভীরভাবে প্রণয়াসক্ত হয়েছিল, যদিও কোনোদিন কেউ কারো হাতে হাত পর্যন্ত দেয়নি। যখন তরুণীটির অন্যের সঙ্গে বিবাহের ব্যবস্থা হলো, সে তার প্রণয়ীর সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়ে এক চাঁদনী রাতে বাড়ির ছাদে ফুলশয্যা রচনা করে, গলায় মালা দিয়ে একত্রে বিষপানে আত্মহত্যা করল।

"তোমাদের আবেলার ও এলোয়াস-এর স্বর্গীয় প্রেম, কিংবা মাদাম্ বোভারির প্রেমের ভ্রান্তিও দেখতে পাবে আমাদের সমাজে —কেবল তার প্যাটার্নে কিছুটা তফাৎ।"

মার্থ একবার প্রশ্ন শুরু করলে তা চলত ধারাবাহিক। ছোট ছেলেদের গল্প বললে যেমন ক্রমাগত বলে যায় 'তারপর কি হলো' —তার প্রশ্নগুলিও প্রায় সেই রকম। সে বললে, "তোমাদের বিবাহ বিনা স্ত্রী পুরুষের আদি প্রেম সম্ভব হয় না কিন্তু বিবাহের পর কি আদি প্রেমের মতো প্রণয় ঘটতে পারে না? তোমাদের আবেলার, এলোয়াস ও মাদাম্ বোভারিদের শেষ পরিণতি কি হয়?"

বললাম, "আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা না থাকায় বলতে পারি না —বিবাহের পর আমাদের দেশে আদি প্রণয়ের মতো সফল চুক্তিহীন প্রেম হয় কি-না। আমাদের আবেলার ও এলোয়াসরা বেশীরভাগই করে আত্মহত্যা আর তা না হলে

হয় দেশত্যাগী। আর মাদাম্ বোভারিরা শুদ্ধ সমাজে টি`কতে পারে না। তাদের বেশীর ভাগই ভিড় করে দেহের পণ্যশালাগুলিতে।

"আমাদের সমাজের বিধিদাতা মনুর নাম শুনেছ? তাঁর বিধানে, বিবাহের উদ্দেশ্য সন্তানার্থে স্ত্রী গ্রহণ। তোমাদের দেশে বিবাহ বন্ধনের বাইরে প্রেমের যত ছড়াছড়িই হোক অন্তত সন্তান-কামনায় বিবাহ-বন্ধনে তোমরা আমাদের মনুর বিধি অক্ষরে অক্ষরে পালন করছ। আমাদের দেশের বিবাহটা হয় শাস্ত্রমতে কিন্তু বিধির উদ্দেশ্যটা মুখ্য করে নয়। সন্তানরা আসে বাঞ্ছনীয় বলে নয়, বেশীর ভাগই অবাঞ্ছিত তারা। পৃথিবীতে আসতেই থাকে কারণ তাদের আসবার পথ লোকে রুদ্ধ করতে পারে না বলে। স্ত্রী পুরুষের মধুর সম্পর্কের কোন পথটা উচিত বা অনুচিত তার সর্বজন-সম্মত ধারণা এখনও করা যায় না। আমার মনে হয়, যতক্ষণ যে, যে-সমাজে বাস করছে তারই নীতি ও ধর্ম মেনে চলা উচিত। না হলে সমাজেব ভিত্তি আল্‌গা হয়ে 'এনার্কি'র স্ত্রপাত হবে। জোর করে সমাজের বিরূপ রীতি অন্য সমাজ থেকে আমদানী করলে কেবল বিক্ষোভেরই সম্ভাবনা। তোমার চোখ দেখে বুঝেছি, তুমি এখনই বলবে, 'হোক না এনার্কি'। তার জবাবে বলব, 'এনার্কি'তে হবে বহু জনের ক্লেশ ও আক্ষেপ। মানুষের স্বভাবধর্ম তা চায় না, তাই যা অনেক যুগ ধরে মানুষের সমাজ যাচাই করে চিনে নিয়েছে মঙ্গলকর প্রবৃত্তি ও পথ বলে, সেগুলিকেই তারা চিরন্তন করে ধরে রাখতে চায়। তার কিছুটা এসেছে ধর্মের বিশ্বাসে ও সমাজের নিয়ম ও নিষেধে কিংবা রাষ্ট্রীয় আইনের কাঠামোয়। যদি নিয়মের কোনোটির প্রয়োজন অচল ও শেষ হয়ে যায়, তবেই সমাজ তাকে ত্যাগ করবে কিন্তু তাও বিনা প্রশ্নে বা প্রতিবাদে নয়। কারণ অভ্যস্ত বিধি অচল হলেও, সহজে তাকে ত্যাগ করা দুরূহ।"

মার্থকে নিরস্ত করা যায় না। তার প্রশ্ন এল, "এতকাল মঙ্গলকর পথ ও বিধি জেনে ও অবলম্বন করেও আমাদের সমাজে দুঃখ, অশান্তি ও ক্ষতির শেষ কোথায়? আদিমকালের মানবসমাজে মানসিক যে ক্ষোভ ও দুঃখ ছিল তার পরিমাণ ও অনুভূতি এখন কি কিছু কম?"

বললাম, "মার্থ এই প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যই আসেন বুদ্ধ ও ক্রাইষ্টের মতো মহাপ্রাণরা। জানো, বুদ্ধকে ক্লেশ ও দুঃখ কি প্রশ্ন করায় তিনি বলেছিলেন, 'যার সঙ্গে সংযুক্ত হতে চাই না তার সঙ্গে যুক্ত হওয়ায় এবং যাকে ছাড়তে চাই না তার বিচ্ছেদেই হয় দুঃখ ও ক্লেশ। সমাজ মঙ্গলের পথ জানলেও বহু দিনের জমা অমঙ্গলের খাদ ছেড়ে উঠে আসতে পারে না। চেষ্টা করেও তাই সমাজ তৈরী করা যায় না, এই মহামানবদের সঠিক উপদেশকে অনুসরণ করে। সমাজের তৈরী ক্রেমে কিছুটা তাঁদের মত ও নীতি ছেঁটে, কেটে, রাঙিয়ে, মানিয়ে, ধরে নেওয়া হলে সেইটুকুই আসে মাত্র। তাই দুঃখের ক্লেশের ও শোকের অন্ত মানবসমাজ কোনো-দিন দেখতে পাবে বলে মনে হয় না।"

সূর্যবিহীন দিনের আলো কমতে কমতে কখন যে সন্ধ্যার ঘোলা আবরণে ঢাকা পড়ে গেছে আমরা লক্ষ্য করিনি। স্তেন নদীর বাঁধের দু' পাশের ও সেতুগুলির ওপরের আলো জলে পড়ে ছোট ছোট ঢেউগুলিকে সোনালী রুপালী রঙে রাঙিয়ে ছিনিমিনি খেলছে। দু' একটা টাগ, ঝিক্‌ঝিক করে আকাশে ধোঁয়ার রেখা ফেলে চলে গেলো। নদীর ওপারে লুভ্‌র প্রাসাদের আবছা সীমারেখা কুয়াসায় যবনিকায় পড়ে যেন বিরাট একোয়া-টিন্ট প্রিন্টের মতো দেখাচ্ছিল।

আমার বেশ ভালো লাগে এই ঝাপ্‌সা ছবি। একে ব্যাকগ্রাউণ্ড করে আঁকা যায় মনের পটে কত নক্‌শা। সেগুলি টকি ফিল্মে ফ্লাশব্যাকের মতো সাজিয়ে দেখা এবং শোনা চলে। পোঁ দেজার —সেতুর ওপারে লুভ্‌র-এর দোতলায় গ্র্যাঁ গ্যালারির গবাক্ষগুলি যেন সহস্র বাতিদানের মুক্তাবৎ আলোয় উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কখনও বা নৃত্যক্লান্ত দম্পতিদের দু' একজন বাতায়নদ্বারে এসে দাঁড়াল। তাদের চলবার ও দাঁড়াবার ভঙ্গিতে নেই আধুনিক যুগের ব্যস্ততা। ধীর সে ছন্দ, আকাশে ভেসে যাওয়া শরতের মেঘের মতো। কানে এল যেন ষোড়শ কি সপ্তদশ শতাব্দীর সুরধ্বনি। সে সংগীতও তাদের গতি ভঙ্গির ছন্দে সাবলীল। সে সুরধারাকে পার্‌কাসান যন্ত্র ঘাত প্রতিঘাতে বিক্ষিপ্ত, চঞ্চল করেনি। কত যেন প্যালেস্ত্রিনা, ভিভাল্‌দি, লুলি প্রভৃতি সুরস্রষ্টাদের সংগীত বাঁশরী ও বেহালার বিবিধ যন্ত্রে উচ্ছ্বসিত হয়ে প্রতি উন্মুক্ত বাতায়ন থেকে আহ্বান করতে লাগল রসিকজনদের, 'এস, এস' বলে।

মার্থকে বললাম, "জানো মাদ্‌ম্যয়জে.ল, যবে থেকে পার্‌কাসান যন্ত্রগুলি সংগীতের রাজ্যে প্রবেশ করেছে, তবে থেকে সুর হয়ে গেছে বন্দী। এই যন্ত্রগুলি বাঁশি ও তন্ত্রীর অব্যাহত সুরধারাকে যেন বন্দীশালার ব্যারাকে পুরে জোর করে কুচকাওয়াজ করাচ্ছে। পার্‌কাসানের ঢাক, ঝাঁঝর, কাঁসা, করতাল ইত্যাদি যেন সংগীতের তাল ও মাত্রাগুলিকে স্থূল অবয়ব দিয়ে ফেলে দেয়, তন্ত্রীময় যন্ত্রের এবং কাঠ, বাঁশ ও ধাতুময় বাঁশির সুর উন্মথিত মোলায়েম সংগীত-ধারার সামনে, বাধা পেয়ে আছড়ে সে সুর-সংগীত ছিটকে পড়ে। যেমন বোম্‌ পড়লে লোকেরা নিজেদের খাদের আড়ালে ফেলে আত্মগোপনের চেষ্টা করে তেমনি, পার্‌কাসানে ঠিক্‌রে-পড়া বাঁশি বা বেহালার সুর যেন কোথায় লুকিয়ে যায়। পার্‌কাসানের ঝন্‌ঝনা মিলিয়ে গেলে আবার তারা যেন সাহস পেয়ে আত্মপ্রকাশ করে। বিক্ষিপ্ত সুরের ধারাগুলি আবার এসে মিলে যায় সংগীতের আসল স্রোতে। বহু ক্ষেত্রে তার দৌড় এগোয় না বেশীদূর। দামামা, ঝাঁঝর কি করতাল গড়িয়ে দেয় তার সামনে দু' একটি তাল ও মাত্রার প্রস্তর কি ইট। আবার সুর ঠিক্‌রে ছিটিয়ে পড়ে স্তব্ধ স্তিমিত হয় সংগীতের স্রোত।

"ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর সংগীতকার প্যালেস্ত্রিনা, ভিভালদি, স্কার্লাত্তি প্রভৃতির সুর-ধারায় পার্‌কাসানের অভ্যুদয় হয়নি বলে বড় প্রাণস্পর্শী সে

রচনাগুলি। তখনকার দিনের লোকদের অনুভূতির গভীরতা ও তীব্রতা যেন মনে হয় এখনকার মানুষের চেয়ে সূক্ষ্ম সংবেদন-শক্তিতে ভরা ছিল। শতাব্দীর জড় করা, এগিয়ে চলার পথে কুড়ানো শিল্প-সম্পদ জমে আজকে শিল্প ও সংগীতকে করে তুলেছে একটি কিউরিও শপ। সেখানে যেন অতি প্রাচীন কলসাসের ধাতব ভাঙা মাথার খুলিতে ফুলদানী করে সাজানো হয়েছে আজকের কেয়ারি-করা কলমের ডাচ টিউলিপ। আর এর সমন্বয়কে বলা হচ্ছে আধুনিকতা। সে যুগের মানুষের স্বভাবে আচার-ব্যবহারে ছিল না এতটা সভ্যতার 'ভিনিয়ার'। তাই তাদের ভালোবাসা ও ঘৃণা, হাসি ও কান্না, দান ও লুব্ধতা, দয়া ও ক্রুরতায় তফাতের দাঁড়ি বর্তমানের তুলনায় অতিশয় দীর্ঘ। তাদের বাঁচা মরায় বেশ একটা অভিনয় ও রহস্য ছিল—অন্তত ইতিহাসের খাতায় তার যে ছাপ রয়ে গেছে তাতে সেই রকমই মনে হয়।

"আধুনিকতার সোরগোলে সাধারণের স্বকীয়তা হারিয়ে গেছে তাই ভায়োলিনকে ধাক্কা মারে ট্রম্বোন আর ট্রম্বোন্‌কে ধমক দেয় বিগ-ড্রাম, ওবো-র কাঁদুনি ও ফ্লুটের ফুৎকার তলিয়ে যায় কাঁসর আর ট্রায়াঙ্গেলের ঝঞ্ঝায়। মনে হয়, কে যেন সুরের ডাস্টবিন উল্টে ঢেলে দিয়েছে সংগীতের আবর্জনা। মোৎসার্ত পর্যন্ত পারকাসান সুরের কুলীন সমাজে ছিল অপাংক্তেয়। বিতোফেন তুললেন তাকে জাতে আর ভাগনার তার হাতে যষ্টি দিয়ে করে দিলেন সংগীতের শাসক। তারপর থেকে তার উত্থিত যষ্টি তুলো ধুনছে সংগীতের দেহে। আমাদের দেশের এক বিখ্যাত সুরকার গীতির রচনায় বলেছেন—

গীত কী সংগীত মান
সংগীত কি সুর মান
তাল মান মৃদঙ্গ
নৃত্য মান রম্ভা ॥

আমার মনে হয় রম্ভাকে নাচাতে গিয়ে মৃদঙ্গের তালে সুর ও সংগীতের পড়ে গেছে হাতে পায়ে বেড়ী।"

সে বলল, "আমাদের চারপাশে ঘোলাটে ও আবছা হাওয়ায় মনে হচ্ছে যেন আমরা একটা শ্যাম্পেনের গ্লাসে ডুবে গেছি, আর চারপাশে যে অসংখ্য বুদ্‌বুদের বিন্দু উঠে চলেছে তাদের পথ অনুসরণ করতে করতে হারিয়ে ফেলেছি সময়ের অগ্রপশ্চাৎ, ভুলে গিয়েছি জমির সীমানা—দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ। পারকাসানের বিরুদ্ধে তোমার এই তীব্র দোষারোপ শুনলে ভাগনার, বারলিয়স কি হিন্‌ডেমিথ-এর উপাসকরা তোমায় এই সামনের ল্যাম্পপোষ্টে 'লিন্‌চ' করতে দ্বিধা বোধ করবে না।"

বললাম, "আমাদের দেশের চলিত কথানুযায়ী তারা আমার হাড় খাক, মাস খাক, আর আমার চামড়া নিয়ে ডুগডুগি বাজাক কিন্তু তখন আমার কর্ণদ্বয় তো অব্যাহতি পাবে পারকাসানের নির্দয় অত্যাচার থেকে!"

রাস্তার ঠিক ওপারে ছিল একটি গ্রীক রেস্তরাঁ। সেখান থেকে ভেসে এল সারেঙ্গী জাতীয় যন্ত্রের সঙ্গে অর্ধপ্রাচ্য উদাস সুরের রেশ। সেটা শুনে মার্থ বললে, "নাও, তোমার পারকাসান মর্দিত কর্ণদ্বয়কে স্নিগ্ধ করতে সুরো ধারা ঢালছে কলমাসের দেশের লোক।"

আমি মনে মনে ইতিহাসের ছবির পর ছবি রাঙিয়ে চলেছি। আমি যে এতক্ষণ নীরব থেকেছি তার জন্যে কোনো অনুযোগ মার্থ করেনি। মনে হলো, সেও কোনো পুরনো দিনের কাহিনীর চওড়া বুলভার ধরে এগিয়ে গিয়েছে বহু দূর। সেখান থেকে আমার প্রতি তার নজর আর বোধহয় পৌছাচ্ছে না। কিন্তু হঠাৎ আমরা দু'জনে চমকে উঠলাম আমাদের জাগ্রত স্বপ্নের থেকে।

দুটি ঘোলাটে রাঙা চোখ আর বিরাট একটি হাঁ-করা মুখ যার মধ্যে হলদে কয়েকটা প্রায় মাড়ি-বিচ্ছিন্ন খারাপ দাঁত; সেগুলিকে কাঁপিয়ে বেরিয়ে এল এক উৎকট শব্দ। 'বঁসোয়ার মাদাম্, বঁসোয়ার মঁ্যসিয়ো।' আমরা দু'জনেই বুঝলাম, এখানে বসে আমাদের আর আলাপ করা চলবে না। আগন্তুক মদ্যপানে বেশ নেশায় বিভোর হয়ে এসেছেন আমাদের সঙ্গে আসর জমাতে। আমাদের উঠতে দেখে লোকটি বলল, "উঠছ যে? আমি এলাম তোমাদের সঙ্গে বসে একটু গল্প করতে।"

আমাদের অন্য কাজ আছে বলতেই, সে সামনের হাতটা চিতিয়ে ধরে বললে, "আচ্ছা, যাবে যাও, তবে তোমাদের শুভ কামনার জন্যে আমি কিছু বকশিশ আশা করি। বেশী কিছু নয় —একপাত্র মদিরার দাম দিলেই চলবে।" আমরা তাকে এড়িয়ে, পাশ কাটিয়ে ডুবে গেলাম জনস্রোতে। মার্থ অস্ফুট স্বরে লোকটার উদ্দেশ্যে একটা গালাগাল দিলো।

বললাম, "মার্থ, মাতালকে গালাগালি দিয়ে কি হবে?"

সে বললে, "মাতলামি করছে কিন্তু পয়সা চাইবার জ্ঞানটা খুব টন্‌টনে আছে।"

হেসে বললাম, "জানো —লোকে মাতাল হলেও মগজের খানিকটা অংশ সহজ মানুষের মতো সজাগ রেখে দেয়। এর প্রমাণ আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন একবার পেয়েছি—

"আমাদের বাড়ির কাছেই ছিল একটা তাড়িখানা। সেখানকার খদ্দের বেশীর ভাগই ছিল বাজারের মাছবিক্রেতারা। তারা যখন পথ দিয়ে নেশায় টং হয়ে আবোল-তাবোল গান গেয়ে চলত, পাড়ার লোকে দু' একটা কটূক্তি ছাড়া তাদের এই উপদ্রব মোটামুটি সহ্য করে নিত। কিন্তু একদিন দেখা গেলো একটি ভদ্রসন্তান টল্‌তে টল্‌তে বেসুরো বেতালা আবোল-তাবোল গাইতে গাইতে চলেছেন সেই পথ দিয়ে। পাড়ার একজন গণ্যমান্য ব্যক্তি তাকে ধরলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমরাও খেলুড়ে ছেলের দল জড় হয়ে গেলাম তার চারপাশে। লোকটির গলায় ছিল চাদর। পাড়ার নেতৃস্থানীয় ভদ্রলোক তার গলার চাদরটি সজোরে ধরে রূঢ় ভাষায় তাকে জিজ্ঞেস করলেন যে, ভদ্রসন্তানের এই ইতরজনোচিত আচরণ কেন?

"নিজেকে এই রুষ্ট জনমণ্ডিত দেখে মুহূর্তে মদ্যপের খামখেয়ালী ভাব ও প্রাণ-খোলা সুর কোথায় উবে গেলো। কিন্তু চকিতের মধ্যেই ফিরে এল তার নেশার ঘোর। সে ভেউ-ভেউ করে কেঁদে ভদ্রলোকের চটি জোড়া পায়ের থেকে তুলে নিয়ে নিজের মাথায় রাখলে আর বললে, 'মশাই, ছিলুম বেচুরাম চাটুজ্জে আজ বড় দুঃখেই হয়ে গেছি শেখ বেচু।' অবশ্য মার্থকে প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিতে হলো 'বেচুরাম চাটুজ্জে' ও 'শেখ বেচু'র তফাৎটা কোথায়।

"ভদ্রলোক আবার প্রশ্ন করলেন,'আপনার শেখ বেচু হবার কি দরকার ছিল ?' তখন তার দুই গণ্ডের ধারায় প্লাবন এসে গেছে। সে বলল, 'সাধে কি হয়েছি ? আমার একমাত্র ছেলে, যখন সে চলে গেলো তখন পারলুম না নিজেকে ধরে রাখতে বেচারাম চাটুজ্জে করে।'

"ভদ্রলোক অতি স্নেহে পাদুকা তার হাত থেকে সরিয়ে নিয়ে তার মাথার ধুলো ঝেড়ে দিলেন। তাঁরও চোখে প্রায় জল এল। বললেন, 'ভাই এ পথ দিয়ে যখনই যাবে তুমি, বেচুরাম চাটুজ্জে কি শেখ বেচু যেভাবেই থাকো আমার সঙ্গে বসে দুটো মনের কথা বলে যেও।' আমরা ছেলের দল একটু ব্যঙ্গ-কৌতুক নাটকোপভোগের আশা করেছিলাম কিন্তু এই বিয়োগান্ত অভিনয়ের আধিক্য দেখে কিছুটা আশাহত হয়ে চললাম খেলার মাঠে। আমি কিছুটা এগিয়েই গিয়েছিলাম। পিছনে আসছিলেন টল্‌তে টল্‌তে, আবার থেমে-যাওরা-সুরের মহড়া ভাঁজতে ভাঁজতে 'শেখ বেচু'। হঠাৎ শুনলাম, তিনি আমায় ডাকছেন, 'ওহে ছোকরা, জলখাবারের পয়সা পেয়েছ ?'

"বললাম, 'না'।

"তিনি, বললেন, 'কি রকম বাপ-মা'র ছেলে হে ? জলখাবারের জন্য দুটো করে পয়সা পাও না দিনে ?'

"বললাম, 'থাকলেই বা দেবো কেন ?'

"শেখ বেচুর উত্তর এল, 'দাও হে দাও, আজকে আমার রোজকার বাঁধা মাত্রা থেকে কিছু কম পান করেছি। কাজেই মৌতাতটা ঠিক জমছে না।'

"সন্দেহ হলো। একটু আগে যে লোকটি কেঁদে-ককিয়ে বলল, তার একমাত্র সন্তানের বিয়োগে সে আজ সব কিছু খুইয়ে হয়েছে শেখ বেচু, ঠিক যেন সেই লোকটির গলার স্বর এ নয়। জিগ্যেস করলাম, 'একটু আগে মরা ছেলের জন্যে কাঁদছিলেন আর এত শিগ্‌গির তাকে ভুলে ভাবছেন আপনার মৌতাতের কথা ?'

"শেখ বেচু হেসে বলল, 'আরে ঐ সময় আমার একমাত্র ছেলে বা মা যদি না মারা যেত তা হলে কি ঐখান থেকে এত সহজে ছাড়া পেতাম ?……"

* * *

আমরা এসে গেছি প্লাস স্যাঁন্মিশেল-এ। ডান দিকে মাদাম্ পম্‌পাদুর্-র অট্টালিকার শেষ অবশেষ তিনটি পাথরের খিলেন, তার মধ্যে দিয়ে যেতে হবে একটি সরু

গলিতে, নামতে হবে ছয়টি ধাপ। তারপরে একটি ডান দিকের রাস্তার কোণে কয়েক শতাব্দীর পুরনো ভুমড়ে-পড়া ময়লা কালো একটি বাড়ি। তারই মধ্যে স্যাঁৎসেঁতে ছোট্ট একটি ঘরে আছে মার্থের মা, কন্যার প্রত্যাবর্তন অপেক্ষা করে। স্টোভে হয়ত চড়িয়েছে সুপ।

আমরা পৌঁছালাম। জানি অনুরোধ আসবে একবাটি সুপ খাবার জন্যে। গরম ঘোলাটে সুপ—তাতে কয়েক টুকরো মাংস আর টোস্ট-করা কয়েক খণ্ড রুটি ভাসছে। তারা গরিব কিন্তু তাদের এই আতিথেয়তার অভিব্যক্তি ধনীর আমন্ত্রণের প্রাচুর্যকে লজ্জা দেবে।

প্রফেসর জিওভানেল্লি

আতলিয়েতে মাদাম্ মিউভিল একদিন বললেন, "খোদাই শিখবার জায়গা খুঁজছিলে, তার একটা খবর তুমি পাবে আমার এক বান্ধবীর কাছে। তিনি এখানে আজ দুপুরে আসবেন বলেছেন।"

ঠিক বেলা বারোটায় এক অপরিচিতা ইংরেজ মহিলা এলে তিনি আলাপ করিয়ে দিলেন। এঁর নাম মিস্ হিটন, পাথরে খোদাই করে ভাস্কর্য রচনায় ইনি বেশ দক্ষ। জিজ্ঞাসা করলাম, কোথায় এবং কার কাছে তাঁর শিক্ষা আর সেখানে আমার শিক্ষানবিসির ব্যবস্থা করে দিতে পারবেন কি-না।

তিনি কথা দিলেন যে, আমায় তাঁর শিক্ষক প্রফেসর জিওভানেল্লি-র কাছে আসছে সোমবার নিয়ে যাবেন।

নির্ধারিত সোমবারে মিস্ হিটন-এর সঙ্গে উপস্থিত হলাম 'রু দিদ'য় প্রফেসর জিওভানেল্লি-র আতলিয়েতে।

দরজা খোলার আগেই ভেতর থেকে ছেনী ও হাতুড়ির ঘায় পাথর কাটার ঝিক্-ছিপ শব্দ আসছিল, যেন দূর থেকে ভেসে আসা পার্বত্য নির্ঝরিণীর কল্লোল ধ্বনি। ভেতরে ঢুকে দেখলাম, বেশ মোটাসোটা এবং লম্বা চওড়া এক ভদ্রলোক বিরাট একটা মার্বেল পাথর কেটে মূর্তি তৈরী করছেন। তাঁর শক্ত মাংসপেশীগুলি সাদা ওভারঅলের ভাঁজে ভাঁজে আত্মপ্রকাশ করছিল। তাঁর মাথায় একটা খবরের কাগজের টুপি আর তার নীচে চওড়া কপালকে পটভূমি করে ঘন ভ্রূসংযুক্ত প্রসন্ন দুটি চোখ জিজ্ঞাসু হয়ে আমার দিকে তাকাল।

মিস্ হিটন তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলে তিনি নিজের হাত দুটি অঞ্জলি বেঁধে প্রচুর থুথু সংগ্রহ করে তাইতে সাবানের মতো হাত কচ্‌লে ট্রাউসারের পশ্চাদ্দেশে বেশ মুছে সাফ করে আমার ডান হাতে হাত লাগিয়ে করমর্দনের এক প্রচণ্ড টান দিলেন। সেই মুহূর্তে মনে হলো যে আমার সারা হাতখানা কাঁধের সঙ্গে

আর সংযুক্ত নেই। তাঁর মুখামৃতে পরিষ্কৃত হাতের ছোঁয়াচে আমার দেহে ও মনে একটা অসোয়াস্তি এসে গেলো। কতক্ষণে বাড়ি ফিরে স্নান করে ফের শুদ্ধ হব তার জন্য উদ্‌গ্রীব হয়ে পড়লাম।

প্রফেসর যখন শুনলেন যে, আমি এসেছি তাঁর ছাত্র হতে তিনি আমার কোটের ল্যাপেল দুটি ধরে এক টান দিয়ে বললেন, "এত ভদ্রবেশী লোকেরা যে প্রস্তর-শিল্পী হতে পারে সে বিশ্বাস আমার নেই। তোমার মতো কত লোক এই আতলিয়েতে এসে আমার ধৈর্য এবং সময় নষ্ট করে চলে গেছে! তারা দু'ঘণ্টা পাথর পিটে শক্ত ব্যাপার বুঝে দু' একদিনের পর আর আসেনি।"

তিনি প্রায় আমাকে আতলিয়ে থেকে বের করে দিচ্ছিলেন। সাহস করে বললাম, "কেবল পোশাক দেখে কোনো লোকের কর্মক্ষমতা ও নিষ্ঠার মাপ অনুমান করে নেওয়াটা আমার মনে হয় না সর্বক্ষেত্রে ঠিক। আমি আপনার মূল্যবান সময়ের ক্ষতি করতে চাই না। আমাকে কাজ দিয়ে এক দিনের জন্যে পরীক্ষা করুন এবং অনুপযুক্ত বুঝলে না হয় তখন তাড়িয়ে দেবেন।"

মিস্ হিটনও আমার সপক্ষে একটু উপরোধ করতে তিনি শেষে আমায় ছাত্র করে নিতে রাজী হলেন।

পরের দিন ইঞ্জিন-ড্রাইভারদের মতো ব্লু ওভারঅল কিনে এনে আতলিয়েতে কাপড় বদলে তৈরী হলাম পাথর-কাটার হাতেখড়ির জন্যে।

রু দিদ-র থেকে বেরুনো যে গলির ওপর জিওভানেল্লি-র আতলিয়ে সে রাস্তার দু'ধারে আরও নানান শিল্পী ও কারিগরদের কর্মশালা। এই আতলিয়েগুলির সামনে একফালি জমি। এর প্রবেশপথের দিকের দেওয়ালটার প্রায় সবটা ঘসা কাঁচে ঢাকা। ভেতরে কেবল একখানি চৌরশ বড় কামরা এবং একমাত্র সামনের কাঁচের দেওয়ালে কয়েকটা ছোট ভেনটিলেশন জানালা ছাড়া আর তিনটি নিরেট দেওয়ালে আলো ও বাতাস যাতায়াতের কোনো ফাঁক নেই।

প্রত্যেক কর্মশালার সামনের জমিতে দেখা যেত আতলিয়ে সংক্রান্ত কাজের আবর্জনার গাদা। জিওভানেল্লি-র ঘরের সামনে ছিল ভাঙা পাথর কুচির ছোট বড় কয়েকটি স্তূপ এবং নিকটে সাময়িক শারীরিক ক্রিয়া সম্পাদনের ব্যবস্থা না থাকায় তিনি এবং তাঁর বন্ধুবর্গ অনেকেই ঐ স্তূপগুলির আড়ালে সে কাজ সারতেন। ফলে তাঁর কর্মশালার অস্তিত্ব দরজায় পৌছানোর আগেই নাকের মারফতে লোকে জানতে পারত। আমি প্রথমে এর কারণ না জানায় এই ঝাঁঝালো গন্ধের উৎস কোথায় বুঝে উঠতে পারিনি। একদিন দেখলাম প্রফেসর ঐ স্তূপের আড়ালে দাঁড়িয়ে বাথরুমের কাজ সারছেন। হঠাৎ রাগ সামলাতে না পেরে তাঁকে এই অস্বাস্থ্যকর ও অশিষ্ট অভ্যাস সম্বন্ধে বেশ বড় একটা লেকচার দিয়ে ফেললাম এবং তাঁর থুথু দিয়ে হাত পরিষ্কার করায় আমার মনে যে প্রতিক্রিয়া হয়েছিল তাও জানিয়ে দিলাম। তিনি নবাগত ছাত্রের এ রকম আক্রমণে বেশ আশ্চর্য হয়ে গিয়েছিলেন।

কিন্তু তাঁর এই অভ্যাসের বিরুদ্ধে বিরামহীন ঝগড়া করে শেষ পর্যন্ত ঐ নোংরামি বন্ধ করতে পেরেছিলাম।

মনে আছে, এই ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পরে জিওভানেল্লি আমাকে বলেছিলেন, "বন্ধুদের কামরায় গিয়ে বসে যে আরাম ও খোশগল্প করতাম তার সুখ নষ্ট করেছ তুমি, কারণ তাদের ঘরের আশপাশের পরিচিত গন্ধ আমার নাকে এখন আর সহ্য হয় না। তোমার মতো সোফেস্টিকেটেড লোককে ছাত্র করার এই প্রতিফল।"

বললাম, "অস্বাস্থ্যকর জায়গার বাতাসকে পরিষ্কার করার প্রচেষ্টা মঁ্যসিয়ো ম্য প্রফেসর সোফিস্টিকেশন নয়। ভুলে যাবেন না, আমি ছাড়া একজন ভদ্রমহিলাও এখানে কাজ করে থাকেন। অন্তত এইটুকু শিষ্টাচার তাঁর ন্যায্য পাওনা।"

আমাকে কাজের জন্যে তৈরী দেখে জিওভানেল্লি বললেন, "গলির মোড়ে ক দিদ-র ফুটপাথে একটা মার্বেল পাথর পড়ে আছে সেটা আতলিয়েতে নিয়ে এস।" —বলেই আমার মাথায় একটা খবরের কাগজের টুপি পরিয়ে দিলেন। কিছু বলতে যাবার আগে জানিয়ে দিলেন যে, চারদিকে পাথরের মিহি গুঁড়ো উড়ছে তার থেকে মাথা ও চুল বাঁচাবার জন্য এই ব্যবস্থা।

সেই অদ্ভুত সাজে রাস্তায় দাঁড়িয়ে প্রত্যাশা করলাম সকলে আমার এই সঙগিরি দেখে হাসবে কিন্তু কেউই আমার দিকে ফিরেও তাকাল না। তবুও মনে হতে লাগল, যেন সকলের দৃষ্টি আমার দিকে নিবদ্ধ এবং সেই অসোয়াস্তির অনুভূতি নিয়ে চেষ্টা করলাম পাথরটাকে তুলে ঠেলে গড়িয়ে আনতে। কিন্তু বহু মণ ওজনের সেই পাথরটার এক পাশ একটু উঁচু করে তোলা ছাড়া আর কিছু করা আমার পক্ষে সম্ভব হলো না। দাঁড়িয়ে ভাবতে লাগলাম, আমাকে তাড়াবার এ এক ফন্দি।

কিছুক্ষণ পরে জিওভানেল্লি এসে পাথর না এনে দাঁড়িয়ে আছি বলে বেশ ধমক দিতে শুরু করলেন। বললাম, তাঁর মতো শক্তিশালী মানুষও ওটাকে স্টুডিয়োতে তুলে নিয়ে যেতে পারবে কি-না আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

তিনি বললেন, "তোমায় ওটা উঠিয়ে আনতে বলিনি, বলেছি কেবল আনতে। যাও আতলিয়ে থেকে তিনটে কাঠের মোটা রোলার নিয়ে এস।"

সেগুলি আনতে তিনি পাথরের এক পাশ উঁচু করে তলায় একটা রোলার লাগাতে বললেন এবং তার অন্য পাশেও তেমনি করে আর একটা রোলার লাগানো হলো। তারপর পাথরের সামনের দিকে নীচে ক্রমান্বয়ে রোলার লাগিয়ে সেটাকে সহজে আতলিয়েতে গড়িয়ে আনা গেলো।

এরপর বড় একটা পাথরের টুকরো একটা স্ট্যাণ্ডের ওপর লাগিয়ে বললেন, "এটাকে কাটতে শুরু করো।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কেটে কি তৈরী করব?"

উত্তর এল, "কিছু না, কেবল পাথরটাকে কেটে শেষ করে দাও।"

আড়াই সের ওজনের হাতুড়ি এবং তারই অনুপাতে ভারি মোটা ছেনী দিয়ে

কোনোদিন পাথর কাটিনি। কাজেই আনাড়ির মতো হাতুড়ি ঠিক ছেনীর ওপর পড়ছে কি-না দেখতে গিয়ে তার ফলা পিছলে বাঁ হাতের আঙুল ছড়ে গেলো। পরে ছেনীর ফলা ঠিক পাথরের ওপর পড়ে কাটছে কি-না লক্ষ্য করতে গিয়ে হাতের ওপর হাতুড়ি বসিয়ে দিলাম। রক্তাক্ত ও জখম হাতে ফুঁ দিয়ে যন্ত্রণা নিবারণের চেষ্টা করছি দেখে জিওভানেল্লি জমি থেকে এক মুঠো পাথরের গুঁড়ো নিয়ে হাতের ক্ষতের ওপর ঢেলে এবং ঘষে তার ওপর দুটো চাপড় দিয়ে বললেন, "বাস্, ঠিক হয়ে গেছে আর রক্ত পড়বে না, এইবার কাজ করে যাও।"

পাছে যন্ত্রণা হচ্ছে জানালে আমাকে এ কাজের অনুপযুক্ত বলে তাড়িয়ে দেন তার ভয়ে দাঁতে দাঁত চেপে সহনশক্তিকে যতদূর সম্ভব একত্র করে ফের শুরু করলাম হাত, হাতুড়ি, ছেনী ও পাথরের ঠোকাঠুকি।

প্রায় সাড়ে দশটার সময় দরজায় টোকা পড়তে প্রফেসর বললেন, 'আঁত্রে'। 'বঁজু্র' বলে দরজা ঠেলে লম্বা ফরাসী রুটির লাঠিভরা ঝুড়ি হাতে ঝুলিয়ে প্রবেশ করল এক প্রৌঢ়া। 'বঁজু্র মারি' বলে জিওভানেল্লি তার পশ্চাদদেশে চিম্‌টি দিয়ে তার হাত থেকে একটি লাঠি তুলে নিলেন।

মহিলাটি, 'ওঃ মঁ্যসিয়ো তুমি ভারি দুষ্টু' —বলে কপট ভর্ৎসনার একটা অভিনয় করে হেসে চলে গেলো।

আমি প্রফেসরের ইতরজনোচিত আচরণ দেখে স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। তিনি যেন আমার মনের কথা জেনে বললেন, "তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ যে আমি একটা গর্হিত কাজ করেছি। বিচলিত হয়ো না। এ পাড়ায় সকল শিল্পী ও কারিগরদের রুটি সরবরাহ করে মারি এবং ও মুখে যতই আমাদের এই ব্যবহারে আপত্তির ভান করুক সকলেই জানে যে, ওকে কেউ চিম্‌টি না দিলে তার ভাগ্যে তাজা ও মচমচে রুটি মিলবে না।"

প্রথমে এই ব্যাপারটায় যেন একটা নিকৃষ্ট রকমের রহস্য মনে হতো কিন্তু পরে বুঝেছিলাম যে, এই আপাত অশিষ্টাচারের অন্তরালে কোনো নোংরামি লুকনো ছিল না। কেবল এই কারিগর পল্লীর খেলার ছলে শিশুসুলভ মারির প্রতি স্নেহের এক সরল অভিব্যক্তি মাত্র।

ঠিক বারোটা বাজলে যার আতলিয়ে ছিল রু দিদ-র সদর রাস্তার মোড়ে সে সামনে বাজারের টাওয়ার-এর ঘড়ি দেখে তার পড়শীর দেওয়ালে টোকা দিয়ে বলত, 'ইল্ এ মিদি' —অর্থাৎ এখন বারোটা বেজেছে। অপর জন আবার তার পড়শীর দেওয়ালে ধাক্কা দিয়ে সময় জানিয়ে দিত। এমনিভাবে গলির শেষ প্রান্তের আতলিয়েতে বারোটা বাজার খবর চলে যেতে যদিও সেখানে পৌঁছাতে সময়ের কাঁটা ঘুরে যেত আরও বেশ কয়েক মিনিট। তারপর শিল্পী কারিগররা যে যার কামরায় হাতের যন্ত্রপাতি নামিয়ে কেউ কেউ বা ময়লা হাত সাফ করার ভনিতা করে বসে যেত মধ্যাহ্ন ভোজনে।

এক দলা কড়া চীজ-এ কামড় দিয়ে মচমচে রুটির দু'এক টুকরো মুখগহ্বরে ফেলে বোতল থেকে লালমদিরার এক ঢোকের সমন্বয়ে তারা পৌঁছে দিত খাদ্যকে গন্তব্য স্থানে। আহারান্তে গা এলিয়ে দিয়ে আরম্ভ হতো গল্পসল্প ও ধূমপান। এ পাড়ার বাসিন্দারা প্রায় সকলেই ছিল ইতালিয়ান এবং এদের গল্পের বিষয়বস্তু যাই হোক না কেন প্রতিদিন মুসোলিনিকে অন্তত একবার জাহান্নামে পাঠিয়ে তার মুণ্ড-পাত না করলে তাদের মধ্যাহ্ন ভোজন ঠিক পরিপাক হতো না।

দুটো বাজলেই আবার দেওয়ালে সঙ্কেত-ধ্বনি বেজে উঠত এবং তাঁদের আয়াসে এলানো দেহ কিসের ছোঁয়ায় যেন হঠাৎ চাঙ্গা হয়ে উঠত এবং এসে যেত কর্মের ব্যস্ততা ও তৎপরতা। এমনি করেই পাঁচটা বাজলে সে দিনের মতো কাজ শেষ হয়ে যেত। ওভারঅল খুলে শার্টের আস্তিন নামিয়ে মুখ হাত ধুয়ে-মুছে, টাই লাগিয়ে কোট চাপিয়ে যে যার বাড়ির দিকে ধাবমান হতো।

কয়েক মাস পরে একদিন মারি এল কান্নাভরা মুখ নিয়ে। জানাল, সে আর রুটি সরবরাহ করবে না কারণ সে চলে যাচ্ছে মিদিতে (দক্ষিণ ফ্রান্সে) তার এক ভাইঝির কাছে। সম্প্রতি পিতার মৃত্যুতে সে হয়েছে একটি বড় কাফের অধিকারিণী এবং তার পক্ষে একা ব্যবসা চালানো সম্ভব হবে না বলে সে অনুরোধ করেছে মারিকে সেখানে গিয়ে আমৃত্যু তার কাছে থেকে ব্যবসায় সাহায্য করতে। কোন বিস্মৃতির সীমানা থেকে হঠাৎ এই রক্তের-টানে-আহ্বান মারিকে ব্যাকুল করেছে তার সান্নিধ্যের আকাঙ্ক্ষায়।

রু দিদ-র শিল্পী ও কারিগর সকলে চাঁদা তুলে মারিকে একটা ভালো গরম কোট বিদায়-স্মৃতি হিসাবে উপহার দিলো। সেটা নিয়ে সে হেসে বলল, 'মিদিতে তো শীতে পারীর মতো ঠাণ্ডা পড়ে না। তবুও এটা পরবো এবং তোমাদের স্নেহের কথা মনে করে 'বঁ দিয়ো'-র কাছে প্রার্থনা জানাব যে, তিনি যেন তোমাদের সর্বদা নিরাপদে ও গরমে সুস্থ রাখেন।' তারপর সে হাউহাউ করে কেঁদে ফেললে। আপন ভাইঝির টানের জোর বেশী হলেও রু দিদ-র এতগুলি স্নেহভরা হৃদয়ের বন্ধনকে ছিন্ন করার সঙ্কল্পে মারিকে মনের সঙ্গে অনেক ব্যথার লড়াই করতে হয়েছিল।

পাড়ার বাসিন্দারা একে একে তার অশ্রুসিক্ত গণ্ডে চুম্বনে বিদায় সম্ভাষণ জানাল এবং তাদের অনেকেরই চোখ শুকনো ছিল না। তারপর সকলের কণ্ঠে এক কোরাস বেজে উঠল —বিদায় মারি —আদিয়ো।

পরের দিন রুটি দিয়ে গেলো এক বৃদ্ধ।

বারোটার মধ্যাহ্ন ভোজনে বসে জিওভানেল্লি রুটিতে দু'এক কামড় দিয়ে চিবিয়ে থু-থু করে ফেলে বললেন, 'কি অখাদ্য রুটি দিয়েছে বুড়োটা।' রুটি আসলে মোটেই খারাপ ছিল না কেবল মারির হাতের স্পর্শ পায়নি বলে সে রুটির স্বাদে প্রফেসর সুখ পাননি। সে-দিনের রু দিদ-র শিল্পী-পাড়ায় অনেকেরই মধ্যাহ্ন-ভোজন গলধঃকরণ করতে বেশ কষ্ট হয়েছিল।

জিউসেপি

প্রফেসর জিওভানেল্লি-র আতলিয়েতে নিয়মিত খোশগল্প করতে আগত পড়শীদের মধ্যে বৃদ্ধ জিউসেপি-র উপস্থিতি ছিল প্রায় নৈমিত্তিক ব্যাপার। সকাল কি দুপুর বা অপরাহ্নে কিছু একটা জানবার কি বলবার অজুহাতে তিনি পাঁচ মিনিট বসব বলে সারা বেলাটা ঐখানেই কাটিয়ে দিতেন। অন্য কেউ হলে এই বসে বসে বিনা কাজে বক্‌বকানির জন্য জিওভানেল্লি-র কাছে তাড়া খেয়ে আপন পথ দেখত। বৃদ্ধ জিউসেপি-র কিন্তু ছিল সাতখুন মাপ। মাঝে মাঝে যদিও তাঁর বিরামবিহীন এক-ঘেয়ে বাক্যধারায় আমাদের ধৈর্যের বাঁধ প্রায় ধ্বসে যাবার মতো হতো প্রফেসর তাঁর বিরক্তির আভাস পর্যন্ত মুখে প্রকাশ করতেন না পাছে বৃদ্ধ তা বুঝতে পেরে মনে আঘাত পান।

জিউসেপি আর্তালিয়েতে সকালে এলে প্রফেসারকে 'বঁজু.র জোন ওম' ও আমায় 'বঁজু.র মনাফাঁ' — বলে ভদ্রসম্ভাষণ জানাতেন।

কোনো কারণে জিওভানেল্লি তাঁর কাছে যুবক প্রতিপন্ন হলেও আমি কি কারণে 'শিশুর পর্যায়ে পড়লাম তা বুঝতে না পারায় একদিন তাঁকে সোজাসুজি প্রশ্ন করে বসলাম। আমি জানতাম না যে, এই বৃদ্ধের অবর্তমানে লোকে তাঁর সম্বন্ধে যে আলোচনাই করুক সামনাসামনি তাঁকে প্রশ্ন করবার মতো সাহস অনেকেরই ছিল না।

অপ্রত্যাশিত প্রশ্নে তিনি বেশ আশ্চর্য হয়ে আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে থেকে পরে বেশ রুক্ষস্বরে বললেন, "তোমার বয়েস কত হবে হে ছোকরা!"

বললাম, "তেইশ বছর পার হয়ে চব্বিশে পা দিয়েছি এবং সেটা কি শিশুর বয়েস?"

তিনি বললেন, "তোমার প্রফেসরের বয়েস হচ্ছে ছাপান্ন আর আমি চুরাশিটা শীত কাটিয়ে দিয়েছি। কাজেই হিসাব করে নাও তোমার শিক্ষককে যুবক ও তোমাকে শিশু বলার অধিকার আমার আছে কি-না।"

বিস্ময়ে তাকালাম তাঁর দিকে। প্রায় সাড়ে ছ' ফুট দীর্ঘ ও মেদবাহুল্যহীন তাঁর দেহযষ্টিতে দাঁড়ানো অবস্থায় মাথা থেকে পায়ের গোড়ালির ওপর প্লাম লাইন ফেললে বার্দ্ধক্যের বক্রতার আভাস পর্যন্ত দেখা যেত না। ইস্পাতের মতো দৃঢ় তাঁর মাংসপেশীগুলি যেন সর্বদা দম দিয়ে পাক দেওয়া স্প্রীং-এর মতো সক্রিয় দেখাত।

চুরাশি শীতের ছাপ ছিল কেবল তাঁর চুপ্‌সে-পড়া মুখের শত সহস্র কুঞ্চন ও রেখায়। জিউসেপি হাসলে সেগুলি আরও উঁচুনীচু হয়ে লাঙ্গল-চষা ক্ষেতের মতো দেখাত

রু দিদ পাড়ায় প্রায় সব প্রস্তর-শিল্পীদের আদি বাস ছিল ইতালির মর্মর প্রস্তর-প্রধান কয়ারার শহরে বা পল্লীতে। তাদের মধ্যে সক্ষম অবস্থায় জিউসেপি ছিলেন সেরা কারিগর। পঞ্চাশ বছর আগে প্যারীতে তাঁর সন্তানসম্ভবা স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে কাজে মন-প্রাণ ঢেলে তিনি ভুলতে চেষ্টা করতেন বিয়োগের এই মর্মান্তিক দুঃখ শোককে। জিউসেপি ও তাঁর স্ত্রীর প্রণয় শুরু হয়েছিল কৈশোর থেকে এবং পত্নীর মৃত্যু পর্যন্ত তাঁদের এই প্রেমের জোয়ারে কোনোদিন একটুকুও ভাঁটা পড়েনি। বিপত্নীক বৃদ্ধ এখনও জাগিয়ে রেখেছেন সেই প্রেমের স্মৃতিকে সমানভাবে।

জিওভানেল্লি-র কাছে শুনলাম যে, জিউসেপি-র ঘরে এখনও তাঁর স্ত্রীর সাজ পোশাক, আসবাবপত্র পরিপাটিভাবে সাজানো আছে। তাঁর বন্ধু বান্ধবরা বহু ব্যর্থ চেষ্টা করেছিলেন যাতে তিনি পুনর্বিবাহ করেন। জিউসেপি-র বাইরেটা রুক্ষ বিরস দেখালেও তাঁর অন্তরটা ছিল দয়া মায়া আর স্নেহের রসে কানায় কানায় পূর্ণ। তাঁর দীর্ঘ সবল ও সক্ষম শরীরে বাহ্যত কোনো ভাঙনের চিহ্ন না দেখা গেলেও ভিতরটা সেইমতো সুস্থ ছিল না। দীর্ঘকাল অবিশ্রান্ত পাথরের মিহি গুঁড়ো নিশ্বাসের সঙ্গে ফুসফুসে পলি ফেলতে সেটাকে জমাট করে প্রায় নিরেট করে দিয়েছে। তাই ডাক্তারের নির্দেশ অনুযায়ী তাঁকে এখন পাথর কাটা ছাড়তে হয়েছে।

চিকিৎসকদের ভ্রমই তাঁর স্ত্রীর অকালমৃত্যুর কারণ —এই ধারণা হওয়ায় ফরাসী ডাক্তারদের প্রতি জিউসেপি-র প্রচণ্ড বিদ্বেষ ছিল, তাই প্রথমে তাদের কথায় কাজ বন্ধ করার নির্দেশকে তিনি গ্রাহ্য না করলেও পরে স্বল্প পরিশ্রমে শ্বাসকষ্ট ও মুখে রক্ত ওঠায় বাধ্য হয়ে তাঁকে পাথর কাটা থেকে অবসর নিতে হয়েছে। তাঁর এই অক্ষমতাকে ভুলবার চেষ্টায় বোধহয় তিনি এত ঘন ঘন আসতেন জিওভানেল্লি-র কর্মশালায়।

এই সময়ে নিউইয়র্ক থেকে কোনো এক অর্থপ্রতিষ্ঠালব্ধ শিল্পী প্রফেসর জিওভানেল্লিকে প্রায় আঠারো ইঞ্চি লম্বা একটি প্লাস্টারের ছোট মূর্তিকে পাথরে ছ' গুণ বড় করে নকল করার বায়না দিয়েছিল। মূর্তিটি ছিল তারায়-ভরা কাপড়ের ওপর শয়ান একটি নগ্না নারী এবং এর নাম লেখা ছিল 'রজনী' বলে। মূর্তিটি পাথরে শেষ হলে নিউইয়র্কের কোনো পার্কে শায়িতা থেকে দর্শকদের দৃষ্টি ও মনকে রঞ্জন করবে এই ব্যবস্থা ঠিক ছিল।

জিওভানেল্লি ও তাঁর এক সহকর্মী তিন সেট ক্যালিপার্স নিয়ে এক বিরাট বোর্ডের ওপর মূর্তিটির মাপের ছ' গুণ বড় ঘনত্বের পরিমাপকারি এক ত্রিভুজ এঁকে তার সাহায্যে মাপজোপ করে পাথরখণ্ডের ওপর আক্রমণ শুরু করে দিলেন। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে এক মূর্তির ঘন পরিমাপে ঠিক বহুগুণ বড় বা ছোট মূর্তি নির্মাণ করার পন্থা কবে থেকে ইতালিতে প্রচলিত হয়েছিল বলা শক্ত। দোনাতেল্লো,

ঘিবারতি ও মিকেল আঞ্জেলো প্রমুখ ভাস্কর-রথীরা এইভাবেই পাথর কেটে তাঁদের বিরাট মূর্তির পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছিলেন। বিজ্ঞানের অগ্রগমন আজ বহুবিধ যন্ত্রের উদ্ভাবনে অতীতের মানুষের বহু পরিশ্রমসাধ্য কাজগুলিকে সহজ করে তার কর্ম-ক্ষমতার পরিসরকে বিরাট করে তুলেছে। কিন্তু চিত্রণ ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে আজও রয়ে গেছে বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যবহৃত সেই তুলি, রঙ, ছেনী আর হাতুড়ী এবং তাদের সেই একই প্রয়োগ প্রণালী।

মূর্তিটি পাথরে বড করে নকল করবার সময় জিওভানেল্লি তার গঠনে বহুবিধ ত্রুটিগুলিকে সংশোধন করে তার নব রূপ দিলেন। তার এই উন্নততর নব রূপান্তর দেখে প্রফেসরকে জিজ্ঞাসা করলাম, "পাথরে মূর্তিটি সম্পূর্ণ হলে এর স্রষ্টা হিসাবে কার নাম লিখে দেওয়া উচিত?"

তিনি বললেন, "জানো হে, এই শিল্পীর নামটা পর্যন্ত আমাকে পাথরে কেটে লিখে দিতে হবে কারণ তিনি জীবনে কোনো দিন ছেনীতে হাত দেননি।"

ইয়োরোপ ও আমেরিকার বহু পার্কে, স্মৃতিসৌধে ও শিল্পসংগ্রহশালায় বহু পাথরের মূর্তি নকল ভাস্বরের নাম ও যশকে ঘোষণা করছে কিন্তু সেগুলির আসল স্রষ্টারা রু দিদ-র গরিব ভাস্করদের মতো অজ্ঞাত ও অখ্যাত রয়ে গেছে। যেমন সাহিত্য ও সংগীতের ক্ষেত্রে খেয়ালী ধনীরা কেউ কেউ কুশলী দরিদ্র লেখক ও সুরকারের সাহিত্য ও সুরসৃষ্টিকে অর্থের বিনিময়ে কিনে নিয়ে আপন রচনা বলে নাম জাহির করে আত্মপ্রসাদ লাভ করেছেন এবং করে থাকেন, শিল্পের ক্ষেত্রেও চলে এই নীচ প্রতারণা।

রু দিদ-এ তখন বিত্যাব শিক্ষানবিসি করবার সময় ভাবতে পারিনি যে, একদিন অভাবের তাডনায় আমাকেও নিজের কয়েকটি রচনাকে অপরের নাম এবং খ্যাতির খাতায় সঁপে দিতে হবে।

প্রফেসর জিওভানেল্লি মূর্তিটি কাটতে কাটতে একদিকে প্রয়োজনাতিরিক্ত খানিকটা বাড়তি পাথর থাকায় তার চারপাশে ছোট ছোট গর্ত কেটে তার মধ্যে সূচাগ্র ছোট সাইজের ছেনী কতকগুলি বসিয়ে ক্রমান্বয়ে ঘা দিতে দিতে সেটাকে পরিষ্কার সমান লাইনে খসিয়ে ফেললেন। সেই দানাবাঁধা কারারা খনির পাথরখণ্ডকে পাশের গাদায় আবর্জনা হিসাবে ফেলে দিতে মন চাইল না। কিন্তু তার পরিসর এমন ছিল না যাতে পুরোপুরি নিরেট একটা কোনো মূর্তি গড়া যায়।

এই আতলিয়ের দেওয়ালের চারদিকে লটকানো ছিল মানুষের হাত, পা, মুখ ও শরীরের নানা ভঙ্গিতে ছাঁচে-তোলা প্লাস্টার কাস্ট। এ ছাড়া বহু বিখ্যাত ভাস্করের গড়া মূর্তির প্লাস্টারের প্রতিরূপের কিছু কিছু টুকরোও এখানে ওখানে লাগানো ছিল। আমার সামনে ছিল প্রসিদ্ধ ফরাসী ভাস্কর কারপো-র করা পারীর অপেরাগৃহ অলঙ্কৃত লা দাঁস-এর উদ্দাম নৃত্যকারী মূর্তিগুলির একটির হাসিভরা মুখ। আমি সেই বরানন বাতিল-করা পাথরের টুকরোটা কেটে রূপ দেবার আয়োজন করে ফেললাম।

জিওভানেল্লি আমার তোড়জোড় দেখে কাজ থামিয়ে কিছু একটা মন্তব্য করবার উদ্যোগী হয়ে শেষে কিছু না বলে কেবল ইঙ্গিতপূর্ণ একটা মাথার দোলানি দিলেন অর্থাৎ তাঁর কাছে আমার এই প্রচেষ্টা যেন একটা নিছক পাগলামি।

এই সময়ে বৃদ্ধ জিউসেপি এসে আমার মার্বেল কাটার ব্যবস্থা দেখে বললেন, "ভিক্তর, (জিওভানেল্লি) তোমার এই দিয়াবল্ ছাত্রটি দেখছি কারপো-র নর্তকীর মুখের হাসি কেড়ে নেবার মতলবে আছে।"

তারপর আমাকে শাসিয়ে বললেন, "এটাকে কিন্তু এক সপ্তাহে শেষ করতে হবে এবং তা যদি না করো তা হলে আমি এটাকে ভেঙে ফেলে দেবো আর সেইসঙ্গে তোমার মাথায়ও দু'ঘা বসিয়ে দেবার লোভ সামলাতে পারব না। আমার যারা ছাত্র ছিল তাদের জন্যে এই ব্যবস্থা করেছিলাম। ভিক্তর নিজে কাজ করে ভালো কিন্তু কি করে ছাত্র তৈরী করতে হয় তা জানে না।"

মনে মনে বললাম, 'আমার বহু সৌভাগ্য যে, আপনার ছাত্র হওয়ার যোগাযোগ ঘটেনি।' ভাগ্যবিধাতা বোধহয় আমার প্রতি কিছুটা প্রসন্ন ছিলেন কারণ দিন ছয়েকের মধ্যে মুখটি পাথরে নকল করা শেষ হয়ে গেলো।

জিওভানেল্লি-র প্রশংসার প্রত্যাশী হয়ে যখন পরদিন আতলিয়েতে ঢুকছি বঁজু.র-এর প্রত্যভিবাদন স্বরূপে পেলাম এক প্রচণ্ড ধমক। প্রাচীন শৈলীপন্থী ইতালিয় ভাস্কররা মূর্তির দন্তবিস্ফাবিত হাসিমুখে প্রত্যেকটি দাঁত আলাদা করে কাটেন না, কেবল দন্তপংক্তির স্থান সমান নিরেট কেটে দেন। আমি এ রীতি জানতাম না এবং আরও আমার জানা ছিল না যে, জিওভানেল্লি ছিলেন উৎকট রকমের প্রাচীনপন্থী। কাজেই এই মুখটিতে প্রত্যেকটি দাঁতের আকৃতিকে সুস্পষ্ট করে দেখানোর ফলে সকালেই তাঁর এই আকস্মিক ব্লাডপ্রেসার বৃদ্ধির প্রকোপ। এই অশুভক্ষণে জিউসেপির আবির্ভাবে ভাবলাম এতক্ষণ হিটলার-এর হুমকি হচ্ছিল এইবার হিমলার-এর হামলা হবে অতএব তার আগে চম্পটের ব্যবস্থা দেখা উচিত। কিন্তু সুযোগ করে নেওয়ার আগেই তাঁর লম্বা পেশীবহুল হাত আমার কাঁধ বজ্রমুষ্টিতে ধরে এক নাড়া দিতেই বুঝলাম পরিত্রাণের চেষ্টা করা বৃথা। তিনি অধ্যাপককে বললেন, "কি ব্যাপার, এত চোখমুখ লাল করে চেঁচাচ্ছো কেন, বাড়িতে কি আজ সকালে ঝগড়া করে বেরিয়েছ?"

তাঁর রাগের কারণ শুনে বৃদ্ধ বললেন, "মূর্তির দাঁত দেখিয়েছে তো কি এমন গস্পেল অশুদ্ধ হলো! ওকে আগে জানাওনি কেন, ওর কি করা উচিত ছিল। মিকেল আঞ্জেলোর পথ না ধরে ও যদি বার্নিনির পথে চলতে চায় তো তোমার রুচির গণ্ডি দিয়ে তুমি ওকে রুখতে পারবে কি? কিন্তু সে হবে পরের কথা, এখন অন্তত ভালোভাবে পাথর কাটতে শিখুক।"

আমি বিস্মিত হয়ে ভাবছি জিউসেপি-র আজ এই মধুর রূপান্তরের কারণ কি। কিন্তু এই অবাক কাণ্ড এখানেই শেষ হলো না। তিনি বললেন, "তুমি আমার

কথা রেখেছ এর জন্য তোমার বড় ইনাম পাওয়া উচিত। অপেক্ষা করো, আমি এখুনি আমার বাড়ি হয়ে আসছি।"

অপসৃয়মাণ বৃদ্ধের অভিমুখে জিওভানেল্লিও কিছুটা হতবাক হয়ে দেখে বললেন, "জিউসেপি তোমার জন্যে কি ইনাম আনছে জানি না তবে তোমার সবচেয়ে বড পুরস্কার তাঁর প্রশংসা ও স্নেহ অর্জন। এই বৃদ্ধকে তাঁর স্ত্রীর মৃত্যুর পর থেকে কাউকে নরম করে সম্বোধন পর্যন্ত করতে শুনিনি।"

কিছুক্ষণ পরে কাঠের একটি হাতবাক্স নিয়ে জিউসেপি ফিরে এলেন এবং সেটিকে আমায় দিয়ে বললেন, "এই নাও তোমায় ইনাম। এই বাক্সর মধ্যে পাবে আমার সারা জীবনের কর্মের সহচরগুলি। ভাস্কর্যের প্রতি এবং আমার প্রতি যদি তোমার কিছু শ্রদ্ধা থাকে তা হলে তারই স্মরণে এগুলিকে অবহেলা করো না, এদের উজ্জ্বল, মসৃণ ও সক্রিয় রেখ এই আমার অনুরোধ।"

বাক্সটি খুলে দেখলাম, বিভিন্ন আকারের ফলাযুক্ত নানান রকমের বহু ছেনী এবং পাথর কাটার দুটি ভারী হাতুড়ী। বললাম, "এগুলি নিশ্চয়ই আপনার আপন কাজের যন্ত্রপাতি, আমাকে সম্পূর্ণ উজাড় করে দিয়ে দিচ্ছেন কেন!"

তাঁর অলক্ষ্যে জিওভানেল্লি ঘন ঘন অঙ্গভঙ্গি করে ইঙ্গিত করছিলেন যাতে আর বাক্যব্যয় না করে বাক্সটি নিয়ে ফেলি। আমি মূর্খের মতো প্রায় বলতে যাচ্ছিলাম, তিনি যেন এই ছেনীগুলি ও হাতুড়ীর দামের অন্তত কিছুটা আমাকে দিতে দেন। প্রফেসর ততক্ষণে ধৈর্য হারিয়ে চিৎকার শুরু করে দিয়েছেন, "আর কতক্ষণ ভনিতা করে ক্লান্ত জিউসেপিকে দাঁড় করিয়ে রাখবে। তোমার মাথায় কি এখনও চেতনা হয়নি যে এই অমূল্য উপহার খুব অল্প লোকের জীবনে মিলে থাকে।"

বাক্সটি নিয়ে বললাম, "সিনর জিউসেপি, আপনার এই মহান্ দানে আমার হৃদয় কৃতজ্ঞতায় অভিভূত। তাকে ভাষায় কেবল ধন্যবাদ জ্ঞাপনে ব্যক্ত করার বৃথা প্রয়াস করব না। আপনার আশীর্বাদে একদিন যেন এই সম্মানের যোগ্য অধিকারী হতে পারি।"

ঐ বাক্সে কেবল জিউসেপি-র নিজের ব্যবহৃত ছেনী হাতুড়ী ছিল না তাঁর পিতা ও পিতামহেরও ব্যবহার করা জিনিসও ছিল। বংশ পরম্পরায় এই পরিবার কত শতাব্দী ধরে ধারাবাহিকভাবে পাথরে মূর্তি গড়ে এসেছে। আজ নিঃসন্তান জিউসেপি-র জীবনে সেই ধারা নিঃশেষ হয়ে যাবে। উপলব্ধি করবার চেষ্টা করছিলাম —এই দানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে তাঁর কতখানি পুঞ্জীভূত আফসোস।

তিনি চলে গেলে প্রফেসার বললেন, "তুমি যদি ইচ্ছে করো তা হলে জিউসেপি-র চিকিৎসার খরচের জন্য কিছু অর্থ আমার হাতে দিও কারণ ওঁর তো আর কোনো সঙ্গতি নেই। আমরাই চাঁদা করে মাঝে মাঝে ওঁর চিকিৎসার খরচের ব্যবস্থা করি, তাও ওঁকে না জানিয়ে, পাছে ওঁর মনে আঘাত লাগে এই ভেবে যে আমরা ওঁকে দয়া দেখাচ্ছি।"

দু' একদিন পরে জিউসেপি এসে বললেন, "জানো হে, আজকাল পৃথিবীতে বেশ কিছু আশ্চর্য পরিবর্তন দেখা যাচ্ছে। কাল এক ফরাসী ডাক্তার আমার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করতে এসেছিল। তাকে যখন বললাম, আমি তোমায় ডাকিনি এবং তোমায় ফি দেবার মতো আমার সামর্থ্য নেই, আর থাকলেও দিতাম না। কারণ ফরাসী ডাক্তারদের অজ্ঞতার ফলে আমার স্ত্রীর অকালমৃত্যু ঘটেছে। আবার তোমাদের আমার প্রতি সেই পরীক্ষার পুনরাবৃত্তি করতে দেবার কোনো ইচ্ছে নেই। সে উত্তর দিলো যে, আমার অসুস্থতার সংবাদ লোকের কাছে শুনে নিজে থেকেই সে এসেছে এবং আমার মতো ভাস্করের স্বাস্থ্য পরীক্ষার সুযোগ পাওয়াটাই তার সবচেয়ে বড় পারিশ্রমিক, তার অন্য কোনো ফি-র প্রয়োজন নেই। যে জাতের লোকেরা অর্থের বিনিময়ে নিজের আত্মাকে শয়তানের হাতে তুলে দিতে ব্যগ্র তাদেরই একজনের মুখ থেকে এই উক্তি বেশ কিছু বেথাপ্পা শোনাল।"

আমার দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন, "জানো হে ছোকরা, ফরাসীরা দানের অর্থ বোঝে না। এদের কেউ যদি কিছু এমনি উপহার দেবার চেষ্টা করে তো তার পিছনে কোনো ফন্দি আছে ভেবে এরা সহজে গ্রহণ করবে না। তুমি পারমান্তিয়ে-এর গল্প শুনেছ ?"

'না' বলায় বললেন, "ফরাসী মেন্যুর অমলেৎ পারমান্তিয়ে নিশ্চয়ই খেয়েছ। এই অমলেৎ-এ ভাজা আলু থাকায় তাঁর নামকে উল্লেখ করা হয় কারণ ব্রেজিল থেকে ফরাসীদেশে প্রথমে আলু নিয়ে আসেন এক মঁ্যসিয়ো পারমান্তিয়ে। বহুদিন বিদেশে থাকায় তিনি তাঁর স্বজাতির স্বভাবধর্মকে ভুলে গিয়েছিলেন। তাই দেশে ফিরে তিনি সকলকে ডেকে আলু বিতরণ শুরু করে দিলেন যাতে তারা খেয়ে জানতে পারে এর মুখরোচক আস্বাদকে। কিন্তু তাদের কেউই এই যেচে দেওয়া জিনিসকে নিতে প্রস্তুত হলো না। সহসা মঁ্যসিয়ো পারমান্তিয়ে-এর মনে পড়ে গেলো কি উপায়ে তাঁর দেশবাসীকে আলুর আস্বাদের বশবর্তী করা যায়। তিনি আলুগুলি নিজের বাগানে পুঁতে চারদিকে তারের জালের বেড়া তুলে নোটিস টাঙিয়ে দিলেন— 'বাগানে প্রবেশ নিষেধ। মূল্যবান সব্জি বপন করা হয়েছে।' সেইদিন রাতে তাঁর বাগান লুঠ হয়ে সমস্ত আলু চুরি হয়ে গেলো। তারপর থেকে ফরাসী জাত আলু খেতে অভ্যস্ত হয়েছে।"

আমরা হেসে উঠলাম শুধু তাঁর রহস্যে নয় জিওভানেল্লি-র নির্দেশ মতো চিকিৎসকের নিপুণ অভিনয়ে এবং এর জন্যে তাঁর বরাদ্দ চিকিৎসার পারিশ্রমিক ছাড়া তাঁকে আলাদা আর কোনো ফি দিতে হয়নি।

প্যারী

এক শুক্রবারে আতলিয়েতে পৌঁছাতে জিওভানেল্লি আমায় দেখেই রোসিনির বারবার্ অফ্ সেভিল্-এর এক আরিয়া ভাঁজতে শুরু করে দিলেন।

বললাম, "প্রফেসর-এর আজ দেখছি যে ভারি মেজাজ খুশ্।"

তিনি গান থামিয়ে খুব ভালোভাবে হাত সাফ করার ভনিতা করে পকেট থেকে বের করলেন একটি ভিজিটিং কার্ড। সেটিকে অতি সন্তর্পণে দু' আঙুলে ধরে নাকের কাছে নিয়ে একটা আঘ্রাণের লম্বা টান দিলেন, যেন কত আতরের সুগন্ধ কার্ড থেকে বেরিয়ে তাঁর নাসারন্ধ্রে সুবাসের সুখানুভূতিতে ভরে দিলো। এত অভিনয়ের কারণ শেষ পর্যন্ত দাঁড়াল যে, মিস্ হিটন তার কার্ডের পিছনে পরের দিন আমাকে তাঁর আতলিয়েতে চায়ের নিমন্ত্রণ জানিয়েছেন।

রুদে প্লাঁত রাস্তার দু'ধারে অনেকগুলি ইমারত যেগুলিতে কেবল শিল্পীদের জন্য তৈরী আতলিয়ে ফ্লাট ছাড়া অন্য কোনো ব্যবস্থা নেই। সঙ্গতিসম্পন্ন শিল্পী বা শিল্পীর পেশার ভানকারি ধনীদের আবাস এগুলি। প্রত্যেকটি ফ্লাট-এ একটি ছাদ-উঁচু আতলিয়ে কামরা যার বাইরে-মুখ-করা দেওয়ালে আছে বারো কি চৌদ্দ ফুট লম্বা-চওড়া কাঁচের জানালা। এরই মাঝখানে আবার ফ্রেঞ্চ উইনডো যার সামনে ঝোলা বারান্দায় গেলে প্লেন গাছে ভরা রাস্তার মনোরম দৃশ্য দেখতে পাওয়া যায়। দিনের বেলায় নক্‌সাদার লেস্-এর মতো জালি-পর্দায় ঢাকা জানালা দিয়ে জৌলুষ নিঙড়ে-ফেলা দিনের আলো ঘোলা হয়ে ভেতরে আসে কিন্তু বাইরে থেকে অন্দরের কিছু দেখতে পাওয়া যায় না অথচ কামরার ভেতর থেকে বাইরের দৃশ্য বেশ পরিষ্কার দেখা চলে। রাতে আলো জ্বাললে দিনের বেলার আব্রু জালি-পর্দায় আর রক্ষা হয় না বলে ভারি ভেল্‌ভেটের মোটা পর্দা টেনে দেবার ব্যবস্থা আছে। জানালার উল্টো দিকের দেওয়ালের এক পাশ দিয়ে সিঁড়ি, ছাদ আর মেঝের মাঝ বরাবর খানিকটা ঢাকা ছাদের ওপর গ্যালারি পর্যন্ত। এই গ্যালারির একটা অংশে বাথরুম ও রান্নার ঘর এবং অপর দিকে শোবার ঘর আর মাঝখানের অংশে বসবার ঘরের কাজ সারা যায়।

ধনীনন্দিনী মিস্ হিটন-এর আতলিয়েতে পৌছে দেখি চায়ের রীতিমতো আয়োজন হয়েছে। কাঁচে ঢাকা গোল টেবিলের ওপর ফরাসী পেস্ট্রি ও মিঠাই-ভরা প্লেটগুলি ফুলের তোড়ার মতো শোভা পাচ্ছিল।

তাঁর অতিথিদের মধ্যে আমি ছাড়া উপস্থিত ছিলেন হিটলার-পীড়িত প্রাচ্য ইয়োরোপীয় এক দেশের ডাঃ. লিট্‌না ও তাঁর ইংরাজ স্ত্রী, মাদাম্ মিউভিল এবং এক চৈনিক অধ্যাপক। ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী ডাঃ. লিট্‌না দেশত্যাগী এবং তাঁর কথার বিষয়বস্তুতে সর্বদা পলিটিক্স-এর ঝাঁজ ঘুরে ফিরে আসছিল। চীনা অধ্যাপক

নির্বিকার শ্রোতা হয়ে তাঁর সদাপ্রসন্ন মুখে মাঝে মাঝে হাসির চিড় খাইয়ে দেখাচ্ছিলেন যে, তিনি আমাদের সব কথা মন দিয়ে শুনছেন কিন্তু তিনি যাবার আগে বিদায় সম্ভাষণ ছাড়া আর একবারও কথা বলেননি!

ডাঃ. লিট্‌না প্রশ্ন করলেন, "তোমরা কি সত্যি বিশ্বাস করো যে, গান্ধির অহিংস পন্থায় তোমাদের দেশ স্বাধীন হয়ে যাবে?"

বললাম, "বিশ্বাস না করলে এত শত-সহস্র ভারতবাসী তাঁর কথামতো আন্দোলন করে স্বেচ্ছায় কারাবরণ ও উৎপীড়ন সহ্য করছে কেন?"

শুনে তিনি একটি বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, "অহিংস আন্দোলনে ইংরেজের বিরাট সামরিক শক্তিকে প্রতিহত করবার স্বপ্ন দেখা বাতুলতা মাত্র। তোমরা যদি স্বাধীনতা সত্যিই পেতে চাও তা হলে, হয় ইংরাজ-বিরোধী অন্য সামরিক শক্তিমান জাতির সৈন্যবাহিনীকে আহ্বান করে ওদের হটাবার ব্যবস্থা করা উচিত অথবা গোপনে হাল্‌কা অথচ ফলদায়ক এমন আধুনিক আয়ুধ অন্য দেশ থেকে সরবরাহ করে দেশের লোককে গেরিলা যুদ্ধে পারদর্শী করে ব্যাপক অভিযানের আয়োজন করতে হবে।"

উত্তর দিলাম, "মহাশয়, আপনার দেশের হিটলার-এর পদলেহী ফ্যাসিষ্ট শক্তিকে এই পন্থায় হটাবার ব্যবস্থা করেছেন বুঝি? কিন্তু ফ্যাসিজম তো কেবল অস্ত্রবলে বলীয়ান একটা সামরিক শক্তি নয়, এটা তার উদ্দেশ্যকে সিদ্ধ করবার একটা অঙ্গ মাত্র। ফ্যাসিজম-এর অভিব্যক্তি ঘটেছে একটা বিশিষ্ট চিন্তাধারায় যার অবলম্বনে ও বিশ্বাসে জন্মেছে এই শক্তি। ভারতবাসীর স্বাধীনতার ঐকান্তিক ধারণা থেকে যে শক্তি জন্ম গ্রহণ করবে তাকে কামান বন্দুক দিয়ে প্রতিহত করা যাবে না। জানেন কি গান্ধিজীকে একবার গ্রেপ্তার করলে তিনি বলেছিলেন, 'তোমরা শরীরকে কারারুদ্ধ করছ কিন্তু আমার দেশ-স্বাধীনতার চিন্তাকে তোমরা কোনোদিন বন্দী করতে সক্ষম হবে না।' যখন ক্রিশ্চিয়ানিটি প্রথম বিরাট রোমক সামরিক শক্তির সম্মুখীন হয়েছিল একমাত্র ধর্মের গভীর বিশ্বাস ছাড়া তাদের আর কোনো অস্ত্র ছিল না। সে সময় আমার মনে হয়, আপনার মতো অনেকে নিশ্চয়ই ঐ পাশবিক শক্তিকে অজেয় মনে করেছিলেন এবং ভেবেছিলেন যে, তার প্রকোপে ক্রিশ্চিয়ানিটি বিলুপ্ত হয়ে যাবে। দাসত্বের মুক্তিকামী স্পার্টাকাস রোমক শক্তির বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ না করে যদি অহিংস পন্থায় বিরোধিতা করত তা হলে তার আত্মত্যাগে যে শক্তির সঞ্চার হতো তাকে সহজে রুদ্ধ ও বিনষ্ট করবার মতো সামর্থ্য তদানীন্তন রোমক সামরিক শক্তির দীর্ঘকাল বজায় থাকত কি-না সন্দেহ।"

তিনি বললেন, "হিংসা বা অহিংসা যে-পন্থাই হোক রোমক শক্তির বিরুদ্ধাচরণে স্পার্টাকাস এবং তার অনুচরবর্গ একবার কেন দশবার ক্রুশবিদ্ধ হয়ে প্রাণ হারাত।"

বললাম, "না মহাশয়, ফল কিছুটা তফাৎ হতো। অহিংসভাবে আন্দোলন

করে স্পার্টাকাস বিফল হলেও ইতিহাস তাকে আজ বলত মার্টার এবং যুগযুগ ধরে সে মানবধর্মে বিশ্বাসীদের কাছে পেত সম্মান ও সহানুভূতি। কিন্তু জিঘাংসার পথ নিয়ে মুক্তিকামী স্পার্টাকাসের মৃত্যু ইতিহাসের পাতায় একটা সামান্য বিদ্রোহ-দলন মাত্র।"

লিটনা-পত্নী অন্য মন্তব্য করে আমাদের তর্কের মোড় ঘুরিয়ে দিলেন। তাঁর মতে আমরা অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ জাত। ইংরাজ অসভ্য ও অনুন্নত ভারতবাসীদের উপকারার্থে শহর, রাজপথ, সেতু, রেলপথ, বড় বড় ইমারত ইত্যাদি নির্মাণ করেছে এবং আমাদের সভ্য করার চেষ্টা করেছে। আমরা তাদের অনুগত থেকে এই উপকারের সুযোগ না নিয়ে অকৃতজ্ঞতা ও নির্বুদ্ধিতার বশবর্তী হয়ে আন্দোলন করছি এবং এর চেয়ে বড় অন্যায় আর কি হতে পারে! আমাদের না আছে আত্মরক্ষা বা দেশরক্ষার সৎসাহস, সামর্থ্য ও আশয়। রক্ষক ইংরাজ আমাদের ছেড়ে চলে গেলে নৃশংস কমিউনিস্ট রাশিয়ানরা ভারত অধিকার করে ভারতবাসীকে তাদের দাস বানিয়ে উৎপীড়ন আরম্ভ করে দেবে। আমরা এ সব কথা একবার ভাবলে এমন মতিচ্ছন্ন হতাম না।

মাদাম্ লিটনাকে এর সঠিক জবাব দিলে জানতাম যে, সেখানে বসে চা খাওয়া আর সম্ভব হতো না এবং মিস্ হিটনের সঙ্গে বাক্যালাপ বন্ধ হয়ে যাবার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। দুঃখের বিষয় যে, এই ভ্রান্ত ধারণা কেবল লিটনা-পত্নীর একার নয় আজও সারা ব্রিটেনে লক্ষ লক্ষ লোকে এই একইভাবে চিন্তা করে এবং ভারত সম্বন্ধে অবিচার করে। দুই শতাব্দীর রাষ্ট্রীয় সান্নিধ্য সত্ত্বেও ব্রিটেন নিজ সাম্রাজ্য শাসনপদ্ধতির সাফাই গাইবার একটা কপট অভিমতকে আপন দেশবাসীর মধ্যে বিজ্ঞাপন দেওয়ার অভিসন্ধিতে ভারতীয় জন ও সংস্কৃতির সম্বন্ধে কত মিথ্যা অপবাদ রটনা করে চলেছে এবং সেই ভুল ধারণা ব্রিটিশ জনগণের মনে এখনও বদ্ধমূল হয়ে আছে।

নিজেকে সংযত করতে না পেরে বললাম, "মাদাম্, কেবল কিংবদন্তির ওপর বিশ্বাস করে আমাদের দেশ ও জাতি সম্বন্ধে এতগুলি কটূক্তি না করে যদি সত্য জানতে ইতিহাসে একটু চোখ ফেলে দেখতেন তা হলে আপনার উপলব্ধি হতো যে, আমাদের উপকারার্থে বৃটিশ সরকার রাজপথ, রেলপথ, সেতু, ইমারত ইত্যাদির কোনোটাই তৈরী করেননি। এগুলি করার আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে, অনায়াসলভ্য মোটা রেভিনিউ-র লোলুপতায় নামমাত্র পারিশ্রমিকজীবী সস্তার জনমজুরদের খনি ও কারখানায় প্রেরণের সুবিধার জন্য ও প্রায় পড়ে পাওয়া কাঁচামাল ভারত থেকে রপ্তানি করে সহজে পয়সা বানাবার চেষ্টায়। ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভলিউশান সফল করতে যে সোনাদানার প্রয়োজন হয়েছিল তার বেশীর ভাগই লুণ্ঠন করা হয়েছিল এই অভাগা দেশ থেকে। রাজ্ঞী ভিক্টোরিয়ার আমলে প্রত্যেকটি স্টারলিং-এর চার ভাগের প্রায় তিন ভাগ এসেছিল ভারতের ধনভাণ্ডার শোষণ করে। আমাদের

দেশের অশিক্ষিতের সংখ্যাধিক্য জ্ঞাপন করতে আপনার বিস্ময়ে ওপরে ওঠা ভুরু মাথার চুলের কিনারায় ঠেকে ধাক্কা খেতে চায় কিন্তু আমাদের দেশের বৃটিশ সরকার ভারতবাসীর শিক্ষাকল্পে যে ব্যয় বরাদ্দ করে তা শুনলে আপনার বিবেকে যদি বিশ্বাস থাকে তো আড়ষ্ট হয়ে ঐ ভুরু আর নীচে নামতে চাইবে না। সারা বছরের শিক্ষাকল্পে প্রতিটি ভারতবাসীর জন্য বৃটিশ সরকার গড়ে দুই পেনির মতো অর্থ ব্যয় করতে প্রস্তুত। বড়ই দুঃখের কথা যে, সরকার থেকে এত বড় দান পেয়েও আজ ভারতে শতকরা তিরানব্বই জন নিরক্ষর। আর বৃটিশ ন্যায়-বিচারের কথা বলছেন —ওয়ারেন হেস্টিংস-এর আমলে ভারতবাসী কলকাতা শহরে ব্যবসা করতে চাইলে তাদের মাশুল দিতে হতো কিন্তু ইয়োরোপীয় হলে বিনা মাশুলে তাদের ব্যবসা করার অধিকার ছিল। হেস্টিংস যখন বলেছিলেন, এ অন্যায় প্রথা এবং এটা বন্ধ হওয়া উচিত তখন তাঁকে অসাধু বলে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল এবং মিথ্যা অপবাদ দিয়ে আদালতে তাঁর বিরুদ্ধে মামলা শুরু হয়েছিল। তাঁর সারা জীবন ব্যাপী এই মামলায় যখন তাঁকে নির্দোষ প্রতিপন্ন করে মামলার নিষ্পত্তি হলো তখন সুনামহানি ও অর্থহানির জন্য হেস্টিংসকে ক্ষতিপূরণ হিসাবে কিছুই দেওয়া হয়নি।"

মিস্ হিটন বলে উঠলেন, "অনুরোধ করছি ম্যঁসিয়ো, আর আমাদের হেয় করো না। যদি এমনি করে আমাদের কলঙ্কের ফিরিস্তি দিতে থাকো তা হলে আমার আতলিয়ের সাদা দেওয়াল কালো হয়ে যাবে।"

তাঁর আতিথ্য গ্রহণ করে হঠাৎ এতগুলি অপ্রিয় সত্য কথা বলে ফেলার জন্য তাঁর কাছে মাপ চাইলাম।

ডাঃ. লিট্‌না বললেন, "যে অবিচার, অন্যায় ও পরধন শোষণের কথা বললে সেটা টিউটন জাতির একটা মজ্জাগত দোষ। তারা যেখানেই গিয়েছে সেখানেই দেখিয়েছে আসুরিক শক্তির দম্ভ ও দুর্বলের ওপর পীড়ন। এই জাতের চরম প্রতীক হচ্ছে হিটলার।"

উপস্থিত তিনজন ইংরাজ মহিলা সমস্বরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "আমাদের জাতকে যত খুশী গালাগালি দাও কিন্তু ঐ পাষণ্ডের সঙ্গে বা তার স্বজাতের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক তুলে অপমান করো না।"

সমষ্টিগতভাবে কোনো জাতির স্বভাবধর্ম নৃশংস ও হীন বলে দোষারোপ করা অন্যায় হবে কিন্তু হিটলার-এর ইহুদী-পীড়নের নির্মম অত্যাচার ও হত্যা প্রণালীর অভিনবত্বে সারা জগতে যে মর্মান্তিক গ্লানির সৃষ্টি করেছে তার কালিমাকে মুছে ফেলতে সারা জার্মান জাতিকে বহু যুগ ধরে প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে।

মধ্যযুগে যে কারণে ইহুদী-পীড়ন হয়েছিল বর্তমানের বিদ্বেষ তাকে উপলক্ষ্য করে নয়। ঊনবিংশ শতাব্দীতে জার্মানী ও অস্ট্রিয়ায় স্বার্থাভিসন্ধক দু'একটি রাষ্ট্রীয় দল রাজনৈতিক মন্দ পরিস্থিতির জন্য ইহুদীদের মিথ্যা দায়ী করে জনমতকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করেছিল। প্রিন্স বিস্‌মার্ক, প্রিন্স লেইস্‌তেন্‌ষ্টাইন, অস্ট্রিয়া ও হাঙ্গেরির

রক্ষণশীল দল তৎকালীন রুমানীয় সরকার, চার্চের পক্ষাবলম্বীরা এমন কি পোপ পর্যন্ত ইহুদীদের সকল পাপ বহনকারী ছাগের পর্যায়ে ফেলে নিজেদের স্বার্থাভিসন্ধি পূরণের পন্থা অবলম্বন করেছিলেন। ইহুদীরা ইষ্টার ব্রতের জন্য তৈরী রুটিতে মানুষের রক্ত মেশায় এই মিথ্যা অপবাদ প্রচারে রাশিয়া ও পোল্যাণ্ডে তাদের লক্ষ লক্ষ আবালবৃদ্ধের নির্মম হত্যাকাণ্ড ও সহস্র সহস্র ইহুদী রমণীর পাশবিক ধর্ষণ অত্যাচার ও পরিশেষে প্রাণনাশের পিছনে ছিল রাজনৈতিক দুরভিসন্ধি। ফ্রান্সে ঘৃণ্য ড্রাইফুস্ কেস-এর উৎস ছিল ঐ একই কারণ। সারা ইয়োরোপে প্রায় দুই শতাব্দীতে জমা ইহুদী পীড়নের কদর্যতম রূপ ধরেছে জার্মান ফুরের হিটলার-এর প্রতিষ্ঠায়।

যে লক্ষ কোটি ইহুদী তার কবলে পড়ে পাশবিক নির্যাতন ও পরিশেষে হত্যার বিবিধ ও অভিনব পন্থায় নিহত হয়েছিল তাদেরই একজন ছিল স্সারা। সে ছিল জাতে পোল ও ইহুদী। আর্যরক্ত সংরক্ষণ ও সভ্যতা শুদ্ধিকরণের দাবানলকে এড়িয়ে পারীতে এসে সে ভেবেছিল এবার পরিত্রাণের সীমানায় পৌঁছে আরম্ভ করবে নতুন জীবন। আমার সঙ্গে তার আলাপ হয়ে গেলো এক বন্ধুর ডেরায়। সে খুঁজছিল, তাকে বিনা পারিশ্রমিকে ইংরাজী শেখাতে রাজী এমন কাউকে। বন্ধু প্রস্তাব করলেন যে, আমরা যদি দু'জন ইংরাজী ও ফরাসী ভাষা শেখার বিনিময় করি, তা হলে কেউ পারিশ্রমিক দিচ্ছে না এই দ্বিধা মনে আসার কোনো কারণ থাকবে না। পরিচয় একটু পুরনো হলে স্সারার অনুরোধে তাকে ভারতীয় প্রথায় আঁকা আমার কয়েকখানি ছবি দেখিয়েছিলাম।

তারপর আবার যে-দিন আমরা ভাষা শিক্ষার ক্লাস করতে বসলাম সে একটু ইতস্তত করে বলল, "তোমার ঐ ছবিগুলি আমার মনকে রীতিমতো আকৃষ্ট করেছে। কিন্তু ক্ষোভের বিষয় এই যে, আপন দেশ থেকে আমি বিতাড়িতা দরিদ্রা রেফিউজি। আমার এমন সঙ্গতি নেই যে মূল্য দিয়ে তোমার রচনার একটি কিনতে পারি। কিন্তু এর একটি পাওয়ার আর কোনো উপায় না দেখে ভেবে ভেবে যে আকাশকুসুমকে চোখের সামনে খাড়া করেছি সেটা তোমাকে বলে ফেলে অন্তত মনকে হাল্কা করে ফেলতে চাই। তোমার ছবির দাম নিশ্চয়ই অনেক এবং আমার সাধ্যাতীত। কাজেই মূল্য জিজ্ঞাসা করার ধৃষ্টতা ছেড়ে তোমায় আমি অনুরোধ করছি যে, আমাকে তোমার কোনো কাজ করতে দাও এবং যতদিন না সেই কাজের পারিশ্রমিক তোমার ছবির দামের সমান হয় ততদিন পর্যন্ত খাটতে প্রস্তুত আছি।"

বললাম, "মাদ্ময়াজেল আমি এক গরিব শিল্পশিক্ষার্থী, কি কাজ তোমায় দিতে পারি যার জন্যে পারিশ্রমিক দেওয়া যেতে পারে।"

সে বলল, "তোমরা তো শিল্পানুশীলনে মডেল নিযুক্ত করো আমি তোমার মডেলের কাজ করতে প্রস্তুত। অবশ্য বিবসনা হয়ে জীবনে কখনও অপরের সামনে

দাঁড়াইনি। আজ সে লজ্জাকে ভাঙবার মতো সাহসকে আনতে পারব কি-না যথেষ্ট সন্দেহ আছে।"

তার প্রস্তাবে হতবাক হয়ে আমি কি জবাব দেবো ভাবছি দেখে সে ভুল বুঝে বলল, "ও কি আমার বোকামি! আমার শরীরের গঠন তোমার শিল্পাদর্শের উপযোগী কি-না না দেখে কেমন করে তুমি রাজী হবে যে আমি মডেলের পারিশ্রমিক অর্জনের যোগ্যা। যদি রাজী হও তো আমি চেষ্টা করব আমার শরীরের গঠনকে তোমার সামনে দেখাতে এবং যদি দেখো যে, আমি কাজের অযোগ্যা তা হলে যে প্রস্তাব করেছি তা ভুলে যেও। আমি মনকে বোঝাব যে, আমার মতো দীনার শিল্পবস্তু সংগ্রহের লোভ সংবরণ করা উচিত।"

"এ বিষয়ে পরে কথা হবে" —বলে পরের ভাষাচর্চার ধার দিনে আমার ছবি-গুলির একটি এনে তাকে উপহার দিলাম।

সে জিজ্ঞাসা করল, কবে থেকে তাকে মডেলের কাজ আরম্ভ করতে হবে। তাকে আমার মডেল হতে হবে না বলায়, ভীষণ আপত্তি করে স্যারা বলল, "বিনামূল্যে আমি কোন স্পর্ধায় এ ছবি নিতে পারি! অন্তত তুমি যতদিন পারীতে আছ আমায় তোমার ময়লা জামা-কাপড় কেচে সাফ করতে দাও এবং ছিঁড়ে যাওয়া মোজাগুলি আমায় রিপু করতে দেবে। এটা ঋণশোধের চেষ্টা বলে মনে করি না, কিন্তু তার একটি ভান-করা তৃপ্তির প্রচেষ্টা থেকে আমাকে বঞ্চিত করো না।"

বললাম, "এ সামান্য ছবির দাম দেওয়ার জন্য এত ব্যতিব্যস্ত হচ্ছ কেন? এর বাস্তব মূল্য তো কেবল পঞ্চাশ সাতিম্-এর (পুরনো ছ'পয়সার সমান) একখানা কাগজ আর সামান্য কয়েক ফ্রাঙ্কের রঙ। কিন্তু মনের জগৎ থেকে আহরণ করে যে রূপকে এই কাগজখানার ওপর রাঙানো হয়েছে তার সঠিক মূল্য দিতে পারে এমন মুদ্রা আজও তৈরী হয়নি। ক্রেতা আপনার মন ঠকায় শিল্পীকে তার পারিশ্রমিকের উপযুক্ত মূল্য দিয়ে তাকে কৃতার্থ করেছে ভেবে, আর শিল্পী সে মূল্য পেয়ে ভাবে, এ হলো তার দৈনন্দিন তৈল ইন্ধনের সমস্যার সাময়িক সমাধান এবং এর ফলে উদরান্ন সংস্থানের দুশ্চিন্তা থেকে কিছুকাল অব্যাহতি পেয়ে সে মনের জগতে রূপের খোঁজে বেপরোয়া ঘুরতে পারবে। কাজেই এ ছবির পয়সায় দাম নেই মাদ্‌ময়জেল। শিল্পী তার মনের গহনে চিন্তার বনপ্রান্তরে চলতে চলতে কোন অভিনবের সাড়া পেয়ে আনন্দে ও বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে যায় এবং তারই একটা রূপ ভেবে নিয়ে ছকে, রঙে বা গঠনে ফেলে চায় আবার সেই অনুভূতির উচ্ছ্বাসকে বারেবারে নতুন করে উপলব্ধি করতে। তারপর সে চায় সেই উপলব্ধিকে অপর অনেকের মনে জাগিয়ে তার সৃষ্টির আনন্দের ভাগ দিতে। তাই সে শিল্প সৃজন করেই সম্পূর্ণ তৃপ্ত হয় না, দেখাতে চায় তার সৃষ্টিকে জগৎ জনকে। তার রচনা সার্থক হয় যখন অন্য কেউ শিল্পীর অনুভূতির অংশীদার হয়ে এই নবসৃষ্টির তোরণ

পেরিয়ে চলতে থাকে তার কল্পরাজ্যের রাজপথে, হাটে বা বাগানে এবং তখনি সে দর্শক দিয়ে ফেলে শিল্পের প্রকৃত মূল্য। মাদ্ম্যয়জে.ল, তুমি বোধহয় না জেনে দিয়ে ফেলেছ এ ছবির মূল্য, একে পাবার ঐকান্তিক আগ্রহ দেখিয়ে।"

স্যারা স্বপ্ন দেখত তার প্রেমে মুগ্ধ ছেলেবন্ধু একদিন হবে তার ফিঁয়াসে এবং তারপর সংসারের ভার নেবার মতো অর্থাগম হলে তারা বিবাহ করে বাঁধবে ঘর। তাদের দাম্পত্য নীড়ে সুখদর্শনের স্মারকের একটি হবে এই ছবিখানি। তার বন্ধুকে স্যারা প্রায় দশবার সবিস্তারে জানিয়েছিল কেমন করে সে আমার কাছ থেকে ছবিখানি আদায় করেছে।

যুদ্ধান্তে পারীতে ফিরে হারিয়ে যাওয়া বন্ধুদের খোঁজে পেলাম স্যারার খবর। হিটলারীয় ইহুদীবিনাশী অনুসন্ধানীদের কবলে পড়ে তার সুখস্বপ্নের শেষ হয়ে যায় গ্যাস চেম্বারে। ব্যাপক হত্যাকাণ্ডের বেলাভূমিতে স্যারা একটি বালুকণা মাত্র, যার সর্ব অস্তিত্ব হতসমষ্টির রাশিতে লুপ্ত হয়ে গেছে।

ডাগারম্যান, স্ফ্যাক্স্ এবং প্যাটারসন স্মিথ

আতলিয়েতে যে ক'জন ভাস্কর শিক্ষানবিসি করত ডাগারম্যান কেবল তাদের একজন বললে তার প্রতি অবিচার করা হবে। আমাদের সমষ্টিকে সক্রিয় একটি কলকব্জার মতো মনে করলে ডাগারম্যানকে বলতে হবে যেন তার মেন স্প্রিং। সকালে সে না আসা পর্যন্ত সকলে মনে মনে তটস্থ হয়ে থাকত —পাগলটা কি অদ্ভুত বিস্ময় কি বীভৎসের ঝাঁকা মাথায় বয়ে এনে হঠাৎ সেটা আমাদের মাঝে ফেলে দিয়ে সকলের ধরা-বাঁধা কাজে একটা উল্টপালটের ব্যবস্থা করবে।

আতলিয়ের বাইরে তার আড্ডা ছিল বেশীরভাগ সময় গানবাজনার সরগরমে ভরা কোনো কাফেতে বা শরাবখানায় কিংবা কুখ্যাত পল্লীর কোনো দেহোপভোগের রঙ্গালয়ে। অনেক সময়ে তার সঙ্গে আসত ঐ সব জায়গা থেকে তার পরিচিত দু'একটি সজীব স্মৃতি।

দিনের কাজ শেষ হলে সে বলবে হয়ত, 'চল হে 'স্ফ্যাক্স্'-এ গিয়ে একটু ফুর্তি করে আসি।' এই প্রস্তাবে আতলিয়ের ইংরেজ মহলে বেশ একটা চাঞ্চল্যের সূত্রপাত হতো, যেন তাদের দেশ থেকে আনা মরালিটির ফানুশের কাঁচে ডাগারম্যান একটা ইট ফেলেছে।

পারীতে শিক্ষা ও সংস্কৃতির সান্নিধ্য পেতে যেমন আসে দলে দলে শিক্ষার্থী ও বিদগ্ধজন সারা জগৎ থেকে, তার বেশী আসে ট্যুরিষ্ট, উন্মাদভোগের বিপণীভরা এই শহরে পঞ্চেন্দ্রিয়ের লালসাকে তৃপ্ত করতে। এই উদ্দেশ্য চরিতার্থের উপায় যদিও পৃথিবীর সর্বদেশের শহরগুলিতে বিদ্যমান, কিন্তু সেগুলিকে অন্যত্র লোক-দেখানো

মরালিটির খোলস ঢাকা দিয়ে, ছদ্মবেশের আড়ালে বাঁচিয়ে রাখতে হয়। ফরাসীরা সেগুলিকে ভব্যভাবে সৌন্দর্যের বেশ সল্মা-চুমকি লাগিয়ে খোলাখুলিভাবে ট্যুরিষ্ট-দের সামনে তুলে ধরেছে আর তারা সাময়িক সকল ইন্‌হিবিশান-মুক্ত হয়ে এই আদিম ইচ্ছা চরিতার্থের সুখসাগরে কয়েকটা ডুব দিয়ে নিচ্ছে।

আবার দেশে ফিরে ইন্‌হিবিশান-এর জেলখানায় ঢুকলে তাদের মনের চোরা মণিকোঠায় থেকে যাবে একটা শৌখীন অপরাধের স্মৃতি যাকে মনে মাঝে মাঝে স্মরণ করে পূর্বসুখের স্পর্শকে জাগিয়ে তোলার একটা আনন্দ পাবে।

মোপার্নাস পাড়ায় 'স্ফ্যাঙ্কস্' ছিল প্রাচীন মিশরীয় ভোগজীবনের একটা নকল পরিবেশ। একটি বড় বাড়ির বেসমেণ্ট অর্থাৎ জমির লেবেল-এর নীচে তৈরী তলায় ছিল এক বিরাট হলঘর যার মাঝখানে বসানো ছিল নারীমুখ ও সিংহদেহের একটি বিরাট স্ফিঙ্কস্-মূর্তি। থামগুলি মিশরীয় স্থাপত্যের ঢঙে গড়া নক্সায় রঙিন। পিরামিডের নীচের কামরাগুলিতে যেমন প্রাচীরচিত্র আছে তারই অনুকরণে এই হলের দেওয়ালে ছবি আঁকা। হলে পানকারীদের বসবার চেয়ার এবং টেবিলগুলিও প্রাচীন মিশরীয় আসবাবের ছাঁদে গড়া। পানীয় সরবরাহ করত প্রাচীন মিশরীয় ক্রীতদাসীদের অনুকরণে স্বল্পমাত্র বাসপরিহিতা প্রায় উলঙ্গ সুন্দরী তরুণীরা।

পানীয়ের দামের একটু বেশী পয়সা দিলে এরা ক্রেতাদের পাশে বসে বকশিশের মাপ অনুযায়ী আলাপ গল্প করবে আর তার চেয়ে গভীর আন্তরিকতার সুখ তাদের পরিবেষণ করবার অনুরোধ জানালে তার উপযুক্ত মূল্য দিয়ে লিফটে ওপরে উঠে প্রাচীন মিশরীয় আবহাওয়া-ভরা ছোট ছোট কামরায় ক্রেতা এই ভাড়া-করা ক্রীতদাসীদের সঙ্গে কিছুক্ষণের জন্য একলা হতে পারেন।

ভাগারম্যান স্ফ্যাঙ্কস্-এ যাবার পয়সা কোন উপায়ে পেত জানি না কারণ আমাদের আর তিনজনের মতো তার পকেটে হাত দিলে খালি বাতাস ছাড়া মুঠোয় আর কিছু আসত না।

সে কিন্তু স্ফ্যাঙ্কস্-এ যেত না ট্যুরিষ্টদের মতো একটা কেনা আমোদের সুখান্বেষণে। কয়েকটি পুরুষ সঙ্গীর দল নিয়ে সে বসত একটা টেবিল অধিকার করে এবং একটা করে কফি নিয়ে তারা সকলে অন্যদের রঙ্গলীলা দেখত কট্‌মট করে তাকিয়ে। প্রেম বেচাকেনায় নিরাসক্ত তাদের এই কড়া দৃষ্টি অন্যদের মনে আনত চাঞ্চল্য। সাধারণ সমাজনীতিতে হেয় এই সাময়িক লাম্পট্য ভাগারম্যান ও তার সঙ্গীদের চোখে ধরা পড়ায় ট্যুরিষ্টরা যেন অপরাধী হয়ে পড়ত।

যারা একটু আনন্দের খোঁজে এসেছে তাতে তারা যে দুর্বলতাই দেখাক ভাগারম্যানের কি লাভ হয় তাদের উদ্দেশ্যকে পণ্ড করবার চেষ্টায় তা জানতে চাইলে সে বলত, "আমি তাদের কেবল জানিয়ে দিতে চাই যে, যারা ওখানে যায় তারা সকলেই একই উদ্দেশ্যে আসে না বা তাদের প্রবৃত্তি একই নয়। এরা এসেছে তো একটা স্বাভাবিক আদিম ইচ্ছাকে চরিতার্থ করতে। তার জন্যে মরালিটিকে বাঁচিয়ে

চলার এত ভড়ং কেন। জানো, একদিন এখানে বসে কফি খাচ্ছিলাম। এমন সময় পানীয় সরবরাহকারিণী একটি মেয়ে এসে আমার পাশে বসে আলাপ করতে চাইলে তাকে বলেছিলাম, যদি কোনো নিগ্রো মেয়ে থাকে তো তাকে পাঠাও, তার সঙ্গে ঠিক স্বাভাবিক মানুষ হতে পারব। সে তখনি 'পাত্রঁ'কে গিয়ে নালিশ করে যেআমি তাকে অপমান করেছি। 'পাত্রঁ' যখন মেয়েটিকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ জিজ্ঞাসা করল বললাম, এখানকার সাদা মেয়েদের আমার পছন্দ হয় না। এই উত্তরে সে ধরে নিল আমি সেক্স সম্বন্ধে নিশ্চয়ই অস্বাভাবিক ধরনের লোক এবং বলল যে, হোমোসেক্সুয়ালদের একটি বিখ্যাত ক্লাব আছে সেখানে না গিয়ে এখানে এসে স্বভাবনির্দিষ্ট লোকগুলির আনন্দের অন্তরায় হই কেন? তাকে বললাম, ম'সিয়ো একটা নকল মিশরীয় পরিবেশে অপ্রাকৃত মিশর-সুন্দরীর অলীক সংস্করণ ক্রেতাদের কাছে বিতরণ না করে সত্যিকারের প্রাচ্যদেশীয় সুন্দরীদের আমদানী করা উচিত। তা হলে এই মিথ্যা মায়ার বাজারের অন্তত খানিকটা হবে সত্য। আমার বাইরেটা ভুল করে হয়েছে শ্বেতকায় সুইডিস, অন্তরে আসলে আমি আদিম প্রকৃতির তাই আমার চোখে প্রাচ্যদেশীয় কিংবা আফ্রিকার কালো মেয়েকে সবচেয়ে সুন্দরী লাগে। এখানকার শ্বেতকায় মেয়েদের দিকে তাকালে মনে হয়, এদের চামড়ার বাইরের পর্দাকে যেন ছিঁড়ে নিয়েছে আর তারা হয়ে গেছে যেন চলমান কাঁচা মাংসপিণ্ড।

"এইসব লম্বা-চওড়া কথা শুনে 'পাত্রঁ' নিজের মাথার খুলিতে স্ক্রুর প্যাঁচের মতো আঙুলের ভঙ্গি করে বললে, 'ইল্ এ ফুঃ' অর্থাৎ আমার মাথার খুলিটি বেশ আল্‌গা যার ফাঁক দিয়ে প্রচুর বাতাস প্রবেশ করায় এই অভাগার মস্তিষ্ক বিকৃতি ঘটেছে। কিন্তু জানো হে, শুধু আমি কেন, সারা সুইডিস জাতটার মধ্যে দেখতে পাবে আমারই মতো আদিম প্রবৃত্তির স্বতঃস্ফূরণের আবেগ যাকে সাদা চামড়ার লেপ্টে থাকা সভ্যতার ভিনিয়ার কেবল চেপে রাখতে গিয়ে এনে দেয় একটা মানসিক অবসাদ। তাই এই ধরনের আমোদ আমাদের ঠিক ভালো লাগে না, তাকে যেভাবে পেতে চাই তা পাই না বলে। আমরা খুঁজে বেড়াই বেখাপ্পা,বেরসিক কিছুর সন্ধানে যার সান্নিধ্যে দিনে অন্তত ঘণ্টা তিনেক অবসরে খুশী হতে পারি। তোমাদের কথা মনে করে আমি তোমায় হিংসে করি কারণ সেক্স সম্বন্ধে মনে হয় ভারতবাসী কোনো ইন্‌হিবিশান-এ পীড়িত নয়।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "সেক্স সম্বন্ধে আমরা ইন্‌হিবিশান-মুক্ত এ ধারণা সে পেল কোথা থেকে।"

সে বলল, "তোমাদের বহুবিবাহকে সামাজিকভাবে মেনে নেওয়া একটা প্রমাণ আর স্ত্রী ও পুরুষের দৈহিক সঙ্গম যে পাপ ও অপরাধ বা অশ্লীলতা নয় এবং এটা একটি প্রয়োজনীয় জৈবধর্ম এই সত্য ধারণার ছাপ দেখতে পাই তোমাদের মন্দিরের ভাস্কর্যে রতিলীলায় উন্মত্ত নরনারীর মিলন মূর্তিতে। এই ভাস্কর্য থেকেই উদ্দীপনা পেয়ে রোদ্যাঁ প্রকৃতির এই অদ্ভুত লীলাকে দেখাবার চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু

ক্রিশ্চিয়ানিটির জারি করা অপরাধ ও অশ্লীলতার ভ্রান্ত নিষেধ-যষ্টির প্রকোপকে তিনি কাটিয়ে উঠতে পারেননি। কাজেই তাঁর করা অন্তরঙ্গ আলিঙ্গনবদ্ধ স্ত্রীপুরুষের যুগল মূর্তিগুলি যেন ঘোষণা করে যে, তারা সাহস করে পাপ করেছে এবং তাদের উপভোগের মাঝে একেবারে গা-ঢালা আনন্দের স্বচ্ছন্দচারিতা নেই যা ভারতীয় যুগলমূর্তিগুলিতে অনুভব করা যায়।”

বললাম, “বন্ধুবর, মিউজিয়াম-এ ভারতীয় ভাস্কর্য দেখে ও প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্য পড়ে ধারণা করে ফেলেছ আমরা কেমন সেক্স ইন্‌হিবিশান-মুক্ত জাতি। বর্তমানে আমরা কিভাবে চলি ও আমাদের আচার, ব্যবহার ও প্রবৃত্তি কি রকম তার সঠিক বিচারে তুমি কিন্তু মহা ফাঁদে পড়ে যাবে। বহুবিবাহ থাকলেও আমাদের দেশে দেহ বেচা-কেনার রঙ্গালয় ছিল এবং এখনও আছে। ইয়োরোপ থেকে আমদানী-করা ক্রিশ্চিয়ান ইন্‌হিবিশান আমাদের মধ্যেও দেখতে পাবে প্রচুর এবং সে নিষেধের তীব্রতা তোমাদের দেশের থেকে আরও জোরালো যদিও সে ইন্‌হিবি-শান-এ অন্ধ সমাজ ভারতে ক্রিশ্চিয়ান নয় হিন্দু।

“স্বীকার করি, এক সময়ে সেক্স সম্বন্ধে ধারণা ভারতে হয়ত ইন্‌হিবিশান-মুক্ত ছিল যখন স্ত্রীপুরুষের দৈহিক মিলন অপরাধ বা অশ্লীলতা ছিল না কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, তা ছিল অবাধ ও স্বেচ্ছাচারিতায় ভরা। আমাদের দেশে এখনও স্ত্রীলোকদের উল্লেখ করা হয় ‘মায়ের জাত’ বলে কিন্তু তার মধ্যে আগেকার সম্ভ্রমের আভাস নেই। এখনও কথাপ্রসঙ্গে লোকে বলে তাদের ধর্মসঙ্গিনী কিন্তু বাস্তবে—ধর্মে বা জীবনে তারা প্রকৃত সঙ্গিনীর অধিকার পায় না। ইসলাম আসায় ভারতের নারীসমাজ ঘরে বাইরে স্বচ্ছন্দ গতিবিধির অধিকার হারিয়ে বন্দী হলো অন্তঃপুরে। ক্রিশ্চিয়ান ভাবধারা তাদের আবার বাইরে আসার দরজা খুলে দিতে সাহায্য করেছে কিন্তু যে সম্মান সঙ্গে নিয়ে তারা অন্তঃপুরে প্রথমে গিয়েছিল আজ বেরিয়ে আসেনি সমাজের কাছে সেই সম্মানের দাবি স্বীকার করিয়ে নিয়ে।

“সেক্সের যে সুস্থ দৃষ্টি ছিল পূর্বের ভারতে তা আজ নেই। শিল্পী গড়েছিল এই অপূর্ব মিলনে আত্মহারা মূর্তিগুলি হাজার বছর আগে যে সমাজের জন্য তা আজ বদলে গিয়ে এর মধ্যে দেখে না শৃঙ্গারকে উপলক্ষ্য করে মূর্তির অপূর্ব ছন্দ-ভঙ্গিমার সৌন্দর্য যা আত্মহারা প্রেমবিকাশই একমাত্র মূর্ত করতে পারে। এই মূর্তিগুলির সামনে দাঁড়িয়ে যদি দর্শকের দৃষ্টি কেবল দেহের ক্রিয়াশীল ইন্দ্রিয়বিশেষের প্রতি আবদ্ধ না হয়ে যায় তা হলে সে দেখতে পাবে শৃঙ্গারের এই অভিব্যক্তিতে স্ত্রী ও পুরুষ সমান সমান অধিকার ও যোগ্যতা নিয়ে দাঁড়িয়ে। তাদের মধ্যে জেণ্ডার হিসাবে মুখ্য ও গৌণের বিচার কোথাও দেখা যাবে না।

“ভারত সংস্কৃতির আজ বিকৃত বিচারে সেগুলিতে অশ্লীলতার চুনকালি পড়ে গেছে। ক্রিশ্চিয়ান ইন্‌হিবিশান-এর দৃষ্টি নিয়ে ভারতবাসী তার পূর্বপুরুষের এই অপূর্ব দানের সামনে দাঁড়িয়ে ভাবে কেবল একটি কথা —জেণ্ডার ও তার ক্রিয়া

এবং তা গোপনীয় ও অশ্লীল। তোমাদের পাশ্চাত্য সভ্যতার এই দান মিশনারী ও সিনেমা-সিক্ষিত হয়ে ভারতের অন্দরে বাইরে রমণীকে করেছে একটা অশ্লীল ইচ্ছা চরিতার্থের বিষয়বস্তু মাত্র।"

তাকে বললাম, "এই প্রসঙ্গে আমার এক বন্ধুর বলা একটি ঘটনা বলি শোনো। বেশ কয়েক বছর আগে পারীতে এসেছিলেন কলকাতার এক কলেজের বহু গণ্য-মান্য অধ্যক্ষ। তিনি ছিলেন ব্রাহ্মসমাজের একজন কর্ণধার, যে সমাজ গড়ে উঠেছে প্রায় ক্রিশ্চিয়ান ধর্মের কাঠামো অবলম্বন করে। বিগত বহু মনীষীদের আত্মা মাঝে মাঝে এই অধ্যক্ষ মহাশয়ের মাথায় ভর করতেন।

"পারীতে থাকাকালীন একদিন ভোর ছ'টায় তাঁরই এক প্রাক্তন ছাত্রের বাসায় উপস্থিত হয়ে তাকে বিছানা থেকে উঠিয়ে বললেন, 'কাল রাত্রে আমার কাছে ভিক্তর য়্যুগো এসেছিলেন, শিগ্‌গির নিয়ে চলো আমাকে তাঁর বাড়িতে।' কোনো যুক্তি বা অনুযোগ চলল না তাঁর সঙ্গে, যেতে হলো ছাত্রটিকে ভিক্তর য়্যুগোর বাড়ি, যদিও সেখানে তাঁকে অপেক্ষা করতে হলো বেলা দশটায় মিউজিয়াম খোলার সময় পর্যন্ত।

"য়্যুগোর বাসস্থানের সব কিছু দেখে তাঁরা যখন জুলিয়েত-এর ঘরে প্রবেশ করলেন এবং অধ্যক্ষ মহাশয়কে বলা হলো যে, এইখানে য়্যুগো তাঁর প্রণয়িনীর সঙ্গে সময় কাটাতেন, তিনি কাতরকণ্ঠে বলে উঠলেন, 'চলো চলো, শিগ্‌গির এ ঘর থেকে বাইরে যাই। এই ঘরে য়্যুগোর দেহ কলুষিত হয়েছিল।' অধ্যক্ষ মশাই য়্যুগোর জীবনচরিত পড়েছিলেন কি-না জানা নেই এবং এও জানি না জুলিয়েত-এর য়্যুগোর প্রতি যে অনন্যচিন্ত পরিপূর্ণ প্রেম, যা তাঁর লোক তথা ধর্মমতে বিবাহিত স্ত্রী দিতে পারেননি, তাকে উপলব্ধি করবার মতো মন ও হৃদয় এই অধ্যক্ষের ছিল কি-না। য়্যুগোর শেষ জীবন পর্যন্ত বহু প্রণয়িনী সম্ভোগের তালিকা বেশ দীর্ঘ কিন্তু তার জন্য সমাজে তাঁর সুনামের হানি হয়নি। কিন্তু যে রমণীর ভালোবাসার একনিষ্ঠতা তাঁকে আমৃত্যু প্রণয়ের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে গিয়েছে তাকে তোমাদের সমাজ খুব সম্মান না দিলেও অন্তত পাপের পর্যায়ে ফেলবে না। এ ঘটনা আমাদের দেশে হলে, য়্যুগো হয়ত কিছুটা পার পেয়ে যেতেন কিন্তু বেচারি জুলিয়েত-এর জন্য আমাদের সমাজ যে শাস্তির বিধান দিত তাকে সহ্য করবার শক্তি তার হতো কি-না সন্দেহ। কে জানে হয়ত হাজার বছর আগে য়্যুগো ও জুলিয়েত-এর মতো প্রেমিকদের ভারতীয় সমাজ শুধু সমাদর করেই ক্ষান্ত হতো না, হয়ত তাদের যুগলমূর্তি পাথরে খোদাই করে মন্দিরে সাজাত।"

ভাগারম্যান বলল, "আমাদের দেশে এবং আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে মেয়েদের পরিপূর্ণ সম্মান ও আসন দেওয়া হয়েছে এবং বিবাহ বাদে স্ত্রীপুরুষে দৈহিক মিলন সমাজে অবাধে চলছে, কিন্তু তা সত্ত্বেও ভারতীয় ভাস্কর্যের মতো প্রেমলীলার ছবি এ দেশীয় শিল্পীদের হাত থেকে আজও বের হয়নি কেন?"

বললাম, "মঁ্যসিয়ো, তোমরা স্ত্রীপুরুষকে পাপ করার সমান অধিকার দিয়েছ কিন্তু মন থেকে, দৈহিক মিলন যে পাপ নয় এটা যতক্ষণ না সম্পূর্ণ দূরীভূত হচ্ছে —এমন কি মগ্নচৈতন্য থেকেও, গভীর প্রেমানুভূতির এই ছবিকে তোমরা দেখতে বা দেখাতে পারবে বলে মনে হয় না। আমায় কিন্তু ভুল বুঝো না যে, স্ত্রীপুরুষের যথেচ্ছ মিলনকে আমি সমর্থন করছি। স্ত্রী ও পুরুষকে ধর্ম ও সমাজ জীবনযাত্রায় পরস্পর অংশীদারী হবার অধিকার যে রীতিতে দিক না কেন, তাতে যেন বজায় থাকে পরস্পরের প্রতি সম্মান ও আত্মস্ফূরণের মেনে নেওয়া পরিপূর্ণ সমান দাবি।"

*　　　*　　　*

দৈহিকভাবে নিগ্রোদের প্রতি আকর্ষণ শুধু ডাগারম্যানের নয়, শ্বেতকায় জাতির মধ্যে ব্যাপকভাবে দেখা যায়। একদিন সে এক লম্বা ও বলিষ্ঠ নিগ্রোকে আতলিয়ে দেখাতে নিয়ে এল।

থ্রোনে দাঁড়ানো উলঙ্গ মেয়েটির রূপাবলম্বনে আমরা মূর্তি গড়ছি দেখে নিগ্রো ভদ্রলোকটি বললেন, 'কি অদ্ভুত, কি অদ্ভুত! শিল্পীরা এমনি করে মূর্তিগুলি গড়ে এ তো আমার জানা ছিল না।'

তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, আমরা তাঁর মূর্তি ঐভাবে করতে ইচ্ছুক কি-না। আমরা জানালাম যে, তাঁকে সম্পূর্ণ নগ্ন হয়ে দাঁড়াতে হবে। এ শুনেই তিনি কাপড় খুলতে শুরু করে দিলেন। মেয়ে মডেলটি তাড়াতাড়ি থ্রোন থেকে নেমে কাপড় পড়ে তাঁকে মডেলের জায়গা ছেড়ে দিলো। স্যুট ও অন্তর্বাস ছেড়ে দাঁড়াল আমাদের সামনে যেন কালো ব্রোঞ্জের এক অ্যাপোলো মূর্তি। পুরুষের এই বলিষ্ঠ সুঠাম মূর্তি একটু আগে আমাদের চোখে ভাসা ভেনাস-এর রূপকে ম্লান করে দিলো। আমরা নব উদ্যমে আরম্ভ করলাম তাঁর মূর্তি গড়তে। ভদ্রলোক তাঁর নাম পরিচয় দিলেন 'স্মিথ' বলে। ডাগারম্যান-এর সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল কোনো এক পানশালায়।

সপ্তাহ কয়েক পরে মূর্তিটির পরিসমাপ্তিতে মডেলের পারিশ্রমিক তাঁকে দেওয়া হলে তিনি বললেন, 'তোমরা একটু অপেক্ষা করো, আমি এখুনি বাইরে থেকে আসছি, তোমাদের সঙ্গে বিশেষ কথা আছে।'

তিনি ফিরে এলেন এক ডজন শ্যাম্পেন-এর ভরা বোতল নিয়ে এবং সেগুলি প্রায় আমাদের হাতে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, 'পান করো, আমোদ করো, আমার শুভ সাফল্য কামনা করো।'

জিজ্ঞাসা করলাম, "কিসের সাফল্য কামনায় আমরা পেলাম এতগুলি শ্যাম্পেন যা কিনতে তিনি তাঁর মডেলের পারিশ্রমিকের অন্তত ছ'গুণ ব্যয় করেছেন।"

তিনি বললেন, "তোমরা দেখছি জানো না যে, আমি মুষ্টিযোদ্ধা প্যাটারসন স্মিথ, আসছে কাল ফরাসী চ্যাম্পিয়ান-এর সঙ্গে আমার লড়াই হবে।"

আমরা কাগজে এ সংবাদ পড়েছিলাম ঠিকই কিন্তু শুধু স্মিথ পরিচয় দেওয়ায়

লক্ষ লক্ষ সাধারণ স্মিথ পদবীধারীদের মধ্যে তাঁর বিশেষ পরিচয় আমাদের মনে চাপা পড়েছিল।

মুষ্টিযোদ্ধা প্যাটার্‌সন স্মিথ সারা জীবন বহু লড়াই করে প্রায় বিশ্ববিজয়ী মুষ্টি-যোদ্ধা হবার সম্ভাবনা পেয়েছিলেন কিন্তু সম্পূর্ণ সাফল্য তাঁকে কেবল পাশ কাটিয়ে গিয়েছে বহুবার। কয়েক বছর আগে হঠাৎ কাগজে দেখলাম সংবাদ— 'প্যাটার্‌সন স্মিথ' প্রায় ভিখারী অবস্থায় নিউইয়র্কের কোনো নিগ্রো পল্লীতে অতি দুঃস্থভাবে প্রাণত্যাগ করেছেন।' কালো মিশমিশে ও শক্তিতে তরঙ্গায়িত পেশীভরা সেই সুঠাম দেহ আর ঘর-কাঁপানো প্রাণখোলা তাঁর হাসি আজও আমি ভুলিনি এবং কখনও ভুলব না।

প্রোফেসর কুশে

পঞ্চেন্দ্রিয় সুখ ও তৃপ্তির উপাদান অন্বেষী ট্যুরিষ্ট যেমন পারীতে আসে ভিড় করে —জনপ্রিয় দ্রষ্টব্যের তালিকা হাতে নিয়ে, জ্ঞানান্বেষী ছাত্র ও গবেষকরাও তেমনি আসেন দলে দলে এই শহরের বিদ্যাকেন্দ্রে পৃথিবীর বিখ্যাত বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যতম, 'সোর্‌বন'-এ।

ইতালির 'সালেরনো' বিশ্ববিদ্যালয়ের পরই ইয়োরোপে প্রাচীনত্বে পারীর বিশ্ব-বিদ্যালয়ের স্থান। মধ্যযুগের গোড়ায় খৃষ্টিয় ধর্মতত্ত্বানুযায়ী তর্ক ও মীমাংসার আলোচনা আরম্ভ হয়। এ সম্বন্ধে দক্ষ ও প্রাজ্ঞ তার্কিক ধর্মযাজকদের বিধান শুনতে দেশদেশান্তর থেকে ছাত্রদের সমাগম হতো এখানকার গীর্জার বিদ্যায়তনগুলিতে। দ্বাদশ শতাব্দীতে গিয়োম দ্য শাম্‌পো খৃষ্টিয় ধর্ম-সম্পর্কিত তর্কালোচনার একটি শিক্ষায়তন স্থাপন করেন। বিখ্যাত আবেলার ছিলেন এই বিদ্যায়তনের ছাত্রদের একজন। তাঁর ভাষণের যশ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ায় এখানে ছাত্রসংখ্যা ক্রমেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। আবেলার প্রথম নোতরদাম কাথেড্রাল-এর সংশ্লিষ্ট বিদ্যাকেন্দ্রে ও পরে তাঁর প্রতিষ্ঠিত 'ম-সাঁ-জেনভিয়েভ'-এর শিক্ষায়তনে ছাত্রদের শিক্ষা দিতেন। এই সাঁ-জেনভিয়েভকে কেন্দ্র করে আস্তে আস্তে গড়ে উঠল ভবিষ্যৎ পারী বিশ্ব-বিদ্যালয়ের সম্ভাবনা এবং ছাত্রদের বিদ্যা আয়ত্তের পরিমাপকারী তিনটি ক্রমোত্তরমান উপাধির সূত্রপাত হয় এখানেই।

১২৫৬ খৃষ্টাব্দে রেয়ার দ্য সোর্‌বন একটি বিদ্যায়তনের স্থাপনা করেন। যদিও অনেকগুলি বিদ্যালয়ের সমষ্টিই পারীর বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার ভিত্তি স্থাপনা করেছিল, সোর্‌বনের শিক্ষকদের ছাত্রজনপ্রিয়তা বিশেষ প্রসার লাভ করায় এর পরিবর্ধিত থিওলজির ফাকুলতে প্রদত্ত উপাধির সম্মান সর্বোচ্চ বলে ধরা হতো।

এই সোর্‌বনেই ফ্রান্সে প্রথম পুস্তক মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়। ১৮০৮ খৃষ্টাব্দে

সোর্বন-এ পারীর বিশ্ববিদ্যালয় ও 'একাদেমী দ্য পারী' স্থাপিত হয়। অন্যান্য বহু বিভাগের মধ্যে সোর্বন-এ ভারতীয় সংস্কৃতির বিভাগ 'এঁ্যাস্তিতুৎ দ্য লা সিভিলিজ্যাসিয় এঁ্যাদিয়ান্' ভারতীয় ছাত্রদের প্রধান আকর্ষণ। এখানে ভারতীয় ও অন্যান্য দেশীয় ছাত্ররা ভারতের কৃষ্টি সম্পর্কিত বিষয়ে গবেষণা করে থাকেন এবং তাঁদের থিসিস গৃহীত হলে 'দক্তরাত' উপাধি দেওয়া হয়ে থাকে। ভারতে বা অন্যান্য দেশের বিশ্ববিদ্যালয়ে বহু বিষয় গবেষণার বস্তুহিসাবে অনুপযুক্ত ও প্রত্যাখ্যাত হলেও এই এঁ্যাস্তিতুৎ-এ স্থান লাভ করে বলে সহজে ডিগ্রী পাবার লোভও ছিল ভারতীয় ছাত্রদের সোর্বনাসক্তির একটি বিশেষ কারণ।

একদিন এঁ্যাস্তিতুৎ-এর এক অধিবেশনে যেতে একজন ছাত্র সমবেত অধ্যাপকদের একজনকে নির্দেশ করে বললেন, 'উনি কে জানো?'

'না', বলায় জানালেন যে, ইনি বিখ্যাত ভারত প্রত্নতাত্ত্বিক পণ্ডিত ফুশে। আমার পিতার বয়সী অনেকে তাঁদের বাল্যে অধ্যাপক ফুশের নাম শুনেছিলেন। তাই তাঁকে যে স্বশরীরে এমন সুস্বাস্থ্যে জীবিত দেখব এ আশা করিনি। বেঁটে দোহারা চেহারায় ফরাসী বৈশিষ্ট্য সুলভ চৌকস মুখে তাঁর যেমন দৃঢ়ত্বের ব্যঞ্জনা ছিল, ছোট চোখ দুটিতে ছিল তেমনি সহৃদয়তা ও স্নেহ। তিনি চলে গেলে এঁ্যাস্তিতুৎ-এর দপ্তরে জিজ্ঞাসা করলাম, পণ্ডিত ফুশের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের চেষ্টা ধৃষ্টতা হবে কি-না। তাঁরা বললেন, তাঁকে দেখা করবার অনুরোধ জানিয়ে চিঠি দিলে তিনি নিশ্চয়ই সে অনুরোধ রাখবেন।

সেই উপদেশ অনুযায়ী তাঁকে লিখলাম যে, বিখ্যাত পুস্তক Beginnings of Buddhist Art-এর গ্রন্থকার হিসাবে তাঁর নাম অনেক দিন থেকেই জানি এখন তাঁর সাক্ষাতের সুযোগ পেলে নিজেকে ধন্য মনে করব।

সরাসরি তাঁর জবাব পেলাম—তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজ থেকে অবসরপ্রাপ্ত হয়ে এখন তাঁর বাসায় আশ্রমায় আবহাওয়ায় দিনগুলি শান্তিতে কাটাচ্ছেন। অতএব আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সাহায্যের সুযোগ অভিপ্রায়ে তাঁর কাছে গেলে নিরাশ হব। তিনি এবং তাঁর স্ত্রী ভারতের এবং ছাত্রদের শুভানুধ্যায়ী। আমার সঙ্গে এমনি আলাপ পরিচয় করে তাঁরা খুব খুশী হবেন এবং কেমন করে তাঁদের ঠিকানায় পৌছানো যায় তার এক সবিস্তার বিবরণী দিয়ে এক সোমবারের অপরাহ্ণে তাঁদের বাড়িতে যাবার আমন্ত্রণ জানালেন।

পারীর লুক্‌সাম্বুর মেট্রো স্টেশন থেকে ট্রেনযোগে বেশ লম্বা কয়েক কিলোমিটার পথ ছাড়িয়ে 'সো'-তে পৌছালাম। সেখানে নেমে প্রফেসার ফুশের নির্দেশ অনুযায়ী ১৫নং রু মার্শাল জোফর্ খুঁজে পেতে বেশী দেরি হলো না। দরজায় ঘণ্টা বাজাতে এক বৃদ্ধা পরিচারিকা দোর খুলে ভেতরে নিয়ে গেলো। প্রফেসর ফুশের বাড়িটি সত্যিই আশ্রমের মতো আবহাওয়ায় ভরা। বড় বসবার কামরায় দু'দিকের দেওয়ালের ছাদ পর্যন্ত উঁচু বইভরা তাকে ঢাকা আর একদিকের বড় জানালায়

লেসের পর্দা ভেদ করে আব্‌ছা দিনের আলো অপরদিকে ফায়ার প্লেস-এর আলসেতে রাখা গান্ধার শৈলীর এক সুন্দর বুদ্ধ মূর্তির ওপর পড়ে এক অপূর্ব মায়ালোক সৃষ্টি করছিল।

তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে তিনি আলাপ করিয়ে দিয়ে বললেন, "ইনি রাশিয়ান এবং আমার চেয়ে ভালো ইংরাজী বলেন।"

মাদাম্‌ও বেশ সুপণ্ডিত। প্রফেসর-এর সব বইয়ের অনুক্রমণিকাগুলি তাঁরই করে দেওয়া।

প্রফেসর ফুশের গবেষণার সর্বপ্রধান দান হচ্ছে বৌদ্ধশিল্পকলা সম্বন্ধে এবং বিশেষ করে গান্ধার শিল্প সম্বন্ধে তার বিশদ ব্যাখ্যা পণ্ডিতমহলে তখনও পর্যন্ত শেষ কথা বলে গণ্য করা হতো। তাঁর মতে বুদ্ধের পদ্মাসন বা কায়োৎসর্গ মানবমূর্তির প্রথম পরিকল্পনা ভারতীয়রা করেননি। এর রূপ দিয়েছিলেন বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী গান্ধারের গ্রীকো-রোমক শিল্পীরা। এ ধারণা যে ভুল তা আজ বহু প্রমাণে পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে এবং যে সময়ে মঁসিয়ো ফুশের সঙ্গে আলাপ হয় তখন বহু পণ্ডিত এই ভুল নিয়ে বাদবিতণ্ডা আরম্ভ করে দিয়েছিলেন।

ফুশের পূর্ববর্তী ইয়োরোপীয় প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকদের অনেকে সাব্যস্ত করেছিলেন যে, প্রাচীন ভারতীয়েরা শিল্পকলা সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলেন অথবা তাঁদের শিল্পরচনা অতিশয় নিকৃষ্ট বা বীভৎস ধরনের ছিল এবং এ দেশীয় যা-কিছু ভালো শিল্পনিদর্শন দেখতে পাওয়া যায় তা গ্রীকো-রোমক শিল্পীদের রচনা অথবা তাদের অনুকরণে সৃষ্ট শিল্প। ফুশে বোধহয় কতকটা এই ভ্রান্ত ধারণায় সংস্কারাচ্ছন্ন হয়ে এই অভিমতকে প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ দিয়ে ফেলেছেন। কিন্তু পদ্মাসনে বসা এই রূপে মূর্তি পরিকল্পনার নিদর্শন অতি প্রাচীন মহেঞ্জো-দড়োর আবিষ্কার হওয়ার পর ফুশে ও তাঁর অনুরূপ পণ্ডিতদের ভ্রমাত্মক অভিমত ইতিহাসের পাতায় আর স্থান পায় না। কিন্তু এই ভ্রান্ত সংস্কারটুকু বাদ দিলে প্রফেসর ফুশের গান্ধার বৌদ্ধশিল্প সম্বন্ধে যে গভীর পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণা তা ভারতের শিল্প ইতিহাসে এক অমূল্য দান যার জন্য ভারতীয় সংস্কৃতির অনুধাবনকারীরা তাঁর কাছে চিরঋণী থাকবে। গান্ধারীয় বৌদ্ধ মূর্তির পরিচিতি ও সঠিক নামের যে বিবরণী ও তালিকা পণ্ডিত ফুশে দিয়েছেন তা আজও পণ্ডিতেরা এ বিষয়ের মানদণ্ড হিসাবে ব্যবহার করে থাকেন।

সমগ্রভাবে ভারতীয় মূর্তিকলায় দেবদেবীর সঠিক পরিচিতি সম্বন্ধে আজও পরিষ্কার কোনো মহাকোষ লেখা হয়নি এবং এই সম্বন্ধে প্রফেসর ফুশের সঙ্গে আলোচনা করতে তিনি হঠাৎ প্রস্তাব করলেন, "তোমার এ বিষয়ে যখন এত উৎসাহ আমার মনে হয় এঁ্যাস্তিতুৎ-এ তোমার এ সম্বন্ধে গবেষণা করা উচিত।"

বললাম, "আমি তো বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাধিধারী নই অথবা গবেষণার জন্য যে পাণ্ডিত্যের প্রয়োজন তা আমার নেই অতএব কোন অধিকারে আমি এ কাজে ব্রতী

হবার সাহস করতে পারি! তা ছাড়া আপনার সঙ্গে আমি এই উদ্দেশ্য নিয়ে দেখা করতে আসিনি যাতে প্রকারান্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো সাহায্য বা সুবিধার খোঁজ আপনার কাছ থেকে পাওয়া যায়। আমি এসেছি কেবলমাত্র আপনার মতো পণ্ডিতের দর্শন সুখের আশায়।"

তিনি আমায় থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি এ বিষয়ে গবেষণার যোগ্য কি-না তার বিচার করব আমরা আর আমায় তুমি বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত কাজের কথা বলবে না বলে যে নিষেধ পাঠিয়েছিলাম তা কেবল অপরিচিতের প্রতি প্রযোজ্য। কিন্তু তুমি তো এখন আমাদের পরিচিত বন্ধু। আসছে শুক্রবার আমি এ্যাস্তিতুৎ-এ যাব এবং তুমি সেখানে উপস্থিত থাকবে।"

তারপর আমাকে চায়ে আপ্যায়ন করে তিনি বিদায় দিলেন।

শুক্রবার এ্যাঁস্তিতুৎ-এ পৌঁছে তাঁর সঙ্গে দেখা হলে প্রফেসর ফুশে সেখানের বহু গণ্যমান্য অধ্যাপকদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং আমার গবেষণার এ্যাঁস্ক্রিপসিয়ঁ-র (প্রবেশাধিকারের) ব্যবস্থা করে দিয়ে বললেন, "গবেষণার একটা খসড়া করে আমায় পাঠাবে এবং পরে তুমি কোন কোন অধ্যাপকের তত্ত্বাবধানে কাজ করবে তার ব্যবস্থা করে দেবো।"

খসড়া প্রস্তুত হলে প্রফেসর ম্যাঁসুরসেল ও লালোর নিকট আমার অধ্যাপনার বন্দোবস্ত হলো এবং যাতে করে ল্যাঁস্তিতুৎ দ্য লার-এ লারসিওলজির বিরাট গ্রন্থাগারে নির্বিবাদে পুস্তকালোচনা করতে পারি তার জন্য সেখানের দিরেক্তর প্রফেসর শারল পিকার-এর নামে এক পরিচয়পত্র পাঠিয়ে ফুশে বললেন, "তুমি এই পরিচয়পত্র নিয়ে প্রফেসর পিকারের সঙ্গে দেখা করবে এবং আমি নিশ্চিত যে, তুমি তাঁর স্নেহভাজন হবে যেমন তোমার বিনয় ও আন্তরিকতা আমাদের ভালোবাসা অর্জন করেছে।"

জীবনে অনেকের কাছ থেকে প্রশংসাপত্র পেয়েছি কিন্তু প্রফেসর ফুশের আন্তরিকতায়-ভরা এই চিঠিখানা আমার জীবনে এক বহুমূল্য সম্পদ হয়ে আছে। এটি নিছক প্রশংসাবাদ নয় এর মধ্যে সিঞ্চিত হয়ে আছে ফরাসী অধ্যাপকদের ছাত্রদের প্রতি সহজাত অপরিসীম স্নেহ ও শিক্ষার সফল পথে তাদের এগিয়ে দেবার ঐকান্তিক আগ্রহ।

যুদ্ধের দাবাগ্নি জ্বলে ওঠায় বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তিভরা ভবনে ভবনে ক্রোধ, ঘৃণা ও জিঘাংসার মহামারী সংস্কৃতি ও বিদ্যার পীঠস্থানকে কোনো এক বিগতদিনের উপসংহারে ঠেলে দিলো। জ্ঞানানুধ্যায়ী সক্ষম শিক্ষক ও ছাত্ররা নাট্যমঞ্চে রূপ পরিবর্তনের মতো ত্বরিতে হিংস্র যোদ্ধায় পরিণত হলেন আর বৃদ্ধ অধ্যাপকেরা আশঙ্কা ভীতি ও হতাশাকে সঙ্গী করে গ্রামান্তরে গিয়ে আসন্ন দুর্যোগের অপেক্ষমান হয়ে রইলেন। দেবদেবীর দর্শনলাভ আর ঘটল না —গবেষণার পাতাগুলি শূন্য রয়ে গেলো।

যুদ্ধের পর ইয়োরোপে ফিরে প্রফেসর ফুশে জীবিত সংবাদ পেয়ে পারীতে গিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তাঁর কি আনন্দ। Classical Indian Sculpture বইটি ছাপা হলে তাঁকে কপি পাঠাতে তিনি শুধু প্রশংসাবাদ নয় নানা রকমের মন্তব্য ও ভ্রম সংশোধনের কথা লিখলেন যাতে পরের সংস্করণে বইটির উন্নতি সাধিত হয়।

১৯৫২-তে Indian Metal Sculpture পাঠালে তিনি লিখলেন, "তোমার নতুন বই মনে হচ্ছে বেশ ভালো হয়েছে, কিন্তু আমার চোখের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হওয়ায় ছবিগুলি ভালো করে দেখতে পারিনি। তবে লিখিত অংশটি আমার স্ত্রী পড়ে শুনিয়েছেন। ডাক্তারে বলেছে, চোখ অপারেশন করলে ফের ভালোভাবে দেখতে পাব এবং তারপর ছবিগুলি দেখে তোমায় সবিস্তার মন্তব্য পাঠাব।" এর বহু পূর্বে অধ্যাপক ফুশের বয়স আশীর অনেক উঁচুতে উঠলেও তিনি এই প্রথম জানালেন যে, "আমার মনে হচ্ছে বোধহয় এইবার বার্দ্ধক্যের শয়তান আমাকে স্পর্শ করতে আরম্ভ করেছে।"

ফুশে মারা গিয়েছেন মাত্র কয়েক বছর। শুনলাম তিনি মৃত্যুর কয়েক মাস আগে পর্যন্ত এঁ্যাস্তিতুৎ-এর অধিবেশনে সমানে উপস্থিত থাকতেন। আমার মনে যেন বিশ্বাসই হয় না যে, তিনি আর জীবিত নেই। এখনও ভুলে মনে করি যে, পারীতে গেলে আবার তাঁর সঙ্গে দেখা হবে।

এ্যাস্তিতুৎ-এ গবেষণায় ব্যাপৃত অন্তেবাসী ও অধ্যাপকরা ছাড়া দেশান্তর থেকে আগত মনীষী ব্যক্তিদের শুভাগমনে মাঝে মাঝে বিশেষ অধিবেশন করে তাদের ভাষণ শোনা যেত।

একবার এক খ্যাতনামা ভারতীয় তথা বাঙালী অধ্যাপক সোর্বন-এ আসায় তাঁর সম্মানার্থে তাড়াতাড়ি ধারাবাহিক কাজ ভেঙে এক বিশেষ অধিবেশনের ব্যবস্থা হলো। তিনি ভারতীয় দর্শন ও মিস্টিসিজম সম্বন্ধে বলবেন বলে মুখবন্ধে শ্রোতাদের প্রকারান্তরে জানালেন যে, ইয়োরোপীয়রা মূলত পার্থিব ভোগসুখপরায়ণ অতএব তাঁদের পক্ষে আধ্যাত্মিক সূক্ষ্ম অনুভূতিকে উপলব্ধি করা মুস্কিল হবে।

আমাদের দেশের অনেকেই যাঁরা ওদেশে সফর করেন, তাঁদের ভারতীয় আধ্যাত্মিকতার কথা বাজারে প্রচার করতে দেখা যায়। আমাদের অধ্যাত্ম দর্শনে দখল না থাকলেও শিক্ষিত ইয়োরোপীয়রা ইয়োগীর দেশের লোকদের জীবনের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গি যে কিছুটা অন্যতর হবে আগেই এ ধারণা করে নেন। কিন্তু আধ্যাত্মিকতার অভিব্যক্তিটার সঙ্গে আমাদের দেশীয়দের মারফতে তাঁদের যখন সাক্ষাৎ পরিচয় হয় তখন তাঁরা বেশ কিছু বিস্ময়ান্বিত এবং আড়ষ্ট হয়ে যান। ইয়োরোপীয়দের মধ্যেও যে জীবনের প্রতি অপার্থিব একটি দার্শনিক দৃষ্টি থাকতে পারে এবং তাঁরা তার দ্বারায় জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা করেন এর দৃষ্টান্ত খুব অবিরল নয় কিন্তু তাকে দেখবার ও চেনবার মতো দৃষ্টি বা আগ্রহ আমাদের প্রাচ্যদেশীয় অধ্যাত্মবাদী পর্যটকদের মধ্যে দেখা যায় না।

এই অধিবেশনে ভারতীয় ছাত্ররা বক্তার এ রকম রূঢ়োক্তিতে বেশ লজ্জিত ও বিচলিত হয়েছিলেন কারণ সভায় উপস্থিত ছিলেন কয়েক জন ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত ফরাসী অধ্যাপক ও গবেষকবৃন্দ।

আগত অধ্যাপক মহাশয়কে পারী দেখানোর ভার আমার ওপর ভারতীয় ছাত্রদের তরফ থেকে ন্যস্ত করা হলো কারণ আমাদের দেশের সাধারণ ধারণায় যে ছাত্র আঁকে বা মূর্তি গড়ে তার হাতে নষ্ট করবার মতো অফুরন্ত সময় থাকে।

আমাদের দেশের সাধারণ ট্যুরিষ্টদের পারী দেখানো খুব বিড়ম্বনার ব্যাপার হতো না কারণ তাদেব ওদেশী আচার ব্যবহারের কি রকম ভব্যতা রক্ষা করা উচিত জানালে তাঁরা সেইমতো শুধরে অভ্যাস করে নেবার চেষ্টা করায় আপত্তি জানাতেন না। কিন্তু আমাদের দেশের গণ্যমান্য যাঁরা আসতেন তাঁদের যদি বলা হতো যে, আমরা দেশে সাধারণত যেমন গলাবাজী করে কথাবার্তা বলি, সে রকম ভাবে কথা বললে, এমন নিনাদ বিনিন্দিত কণ্ঠস্বর শুনতে অনভ্যস্ত এ দেশীয় শ্রোতাদের কান ঝালাপালা হয়ে যাবে, তা হলে তাঁরা এই স্পর্ধাজনক উক্তিতে প্রস্তাবকারীকে বিশেষ ভুরু আর চোখের ভঙ্গিতে প্রায় ভস্ম করবার ব্যবস্থা করতেন। চা, স্যুপ ও স্থূল খাদ্য গ্রহণের সময় ফু-রু-রু-প, চক্-চক্, সপ্‌সপ ইত্যাদি শব্দে ভোজনের চোষণ, নিষ্পেষণ ও নিষ্কাষণের ঐকতান আওয়াজ এবং ব্যাঘ্র ও গো-মহিষাদিকে লজ্জা দিতে পারে এমন মুখব্যাদনে দন্ত জিহ্বা ও ওষ্ঠাধরের কসরতে ভোক্তব্যের রকমারী ওলটপালট যে এ দেশীয়দের অতিশয় দৃষ্টি-কটু লাগে তা জানালে বলতেন, 'আমাদের খুশী যে আমরা দেশীয় সামাজিক আচারে চলব, ওরা আমাদের দেশে গিয়ে কি আমাদের আচার অভ্যাস নকল করে?'

এ যুক্তি আমি মেনে নিতে রাজী যে, ইয়োরোপীয়রা অন্তর্দৃষ্টির সূক্ষ্মতা সম্বন্ধে আমাদের মতো পারদর্শী না হলেও আপন জীবনের চারপাশের পরিবেশকে পরিষ্কার ও সুন্দর রাখতে চায় এবং তাদের পক্ষে আপন ঘর, গ্রাম ও শহরকে আঁস্তাকুড় ও আস্তাবলে পরিণত করে সুখ অনুভব করা অসম্ভব হবে। কিংবা হাঁচি, কাশি ও অন্যান্য শারীরিক বিস্ফোরণের আস্বাদ আশপাশের সকলকে বিতরণ করার অভ্যাসে তাদের রীতিমতো বেগ পেতে হবে। পথে চলতে বা বিরামে নিজেকে ব্যাপৃত রাখতে ওয়্যাখ, থ্যাঃ প্রভৃতি নিষ্ঠীবন উদ্গারের বজ্রধ্বনি সহকারে ইমারত ও বাসগৃহের কোণগুলিকে পিকদানীতে পরিণত করা কিংবা নাসিকানিঃসৃত সর্দিকে কেতাদুরস্ত আঙুলে নিষ্কাষণ ও সেই লালাসিক্ত আঙুল নাগালে-পাওয়া দেওয়াল থাম বা আসবাবে ঘষে শুকিয়ে সাফ করে নেওয়া, আমাদের মতো দার্শনিক দৃষ্টির অভাবে কোনোদিন তারা অভ্যাস করতে পারবে না।

অধ্যাপক মহাশয় আমাদের উপযুক্ত দেশাচারের অনেকগুলি গুণকে পারীতে থাকাকালীন সযত্নে বজায় রেখেছিলেন এবং জাতীয় চরিত্রবিহীন আমি তাঁকে সঙ্গে নিয়ে কোথাও যেতে বেশ বিব্রত বোধ করতাম।

পারীর সুবিখ্যাত রাজপথ শাঁজেলিজে-তে বিগত যুদ্ধের আগে দুটি প্রসিদ্ধ কাফে তিরল ও উঙ্গারিয়া ছিল ট্যুরিষ্টদের আকর্ষণ। এ দুটি স্থানেই অতি অল্প-মূল্যের পানীয় নিয়ে সারাদিন সন্ধ্যা ও গভীর রাত পর্যন্ত সুইস্ গ্রাম্য সংগীত ও নৃত্য বা হাঙ্গেরিয়ান জিপ্‌সি বাদ্যবাদন যতক্ষণ খুশী শুনে চিত্তবিনোদন করা যেত। অধ্যাপক মহাশয়কে নিয়ে গেলাম উঙ্গারিয়াতে এক সন্ধ্যায়। তিনি আশপাশে তাকিয়ে বললেন, "এখানে সবাই বসে দেখছি মদ খাচ্ছে, জায়গাটিতে বেশীক্ষণ বসাটা কি নিরাপদ হবে?"

জানালাম যে, ফ্রান্সে মদ ছাড়া অন্য পানীয় বড় কেউ পান করে না। একমাত্র পরিপাক শক্তি বিকল হলে লোকে এখানে জলপান করে থাকে কিন্তু সে সাধারণ কলের জল নয় ভিসি ও অন্যপ্রকার হজম-সাহায্যকারী হাকিমী বারি এবং তা কিনতে শরাবের চেয়ে বেশী দাম লাগে। এত মদ খেয়েও এ দেশে কেউ মাতলামি করে না। এখানে লোকে মদিরা পান করে একমাত্র পানীয় হিসাবে আর আমাদের দেশে লোকে মদ খায় মাতাল হবার উদ্দেশ্যে।

ইতিমধ্যে আমাদের পাশে খালি টেবিলে একটি সুশ্রী তরুণী এসে চেয়ারে বসল। অধ্যাপকের দৃষ্টি তার দিকে ধাবিত হয়ে একেবারে নিষ্পলকে নিবদ্ধ হয়ে গেলো এবং সে দৃষ্টিতে মিস্টিসিজম বা দার্শনিক কিছুর আভাষ ছিল না। আমাকে বাধ্য হয়ে বলতে হলো যে, অমন করে কোনো তরুণীকে চোখের চাউনীর মারফতে উচ্ছিষ্ট করার প্রচেষ্টা এ দেশে অতি অভদ্র আচরণ বলে গণ্য করা হয়।

তিনি তাতে বিচলিত না হয়ে বললেন, "সে কি হে, আমি তো শুনেছি এ দেশে মেয়েদের দিকে সৎ বা অসৎ উদ্দেশ্যে অগ্রসরে কোনো বাদ-বিচারের বালাই নেই আর আমি মেয়েটির দিকে একটু তাকিয়েছি বলে অভদ্রতা হয়ে গেলো! আহা যেন সরস্বতীর মতো রূপ, আমার সঙ্গে আলাপ করিয়ে দাও না।"

বললাম, "অচেনা মহিলার সঙ্গে বিনা কারণে ডেকে আলাপ করানো এ দেশে চলে না।"

তিনি বললেন, "ইয়ংম্যান, তোমার সাহসের অভাব দেখে আমি তোমার প্রতি বীতশ্রদ্ধ হচ্ছি।"

তারপর তাকে মাদ্‌ময়জে.ল, মিস্ ইত্যাদি সম্বোধনে হাতছানি দিয়ে ডাকতে শুরু করে দিলেন। আমি তাঁর কাণ্ড দেখে তো হতবাক।

মেয়েটি ভাঙা ইংরাজীতে বলল, "আপনি কি আমাকে ডাকছেন?"

অধ্যাপক বললেন, "তুমি ওখানে একা বসে কেন, আমাদের টেবিলে এস।"

সে বললে, "ধন্যবাদ, আমার ছেলেবন্ধুর অপেক্ষায় আছি, সে এখুনি এসে পৌছাবে।"

তিনি বললেন, "তাতে কি হয়েছে, সে এলেও আমাদের সঙ্গে যোগদান করতে পারবে।"

ঘটনা অনেক দূর গড়াচ্ছে দেখে ফরাসী ভাষায় তরুণীকে জানালাম যে, আমার সঙ্গীর এই পাগলামীতে যেন কিছু মনে না করেন কারণ তিনি একটু বেশী মাত্রায় পান করায় অপ্রকৃতিস্থ হয়েছেন।

সে হেসে বলল, "তা তাকার ঘটা দেখেই বুঝেছি" এবং উঠে দূরের একটা খালি টেবিলে স্থান পরিবর্তন করল।

অধ্যাপককে জিজ্ঞাসা করলাম, কাফেতে মা-সরস্বতীদের রূপ দর্শন ছাড়া তাঁর আর কিছু পারীতে দেখবার ইচ্ছে আছে কি-না।

তিনি প্রশ্ন করলেন, "কি কি এখানে দেখা উচিত?"

প্রস্তাব করলাম, প্রাচীন গীর্জা, প্রাসাদ, বিখ্যাত সংগ্রহশালা ও গ্রন্থাগারগুলি দেখা উচিত। কিন্তু তাঁর এ প্রস্তাব পছন্দ হলো না, কারণ তিনি তো লণ্ডনে সেণ্ট পলস্ গীর্জা ও ব্রিটিশ মিউজিয়াম দেখেছেন। তিনি মাত্র কয়েক দিনের জন্য এই শহরে এসেছেন কাজেই নতুন অন্য কিছু দেখতে চান যাতে তাঁর বিশেষ রকমের চিত্তবিনোদন হতে পারে।

তাঁকে নিয়ে গেলাম ক্যাসিনো দে পারীর রঙ্গালয়ে। সেখানে তিনি সুবেশী স্বল্পবেশী ও উলঙ্গিনী সুন্দরীদের লাস্য, নৃত্য ও গীত খুব রসের সঙ্গে উপভোগ করলেন। কিন্তু বেরিয়ে এসে বললেন, এর চেয়ে নিশ্চয়ই আরও উদ্দীপনাময় কিছু দেখার জিনিস আছে এবং রসিকতা করে জানালেন, "বুঝছ তো হে, আবার তো ফিরে যাব দেশের সেই রঙতামাশাবিহীন একঘেয়ে জীবনে আর ঘরেতে সেই আট-পৌরে গৃহিণীর বিরস সাহচর্যে। এতদূর এতকষ্ট করে যখন এলাম একটা বিশেষ কিছু ভোগ করে যাই যা চিরদিন মনে থাকবে।"

বললাম, "ক্যাসিনো দে পারীর চেয়ে ঐ ধরনের আরও উদ্দীপনাপূর্ণ কিছুর পরিচয় পেতে গেলে তাঁকে যেতে হবে অন্য বিশেষ রঙ্গালয়ে যেখানে এই নগ্না সুন্দরীদের দূরে বসে দূরবীণ দিয়ে দেখতে হয় না, হাতের নাগালে তিনি তাদের স্পর্শসুখও উপভোগ করতে পারবেন এবং তার জন্য রাস্তা দেখাতে আমার সাহায্যের প্রয়োজন হবে না কারণ এখানে সর্বত্র সে ভোগালয়গুলির সামনে লাল-বর্তিকা দিয়ে চিহ্নিত করা।"

এই শুনে তিনি আমায় প্রচুর গালিবর্ষণ করলেন। যার মর্মার্থ হলো এই যে, আমরা ছাত্ররা যুবকজীবনকে সব রস ও উপাদান দিয়ে ভোগ করার অফুরন্ত সুযোগ পেয়েছি বলে তার দম্ভে এক বৃদ্ধের বিরস জীবনকে নিয়ে রহস্য করবার সুযোগ নিলাম। অধ্যাপক দেশে ফিরবার আগে তাঁর বিরস জীবনে পারী থেকে উদ্দীপনা-পূর্ণ কিছুর স্বাদ নিয়ে ফিরেছিলেন কি-না জানি না কারণ তাঁর সঙ্গে আমার আর সাক্ষাৎ হয়নি। কাগজের মারফতে জানলাম, তাঁর ইয়োরোপে ভ্রমণকাহিনী লিপিবদ্ধ করে সবিস্তারে বর্ণনা দিয়েছিলেন চরিত্রনাশের প্রলোভনভরা শহর পারীতে ভারতীয় যুবক ছাত্রদের ব্যাভিচারের এক বিবরণ।

মার্থ ও গ্যাব্রিয়েল

লুভ্‌র মিউজিয়ামে দর্শকদের জন্য চারটি প্রবেশ দ্বার আছে। পূর্ব প্রান্তের দরজা দিয়ে মিশরীয় বিভাগ থেকে যাত্রা শুরু করা চলে অথবা পশ্চিম প্রান্তে ইয়োরোপীয় মধ্যযুগের ভাস্কর্য-সংগ্রহে আসা যায়। কিন্তু প্রাসাদের মাঝ বরাবর উত্তর ও দক্ষিণ দিকের সরাসরি প্রবেশপথ দুটিরই প্রাধান্য বেশী। এই দুই দরজা দিয়ে প্রত্যহ দর্শকরা আসেন দলে দলে। এর এক থেকে অপর প্রান্তে বিস্তৃত বিরাট ভেসটি-বিউল-এ টিকিটের কিওস্ক, হাতের ব্যাগ, পার্সেল, ছাতা ছেড়ে হাল্‌কা হবার ব্যবস্থা এবং বিশিষ্ট শিল্প নিদর্শনের প্রতিলিপি, পোস্টকার্ড, ফটোগ্রাফ, প্লাস্টার ও ব্রোঞ্জ কাস্ট কেনার কাউণ্টার, সব গ্যালারীর অবস্থান ও সংগ্রহের তালিকাজ্ঞাপক একটি মডেল ইত্যাদির সমাবেশ দর্শকদের মনকে যেন সংগ্রহশালার বিশিষ্ট আবেষ্টনীতে থাকার জন্যে তৈরী হতে বলে।

লুভ্‌র দেখার আমন্ত্রণে এইখানে দাঁড়াতাম মার্থের অপেক্ষায়।

সে পৌঁছে ভালো দিনের শুভেচ্ছা জানিয়েই, "দাঁড়াও, কয়েক মিনিট এখুনি একটু ঘুরে আসছি" বলে উধাও হয়ে বেশ লম্বা সময় আমাকে অপেক্ষার অসোয়াস্তিতে বিরক্ত করে ফিরত এবং বিশেষ কোনো গ্যালারীতে যাবার প্রস্তাবে ও সেখানে গিয়ে ছবি দেখায় ও শিল্পালোচনায় খুব ব্যস্ত হয়ে যেত, যাতে তার এই সময় নষ্টের জন্য আমি কোনো অভিযোগের সুযোগ না পেতে পারি।

পরপর বার দুয়েক 'এই এখুনি আসছি'-র পুনরাবৃত্তি হতে রাগত হয়ে বললাম, "মাদ্‌ম্যয়জে.ল, লুভ্‌র-এ পৌঁছেই তোমার নিত্য এক প্রয়োজনে অতি সম্প্রসারিত যে কয়েক মিনিট কাটিয়ে আসতে হচ্ছে সেটা কি আমি এখানে আসার আগে সেরে এলে ভালো হয় না?"

সে বলল, "না মঁ্যসিয়ো, তুমি আমার প্রয়োজনকে ভুল আন্দাজ করছ। লুভ্‌র-এ এলেই সবার আগে একজনের সঙ্গে একটু মোলাকাত করবার একটা শর্ত আমার সঙ্গে অনেক বছর ধরে ঠিক হয়ে আছে, সে অভ্যাসটা অকারণে আমি ছাড়তে চাই না। তোমাকে একটু অপেক্ষা করতে হয়েছে বলে মাপ চাচ্ছি।"

কিন্তু আবার যখন একসঙ্গে লুভ্‌র দেখার ব্যবস্থা হলো, সে ঠিক আগের মতো "রাগ করো না আমি এখুনি আসছি" —বলে উধাও হলো।

রাগ ও কৌতূহল এ দুয়ের নির্দেশে তার গতি অনুসরণ করে পৌঁছালাম গ্রীক গ্যালারীতে। চলতে চলতে ভাবছিলাম মার্থের সঙ্গীবিবাগী হওয়ার ঔৎকট্য বোধহয় একটা ভান। তার নিশ্চয়ই আছে সবারই মতো এক বিশেষ সঙ্গী যার সঙ্গে রাঁদেভুর ব্যবস্থা হয় এই লুভ্‌র-এর কোনো গ্যালারী দেখার অছিলায়। এই গ্যালারীতে বহুবার তার সঙ্গে এসেছি এবং গ্রীক শিল্প নিয়ে আমাদের তর্ক-বিতর্ক

হয়ে গেছে প্রচুর। ইয়োরোপীয় সংস্কৃতির ভিত্তিতে গ্রীক কৃষ্টির দেওয়া বুনিয়াদ পেয়ে পাশ্চাত্ত্য দেশের লোকেরা ধরে নেন যে, প্রাচীন গ্রীক সভ্যতা ইয়োরোপীয় সভ্যতার গণ্ডীর অন্তর্ভুক্ত। মার্থ এই যুক্তিকে এক রকম ঝগড়া করে জারি করবার চেষ্টা করত।

আমি তাকে ধৈর্যের সঙ্গে বোঝাতে চাইতাম যে, যে-গ্রীক সভ্যতার উত্তরাধিকারীর বড়াই আজকের ইয়োরোপবাসীরা করতে চান তার উৎপত্তি ও প্রসারকালীন গ্রীকরা কিন্তু ইতালির উপদ্বীপের উত্তরের জগৎ সম্বন্ধে জানতে বিশেষ উৎসুক ছিলেন না, কারণ ঐ সব দেশের লোকেদের সভ্যতায় তখন বলবার বা জানাবার মতো কিছু ছিল না। সে যুগের গ্রীকদের স্বতন্ত্র উপনিবেশের এলাকায় পশুপালন ও চাষবাসে ব্যাপৃত গ্রামীণ জীবনে পশ্চিম এশিয়া ও উত্তর পূর্ব আফ্রিকার শক্তি, সমৃদ্ধি ও সভ্যতার সঙ্গে সাক্ষাৎ পরিচয় করার প্রচেষ্টা ছিল তাদের একটা উচ্চাভিলাষের স্বপ্ন।

এশিয়া ও আফ্রিকার রাজন্যবর্গের সেনাবাহিনীকে পুষ্ট করত বহু ভাগ্যান্বেষী ভাড়া-করা গ্রীক সৈনিকরা। ধনরত্ন ও সৌভাগ্যের চিন্তায় তাঁদের দৃষ্টি ধাবিত হতো এজিয়ান সমুদ্রের পূর্ব উপকূলে। শুধু তারা নন গ্রীকের দেবতারা ও পৌরাণিক বীরেরাও পাড়ি দিতেন প্রাচ্যের দিগন্তে। দ্রাক্ষারসের মদিরার তর্পণে পূজা পাবার উদ্দেশ্যে পানে মত্ত মেনাদ্, ফন্, সাতির্, সেণ্টর ও নিম্ফদের বাহিনী নিয়ে দেবতা দিওনিসুস প্রাচ্যের বহু রাজ্য জয় করে পরিশেষে বিজিত ভারতের সৌন্দর্যে মোহিত হয়ে সেখানে থেকে গিয়েছিলেন।

শোনা যায় যে, বীর আলেকজাণ্ডার-এর ভারত বিজয়াভিযানের পশ্চাতে ছিল পরাক্রমে দেবতা দিওনিসুস-এর সমকক্ষ হবার স্বপ্ন। বহু অভিযান-পীড়িত গ্রীকেরা আপন সত্তাকে বাঁচিয়ে রাখতে ব্যায়াম ও ক্রীড়ার শারীরিক চর্চায় দৈহিক শক্তিকে যতখানি বর্ধিত ও কেন্দ্রীভূত করা যেতে পারে তাতে চেষ্টিত থাকতেন এবং এইভাবে অর্জিত অমানুষিক দৈহিক বলে বলীয়ান সংখ্যালঘিষ্ঠ বীরেরা যখন বৈরীর বিপুল বাহিনীকে পরাজিত করতেন তখন তাঁদের শৌর্যে ও জয়ে বিস্মিত ও মুগ্ধ জনসাধারণ দেখত তাঁদের স্বরূপে দেবতার আবির্ভাব।

তাই কবি হোমার-এর কাব্যে কত স্বর্গের দেবদেবীরা মর্তের মানুষের রঙে ও খেলায় মিশে কত লীলাখেলা করে গেলেন। শক্তির উন্মেষে উদ্বেলিত, পেশীর ছন্দে লীলায়িত সুন্দর মানবদেহে অবতীর্ণ হলেন জিয়ুস্, অ্যাপোলো, হেরা, আথেনা পোসেইদন, অ্যাফ্রোদাইতে ও অন্যান্য দেবদেবীরা পাথর ও ব্রোঞ্জের মনোরম মূর্তি পরিগ্রহ করে। কিন্তু গ্রীক ভাস্করদের গড়া এই দেবমূর্তিতে মানবাতীত বল ও সৌন্দর্য ফুটে উঠলেও তার মধ্যে বিকাশ পায়নি শক্তিমত্তার দম্ভ বা রূপাভিমান। মানবাকৃতি নিহিত কেবল এক স্বর্গীয় মহিমাভরা এই দেবতারা ভক্ত ও পূজারীদের অর্ঘ্য, আহুতি, পুষ্প, মাল্য, পান, আহার, নৃত্য, সংগীতে মোহিত হয়ে মর্ত্যকে

যেন স্বর্গের ভ্রমে গ্রীসের পর্বতশৃঙ্গে, প্রান্তরে, নদীতটে, তোরণে, স্তম্ভে, মন্দিরে ও প্রাসাদে আসন পরিগ্রহ করেছিলেন স্থায়ীভাবে।

সেকালের গ্রীসের সেরা ভাস্করশিল্পী ফাইদিয়াস, মাইরন পলিক্লিতাস ও প্রাক্সিতেলস্-এর রচিত অপরূপ সব মূর্তিগুলিই বোধহয় কালের ধ্বংসাবলেপনে অজ্ঞাতের গহ্বরে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে। পড়ে আছে আজ কেবল প্রাচীন নকলনবিসি শিল্পীদের করা তাঁদের সৃষ্টির নাম ও স্মৃতি বহনকারী কয়েকটি মূর্তির অনুকরণ মাত্র।

এই নকল-করা মূর্তির রূপ যদি আমাদের মন ও হৃদয়কে সৌন্দর্যের মাধুরী দিয়ে আজ এমন মধুময় করতে পারে, না জানি তাঁদের আসল রচনাগুলিকে দেখবার সুযোগ পেলে রূপভোগানন্দের কোন সাগরে আমরা অবগাহন করে মজে যেতাম। আজ ভেনাস দ মিলো, কিংবা ভিক্‌ট্রি অফ সামোথ্রাস্ একাধারে মানবদেহের অসীম সৌন্দর্য ও ভাস্কর্য নৈপুণ্যের উচ্চতম উদাহরণ হিসাবে জগদ্বিখ্যাত হলেও ঐ রচনার সমসাময়িক রূপবেত্তাদের কাছ থেকে উৎকৃষ্ট শিল্প রচনার উদাহরণ হিসাবে এই মূর্তি দুটির কোনো উল্লেখ পাওয়া যায় না।

গ্রীকমূর্তির বহু যুযুধান বীরের আহ্বান, নিম্‌ফদের হাতছানি, অ্যাপোলোর নিপুণ আঙুলের টানে লায়ার তন্ত্রীতে ধ্বনিত সুরমূর্চ্ছনার মোহ ও অ্যাফ্রোদাইতের উন্মুক্ত রূপের আকর্ষণকে এড়িয়ে আমার চোখ পড়ল মার্থের ওপর।

বিরাট জানালা থেকে একফালি রোদ পড়েছিল দু'কোণ হয়ে ভাঁজ খাওয়া দেওয়ালের এক কিনারায়। আমার দৃষ্টির আড়ালে পড়া সেই দেওয়ালে রাখা একটা কিছু যেন সম্মোহিত করে মার্থকে নিশ্চল দাঁড় করিয়ে দিয়েছিল। তার স্থিরদৃষ্টির কিনারা উপচে অশ্রুধারা দু'গণ্ডে প্রবাহিত দেখলাম। আমার অস্তিত্বকে সে গ্রাহ্য করল না। মার্থের লক্ষ্যকে অনুসরণ করে দেখলাম তার সামনে রয়েছে পার্থেনন্-এর মন্দিরে খোদিত ঘোড়সোয়ারী বীরদের একটির শুধু প্রায় ভাঙা মুখ যার ওপর রোদ্দুরের আভা পড়ে জীবনের স্ফুরণ যেন ঝল্‌কে-ঝল্‌কে উদ্ভাসিত হচ্ছিল। মূর্তিটির সঙ্গে মার্থের অশ্রুধারার সম্বন্ধ নির্ণয়ের চেষ্টা না করেই আস্তে আস্তে ফিরে গেলাম ভেস্‌টিবিউল-এ।

সে কিছুক্ষণ পরে স্বাভাবিক হয়ে ফিরে আসতে সে দিনের রফা মতো ড্যাচ গ্যালারী দেখে দিনটা কাটানো গেলো।

লুভ্‌র-এ আমার আর এক নিমন্ত্রণে মার্থ ফের 'আসছি বলে' চলল, গ্রীক গ্যালারীতে এবং তাকে অনুসরণ করে দেখলাম সে আবার দাঁড়িয়েছে যৌবনের ব্যঞ্জনায় স্ফুট সেই মুখখানির সামনে। কিন্তু সে-দিন অশ্রুধারার বদলে দেখি যে-তার চোখদুটিতে হাসির উচ্ছ্বাস আর যেন বাঁধ মানছে না আর কোনো প্রচ্ছন্ন কথোপকথনে তার ঠোঁট দুটি ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে উঠছিল। আমার মনে হলো, সে নিশ্চয়ই পাগল। এই হেঁয়ালি-ভরা আচরণ কাউকে ছলনার অভিনয় তো হতে পারে না।

তাকে চমকিয়ে ডাক দিলাম।

কোন বিস্মৃতির ওপার থেকে এক ধাক্কায় সে বাস্তব জগতে আছড়ে পড়ে বলে উঠল, "একি তুমি এখানে কেন! ভেস্‌টিবিউলে আমার জন্যে তোমার অপেক্ষা করা উচিত ছিল।"

বললাম, "মাদ্‌ম্যয়জে.ল অপেক্ষা করতে বলেছ ঠিকই কিন্তু তোমাকে অনুসরণ করতে তো মানা করোনি। তোমার কোনো আপত্তি বা অনুযোগ আজ শুনব না। আমার কয়েকটি প্রশ্নের জবাব তোমাকে ঠিকমতো দিতেই হবে। এর জন্য যদি আমাদের বন্ধুত্বকে বরাবরের মতো ছুটি দিয়ে দিতে হয় তাতেও আমি রাজী আছি। তুমি এই প্রায় ভাঙা মুখের সামনে দাঁড়িয়ে একদিন কাঁদলে এবং একদিন হাসলে কেন? এ কি রহস্য যে, তুমি যেন নীরবে কথা বলছিলে কোনো অশরীরীর সঙ্গে।"

সে বলল, "কেঁদেছি, হেসেছি বাগবিতণ্ডা করেছি কার সঙ্গে তুমি তো চিনবে না। ও আমার গ্যাব্রিয়েল। আজ আর গ্যালারী দেখা হবে না। স্থেন-এর ধারে গিয়ে বসি চলো, তারপর এ হেঁয়ালির ভালো করে সমাধান করে দেবো।"

* * *

অপরাহ্নের পড়ন্ত রোদ প্লেন গাছের পাতা ও শাখা-প্রশাখার সঙ্গে লুকোচুরি খেলে নীচের জমি আর নদীর জলে সোনালী আলোর বুটি ফেলে কত নকসা কাটছিল। এই আলো ও ছায়ায় মেশানো চাঁদোয়ার নীচে পাতা বেঞ্চে আমরা বসে গেলাম।

মার্থ বলল, "গ্যাব্রিয়েল আমায় ছেড়ে গিয়েছিল দশ বছর আগে এবং এ পর্যন্ত তার কথা আর কাউকে বলিনি।"

সে যে কথা প্রসঙ্গে এই নাম দু' একবার আগে উল্লেখ করেছিল তা স্মরণ করিয়ে তার কথায় বাধা দিলাম না।

সে বলে চলল, "গ্যাব্রিয়েল-এর সঙ্গে আমার প্রথম দেখা হয় গ্রাঁ সালোঁতে এক নাচের সম্মেলনে। আমার পরিচিত এক সখের শিল্পী এই নাচের আসরে যাবার জন্যে একটা নিমন্ত্রণপত্র দিয়েছিলেন কিন্তু সেখানে পরিচিত ছেলেবন্ধু সঙ্গে কেউ না থাকায় ঠিক পছন্দসই নাচবার সঙ্গী পাচ্ছিলাম না। দু'একজন বৃদ্ধ নৃত্যের নামে আমাকে ধরে জাপটাজাপটিতে প্রায় ভল্লুক-নৃত্য করলেন। বিতৃষ্ণায় ও বিরক্তিতে নাচের আসর ছেড়ে চলে আসবার উদ্যোগ করছি এমন সময় 'আমি গ্যাব্রিয়েল, মাদ্‌ম্যয়জে.ল তুমি আমাকে নাচবার সম্মতি দিলে ধন্য হব' —বলে সামনে দাঁড়াল ব্লণ্ড ও সুপুরুষ একটি যুবক। তার সঙ্গে নাচতে নাচতে ভ্যাল্‌স্‌-এর ঘূর্ণিপাকে যে প্রণয় শুরু হয়ে গেলো তারই আনন্দস্রোতে আমরা নিজেদের অবাধে ভাসিয়ে দিলাম।

"সে কিন্তু সাধারণ প্রেমান্ধের মতো কেবল ভালোবেসেই তৃপ্ত ছিল না। তার মতে স্ত্রী ও পুরুষের প্রথম ভালোবাসার বন্ধনে পরস্পরকে সব কিছু দিয়ে দেওয়ার চেয়ে বেশী দান করার যে নিয়ত নিবেদন চলতে থাকে তার জোয়ারে ভাঁটা না

পড়তে দেওয়ার ম্যাজিকটি আবিষ্কার করা প্রেমের সবচেয়ে বড় কথা। প্রণয়ের প্রথম জোয়ারে অনেক ব্যক্তিগত মুখ্য রুচিভেদ ও ভিন্ন স্বভাবের স্তর ডুবে যায় সাময়িকভাবে প্রেমের গভীরে। সময়ে ভালোবাসার উৎসের খরস্রোত থেমে স্থির হলে সেই রুচির ভেদ আর চাপা-পড়া স্বভাবের স্তর প্রেমের বন্যার ওপরে ভেসে উলট-পালট খেতে থাকে। কারো ভাগ্যে এই ভেসে-ওঠা স্তরগুলি যেন বড বড আইস্‌বার্গ হয়ে প্রেমের জাহাজ ধাক্কা মেরে ভেঙেচুরে ডুবিয়ে দেয়। তাই সে আমাদের প্রণয়ের গভীরে মনের চেতন ও অবচেতনেব তলায় কোনো বিবাদী অংশ লুকিয়ে আছে কি-না তাব আবিষ্কাবের চেষ্টা করত।

"যদি বলতাম, এখন সে সবের খোঁজ ছেড়ে দাও যবে সে অংশের উন্মেষ দেখা দেবে তার নিষ্পত্তি তখন করা যাবে। কিন্তু সে নিরস্ত হবার পাত্র ছিল না। সে আমাব মুখেব দিকে বহুক্ষণ স্থির দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকলে যদি বলতাম, 'কি দেখছ?' সে জবাব দিত, 'মনে করো না, তোমার মুখের রূপসুধা পান করছি কারণ তুমিও জানো আব আমিও জানি যে, তোমাকে কেউ সুন্দরী বলবে না। কিন্তু তোমার মুখ চটকদার সুন্দব নয় বলেই এত ভালোবাসি কাবণ কোনো রূপলোভীর চোখ তোমার সৌন্দর্য-সুধা অবাধে পান করতে লুব্ধ হবে না বলে। বিধি যদি তোমার মুখের সুচারু ছাঁদ দেবাব সময় অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে থাকেন, গলা থেকে পা পর্যন্ত তোমায় যে সুঠাম মূর্তিতে তিনি গড়েছেন তাতে তাঁব গভীর মনোনিবেশের কোনো ত্রুটি পাওয়া যায় না। আমি তাঁব কাছে কৃতজ্ঞ যে, এই সৌন্দর্য অর্ঘ্য পাবে কেবল আমার কাছ থেকে।' সে আমাকে লজ্জায় রাঙা করে আবও যে কত অন্তরঙ্গ কথা বলত তা তোমায় আমি বলতে অপারগ।

"গ্যাব্রিয়েলের মতে, প্রাক্সিতেলস্‌-সৃষ্ট বলে অভিহিত অ্যাফ্রোদাইতের যে টর্‌সো লুভ্‌র-এ আছে আমার দেহ না-কি তারই অনুরূপ। সে এক অদ্ভুত প্রতিভাবান শিল্পী ছিল। মূর্তিগড়া আর চিত্রণে তার ছিল সমান দক্ষতা। নিজের দেহকে নিয়মিত ব্যায়ামে সুন্দর সক্রিয় রাখায় তার উত্তম ছিল প্রচুর। নিজেকে সে সুপুরুষ জানলেও তার এ নিয়ে কোনো আত্মাভিমান ছিল না। তিন বছরের সান্নিধ্যে আমাদের ভালোবাসায় প্রথমে দু' একটা আকস্মিক ফাটল দেখা দিয়েছিল। কিন্তু সেগুলি বন্ধ হয়ে ক্রমে একটা নিরেট ও পরিপূর্ণ প্রেমকে আমরা পেয়েছিলাম যার স্বরূপের সবটা সারা অনুভূতি ও আনন্দ দিয়ে নিয়তই ধরা ছোঁয়া যেত।

"এরপর ঠিক হলো আমরা বিবাহ করে ঘর বেঁধে হব স্বামী স্ত্রী। মূর্তিগড়া ও ছবি আঁকা ছাড়া গ্যাব্রিয়েল-এর আর এক নেশা ছিল —মাঝে মাঝে কোনো বিপদ্‌সঙ্কুল অভিযানের মাঝে নিজেকে ফেলে দিয়ে তার জয়ের ও উত্তেজনার আনন্দকে উপভোগ করা। পরকে বাহাদুরী দেখবার উদ্দেশ্যে নয়, এ কেবল নিছক নিজে একটা উদ্দীপনা পাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে চলত তার এই দুঃসাহসের সম্মুখীন হওয়া।

"এই সময় শোনা গেলো যে, এক অধ্যাপক উত্তর মেরুর গবেষণায় কয়েক জন বিশেষজ্ঞকে নিয়ে এক জাহাজে শিগ্গির পাড়ি দিচ্ছেন। তাঁরা একজন শিল্পীকে সঙ্গে যেতে আহ্বান জানান, যে তাঁদের আবিষ্কারকে চিত্রণে নিপুণভাবে আলেখ্য-বদ্ধ করতে পারবে। এ অভিযানে বিপদ ছিল, তাই আর কেউ এগিয়ে আসার আগে গ্যাব্রিয়েল এ যাত্রায় সাথী হবার ব্যবস্থা করে ফেলল।

"আমার শত অনুযোগ ও আপত্তি তাকে ঠেকাতে পারল না। সে বলে গেলো, 'মার্থ, আমার একক জীবনের এই শেষ অভিযান। ফিরে এসে আমি নিশ্চয়ই নিজেকে সম্পূর্ণ তোমার হাতে সঁপে দেবো। জানি, এই সাময়িক বিচ্ছেদে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমার মনে অশেষ কষ্ট দিচ্ছি। এতে আমার হৃদয়ে ও মনে ব্যথা জমেছে প্রচুর তাই অনুযোগে আমার সঙ্কল্পে দুর্বলতা এনে ফেরাতে চেষ্টা করো না। অনুপস্থিত ভালোবাসার দিনগুলি যে একেবারে ফাঁকা থেকে যাবে এ কথা ভেবো না, আমার অশরীরী সত্তা তোমাকে ঘিরে থাকবে সর্বদা। সেই সত্তাকে এখনকার মতো তোমার জিম্মায় দিয়ে গেলাম, দেখো যেন তোমার সান্নিধ্য থেকে তাকে হারিয়ে ফেলো না।'

"সে চলে যাবার পর আমার সামনে থেকে চন্দ্র ও সূর্যের অবসান হয়ে গেলো, যেন বরাবরের মতো, রাত ও দিনের কোনো ব্যবধান রইল না। ঘড়ির কাঁটা হয়ে গেলো নিশ্চল। তারপর চলে গেলো নীরব কয়েক সপ্তাহ। হঠাৎ একদিন সকালে দেখা সংবাদপত্রের বড় অক্ষরের হেডলাইন আমার চোখে পড়ে ছুরিকাঘাত করল। মুহূর্তে হৃদয়কে মুচড়ে দারুণ নিষ্পেষণে কে যেন আমার নিশ্বাসকে রুদ্ধ করে দিলো।

"গ্যাব্রিয়েল্‌দের জাহাজ বরফের সমুদ্রে ডুবে নিখোঁজ হয়ে গেছে। যে উনচল্লিশ জন যাত্রী ছিল তাদের একজনেরও কোনো হদিস পাওয়া যায়নি। আমার মন ও হৃদয় ছিন্নভিন্ন হয়ে চিন্তাশক্তি সম্পূর্ণ লুপ্ত হয়ে গেলো। দু'একদিন পরে যখন এই দারুণ দুর্ঘটনাকে কিছুটা ধারণা করার মতো বুদ্ধি ফিরে এল তখন ঠিক করলাম আত্মহত্যা করব।

"স্যেন নদীর বিভিন্ন পুলের ওপর বসে কতদিন অপেক্ষা করলাম নির্জন ক্ষণের জন্য যখন নিজেকে নামিয়ে দিতে পারব নীরবে সকলের অগোচরে জলের গভীরে এবং একইভাবে জলে আমার প্রাণবায়ু নির্গত হয়ে মিলে যাবে গ্যাব্রিয়েলের শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে। কিন্তু যতবার চেষ্টা করলাম মনে হলো, যেন সব পথচারীরা আমার সঙ্কল্প বুঝতে পেরে ষড়যন্ত্র করে মুহূর্তের জন্য আমাকে একলা হতে দিচ্ছে না। কিছুদিন পর বুঝবার ও ভাববার শক্তি আর একটু পরিষ্কার হলে মনে হলো যে, আমার মতো দক্ষ সাঁতারুর পক্ষে সকলের অলক্ষ্যে জলে ঝাঁপিয়ে পড়ার সুযোগ মিললেও একেবারে ডুবে মরা সম্ভব হবে কি-না বেশ সন্দেহ আছে।

"বিয়োগে হৃদয়ে প্রজ্জ্বলিত অগ্নিশিখাগুলিকে একে একে নির্বাপিত করে সময়

বয়ে যায় অঙ্গারে আবৃত ক্ষতের খানিকটা যার বেদনার ধার থেকে তীক্ষ্ণতা চলে গিয়েছে। ভাবলাম, কন্‌ভেণ্টে নান্‌ হয়ে ছারখার হয়ে যাওয়া জীবনটাকে ভগবানের পায়ে অর্পণ করে দেবো। গীর্জায় মনোবেদনা নিবেদন করে শান্তি পাবার আশায় যে পুরোহিতের শরণ নিলাম, তিনি আমার মনোকষ্টের বেদনার লাঘবে সান্ত্বনা না দিয়ে কন্‌ফেশন-এ বারবার জানতে চাইলেন আমাদের বাস্তব প্রণয় জীবনে কতবার দৈহিক মিলন ঘটেছিল তার সঠিক সংখ্যা।

"বুঝলাম, নিজেকে এমন করে ঠকিয়ে হারাবার চেষ্টা না করে গ্যাব্রিয়েল এর স্মৃতির ছড়ানো টুকরোগুলি কুড়িয়ে একত্রিত করে যদি তার স্বরূপকে খানিকটা ফিরে পেতে পারি তা দিয়ে হয়ত বাকি জীবনটাকে কোনোমতে বরদাস্ত করতে পারব।

"সে ছবি আঁকত, মূর্তি গড়ত তাই তার কাজের আনন্দের আস্বাদ পেতে গিয়েছি আতলিয়েতে। মনের মানুষ কাছে থাকলে তার স্থূল উপস্থিতি, দৃষ্টি আর হৃদয়কে আচ্ছন্ন করে দেখতে দেয় না তার প্রকৃত রূপকে। গ্যাব্রিয়েলকে কাছে পেয়ে তার অঙ্গের প্রতিটি কণাকে অনুভব করেছি কিন্তু সে চেহারার সম্পূর্ণ আদলকে চোখ দেখতে যেন ভুলে গিয়েছিল। তার কণ্ঠস্বরে আনন্দের রোমাঞ্চে উৎফুল্ল হয়েছিলাম এবং তারই আবেগ শুনতে দেয়নি তার বক্তব্যের সবটুকু। বিচ্ছেদের পরিপ্রেক্ষিতে অশরীরী গ্যাব্রিয়েল-এর চেহারাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে দেখবার আগ্রহে আমার চোখ দুটি ডুবুরীর মতো অতীত স্মৃতির ঘোলাজল কত হাতড়াতে লাগল। আধশোনা তার কতকথা মনের আঙিনায় সম্পূর্ণ হয়ে আসবার জন্যে ভিড় করতে লাগল। তারই দু'একটা যেন তার কণ্ঠস্বরকে জীবিত করে বেজে উঠত আমার কানে মাঝে মাঝে। সে যেন স্মরণ করিয়ে দিচ্ছিল যে, তার সত্তা চিরতরে আমার সান্নিধ্যের বন্ধন ছেড়ে চলে যাইনি।

"একদিন মনে পড়ল গ্যাব্রিয়েল বলেছিল, তার এক সংস্করণ না-কি লুভ্‌র-এ আছে। তখুনি ছুটলাম সেখানে। দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নিষ্পলক চোখে দেখতে লাগলাম শত শত দর্শকদের আসা-যাওয়া কিন্তু তার মধ্যে হারানো গ্যাব্রিয়েলকে ফিরে পাওয়া গেলো না। ভাবলাম যে, একবার দু'বারের জন্যে যাঁরা এখানে আসেন তাঁদের মধ্যে তাকে পাওয়া অসম্ভব বরং যাঁরা নিত্য এখানে আসেন বহুকাল ধরে, তাঁদের মধ্যে সন্ধান করা উচিত। লুভ্‌র-এর প্রত্যেক কর্মচারীদের এক এক করে দেখে নিলাম এমন কি ঝাড়ুদারকে পর্যন্ত কিন্তু তবু তার সন্ধান মিলল না। তখন তন্নতন্ন করে দেখলাম লুভ্‌র-এর সব ছবিগুলি, যদি তার একটির মধ্যে রয়ে গিয়ে থাকে তার চেহারার একটা ছাপ। অকৃতকার্য হয়ে মন নৈরাশ্যে ভরে গেলো। চেষ্টা করলাম ভাস্করের সব মূর্তিগুলির মধ্যে যদি সে কোথাও লুকিয়ে থাকে।

"সব আশা ছেড়ে প্রায় নিশ্চেষ্ট হয়ে একদিন যাচ্ছিলাম গ্রীক গ্যালারী দিয়ে। জানালা দিয়ে এক কোণে বেশ রোদ পড়েছিল। শীতে-জমা হাত দুটোকে তাপে একটু সেঁকে নেবার উদ্দেশ্যে সেখানে পৌঁছাতেই দেখি গ্যাব্রিয়েল-এর মুখখানি

আমার দিকে সারা নয়ন মেলে চেয়ে আছে। শুনলাম যেন সে বলছে, 'কি মার্থ, কেমন আছ ?' কেবল মুখখানি দেখা গেলেও আস্তে আস্তে সে যেন তার সবখানি নিয়ে এল আমার সামনে।

"যে-দিন থেকে তাকে ফিরে পেয়েছি আমাদের কত অসমাপ্ত কথাকে বলে পুরো করে নিয়েছি। কিন্তু সে যেন একটু বদলে গিয়েছে। কোনোদিন সে নিজে হেসে আমাকে হাসিয়ে আনন্দের হুল্লোড় তোলে আবার কোনোদিন অভিমান করে নীরব থেকে পাষাণ হয়ে আমাকে কাঁদিয়ে আকুল করে। তাই তুমি আমাকে কখনও কাঁদতে বা হাসতে দেখেছ।"

* * *

দেখতে দেখতে কখনও শুকনো কখনও ভেজা অটাম্-এর দিনগুলি ছোট হতে হতে শীতের আগমনবার্তা জানিয়ে দিলো। সব পাতা ঝরে বুলভার ও নদীর পাশের গাছগুলি কঙ্কালসার হয়ে ঠাণ্ডায় যেন ঠক্‌ঠকিয়ে কাঁপতে শুরু করল। বৃষ্টির বদলে ঝরতে থাকে সাদা পালকের মতো তুষারের কণারাশি এবং ক্ষণকালের মধ্যে সারা দৃশ্যকে শবাচ্ছাদনের সাদা কাপড়ে ঢেকে মৃতের মতো করে দেয় চারদিক নিস্তব্ধ ও নীরব।

বেশ কয়েক সপ্তাহ কাজের চাপে মার্থের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব হয়নি। একদিন শীত জড়ানো আলসেমিতে লেপ ছেড়ে উঠব কি-না তার বাজি কষছি এমন সময় দরজায় পড়ল কার করাঘাত। দরজা খুলে অবাক হয়ে দেখি মার্থ দাঁড়িয়ে। সে আগে কখনও হোটেলে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসেনি। ভাবলাম কোনো নতুন বিপদ বা হেঁয়ালির তাড়নায় সে এসেছে এত ভোরে আলোচনা করতে।

সে শুধু বললে, "বিদায় নিতে এসেছি। যদি চাও তো এইখানে সেটা সেরে ফেলে চলে যাব আর যদি স্টেশন পর্যন্ত আমার সঙ্গে যেতে রাজী হও তো তাড়াতাড়ি তৈরী হয়ে নাও।"

আমাকে সে কোনো প্রশ্ন করতে দিলো না। পথে শুনলাম, গ্যাব্রিয়েল-এর সঙ্গে তার না-কি কয়েক দিন ধরে ঝগড়া হয়ে গিয়েছে তাই তাকে অনুপস্থিতির সাজা দিতে সে চলেছে হল্যাণ্ডে। সে জানাল কয়েক মাস তাকে না দেখতে পেলে গ্যাব্রিয়েল-এর অহঙ্কারটা কিছু বেশ কমে যাবে।

এর আর কোনো উত্তর দেবার চেষ্টা আমি করিনি। মনে মনে বিচার করার চেষ্টা করছিলাম আমাদের মধ্যে কে পাগল।

গাড়ী ছাড়বার ঘণ্টা বাজতে সে কামরায় উঠে বললে, "তোমায় আমি কোনো ঠিকানা দেবো না, কারণ অনুপস্থিতিতে বন্ধুত্বকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য চিঠি লেখার ভানে আমি বিশ্বাস করি না। প্রথম মাসে হয়ত ঘনঘন চিঠিপত্রের আদান প্রদান হবে তারপর চিঠি দিতে ভুলে গিয়ে কর্তব্যের পর্যায়ে পড়ে যাবে এ অভ্যাস, শেষে সে কর্তব্য ভুলতে ভুলতে একদিন চিঠি লেখায় অবহেলা, অনিচ্ছুক অপরাধ

হয়ে দাঁড়াবে এবং এই অপরাধকে চাপা দেবার সমর্থনে পত্রের স্রোত একেবারে শুকিয়ে যাবে।

"কি হবে বন্ধু এ সব বৃথা ছলনায়। আমাদের মনের খাতায় জমা থাক তোমার আর আমার স্বল্প দিনের সান্নিধ্য। গ্যাব্রিয়েল-এর মতো তো আমার কোনো দ্বিতীয় সংস্করণ নেই আর থাকলেও বা তা হয়ত তোমার কাছে আমার আদলের প্রাণহীন এক ছবি বা মূর্তি ছাড়া আর বেশী কিছু হবে না।

"গ্যাব্রিয়েল্‌কে দেখো মাঝে মাঝে যদি সময় পাও এবং যদি মনে করো যে, আমার বিচ্ছেদের ব্যথায় সে পীড়িত তা হলে তাকে জানিয়ে দিও যে, সে-ব্যথার বেশীটা আমি আমার সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছি।"

ট্রেন ছেড়ে দিলো।

রুমাল উড়িয়ে বা হাত দুলিয়ে বিদায়কে দীর্ঘ করবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। সর্পিল গতিতে ট্রেন প্লাটফর্ম অতিক্রম করে সকালের ঝাপ্‌সা আলোয় খানিকক্ষণ চোখের সামনে রেখে দিলো তার পশ্চাতের গাঢ় ধোঁয়া রঙের স্বল্প পরিসরটুকু। সেটুকুও ক্রমে মিলিয়ে রয়ে গেলো কেবল একটা ছোট্ট লাল আলোর বিন্দু এবং কয়েক মুহূর্ত পরে তাকে একটা কুয়াসার পর্দা মুছে সম্পূর্ণ নিশ্চিহ্ন করে দিলো।

পাপা লুসিয়ান, এন্দা ও রিদ্‌নিক

১৯৩৯-এর পয়লা সেপ্টেম্বর ফ্রান্স হিটলারীয় শক্তির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করল। যদিও কয়েক মাস যাবৎ বিশ্বজনীন রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও তার নিশ্চিত পরিণতি সম্বন্ধে কারুর মনে কোনো সন্দেহ ছিল না, সকলেই যেন সামনে দাঁড়ানো যুদ্ধের ভয়াবহ মূর্তিকে চোখ বন্ধ রেখে তার কোনো অস্তিত্ব নেই বলে মনকে ঠারাবার চেষ্টা করছিল।

যুদ্ধ ঘোষণা করার পর পারী শহরে বাহ্যত দৈনন্দিন জীবনে কোনো পরিবর্তন না দেখা গেলেও দারুণ ভয় ও উদ্বেগ যে একটা প্রচণ্ড ঝাপটা দিয়ে সকলের মনকে আচ্ছন্ন করেছিল তার একটা ব্যাপক অভিব্যক্তিকে লক্ষ্য না করে চলা সম্ভব ছিল না।

ফ্রান্স-এর সঙ্গে জার্মানীর যে লড়াই লেগেছে এটা না জেনেই ঐ দিন সকালে প্যাভিয়ঁ ব্লো-র স্প্যানিশ রেফিউজি ক্যাম্পে রওনা হয়েছিলাম। সেখানে পৌঁছে দেখি এক বীভৎস দৃশ্য। মেয়েরা সব চিৎকার করে মাটিতে লুটোপুটি খেয়ে চুল ছিঁড়ছে, বৃদ্ধারা বুক চাপড়ে হায় হায় করে মুখে আপন হাতের নখ বসিয়ে মাংস উপড়ে ফেলার চেষ্টায় রক্তারক্তি কাণ্ড করছে আর পুরুষেরা যেন পক্ষাঘাতে অচল, নীরব ও তারা বসে পড়েছে আসন্ন মৃত্যুর অপেক্ষমাণ হয়ে।

খোঁজ করে জানলাম, এই বিয়োগান্ত দুঃখের নিদারুণ আক্ষেপের রচয়িতা হচ্ছে ম্যাজেভিয়েস্কী, সকালের রেডিওতে যুদ্ধ ঘোষণার সংবাদ শুনেই ক্যাম্পের অভিমুখে সে যাত্রা করে এবং পথে আসতে অতিরঞ্জিত গুজব যে, 'জার্মান সৈন্য প্রায় পারী শহরে পৌঁছাল বলে' —শুনে খবরটি সবিস্তারে সে রেফিউজিদের জানিয়ে দেওয়ায় ভয়ের আকস্মিক আঘাতে তারা সকলে প্রায় উন্মাদ হয়ে গিয়েছে।

ম্যাজেভিয়েস্কীকে বললাম, "তুমি কোন বুদ্ধিতে এই বাজে গুজব শুনিয়ে এদের মধ্যে একেবারে 'ম্যাস হিষ্টিরিয়া' এনে ফেলেছ? এরা এক সংগ্রামে হৃতসর্বস্ব হয়েও নিরাপদের আশ্বাসে ছিন্নবিচ্ছিন্ন জীবনকে একজোট করে বাঁচতে আশান্বিত হয়েছিল। কিন্তু এই অভাগারা সে আশ্বাসের ভিত্তি দৃঢ় হবার আগে আবার পড়েছে এই বিরাট যুদ্ধের বিভীষিকায়। এই রেফিউজিদের ভয়স্পর্শকাতর মনকে তুমি কোন আক্কেলে বিনা কারণে এমন করে ভেঙেচুরে দিয়েছ।"

সে বললে, "যুদ্ধের অবশ্যম্ভাবী ফল আজ না হয় কাল এদের ওপর এসে পড়বেই তাই চরম খবরটা জানিয়ে দিয়ে এদের মনকে তৈরী হবার একটা ব্যবস্থা করেছি।"

বললাম, "আর এই অতিরঞ্জিত ও মিথ্যা বাজারে খবরটা কি বলেছ এদের মনকে শক্ত করবার একটা মোক্ষম উপায় ভেবে!" তার প্রতি রাগ আর অনুযোগ করে কোনো লাভ ছিল না তাই বিকৃত মস্তিষ্ক রেফিউজিদের প্রকৃতিস্থ করা যায় কি-না তার চেষ্টা করতে লাগলাম। ম্যাজেভিয়েস্কীর খবরটাকে ভুল প্রতিপন্ন করা খুব মুস্কিল হলো না। তাদের বোঝালাম যে, শত্রু সৈন্যকে পারীতে পৌঁছাতে গেলে তার আগে এখান দিয়ে যেতে হবে কাজেই তারা সেখানে গিয়েছে এ সংবাদ মিথ্যা। বললাম, আমি এখুনি সঠিক খবর শহর থেকে শুনে এলাম যে, সীমান্তে ম্যাজিনো লাইনের বাইরে দু' পক্ষের গোলা বর্ষণের মহড়া চলছে মাত্র। তারা কোনোদিন যে সে লাইনের এ পারে আসতে পারবে তা মনে হয় না।

সত্যি বলতে কি প্রথমে এই ম্যাজিনো লাইনকে ফরাসীরা প্রায় সকলেই যুদ্ধকে সীমান্তে ধরে রাখবার অব্যর্থ রক্ষাকবচ বলে ধরে নিয়েছিল। বেলজিয়াম-এর দুর্বল প্রতিরোধকে ভেঙে অরক্ষিত সেই সীমান্ত দিয়ে ম্যাজিনো লাইনের প্রান্তকে ঘুরে জার্মান সৈন্যবাহিনী যখন ফরাসী সৈন্যদের পিছনে এসে গিয়েছিল তখনও নিজেদের সুরক্ষিত ও নিরাপদ বিশ্বাসে সমানে সমানে তারা কামান দেগে যাচ্ছিল। এক স্ট্র্যাটেজির সাফল্য সম্বন্ধে এই দৃঢ় আস্থাকে ব্যর্থ করে যখন সামরিক পরিস্থিতি রক্ষার নিশ্চিত ব্যবস্থার বিশ্বাসে উপস্থিত করল এক বিরাট বঞ্চনা, ফরাসী সৈন্যদের তখন এসেছিল মনোবল ও সাহসে ভীষণ ভাঙন ও হতাশা। এরপর জার্মান বাহিনীর ফ্রান্সে দ্রুত অগ্রসরে আর কোনো উপযুক্ত বাধা আসেনি।

এই দুর্বিপাকে বিষাদগ্রস্ত রেফিউজিদের মধ্যে একজনকে সবচেয়ে বেশী আক্ষেপ ও বিলাপ করতে দেখা যেত। তিনি কিন্তু এই সর্বহারাদের কেউ ছিলেন না। রেফিউজি ছেলেমেয়েরা তাঁকে ডাকত 'পাপা লুসিয়ান' বলে। ক্যাম্পের আশপাশে

যে-সব সহানুভূতিশীল কৃষকরা শাকসব্জি, ফলমূলাদি দিয়ে রেফিউজিদের সাহায্য করতেন লুসিয়ান ছিলেন তাঁদেরই একজন। প্রত্যহ সকালে ও সন্ধ্যায় এক থলে বোঝাই আলু বা অন্য কিছু ফলমূল এনে তিনি ডাকতেন সব ছেলেমেয়েদের—বিশেষ করে মেয়েদের এবং আলিঙ্গন ও চুম্বনে সম্ভাষণ জানিয়ে তাদের হাতে সে-সব বিলিয়ে দিতেন। সেখানে সকলেই জানত যে, এই বৃদ্ধের শুভেচ্ছা জানাবার আড়ম্বর ঠিক বাৎসল্যের পর্যায়ভুক্ত ছিল না।

ছেলেমেয়েরা সব চলে গেলে মঃ. লুসিয়ান চোখে একটা কদর্য ঝলক টেনে বলতেন, 'বেশ লাগে এই স্প্যানিশ মেয়েদের। রোদ পেয়ে দ্রুত বর্ধিত পরিপুষ্ট ফলের মতো এদের দেহটি কেমন সুন্দর অল্প বয়েসেই পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যে বয়েসে এরা যৌবনভারে টলমল করে সে বয়েসে আমাদের ফরাসী মেয়েরা অঙ্কুর অবস্থা কাটিয়ে উঠতে পারে না। আফসোস এই যে, দেহের দ্রুত পরিবর্তনের সঙ্গে স্প্যানিশ মেয়েদের মনটা বাল্যের প্রভাব কাটিয়ে সে তালে পাকতে চায় না। আর আমাদের মেয়েদের ছ্যাখো, জন্ম থেকেই তারা ককেৎ।'

ক্যাম্পে এই সব মেয়েদের মায়েরা সমাজে স্বাভাবিক অবস্থায় থাকলে লুসিয়ানের পাপ-চক্ষুকে অগ্নিময় শলাকা দিয়ে নিশ্চয়ই অন্ধ করবার ব্যবস্থা করতেন। কিন্তু অবস্থার ফেরে, দায়ে পড়ে তার লালসার ইঙ্গিত-ভরা অভ্যর্থনাকে মেয়েদের বরদাস্ত করতে দিতে তাঁরা বাধ্য হতেন। ছোট হলেও ছেলেমেয়েরা সকলেই লুসিয়ানের এই স্নেহাভিব্যক্তিকে ভালোভাবে বুঝে নিয়েছিল তাই কোনো মেয়েকে তিনি স্বাগত জানাতে এলে তারা চেঁচিয়ে বিদ্রূপের স্বরে বলত, 'যদি ভাগে বেশী চাস তো পাপা লুসিয়ানকে একটু দীর্ঘ ও গাঢ় আম্‌ব্রাস (আলিঙ্গন) দিয়ে দিস।'

যুদ্ধ ঘোষণার দিন ভয় ও ভাবনায় অবসন্ন পাপা লুসিয়ানকে যখন মেয়েরা এল রোজকার মতো স্বাগত জানাতে, তাদের অগ্রসরকে থামিয়ে তিনি বললেন, 'থাক বাছারা আমার কাছে আর এগিয়ে এস না। আমি অতিশয় পাপী। তোমাদের মন্দ ভাগ্যের সুযোগ নিয়ে বাৎসল্যের ভানে আমি চেষ্টা করেছি স্পর্শে মনের মন্দ ইচ্ছা চরিতার্থের। আজ বাদে কাল যখন 'স্যাল্ বস্‌্র'[১] আমাদের দেশ অধিকার করে বসবে তখন ক্ষুন্নিবৃত্তির জন্য আমার একমাত্র কন্যা ইবোন্‌কেও হয়ত তাদের কদর্য লালসার শিকার হতে হবে। আজ থেকে তোমাদের প্রতি আমার স্নেহে ইবোনের সঙ্গে কোনো তফাৎ রাখছি না। তোমরা আদর করে আমার নাম দিয়েছ পাপা লুসিয়ান —চেষ্টা করব সে নামের মর্যাদা রাখতে।'

ভার্দ্যুঁর বিজয়স্মৃতি, ম্যাজিনো লাইন, বৃদ্ধ জেনেরাল পেতাঁ্যা কি গামল্যাঁর সৈন্য নেতৃত্ব, ফ্রান্সের সাধারণ লোকের মনে আনতে পারেনি দেশ ও স্বাধীনতা সংরক্ষণের বিশ্বাস। যুদ্ধের আরম্ভেই লুসিয়ানের মতো অনেকে তাদের পতন যে

১। ইতর জার্মানরা

অনিবার্য এ রকম ধারণা করে নিয়েছিল। হতাশায় রিক্ত ও অভিভূত লুসিয়ানের দশা দেখে আপন দুঃখদৈন্য ভুলে রেফিউজিরা পর্যন্ত তাঁকে সান্ত্বনা দিতে অগ্রসর হলো।

সংঘাতের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে প্রতিদিন শহরে ও গ্রামে নাগরিকদের সাজ-পোশাক ও চালচলনে আসতে লাগল পরিবর্তন। দোকানে, বাজারে, রাস্তায়, কাফে ও রেস্তর াঁয় সক্ষম পুরুষদের সকলের ইউনিফর্ম পরা না থাকলেও মাথায় একটা খাকি টুপি চড়িয়ে জানাচ্ছিল যে, যোদ্ধাদের তালিকায় তারা নাম লিখিয়ে এসেছে এবং হুকুমের অপেক্ষায় আছে। ধীরে ধীরে যুবকদের সংখ্যা কমতে কমতে শহরে রয়ে গেলো প্রথমে কেবল প্রৌঢ় ও বৃদ্ধরা ও পরে কেবল অথর্ব বৃদ্ধের দল। বিরস বিষণ্ণতায় এরা সর্বদাই শোকাতুর।

বিনা ইউনিফর্মে কোনো যুবকের পক্ষে কাফে বা রেস্তর াঁয় গিয়ে খেতে বসা হয়ে দাঁড়াল এক কঠিন পরীক্ষা, কারণ সামনে ও আশপাশে বৃদ্ধ ও বৃদ্ধাদের পানীয় বা খাদ্য নিয়ে বসে থাকতে দেখা যাবে। তাদের হাত যেন নিষ্ক্রিয় হয়ে যাওয়ায় তারা পানীয় বা খাদ্য স্পর্শ করবে না আর নীরব শোক ও দুঃখে তাদের গণ্ড বেয়ে ঝরতে থাকবে অশ্রুধারা ও মাঝে মাঝে ফুঁপিয়ে বের হবে দীর্ঘশ্বাস।

যোদ্ধার পোশাক-পরা কোনো যুবক তাদের দৃষ্টির নাগালে পড়লে তাদের সকরুণ চোখ যেন বলতে থাকে, 'আহা বেচারী, এই তরুণ যে সীমান্তে পাড়ি দেবার জন্যে নির্বাচিত হয়েছে সেখান থেকে আর ফিরবে কি-না যথেষ্ট সন্দেহ আছে। কিন্তু যুদ্ধে যে সংশ্লিষ্ট নয় এমন প্রমাণবিহীনভাবে যদি কোনো যুবক এসে পড়ে তাদের দৃষ্টির পরিধির মধ্যে অমনি তাদের চাউনি হয়ে উঠবে কঠিন ও তীক্ষ্ণ, তাদের চোখ উপচে উঠবে ভর্ৎসনায় ও উপেক্ষায়। মনে হবে তারা অব্যক্ত বাক্যে বলছে, 'যুবক হয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে আমোদ করে বেড়াতে লজ্জা করে না যখন আর সকলে লড়াই-এ মরবার জন্যে প্রস্তুত।'

এদের প্রক্ষিপ্ত গ্লানিকে এড়াবার জন্যে যে-সব বিদেশী যুদ্ধে যোগ দিতে চায় তার কেন্দ্রে গিয়ে একদিন নাম লিখে এলাম। সেখানে জিজ্ঞাসা করল, কি কাজে নামতে চাই।

বললাম, "রেডক্রস-এর ভলেন্টিয়ার।"

কয়েক দিন পরে পারীর শহরগুলির এক সামরিক ক্যাম্পে যাবার হুকুম হলো। সেখানে যেতে কেন্দ্রের কমাণ্ডান্ট কড়া গলায় নির্দেশ দিলেন ক্যাম্পের সামনের ময়দানে দাঁড়ানো লোকের সারিতে এ্যাটেন্‌সন হয়ে যেতে। এই বেসামরিক পোশাক-পরা আন্তর্জাতিক লোকের পংক্তির সামনে ছিল অনেকগুলি ভারি ভারি চেহারার ট্রাক। সৈনিকপ্রবর আমাদের সারির এপার থেকে ওপার পর্যন্ত একটা প্রখর দৃষ্টির ফোকাস ফেলে লম্বা দম নিয়ে মুখ ব্যাদনের এক অবিশ্রান্ত প্রসারে বার করলেন দুর্বোধ্য ভাষার এক বজ্রনিনাদ।

আমার আশপাশের সকলে সে হাঁক শোনা মাত্রই ছুটে ট্রাকে চড়ে চালাতে শুরু করে দিলো। অফিসারটি খুব একটা বিশেষ উদ্দেশ্যভরা কদমে পা ফেলে আমার কাছে এসে সেই বজ্র ধ্বনির স্বর ও মাত্রা বজায় রেখে আমায় ধমক দিয়ে বললেন, "অপটু উজবুক হাঁ-করে দাঁড়িয়ে আছ কি কারণে।"

বললাম, "এখানে নবাগতকে কি করতে হবে তা আগে একটু না জেনে তাঁর সামরিক ভাষার দুর্বোধ্য হুকুমকে সত্বর তামিল করা এ অধমের সামর্থ্যে কুলোয়নি।"

তিনি আরও গালিগালাজ করে বললেন, "যে কেন্দ্র থেকে এসেছ সেখানে বলা ছিল ট্রাক ড্রাইভার-এর জন্য লোক পাঠাতে। গাড়ীর সামনে দাঁড় করিয়ে হুকুম দিয়েছি 'চালাও' --এর আবার বোঝাবুঝির কি আছে?"

সংক্ষেপে জানালাম, "সত্য এ অতি সরল প্রশ্ন কিন্তু যে কেন্দ্র থেকে আমায় পাঠিয়েছে, তারা আমি ট্রাক চালাতে পারি কি-না জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গিয়েছিল। এ বিভ্রাটের জন্য আমি দায়ী নই।"

আবার ফিরে গেলাম সেই কেন্দ্রে।

এবার তারা বলল, "যারা বিদেশী এবং লড়াই-এ যোগ দিতে চায় তারা বিশ্বাসযোগ্য কি না তার খোঁজ-খবর হচ্ছে পুলিশের থানায়। সেখান থেকে লিখিয়ে নিয়ে এস আমাদের সরকার অননুমোদিত রাজনৈতিক দুষ্কর্মে তুমি লিপ্ত নও তা হলে তোমাকে কোনো কাজে লাগাবার ব্যবস্থা করা হবে।"

প্রেফেক্তর দ্য পোলিশ-এ (থানায়) গেলে আমায় বলা হলো, 'তুমি ভারতীয়, আমাদের লড়াই নিয়ে তোমার এত মাথাব্যথা কেন? তুমি তোমার দেশে ফিরে যাও।' কিন্তু দেশে ফিরতে জাহাজ বা প্লেনে জায়গা পাওয়া তখন একেবারে অসম্ভব ছিল এবং পেলেও প্যাসেজ কিনতে ইংরাজী স্টারলিং অথবা মার্কিনি ডলার ছাড়া অন্য মুদ্রা কোনো কোম্পানী নিতে রাজী ছিল না, এমন কি ফরাসী কোম্পানীরাও ফ্রাঙ্ক নিতে খুব গররাজী ছিল। আমার তহবিলে ফ্রাঙ্ক ছাড়া আর অন্য কোনো মুদ্রা ছিল না। পারী থেকে লণ্ডনের রাস্তা খুব দীর্ঘ নয়। কিন্তু ফ্রান্স থেকে পালাতে ব্যস্ত ধনীরা যত রকমের উপায়ে ইংলিশ চ্যানেলের ওপারে যাওয়া যায় তার সবগুলিকে অর্থের বলে সম্পূর্ণ আত্মসাৎ করে রেখেছিল।

পুলিশের অফিসে বলে এলাম, হয় আমাকে তাদের দেশত্যাগের সুবিধা করে দিতে হবে, না হলে যুদ্ধের কোনো কাজে আমাকে লাগাতে হবে। অন্য কোনে উপায়ের কিনারা না দেখতে পেয়ে তারপর ঘটনার স্রোতাবর্তে এক রকম নিজেকে ভাসিয়ে দিলাম।

যখন আমরা কোনো দুর্ঘটনার খবর পড়ি তখন কেউ নিহত হয়েছে শুনলে কেবল একটা সংবাদ জানার চেয়ে মনে বেশী কিছু ছাপ পড়ে না। কিন্তু সে সংবাদ যখন নিকট আত্মীয় বন্ধু ও প্রিয়জনকে নিহতের তালিকায় ফেলে দেয় তখন তার প্রতিক্রিয়া হয় মনে মর্মান্তিকভাবে তীব্র।

বন্ধুদের মধ্যে রিদ্‌নিক-এর ডনজুয়ান হিসাবে সুখ্যাতি ছিল। বিশ্ববিদ্যালয়ের পড়াশুনা শেষ করে সে কাজ নিয়েছিল এক ফ্যাক্টরীতে কেমিষ্ট-এর। যুদ্ধের আগে ইয়োরোপে ইহুদীদের প্রতি যে বিদ্বেষ উথলে উঠেছিল তাতে সবচেয়ে কুখ্যাতি আরোপ করা হয়েছিল পোলিস ইহুদীদের প্রতি। ভাবটা এই যে, যদি রাস্তায় চলার পথে এক বিষাক্ত সাপ আর একটি পোলিস ইহুদী সামনে পড়ে তা হলে আগে তাকে মেরে পরে সাপকে নিধন করা উচিত। হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করার আগেই সেখানে একটি সম্প্রদায় ইহুদী দলনে বেশ ব্যস্ত ছিল। ইহুদী বংশজ সুপণ্ডিত অধ্যাপকদের চুল ও দাড়ি টেনে বেইজ্জত করা ছাত্রদের মধ্যে অনেকের হবি হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

রিদ্‌নিক ছিল ইহুদী এবং পোল। কিন্তু তার মতো সজ্জন দয়াবান ও নির্ভরশীল বিশ্বাসী বন্ধু খুঁজে পাওয়া ভার। তার একটি মাত্র দুর্বলতা ছিল যার জন্যে তাকে বন্ধুদের তরফ থেকে অনেক অনুযোগ শুনতে হতো। কোন আকর্ষণে বলা যায় না মেয়েরা প্রায়ই তার প্রেমে পড়ে হাবুডুবু খেত আর বন্ধুবর তাদের প্রণয়কে প্রত্যহ প্রাতরাশ গ্রহণের মতো নিয়ে যেন ধন্য করে দিতেন। আস্বাদের বৈচিত্র্য আনতে মেনু বদলের মতো তাঁর প্রেমাস্পদাদের অধিকার পরিবর্তন হতো খুব ঘন ঘন। কিন্তু সব নিয়মেব যেমন ব্যতিক্রম হওয়া সম্ভব তেমনি রিদ্‌নিক-এর বহু প্রেমিকা বিলাসকে খাটো করে একদিন একজন রূপের জালে তার হৃদয়কে পাকাপাকিভাবে বেঁধে ফেলল।

এদ্দা ছিল একাধারে রূপসী ও বিদুষী। আমরা অনেকেই এটা মেনে নিয়েছিলাম যে, তার রূপের এমন একটা বৈশিষ্ট্য ছিল, যা সব বিশেষণ উজাড় করে বললেও ঠিকমতো বর্ণনা দেওয়া হতো না। এই প্রথম রিদ্‌নিক আপন প্রাধান্য হারিয়ে এদ্দার সম্পূর্ণ ইচ্ছাধীন হয়ে পড়ল। যে ডনজুয়ান এর আমরা ভাবতাম দাম্পত্যনীড়ে আবদ্ধ হওয়ার কোনো সম্ভাবনা নেই তার হয়ে গেলো সত্বর বিবাহ।

মিয়েল্ ত্ব লুন্ অর্থাৎ হানিমুন উপভোগের যে-সব নামজাদা রোমাণ্টিক জায়গায় নববিবাহিত দম্পতিরা গিয়ে থাকেন অর্থাভাবে সে রকম সফরের ব্যবস্থা না করতে পারলেও লুক্সাম্বুর বাগানে বেড়িয়ে সেটা যে মনোরমভাবে সারা যায় তার একটা জাজ্জ্বল্যমান উদাহরণ তারা দেখিয়ে দিলো।

রিদ্‌নিকের একটি মাত্র কামরায় স্ক্রিন্-এর আব্রু করে তাদের রন্ধনের উপায় শয়নাগার ও আগত বন্ধুবান্ধবদের বসবার বৈঠকখানার ব্যবস্থা হয়ে গেলো। ল্যাটিন কোয়ার্টার-এর ছাত্রপল্লীতে এই রকম সংসারের বহু সংস্করণ চারদিকে দেখা যায়। প্রয়োজনকে গুটিয়ে কতখানি ছোট করে যে মানুষ বাঁচতে পারে তার পরিচয় এই মিনিয়েচার সংসারগুলি। কিন্তু কষ্টের অভিব্যক্তির চেয়ে এখানে দেখা যাবে অনাবিল আনন্দের অফুরন্ত প্রবাহধারা। তা ছাড়া এদ্দার খেয়ালকে খুশী করতে ব্যস্ত থাকত রিদ্‌নিক-এর বিরাট বন্ধুবাহিনী। কাজেই অভাব ও অভিযোগের

সেখানে পা ফেলার কোনো ঠাঁই ছিল না। মনে পড়ে এদ্দা শাড়ী পরে ফটো তোলার অনুরোধ করায় কত চেষ্টা করে পারীতে আগতা এক মারাঠী মেয়ের খোঁজ পেয়ে তাকে ডেকে এবং বহু অনুনয়ে তার সাহায্যে সে সাধ মেটানো হলো।

পোল্যাণ্ড আক্রান্ত হলে ফ্রান্স যেই যুদ্ধ ঘোষণা করল, স্বদেশ রক্ষার্থে উত্তেজিত রিদ্‌নিক সৈন্যদলভুক্ত হয়ে চলে গেলো ফ্রন্ট-এ। এই মহাসংহারে মৃত আপনজনের যে দীর্ঘ তালিকা চিত্রগুপ্ত লিখতে শুরু করেছিলেন, তার শীর্ষে প্রথম নাম লেখা হয়েছিল নিহত রিদ্‌নিক-এর।

এদ্দার ক্ষণজীবী আনন্দনীড়ে এই ভীষণ বিপর্যয়ের ঝড় কি রেখে গেলো তা গিয়ে দেখবার মতো সাহস আমার হয়নি।

ক্যাবারে ও রোজে

যুদ্ধের আসল গণ্ডির মধ্যে পড়ে অন্য ভারতীয় ছাত্রদের মনে কি প্রতিক্রিয়া হয়েছিল বলতে পারি না। আমার নিজের অভিজ্ঞতাকে যদি সাধারণ অনুভূতির একটা পরিমাপ বলে ধরা যায় তা হলে বলব যে, মনে কেবল কেমন একটা নির্বিকার ভাব এসেছিল মাত্র। যুদ্ধের সম্ভাবনা যতক্ষণ 'হচ্ছে কিংবা হবে না' এই রকম অনিশ্চিত অবস্থায় ছিল তখনকার ধারণায় মনে হতো যে, যুদ্ধ শুরু হলেই একটা দারুণ ভয়ে আড়ষ্ট হয়ে যাব। কিন্তু সেই সমস্যার আসল উপস্থিতিতে অবাক হলাম একটুও ভয় হচ্ছে না বলে। ভারতীয় ছাত্ররা প্রায় সকলেই জুলাই মাসে 'ভ্যাকাঁস্' আরম্ভ হতে ফ্রান্সের বাইরে ছুটি কাটাতে চলে গিয়েছিল। একটি বাঙালী ছাত্র গিয়েছিল মস্কোতে। যুদ্ধ প্রায় আসন্ন সংবাদে প্লেনে সে তাড়াতাড়ি পারীতে ফিরে আসে। মস্কোতে পৌঁছে তার কিন্তু প্লেন-এর টিকিট কিনে ফিরবার মতো অর্থসঙ্গতি ছিল না। তারপর মস্কোর এক নাগরিকের পরামর্শে তার বাড়তি ওভারকোট, স্যুট, জুতো, ঘড়ি, বর্ষাতি সব বেচে যে দাম সে পেয়েছিল তাতে প্লেন-এর ভাড়া দিয়েও অতিরিক্ত পয়সায় পথে জেনিভা থেকে নতুন স্যুট, কোট, ঘড়ি, জুতো ইত্যাদি কিনেও কিছু উদ্বৃত্ত অর্থ নিয়ে ফিরে এল।

সে আফসোস করে বলল যে, রাশিয়ায় ইয়োরোপের পুরনো জিনিস এত চড়া দামে বিক্রী হয় জানলে আরও কয়েকটা স্যুট ও জুতো, ঘড়ি সঙ্গে নিয়ে যেত এবং সেগুলি বিক্রী করে বেশ মোটা টাকা বানিয়ে পারীতে ফিরতে পারত।

তার কথা শুনে মনে হলো রাশিয়ানরা যে বলে, 'ক্যাপিতালিস্ত আওতায় বেড়ে ওঠা মানুষের মন অন্যায় ও দুর্নীতির পাঁকে নোংরা হয়ে যায়, সেটা সব ক্ষেত্রে অত্যুক্তি নয়। পরিবর্তন ও শুদ্ধ করবার চেষ্টা না করে এমন নোংরা প্রবৃত্তির নায়কদের বাতিলের ব্যবস্থা করা বোধহয় উচিত পন্থা।

পারীর ছোট্ট ভারতীয় ছাত্র সম্মিলনীর সম্পাদক ছিলেন 'গন'। রুদে সোমরার-এ তাঁর ঠিকানাকে ছাত্র সম্মিলনীর দপ্তর হিসাবে ব্যবহার করা হতো। কাজেই দেশের সঙ্গে সংযোগ রাখার মতো নানা রকম ছাপানো কাগজ, বিজ্ঞাপনী ও সেইসঙ্গে মাঝে মাঝে নানান খোঁজে আসা দু' একজন দেশী ট্যুরিষ্ট মারফৎ রকমারি উড়ো গুজবী খবর ঐখানে জমা হতো। রঙ-বেরঙের সেই সব খবর কুড়োতে আমরা গন-এর ডেরায় প্রায়ই জমা হতাম এবং তাতে বুড়িছোঁয়ার মতো করে মনটা সাময়িকভাবে যেন দেশের মাটি পর্যন্ত একটা দৌড় দিয়ে আসত।

আমরা নিজেদের ভবিষ্যৎ ভাবনার চেয়ে যুদ্ধ বাধলে বেচারী গন-এর মানসিক পরিস্থিতি কি হবে সে সম্বন্ধে রীতিমতো উদ্বিগ্ন হলাম। কারণ অতি নিরীহ প্রকৃতির মানুষ গন, যুদ্ধ আসায় নিজের অস্বাভাবিক মরণকে বহু রকমে ঘটবার কল্পনা করে প্রায়ই আচ্ছন্ন হয়ে বসে থাকতেন। এর ওপরে আবার ভারতীয় ট্যুরিষ্টদের কেউ কেউ সমস্যার বোঝা মাঝে মাঝে উপস্থিত করে প্রায় তাঁর হার্টফেল-এর সম্ভাবনা ঘনিয়ে আনতেন।

জানার মতো কোনো খবর ছাত্র সম্মিলনীতে এসেছে কি-না একদিন খোঁজ নিতে গিয়ে দেখি গন ও আর একটি বাঙালী ভদ্রলোক চুপচাপ বসে আছেন। ঘরে বেশ একটা থমথমে ভাব জমে উঠেছে দেখে বুঝলাম একটা কিছু বিভ্রাট ঘটেছে।

গন আমায় দেখে বললেন, "বেশ হয়েছে আপনি এসে গেছেন এবং ভদ্রলোককে উদ্দেশ্য করে, বললেন —আপনার সব কথা এঁকে জানান ইনি ভালো উপদেশ দিতে পারবেন।"

তাঁর কাছে যে ঘটনাটি শুনলাম তার সারাংশ হচ্ছে যে, তিনি ইয়োরোপের নানা শহর দেখবার যানবাহনের অগ্রিম টিকিট কিনে সব দেশ ঘুরে শেষ দ্রষ্টব্য পারীতে এসেছেন দু'দিন হলো। যুদ্ধ লাগলেও তাঁর কোনো মুস্কিলে পড়তে হবে না কারণ দেশে ফিরবার প্লেনের টিকিটের ব্যবস্থা অগ্রিম হয়ে আছে বলে তাই তিনি নিশ্চিন্ত মনে এই শহরে যত প্রকার প্রমোদ উপভোগের রঙ্গালয় আছে সেগুলির সুখস্মৃতি নিয়ে দেশে ফিরবার উদ্দেশ্যে সফর করছিলেন।

নৈশাহারের পর পান ও নৃত্য আমোদের যে-সব ব্যবস্থা আছে তার মধ্যে ক্যাবারেগুলি হচ্ছে ট্যুরিষ্টদের একটি প্রধান আকর্ষণ। সেখানে সাধারণ পানশালার চেয়ে অনেক উচ্চহারে মূল্য দিয়ে একটা পানীয় কেনা বাধ্যতামূলক। এই দামের বদলে পাওয়া যায় সেখানে বসে গান শোনা ও নাচ দেখার অধিকার! কেউ ইচ্ছা করলে মাথা পিছু একটা করে পানীয় কিনে স্ত্রীকে বা সঙ্গিনীকে এনে অর্কেষ্ট্রার সঙ্গতে রাত্তিরের প্রায় সব ক'টা প্রহর নেচে কাটিয়ে দিতে পারে।

মাঝে মাঝে নাচের আমোদে বৈচিত্র্য আনতে হয় সাময়িক বিরতি যখন শুরু হয়, 'আত্রাকসিয়ঁ' অর্থাৎ দর্শকদের চিত্ত বিনোদনের বিশেষ ব্যবস্থা। সব আলো নিভিয়ে দিয়ে কেবল নৃত্যমঞ্চটি স্পট্‌লাইট-এর আলোয় প্লাবিত করে দেওয়া হয়।

প্রায় বিবসনা নর্তকীরা একক, যুগ্ম বা অনেকে সমবেতভাবে দেহের নগ্নতাকে প্রকট করে যে অঙ্গভঙ্গি ও নাচ আরম্ভ করে তার আসল উদ্দেশ্যকে বিশদ ব্যাখ্যায় কাউকে বোঝাবার প্রয়োজন হয় না। এই উৎকট নগ্নতার পরিবেষণকারিণীদের ফটোগুলি ক্যাবারের প্রবেশ দ্বারের সামনে বড় বড় গ্লাসকেস-এ আনন্দ সওদা-কারীদের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য সাজানো থাকে।

ভদ্রলোক গিয়েছিলেন একটি ক্যাবারেতে এবং রঙ্গ নাচের শেষ হয়েছে ঘোষণা হলে তিনি নজর করেন যে, বাইরের গ্লাসকেস-এ যত নর্তকীদের ছবি ছিল তাদের সকলকে আসরে দেখানো হয়নি। তিনি দাবি জানান যে, তাদের হাজির করে নাচ না দেখানো পর্যন্ত তিনি ক্যাবারের বাইরে যাবেন না এবং অন্যথায় তাঁকে মূল্যের 'কিছু অংশ ফেরত দিতে হবে।

ক্যাবারের কর্মকর্তারা তাঁকে বহু রকমে বোঝাবার চেষ্টা করেন যে, যুদ্ধ আসায় প্রাণের ভয়ে তাদের নর্তকীরা অনেকে শহর ছেড়ে পালিয়ে গিয়েছে সেই কারণে তাদের হাজির করা সম্ভব হয়নি।

তিনি তার জবাবে বলেন যে, বাইরে সে খবরটা জানিয়ে দেওয়া উচিত ছিল অথবা তাদের বদলি নর্তকীর ব্যবস্থা করা। তা যখন হয়নি তখন মূল্যের খানিকটা তাঁদের ফেরত দিতে হবে।

এই নিয়ে কিছু বচসা ও রাগারাগীর ব্যাপার হয়ে গেলে ক্যাবারের লোকেরা তাঁকে অর্ধচন্দ্র সহকারে রাস্তায় বের করে দেয়। তিনি তখন একটি পুলিশকে ডেকে নিয়ে আসেন এবং তাকে ক্যাবারের লোকেরা কি বুঝিয়ে দেওয়ায় সেও বেশ উত্তম-মধ্যম দিয়ে তাঁকে নিষ্ক্রান্ত করে দেয়। তিনি ফরাসী একটুও জানতেন না তাই থানা থেকে তাঁকে বলা হয়েছে যে, তিনি যেন ফরাসী-জানা তাঁর স্বদেশবাসী কাউকে নিয়ে এসে সালিসীর ব্যবস্থা করেন। তাই তিনি এসেছেন ভারতীয় ছাত্রের কেন্দ্রে তাঁর প্রতি অবিচার ও অত্যাচারের প্রতিশোধ ব্যবস্থায় সাহায্যপ্রার্থী হয়ে।

মানুষ সমাজ ও দেশাচারী অনুশাসনের কড়া দৃষ্টির গণ্ডীর মধ্যে যতক্ষণ আবদ্ধ থাকে ততক্ষণ সে তার উদ্দাম আদিম ইচ্ছা, প্রবৃত্তি ও ক্রিয়াকে লাগাম টেনে সংযত করে রাখে। কিন্তু সেই আবেষ্টনীর সীমানা পার হয়ে বেরুলেই তার সব সংযমের বাঁধনগুলি ঢিলে হতে হতে সে হয়ে পড়ে অন্য এক প্রকৃতির মানুষ। যাদের নজরে পড়লে সমাজ অনুশাসন-বিরোধী ক্রিয়ার জন্য তাকে অপরাধী ও অনুশোচনাগ্রস্ত হতে হতো, তাদের দৃষ্টির বাইরে পড়ায় বেড়ে যায় তার সব ক'টি নিষিদ্ধ ফল ভক্ষণের লালসা, প্রয়াস ও আয়োজন। সব দেশ ও সমাজের অনেক মানুষকে দেখা যায় যে, সমাজের এলাকায় ফিরে এলে সেগুলিকে ফেলে দেয় মনের গোপন কাবার্ড-এর গভীরে।

নীতিবাগীশরা যতই শিউরে উঠুন না কেন, এ ছোটখাট চোরা অপরাধ মানুষ করে চলবেই এবং এতে সমাজের নৈতিক আধারে টোল খাবার কোনো ভয় নেই

যতক্ষণ সেই অপরাধের পুনরাবৃত্তি সে নিজের সমাজে না করছে। কিন্তু আমাদের সামনে বসে থাকা এই বঙ্গসন্তানটি কেবল পরদেশে একটা চোরা সখ মেটাবার চেষ্টা করেছেন তাই নয় তিনি সেইসঙ্গে ছিটিয়েছেন নিজের দেশ থেকে আমদানী করা নোংরা ও নীচ মনের পাঁক ও দুর্গন্ধ।

মনে হলো তাঁর উপস্থিতি গনের ঘরখানা যেন দূষিত করে তুলেছে। ফরাসীতে গনকে বললাম, এই অধম জানোয়ারটাকে এতক্ষণ এখানে বসতে দিয়েছেন কেন? অনেক আগেই একে দরজা দেখানো উচিত ছিল। তারপর লোকটিকে বললাম, "মশাই ফরাসী জেলখানা সম্বন্ধে আপনার কোনো ধারণা আছে কি? সেখানে শূকরও বসতে কি শুতে অসোয়াস্তি বোধ করবে। কিন্তু আপনি সেখানে বেশ দীর্ঘকাল ধরে বসবাস করবার ভালো বন্দোবস্ত করে ফেলেছেন দেখছি। আমাদের দেশের নামোজ্জ্বলকারী আপনার এই কেরামতির জন্য নিশ্চয়ই তারিফ করা উচিত। কিন্তু আপনি যদি আর বেশীক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতে থাকেন তা হলে ঐ ক্যাবারে কর্তৃপক্ষের উদাহরণে আপনাকে অভিনন্দন জানাবার লোভ সম্বরণ করতে পারা আমাদের পক্ষে মুস্কিল হবে।"

ভদ্রলোক বেশ উত্তেজিত হয়ে একটি বক্তৃতা দিলেন যে, আমাদের দেশের লোকেরা নিজেদের জাতভাইদের বিদেশে বিপদ হলে সাহায্য করতে এগিয়ে আসে না। সাধে কি আমরা পরাধীন হয়ে আছি। তাঁর মতে ভারতীয় ছাত্ররা ইয়োরোপে এসে কেবল নিজেদের পিতৃ-অর্থনাশ করেছে, কারণ এ দেশের উচ্চ-শিক্ষা ও কৃষ্টির আদর্শের কিছুটাই নিতে পেরেছে বলে তাঁর মনে হয় না।

হেসে বললাম, "ফিরছেন তো প্লেন-এ কিন্তু ইয়োরোপীয় কৃষ্টির যে বিরাট বোঝা আপনি সংগ্রহ করে সঙ্গে নিয়ে চলেছেন তার ভারে প্লেনটি মাটি ছেড়ে উড়তে পারবে বলে আপনার মনে হয় কি?"

গন বললেন, "মশাই অক্ষত শরীরে দেশে ফিরবার সৌভাগ্য হলে সেখানে গিয়ে না হয় গায়ের ঝাল ঝাড়বেন। কিন্তু এখুনি যদি কোনো প্লেন ধরে ফ্রান্সের সীমানা ছাড়বার ব্যবস্থা না করেন তা হলে বাকি জীবনটা আপনাকে ফরাসী শ্রীঘরে বাসে কাটাতে হবে। কে জানে হোটেলে ফিরলে হয়ত দেখবেন পুলিশ এতক্ষণে ভ্যান নিয়ে আপনাকে সেখানে নিয়ে যাবার জন্য তৈরী হয়ে অপেক্ষা করছে।" ব্যাস্, আমাদের আর কিছু বলতে হলো না। তিনি লগুড়াহত কুকুরের মতো দ্রুত নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন।

ভেবেছিলাম সখের ভ্রমণে আগত পারীতে দেশী পর্যটককুলের বুঝি ঐ শেষ আবির্ভাব। কিন্তু ঐ ঘটনার দু'একদিন পরেই এক বন্ধুর কাছ থেকে পরিচয়পত্র নিয়ে হাজির হলেন আর এক বঙ্গবাসী। এঁর অবশ্য শৌখীন অভিলাষের ফর্দটা খুব বড় ছিল না। ইনি ছিলেন সুরা দেবীর অনন্যমনা সাধক। ফরাসী না জানায় দু'দিন ঠিকমতো পানীয় গলনালীতে না পড়ায় তাঁর মনে হচ্ছিল সর্ব শরীরের রস

শুকিয়ে যাওয়ায় তিনি 'বম্বেডাক্'-এ পরিণত হয়েছেন। অতি শীঘ্র যদি কড়া সুরার টনিক তাঁকে না দেওয়া হয় তা হলে তিনি নিশ্চয়ই 'ফসিল্'-এ রূপান্তরিত হয়ে যাবেন।

তাঁকে বললাম, "আপনার বর্তমান শারীরিক ও মানসিক অবস্থা দেখে আমার মনে পড়ছে কোথায় যেন শুনেছিলাম একটি গান—

জয় মা কালী জয় মা কালী
এই বর দে মা মুণ্ডমালী
যতই কেন বদনে ঢালি
বোতল যেন হয় না খালি।..."

তিনি বললেন, "ঠিক বলেছেন মশাই, সত্যিই যদি এই বরলাভ সম্ভব হয় তো তার জন্যে যে কোনো শক্ত রকমের তপস্যা বলুন আমি করতে রাজী আছি। তবে ঠকাবেন না স্যার সেটা কিন্তু সুরাপানকে বাদ দিয়ে নয়।"

তাঁর সুরাপানের প্রয়োজনটা কতখানি তীব্র তার একটা পরীক্ষা করবার লোভ হলো। নিয়ে গেলাম তাঁকে কাফে উঙ্গারিয়ায় এবং গার্সঁকে বললাম এক বোতল 'রোজে' পরিবেষণ করতে। এ কেবল নামেই মদিরা, খাঁটি আঙুরের রস বললে অত্যুক্তি হবে না এবং মাদকতা শক্তি প্রায় না থাকায় এ মদিরা শিশুকে পর্যন্ত বিনা দ্বিধায় পরিবেষণ করা যায়। এর রংটি সুন্দর গোলাবী টোন্-এ টলটলে যার জন্যে গোলাপের নামে এর পরিচয়। কিন্তু তাঁকে বললাম, "এটি একটি অতিশয় চড়া মদ খেয়ে ঠিকমতো সহ্য করতে পারবেন তো? শোনা যায় প্রথম যখন এটিকে রসানো হচ্ছিল ঘ্রাণে আকৃষ্ট হয়ে শয়তান না-কি এসে চেখে ফেলায় তার উচ্ছিষ্ট স্পর্শে এর তীব্রতা প্রায় এখন নাইট্রিক অ্যাসিডের মতো জোরালো।"

তিনি বললেন, "আঃ আপনার কথা যেন আমার কানে ঐ সুধা ঢেলে দেহকে অমৃতময় করছে।" সুরায় আঘ্রাণ ও বিলম্বিত পানের তিনি একটা ওস্তাদি ঢঙ দেখিয়ে বোতলটিকে নিঃশেষ করলেন। তারপর মুহূর্তে নেশায় মশগুল হয়ে গুনগুনিয়ে ধরলেন তান। বুঝলাম যে, মদ্যপায়ীকে তীব্র সুরার ভ্রম দিয়ে রঙিন জল পান করালেও হয়ত বা মৌতাত ঠিকমতো জমে যেতে পারে। অবশ্য এ ফাঁকি কেবল বোধহয় আমাদের দেশের মৌতাত অন্বেষী লোকদের ওপরই চালানো যায়।

সাধারণত আমাদের দেশে মদ খাওয়ার মুখ্য উদ্দেশ্য হচ্ছে মাতলামী করা এবং সুরাপায়ীদের চরিত্র সম্বন্ধে দেশীয় সাহিত্য ও নাটক যা বর্ণনা দেয় সেটা অবাস্তব নয় তা প্রমাণ করতেই যেন তারা মত্ততার দারুণ এক্সিবিসান করে। কারণবারি এদের কণ্ঠনালী আশ্রয় করলেই পিক্আপ-এর পিন রেকর্ডে পড়ামাত্র গান বেরুনর মতো বেরিয়ে আসবে রকমারি সুরের গীত অথবা তাঁরা পীট কি চার্চিলকে হার মানিয়ে দেবার মতো বক্তা হয়ে আরম্ভ করবেন উদ্ভট পুরাণের ব্যাখ্যা। অনেক সময় তা আবার হয়ে পড়বে অশ্লীল পাঁচালী যা করে তুলবে শ্রোতাদের কান

পয়ঃপ্রণালীর মতো দূষিত। আর তাঁরা পালা করে যদি মৌতাতে বেরসিকা পত্নীকে উত্তমমধ্যম ধর্ষণে সেবা না করলেন তা হলে তো মদিরার জন্য খরচটা একেবারে বরবাদে গেলো। মদ্যপায়ীদের মধ্যে যাঁরা 'পড়ে লিখে আদমী' তাঁদের অনেকে আবার উল্লেখ করে থাকেন বৈদিক যুগ থেকে না-কি আমাদের দেশে সোমরস পানের রেওয়াজ শুরু হয়েছে। এত শতাব্দী ধরে যখন ইতিহাস এ অভ্যাস সহ্য করে এসেছে আজ বাপু তাকে নাশ করবার জন্য এত বাড়াবাড়ি কেন! ঠিক কথা, কিন্তু তফাৎ এইটুকু যে, বৈদিক আমলের লোকেদের সোমরস পানের উদ্দেশ্য ছিল শরীরকে বলশালী করে দৈত্যদানব দলনের জন্য তৈরী থাকা। দৈত্যদানবের যুগ শেষ হয়ে যাওয়ায় আজকের বীরগণ বার্লি, যব, অ্যাপেল ও দ্রাক্ষার জারক্রস সেবনে সাময়িকভাবে শৌর্যবীর্যকে টনটনে করে হয় করেন গৃহিণী দলন আর না হলে ক্লাবে গিয়ে বকযন্ত্রের শাণিত অস্ত্রে নিপাত করে চলেন ওপরওয়ালা কিংবা সরকারকে। আর সমাজের নিম্নস্তরের লোকেরা বৈদিক যুগ আর সোমরসের খবর না রাখলেও মদ্যপানে করবে ইতরজনোচিত হল্লা, দাঙ্গা-হাঙ্গামা কিংবা খুনখারাবি। কাজেই এর বিরুদ্ধে গান্ধিজীর মতো অহিংসধর্মীকেও নিষেধযষ্ঠি তুলতে হয়েছিল হিংস্রভাবে। আমাদের দেশের লোকেরা যদি পশ্চিমী দেশবাসীদের মতো সুরা সেবনকে সাধারণ পান আহারের মাত্রায় নিয়ন্ত্রিত করে সমাজগত শালীনতা বজায় না রেখে চলতে পারে তা হলে মদ্যপান নিষেধের নিয়মকে উচিত বিধি হিসাবে এদের মেনে নিতে হবে।

কাফের জনপ্রিয়া গায়িকা গাইছিল যুদ্ধের প্রারম্ভে রচিত সকলের প্রিয় মর্মস্পর্শী গান —'জাতান্দ্রে তুজুর এ লা এ হুই জাতান্দ্রে তঁ রেতুর।' (তোমার ফিরবার অপেক্ষায় বসে থাকব সর্বদা দিবারাত্র)।

কাফেতে উপস্থিত ফরাসী-জানা সকলে তার সঙ্গে কোরাস গাইছিল। এ যেন সমবেত কণ্ঠের গান নয়, এক জনতার বুকভাঙা ক্রন্দনের কোরাস। এই জনমণ্ডলীতে শুধু ফরাসী নয়, ছিল হিটলার বিতাড়িত অস্ট্রিয়ান, চেক্, হাঙ্গেরিয়ান, স্প্যানিশ, পোল ও জার্মান রেফিউজিরা। এদের আর কোথাও পালাবার ঠাঁই নেই। নিরাশ্রয় হয়ে এরা জমা হয়েছিল এই শহরে অভয় ও আশ্বাসের অন্বেষণে। কিন্তু যুদ্ধের বিস্তারিত হস্ত ধ্বংস ও মৃত্যুর জাল ফেলে কেড়ে নিতে ব্যগ্র হয়েছে এদের সে আশাটুকুও। এরা গাইছে মহাবিদায়ের গান, মুখে উচ্চারণ করছে বিদায়ী প্রিয়জনের ফিরবার দিন পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকবে কিন্তু তাদের মর্মান্তিক বেদনা জানাচ্ছে পুনর্মিলনের সব আশাকে বিদায়ের এক মহাযবনিকা চিরকালের মতো বিচ্ছেদে বিলুপ্ত করে দেবে।

এদের কোরাসের সুরে সুর মেলাবার চেষ্টা করছিলেন 'রোজে'-র নেশায় মশগুল আমার সঙ্গীটি। এতগুলি বেদনাশ্রুভরা চোখ ও বিষাদে বিকৃত এতগুলি কণ্ঠের বিদায় সংগীতের মাঝখানে স্বচ্ছন্দ মদিরার বিলাস ও তার আমেজে সুরের

গুনগুনানি আমার অসহ্য মনে হলো। জানিয়ে দিলাম ভদ্রলোকটিকে যে, এখানে বসে থাকার অধিকার আমাদের আর নেই।

হতভম্ব হয়ে তিনি কিছু বলবার আগেই তাঁকে টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম কাফে থেকে। দারুণ বিপর্যয় যখন মানুষকে ঘিরে ফেলে এবং সেই বিপত্তিকে অতিক্রম করার পথঘাট সব বন্ধ হয়ে যায় তখন তাকে হতে হয় বেপরোয়াভাবে উদাসীন ও তার সকল দুশ্চিন্তাকে এড়াবার চেষ্টা চলে দার্শনিক ভাবনায়। আমি তাই উপায় না দেখে যুদ্ধের প্রকোপে আসন্ন সমস্যাগুলির দুর্ভাবনাকে সরাবার জন্য 'এমন বিশ্বধ্বংসী লড়াই এল কেন' তার সমালোচনায় মনকে নিবিষ্ট করতে প্রয়াসী হলাম।

ঐতিহাসিক, সমাজবিজ্ঞানী ও অর্থনীতিবিদ্‌রা নানান ব্যাখ্যায় প্রমাণ করে দেবেন প্রতিটি মহাযুদ্ধ হবার কারণ ও পরিণামকে। সাধারণের কাছে কিন্তু মনে হয় যে, লড়াই লাগিয়ে দেয় সামরিক শক্তিতে স্ফীত কয়েক জন মাথা গরম নেতৃবর্গ। তাঁরা মানুষের আদিম হিংস্র স্বভাবকে জাগ্রত ও উত্তেজিত করে এদের জীবনবহ্নিতে আপন জিঘাংসা ইপ্সাকে যেন তুষ্ট করে থাকেন।

কেন্ এবেল্‌কে বধ করার অনেক আগেই মানুষের উপলব্ধি হয়েছিল যে, এ হত্যা নিদারুণ অন্যায় ও মহাপাপ। কিন্তু তা সত্ত্বেও অনাদিকাল ধরে মানুষ— অন্যান্য প্রাণীর কথা তো অবান্তর, আপনার জাতভাইদের হত্যা করে চলেছে। শুদ্ধভাবে চিন্তা করলে রাজনৈতিক কারণে ও আইন-সম্মতভাবে মানুষ মারাকে মানবতার নীতি ও যুক্তিতে উদ্বুদ্ধ সভ্য মানুষ কোনোদিন সমর্থন করবে না। অবশ্য সে ধরনের লোকের সংখ্যা যুগে যুগে কম বেশী হয়ে থাকে এবং সেই অনুপাতে জগতে হত্যার পরিমাণকে সঙ্কুচিত ও সম্প্রসারিত হতে দেখা যায়। পশু প্রবৃত্তিগত আদিম হিংস্র স্বভাবের তাড়নাকে মানুষ সভ্যতার অনুশাসন ও ধর্মনীতির একটা প্রলেপ দিয়ে ঢেকে রাখতে চায় এবং মাঝে মাঝে এর প্রেরণা ও উত্তেজনাকে পরোক্ষভাবে স্তিমিত ও তৃপ্ত করে নেয় নানা ছলে। বহুবিধ খেলার প্রতিযোগিতা, ব্লাড স্পোর্ট, বুল ফাইট, সাহিত্য ও নাটকের সংহার কাহিনী এবং অভিনয় সভ্যতার গিল্‌টিতে ভরা মানুষের বর্বর ইচ্ছাকে পরিতুষ্ট করছে ভদ্রভাবে। প্রত্যহ বাস্তবে ঘটিত ধর্ষণ, লুণ্ঠন, খুন-জখম ও মৃত্যুদণ্ডের কাহিনীগুলি সংবাদপত্রে সবিস্তারে না ছাপালে সাধারণ ও সংখ্যাগরিষ্ঠ পাঠকদের কাছে খবর একেবারে পান্‌সে হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা খুবই বেশী। নিবিষ্টভাবে এগুলি পড়বার সময় অবচেতন মনে পাঠক কল্পনায় করে যায় বাস্তবে অন্যের করা ধর্ষণ ও হত্যা এবং কল্পনায় নিজেই জল্লাদ সেজে তুলে দেয় দণ্ডিতের গলায় ফাঁসির দড়িটি অথবা খাঁড়ার শেষ নির্মম আঘাত।

মহাযুদ্ধ আরম্ভ হবার বছর খানেক আগে জার্মান ভিদ্‌ম্যান ও তার সহকারী খুনী ফরাসী যুবকে মিলে তরুণী ও যুবতী নারী হত্যায় যেন এক মহামারী প্যারীতে

এনেছিল। পাশবিক হত্যাকাণ্ডের কাহিনী কাগজে বেরুতে শুরু হলে সহস্র সহস্র পাঠক ব্যগ্রভাবে পড়ে যেত সেই খবরগুলি। এমন কি আসন্ন ভয়াবহ যুদ্ধের সংবাদ প্রাধান্যও এই কাহিনীর উচ্ছ্বাসে কোথায় তলিয়ে গিয়েছিল।

ভিদ্‌ম্যান ও তার সাকরেদ চালাকি করে সংবাদপত্রে নার্স, মহিলা সেক্রেটারী কিংবা দোকানে পণ্যবিকারিণী চাই বলে বিজ্ঞাপন দিত। তারপর আবেদনকারিণীদের মধ্যে থেকে কোনো সুরূপা তরুণী বা যুবতীকে বেছে নিয়ে করত তাদের শিকার। তারপর তাকে কোনো অছিলায় ভুলিয়ে নিভৃত স্থানে নিয়ে গিয়ে তার কপালে গুলি মেরে হত্যা করত। নিছক হত্যা করা ছাড়া অন্যভাবে ধর্ষণ বা নিপীড়নের অভিসন্ধি তাদের ছিল না।

ধরা পড়ার আগে যে শেষ তরুণীটিকে হত্যা করা হয় তাকে গুরুর শেখানো হাত সাফাই দেখাতে হত্যা করে ভিদম্যানের সহকারী ফরাসী যুবকটি। মেয়েটির দেহ তারা 'দাঁফে রসরুর' ঐতিহাসিক স্থানে ক্যাটাকম্বের নিকট এক নালায় ফেলে আসার সময় হত্যাকারী যুবক প্রথম হত্যার উত্তেজনায় অসাবধান হয়ে তার হাতের একটা দস্তানা ভুলে ফেলে আসে। পুলিশ সেটির নিশানা নিয়ে তাকে সনাক্ত করে গ্রেপ্তার করলে সে ভয়ে সবিস্তারে তাদের জানিয়ে দেয় তারা দু'জনে কতগুলি রমণীর প্রাণনাশ করেছে। অভিযুক্ত হয়ে বিচারে গিলোটিনে মৃত্যুর দণ্ড পেল ভিদ্‌ম্যান এবং তার সহকারীর হলো যাবজ্জীবন কারাবাস।

স্ত্রী এবং একমাত্র পুত্র সহ ভিদম্যান এর ছোট পরিবারে কোনো অভাব ও অভিযোগ ছিল না বরং তাদের দাম্পত্য জীবনকে পড়শীরা এক আদর্শ সুখী পরিবার বলেই জানত। কিন্তু কোন কারণে সে হলো এমন নির্মম পাষণ্ড। পৃথিবীর নানান দেশ থেকে মনস্তত্ত্ববিদ পাণ্ডিতরা তার এই অদ্ভুত মনোবৃত্তি সম্বন্ধে গবেষণা করতে সময় পাবার উদ্দেশ্যে ফরাসী সরকারকে অনুরোধ জানালেন ভিদ্‌ম্যানকে গিলোটিন করার দিন পিছিয়ে দিতে। কিন্তু তাঁদের অনুরোধকে উপেক্ষা করে তার মৃত্যুর নির্ধারিত দিনকে বজায় রেখে দেওয়া হলো।

সংবাদ ছিল যে, ফরাসী রিপাব্‌লিকের প্রচলিত প্রথা অনুযায়ী এত বড় খুনী আসামীর প্রাণদণ্ড করা হবে প্রকাশ্যে জনতার সামনে।

পারী শহরে দিগদিগন্ত থেকে জমা শুরু হলো প্রকাশ্যে মানুষের মস্তকচ্ছেদন দেখবার আগ্রহে আগত অসংখ্য দর্শকের। রাত্রিবাসের উপযোগী বা অনুপযোগী যা কিছু আশ্রয় ভাড়া পাওয়া যেতে পারে সেগুলি সব আগন্তুকের ভিড়ে ভরে গেলো। এমন কি স্টেশনের প্ল্যাটফর্মগুলিতে পর্যন্ত এই দর্শকরা অস্থায়ীভাবে থাকবার স্থান করে নিল। পারীতে এই ক্রমবর্দ্ধিত অসংখ্য লোক সমাগম দেখে বিপত্তির আশঙ্কায় ফরাসী সরকার ঘোষণা করলেন যে, ভিদ্‌ম্যানের গিলোটিন সম্পন্ন করা হবে পারীতে নয় ভেয়ারর্সাই শহরে। কিন্তু কেবল স্থান পরিবর্তনে কি এই নরমেধ যজ্ঞের উপাসকদের ঠেকিয়ে রাখা যায়! তারা ছুটল ভেয়ারর্সাই-এ

এই দর্শকদের স্রোতবাহী হয়ে লণ্ডন থেকে এলেন বহু ভারতীয় ছাত্রছাত্রী অধ্যাপক ও পর্যটকেরা। তাঁরা প্রায় দাবী করলেন যে, পারী নিবাসী ছাত্রদের তাঁদের থাকবার ও গিলোটিন দেখবার সব ব্যবস্থা করে দেওয়া একটা অবশ্যকর্তব্য বলে ধরে নেওয়া উচিত।

গিলোটিন দেখবার জন্য তাঁদের আয়োজনের ঘটা দেখে জিজ্ঞাসা করলাম, দণ্ডিতের নিধন দৃশ্য দেখতে কৌতূহলী ও বুদ্ধি বিবেচনাহীন জনতার সঙ্গে তাঁরা কি করে নিজেদের মিলিয়ে ফেললেন। শুনে তাঁরা সবাই বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলে বললেন, "সে-কি মশাই আপনি এ দেখতে যাচ্ছেন না!" 'না' বলায় তাঁরা উপদেশ দিলেন, "শিল্পী হিসেবে আপনার এ গিলোটিন দেখা অবশ্য প্রয়োজন; বিশেষ করে যখন এ অভিজ্ঞতা লাভ মানুষের ভাগ্যে কদাচিৎ হয়ে থাকে। ভেবে দেখুন এই অভিজ্ঞতা হয়ত আপনাকে এক অনুপ্রেরণা দিয়ে বিরাট এক শিল্পসৃষ্টির সম্ভাবনা এনে দেবে।"

হেসে বললাম, "সে অভিজ্ঞতা হবার আগে আপনাদের এ ব্যাপারে যে জল্লাদী আনন্দের উচ্ছ্বাস দেখছি তাকে নিয়েই তো অনেক বড় শিল্পের মালমশলা তৈরী হয়ে যাচ্ছে। আমার এই ক্ষুদ্র মস্তিষ্কে অতিরিক্ত অভিজ্ঞতা চাপালে ব্রেন-এ হেমারেজ হয়ে যেতে পারে। তাই আপনারাই এই অমূল্য অভিজ্ঞতা অর্জন করে আসুন। পরে যদি প্রয়োজন হয় তো আপনাদের কাছ থেকে এর খানিকটা ধার নেওয়া চলবে।"

ভেয়ারশাইতে বধ্যমঞ্চের যতখানি নিকট হতে পারে সরকার অনুমোদিত এমন স্থানে উঠল কাঠের তৈরী ধাপে ধাপে আসন। এই আসনে বসবার টিকিটের জন্য অসম্ভব উচ্চহারের মূল্য ধার্য করা হলেও মুহূর্তে ক্রেতারা তা সবগুলি লুট করে নেবার মতো ভাবে কিনে ফেললেন এবং শত শত দর্শকদের এ স্থানের টিকিট না পাওয়ায় নৈরাশ্যে হার্টফেল করার মতো অবস্থা হলো। নিকটবর্তী বাড়িগুলির ছাদ ও বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখবার স্থানগুলিও ভাড়া হয়ে গেলো অবিশ্বাস্য উচ্চমূল্যে।

গিলোটিন সম্পন্ন হবার দিনের পূর্ব সন্ধ্যায় হিটলার ঘোষণা করলেন যে, তিনি এই অত্যন্ত পশুরও অধম ঘৃণিত অপরাধের জন্য ভিদ্‌ম্যানকে জার্মান নাগরিকের অধিকারচ্যুত করলেন। যে নরাধম পাষণ্ড লক্ষ লক্ষ নিরপরাধ নরনারী ও শিশুকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে তার এই কপট মর‍্যালিটির ভান যুদ্ধের আগে সবচেয়ে অমার্জনীয় পরিহাস।

পুরো একটা বিনিদ্র রজনী বসে কাটিয়ে গিলোটিন দেখে দর্শককুল ফিরলেন পারীতে। তাঁদের ভেয়ারশাইতে যাওয়া ও ফিরে আসায় যে ভাব-বৈচিত্র্য দেখলাম তাতে মনে হলো পূর্বে তাঁরা যেন মাড় দিয়ে মড়মড়ে ইস্তিরি-করা কাপড়ের মতো ছিলেন তাজা ফিটফাট ও চোস্ত কিন্তু ফিরলেন তাঁরা যেন দলামলা ঝুলে-পড়া বাসি

কাপড়ের তাল হয়ে। যা দেখবার আকুল আকাঙ্ক্ষা নিয়ে তাঁরা গিয়েছিলেন এত কষ্টকে উপেক্ষা করে তা দেখার পর কিন্তু তাঁদের হাবভাবে তৃপ্তি বা উদ্দীপনার ছাপ খুঁজে পাওয়া গেলো না।

প্রশ্ন করে জানলাম যে, তাঁরা ফরাসী সরকারের বেরসিকতায় অত্যন্ত ক্ষুণ্ণ ও রুষ্ট হয়েছেন। প্রকাশ্যে গিলোটিন করা হবে এ ভাঁওতা দেবার কি প্রয়োজন ছিল যখন পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যাবে, বধ্যমঞ্চের এমন নিকটবর্তী স্থানে দর্শকদের বসতে দেওয়া হয়নি। তাও যদি বা মাপ করা যায়, ভিদ্‌ম্যানের মুণ্ডচ্ছেদন ভোর ছ'টার অন্ধকারে করার জন্য ফরাসী সরকারকে কোনোমতেই ক্ষমা করা যায় না। মঞ্চের চারপাশে যে ফ্লাড লাইটের ব্যবস্থা ছিল তাতে দৃশ্যকে পরিষ্কার করা দূরে থাক আরও না-কি ঘোলাটে করেছিল। ঘড়ির কাঁটা ছ'টায় পৌছালে মঞ্চে, পূর্বে স্থির আলোছায়ার একটা স্পন্দন লক্ষ্য করে মনে মনে তাঁরা ভিদ্‌ম্যানের মুণ্ডটি কেটে পড়ছে তার একটা কাল্পনিক দৃশ্যকে সামনের অস্বচ্ছ কুয়াসাকে সরিয়ে দেখবার অক্ষম চেষ্টা করছিলেন। এইটুকুই তাঁদের স্মৃতির খাতায় অমূল্য ছাপ হয়ে থাকবে। আর কিছু হোক বা না হোক, যে ভোরের বাতাসে ভিদ্‌ম্যানের শেষ নিশ্বাস মিশে গিয়েছিল ও তার খণ্ডিত দেহের তাজা রক্তের গন্ধ যে বায়ু তরঙ্গে ছড়িয়ে পড়েছিল তারই সান্নিধ্যে থেকে সেই বাতাস নাকে নিয়ে তাঁরা ফিরেছেন এও কি কম কথা!

একটা বান এসে চলে যাওয়ার মতো দর্শককুল শহরকে দু'এক দিনের জন্য জন-বহুল করার পর যে যার গন্তব্যে প্রস্থান করে পারীকে আবার স্বাভাবিকতায় ফিরিয়ে দিলেন।

* * *

প্রথম মহাযুদ্ধের প্রলয় স্মৃতি মন থেকে মুছে যাবার আগেই এসে পড়ল আর এক আরও ভয়াবহ বিশ্বসংগ্রাম। এ যুদ্ধ সম্ভাবনার নানা যোগাযোগের স্রোতাবর্ত বছরের পর বছর অশান্তির ধারা দিকে দিকে ছড়িয়ে শেষে একজোট হয়ে মিশে এনেছে এই ব্যাপক মহাধ্বংসের প্লাবন। প্রথম মহাযুদ্ধ পরিসমাপ্ত হওয়ার আগেই শান্তিকামী জনগণ নানা দেশে অগ্রণী হয়ে এই মহাধ্বংসের পুনরাবৃত্তিকে প্রতিরোধ করবার উদ্দেশ্যে স্থাপন করে জগতের আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'লিগ অব নেশন'। কিন্তু লিগ অব নেশন-এর শক্তিবর্গ এই দারুন সংগ্রামের সূচনা চোখের সামনে তৈরী হচ্ছে দেখেও তার স্বরূপকে যেন দেখতে পাননি। দেশে দেশে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে লিগের সদস্য মিত্রশক্তিগণের ধারাবাহিক উদাসীনতা যে এই জগৎজন-বিলোপ-সংহারকে স্বচ্ছন্দে ডেকে এনেছিল সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। ১৯৩১-এ জাপান কর্তৃক মাঞ্চুরিয়া আক্রমণকে দ্বিতীয় মহাসংগ্রামের বোধন বললে অত্যুক্তি করা হবে না। কিন্তু জাপানের এই অভিযান ও আক্রমণের প্রতিরোধার্থে লিগ অব নেশন থেকে কোনো সক্রিয় ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়নি। এই অন্যায় পররাষ্ট্র অপহরণ যাতে বিনা দ্বিধায় করা যায় তার জন্য জাপান এই সময় লিগ-এর

সঙ্গে সুবিধামতো সব সম্পর্ক পরিত্যাগ করে। তারপর ১৯৩৫-এ ইতালির ইথিওপিয়া আক্রমণ ও অধিকার এবং পরের বছর হিটলার ও মুসোলিনির স্পেনের অন্তর্বিপ্লবে অভিসন্ধিপূর্ণ সশস্ত্র হস্তক্ষেপে বিশ্বের রাষ্ট্রনৈতিক শান্তির কাঠামো ভেঙে চুরমার হতে থাকলেও লিগভুক্ত মিত্রশক্তি সদস্যদের মধ্যে এর প্রতিবিধানে কোনো উদ্যম দেখা যায়নি। বরং তাঁরা যেন নন্‌-ইন্টারভেনসন নীতির অহিফেন সেবনে বেহুঁস ও নিরপেক্ষ হয়ে ফ্যাসিষ্ট ঘাতকদের সীমাহীন ধর্ষণ, লুণ্ঠন, ধ্বংস ও হত্যার পথ পরিষ্কার করে দিয়েছিলেন।

অতীতের সামরিক অভিযান ও বিজয়ের স্মৃতিতে গর্বিত জার্মান জাতি প্রথম মহাযুদ্ধের পরাজয়কে সত্য ঘটনা বলে গ্রহণ করতে পারে'ন। তাদের ধারণায়, বীর্য বিক্রমের চেয়ে ছল-চাতুরীর দ্বারা বিপক্ষশক্তি জয়লাভ করেছিল এবং এই প্রতারণার জন্য যে অপমানের কালিমা জার্মান জাতির ওপর পড়েছে তার প্রতিকার ও প্রতিশোধের উগ্র আকাঙ্ক্ষায় তারা গুমরে মরছিল। হিটলার এই জাতীয় বিভ্রান্তি ও ক্ষোভকে উদ্বেলিত করতে যে মিথ্যা অভিযোগ জাহির করেছিলেন তাকে তাঁর জাতভায়েরা ব্যগ্রভাবে সমর্থন করেছিল। তাই তিনি লোকার্নো চুক্তিকে প্রথমে মেনে নিয়ে পরে আপন স্বার্থসিদ্ধার্থে ১৯৩৩-এ তাকে অস্বীকার করে রাইনল্যাণ্ড আক্রমণ ও অধিকার করায় আপন দেশবাসীর কাছে জার্মান সামরিক শক্তির এক পয়গম্বর হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন।

প্রথম মহাযুদ্ধের সমাপ্তিতে জাগতিকভাবে প্রায় সবদেশে বিরাট একটা অর্থ সমস্যা এসে পড়েছিল। মিত্রশক্তিবর্গ যদি এই সমস্যাকে সময়ে মিটিয়ে ফেলতে সক্ষম হতো তা হলে বোধহয় ফ্যাসিষ্ট শক্তির পরিবর্দ্ধন বন্ধ হয়ে যেত। মিত্ররাষ্ট্র-গুলির মধ্যে অর্থমানের যে গরমিল ছিল তাকে সুনিয়ন্ত্রিত করবার পথে প্রধান অন্তরায় হয় তখনকার মার্কিনী সরকার এবং এর জন্য সম্পূর্ণ দায়ী ছিলেন প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্ট। তিনি এক ভ্রান্ত ধারণায় স্থির করেছিলেন যে, তাঁর দেশের ব্যবসায়ী লেনদেন-এর শুভার্থে মার্কিনী মুদ্রার উচ্চহারকে বজায় রাখা উচিত। তাঁর এই ভ্রান্ত নীতিতে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সঙ্কট আরও নিকটবর্তী হয়ে আসে।

প্রকৃতপক্ষে জার্মানীর সামরিক, রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক এমন কোনো অত্যাবশ্যক কারণ দেখা যায়নি যার জন্য তার যুদ্ধ লাগানো একান্ত প্রয়োজন হয়েছিল। লিগ অব নেশন-এর আন্তর্জাতিক সম্মেলনে এমন কোনো বিধি-ব্যবস্থা ছিল না যাতে করে কোনো রাষ্ট্রের আবশ্যকের অতিরিক্ত সামরিক শক্তি সঞ্চয়কে প্রতিরোধ করা যেত। লিগ-এর নিয়মকানুনে বহু দুর্বলতা থাকায় কোনো রাষ্ট্র আন্তর্জাতিক সন্ধি বা চুক্তি ভাঙতে উদ্যত হলে তাকে দমন করবার মতো ক্ষমতা ছিল না। কাজেই নতুন সামরিক শক্তিতে বলীয়ান্ হিটলারীয় জার্মানী যে রাজ্যগুলি আত্মসাৎ করবার মতলব করেছিল তার প্রথম শিকার হয় অষ্ট্রিয়া। চ্যান্সেলার ডলফাস দেশের শাসনশক্তিকে সুনিয়ন্ত্রিত ও বলশালী করতে চেষ্টিত হলে

এবং শাসনবিভাগের কার্য ও দায়িত্ব থেকে নাৎসীদের বাদ দেওয়ার ফলে ষড়যন্ত্র করে তাঁকে হত্যা করা হলো। নতুন চ্যান্সেলার স্থস্‌নিগকে স্টর্মট্রুপাররা ভয় দেখিয়ে নিজেদের স্থবিধা মতো চুক্তিতে জার্মানীর সঙ্গে সন্ধি করাতে বাধ্য করল। তারপর তাঁকে বহুবিধভাবে লাঞ্ছিত করে দেশের আভ্যন্তরীণ গোলমাল মেটাবার অছিলায় ১৯৩৮ এর মার্চ মাসে হিটলার-এর সৈন্যবাহিনী অস্ট্রিয়া অধিকার করে বসল।

এরপর কোপ পড়ল চেকোশ্লোভাকিয়ার ওপর। ডাঃ. বেনেস যখন মিত্রশক্তির কাছে এই সঙ্কট প্রতিহত করবার জন্য সাহায্য ভিক্ষা করলেন তাঁকে তখন মিত্র-শক্তিবর্গ জার্মানীকে স্থতেদেন অংশটি ছেড়ে দেবার উপদেশ দিলেন। বেনেস এই উপদেশ গ্রহণে অস্বীকার করায় সমগ্র জার্মান সামরিক শক্তির সঙ্গে বোঝাপড়ার সমস্যায় হলেন একা।

.৯৩৮-এর সেপ্টেম্বরে ফ্রান্স, ব্রিটেন ও রাশিয়া ধ্বংসে উদ্যত জার্মান শক্তিকে প্রতিহত করবার এক অমূল্য স্থযোগ হেলায় ছেড়ে দিলো। ফ্রান্সের ও ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রীদ্বয়, দালাদিয়ের ও চেম্বারলেনের মতে এই সামান্য ভূখণ্ডের স্বাধীনতা বাঁচাতে একটা বড় হাঙ্গামকে ডেকে আনা উচিত ছিল না। এই দুই দেশের জনগণও এই সিদ্ধান্তে আসন্ন বিপদকে সহজে এড়ানো গেলো ভেবে বেশ নিশ্চিন্ত হয়েছিল।

রাশিয়ার মতিগতি সম্বন্ধে সদা সন্দিহান এই রাষ্ট্রনায়করা রাশিয়াকে বাদ দিয়ে জার্মানীর সঙ্গে মিউনিকের চুক্তি করে নিলেন। তাঁরা ভেবেছিলেন যে, এই নিপুণ চালে তাঁরা দুশমন জার্মানীকে দিয়ে শয়তান রাশিয়ার ওপর হামলা করাবার মোক্ষম ব্যবস্থা করে ফেলেছেন এবং তাঁরা স্বপ্ন দেখছিলেন যে, তাঁদের ছোড়া এই ঢিলে দুটি রক্তপিপাসু পাখীর নিপাত হতে আর বেশীক্ষণ লাগবে না। এই সময়ে মুসোলিনির ফ্যাসিষ্ট সৈন্যবাহিনী বিক্রম দেখাতে ক্ষুদ্র আলবানিয়ায় ঝাঁপিয়ে পড়ে তার স্বাধীনতা কেড়ে নিল। তদানীন্তন রাশিয়ার পররাষ্ট্র সচিব ম্যাক্সিম লিটভিনফ ফ্রান্স ও ব্রিটেনের সঙ্গে মিলিত হয়ে ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসী শক্তির এই দুর্বিনীত পররাষ্ট্র অপহরণকে প্রতিহত করবার যে প্রস্তাব করেন তাতে দালাদিয়ের ও চেম্বারলেন কোনো আস্থা দেখাননি। শেষে নিজেদের সীমান্তকে নিরাপদ ও সংরক্ষিত রাখবার উদ্দেশ্যে রাশিয়ান নেতারা ১৯৩৯-এর আগষ্ট মাসে জার্মানীর সঙ্গে দশ বছরের জন্য নন্‌-ইণ্টারভেনসন-এর এক চুক্তি করে নিলেন। এক রকম নির্ঝঞ্ঝাট হয়ে হিটলার পোল্যাণ্ড আক্রমণ করলেন অনতিপরেই। এইবার মিত্রশক্তিবর্গের ফ্যাসিষ্ট ও নাৎসী নেতাদের আসল অভিসন্ধি সম্বন্ধে চৈতন্যোদয় হলো। কিন্তু এই দিব্যজ্ঞান পেতে অহেতুক বিলম্ব করায় তাঁরা মহাযুদ্ধকে আর দূরে ঠেকিয়ে রাখতে পারলেন না। মনে মনে ধারাবাহিক ঘটনাবলীকে অনুসরণ করে দেখলাম যে, যা উপলক্ষ করে তৈরী হয়েছে আজকের

এই মহাসংগ্রাম তার জন্য দায়ী —শান্তিকামী বলে চেঁচালেও, কয়েকটি রাষ্ট্রের অদূরদর্শী অধিনায়করা। তাঁরা সময়ে সজাগ ও সক্রিয় না হওয়ায় সর্বগ্রাসী লড়াই-এর এই বিভীষিকা সারা জগৎকে আজ এমন নৈরাশ্যময় ও অসহায় করে তুলেছে।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের বিভীষিকা

মহাযুদ্ধ আসায় মানসিক দুশ্চিন্তা ও ভয়াচ্ছন্ন পারীবাসীদের বিষাদক্লিষ্ট রূপের উপযুক্ত ব্যাক্‌গ্রাউণ্ড হলো তক্তা ও বালিভরা বস্তার নক্‌সাদার গাউনে ঢাকা শহরের বিকৃত ও বিবর্ণ চেহারা। বুলভারের চৌমাথার চত্বরের বা পার্কের অপূর্ব ভাস্কর্য-গুলিকে ধ্বংস থেকে রক্ষার্থে বস্তার থাক দিয়ে ঢেকে দেওয়ায় শ্রান্ত পথিক আর তার ধারের বেঞ্চগুলিতে বসবার জন্য প্রলুব্ধ হয় না। নোতর্‌দাম, সাঁস্তুলপিস্‌ প্রভৃতি বিখ্যাত ক্যাথেড্রাল ও গীর্জাগুলি, লুভ্‌র, লুক্‌সাম্বুর প্রভৃতি প্রাসাদসমূহ তক্তা ও বস্তার প্রাকারগত হওয়ায় তাদের দিকে চাইলে আসন্ন ভবিষ্যৎ ভেবে মর্মপীড়াগ্রস্ত হতে হয়। গীর্জাগুলির ঘণ্টার আওয়াজও যেন শোনায় ভাঙা ভাঙা আর ভিতরে প্রার্থনাকারীদের সমবেত কণ্ঠধ্বনি কাঠ ও বালির আবরণে চাপা পড়ায় মনে হয় যেন ক্রিপ্ট থেকে ভেসে আসছে বৈতরণীর অপর পার থেকে অশরীরিদের শেষ যাত্রার গান।

ছোট বড় স্কোয়ারে ও বাগানে খয়ের, হলুদ, সবুজ ও কালো রঙ-এর ছোপ লাগানো বিমান-ধ্বংসী কামানের ইউনিটগুলি গোলাবর্ষণের জন্য তৈরী হয়ে বসে গেলো। সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা ও রাতে আচমকা শুরু হয়ে যায় বম্বিং-এর মহড়া। বুঝবার উপায় নেই কখন এই বম্বিং-এর কুচকাওয়াজ নকল না হয়ে আসল আক্রমণে পরিণত হয়েছে। রাস্তার আলোগুলিতে খুব কম জোরের নীলাভ বাল্‌ব দিয়ে তার ওপর ও নীচে ঠুলি লাগিয়ে দেওয়ায় রাতে ঠিক নজর করে চলাফেরা বেশ অসুবিধাজনক হয়ে উঠল। সেই অস্বচ্ছ ঘোলাটে নীল আলোয় মানুষকে দেখলে মনে হতো যেন পোশাক-পরা পাণ্ডুর মৃতদেহগুলি ঘুরে বেড়াচ্ছে।

পারীর প্রায় সব বড় বাড়িগুলির মাটির নীচে ভারি গাঁথুনীর পাথরে বাঁধানো ঘর আছে, সেগুলিকে বলে 'কাভ'। এগুলিকে মদিরা সংরক্ষণের উপযুক্ত ভাণ্ডার-গৃহ হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যে-সব বাড়িতে এই কাভগুলির অবস্থিতি ছিল খুব গভীরে সেগুলি বম্বিং থেকে বাঁচতে সবচেয়ে নিরাপদ আশ্রয় বিবেচিত হওয়ায় সরকার থেকে সেই বাড়িগুলির সামনে বড় হরফে ছেপে বিজ্ঞাপনী দেওয়া হয়েছিল 'আব্রি' অর্থাৎ রক্ষার আশ্রয় বলে। আকাশে বিমানের গুঞ্জন আর কামানের হাঁক ও সাইরেনের শব্দ উঠলেই লোকেরা রাস্তা ছেড়ে কাছের আব্রিতে ঢুকে পড়ত।

সাইরেন আবার একটানা ভোঁ বাজিয়ে 'অল ক্লিয়ার' জানালে আশ্রয় ছেড়ে লোকেরা যে যার কাজে চলে যেত।

একদিন ক দিদ-র আতলিয়ে থেকে দুপুরে ফিরছি এমন সময় পাশের পার্ক থেকে কামান দাগা শুরু হয়ে গেলো এবং সেইসঙ্গে উঠল সাইরেনের ক্রমাগত চড়া ও খাদে ওঠা-নামার পোঁ শব্দ। হুড়মুড় করে পথ, দোকান ও আশপাশের বাড়ি থেকে সবাই ঢুকতে লাগল কাছের আশ্রিতে। আমিও ছুটে প্রবেশ করলাম। উত্তেজনার ঘোর কাটলে দেখি যে, ভয়সন্ত্রস্ত একজোট মহিলাদের মধ্যে এক আমি ছাড়া আর কোনো পুরুষ ছিল না। তাঁরা যে যেমন অবস্থায় ছিলেন সেইভাবেই নেমে এসেছেন আশ্রিতে। একজন বোধহয় বাথটাবে নিমজ্জিতা ছিলেন। তিনি এলোচুলে ভেজা শরীরের জলধারা ছিটিয়ে বসে গেছেন একটা টাওয়েল গায়ে জড়িয়ে। আর এক মহিলা শিশুকে স্তনদুগ্ধ পান করাচ্ছিলেন। তিনি ভয়বিহ্বলা হয়ে বাচ্চাকে আঁকড়ে ধরে চলে এসেছেন উন্মুক্ত বক্ষা হয়ে। একটা অন্তিম ভয় তাদের মনকে অভিভূত করে ভুলিয়ে দিয়েছে সমাজের মেনে-চলা লজ্জা সরম ও আচারের অভ্যাসকে।

ত্রাস যে কতখানি কুৎসিত ও বীভৎস হতে পারে তার দৃশ্য প্রকট হয়ে ফুটে উঠল আমার সামনে। অনেকেই সেখানে ভয়াশ্রুভরা চোখে বিকৃত কণ্ঠে বিলাপ করছিল, 'ও মা দিয়ো, কেল্ অরর কেল্ মালেরা' ···ইত্যাদি (হে ভগবান কি বিভীষিকা, কি দুর্ভাগ্য)। হঠাৎ নিজেকে ভীষণভাবে কাপুরুষ মনে হলো। কাভ থেকে বেরিয়ে আবার রাস্তায় এসে দাঁড়ালাম।

একটি পুলিশ আমাকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে তেড়ে এসে মুখ খিঁচিয়ে বলল, "যাও শিগ্‌গির ঐ কাছের আশ্রিতে।"

বললাম, "মঁ্যসিয়ো ইচ্ছে করলে নিজে ওখানে গিয়ে প্রাণরক্ষা করতে পারেন। কিন্তু যে দৃশ্য আমি দেখে এলাম তা পুনরায় দেখার চেয়ে এখানে দাঁড়িয়ে মরা ভালো।"

সরকার থেকে বিজ্ঞাপন বের হয়েছিল যে, সকলকে একটা করে গ্যাস-মাস্ক রাখতেই হবে এবং পুলিশের দপ্তর থেকে মাস্ক প্রতি এক পাউণ্ড দক্ষিণা দিয়ে কেনবার নির্দেশ দেওয়া ছিল। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী মাস্ক সরবরাহ না হওয়ায় লোকেরা কিউতে দাঁড়িয়ে লম্বা সময় কাটিয়ে শেষে নিরাশ হয়ে ফিরে যেত।

এক বছর আগে লণ্ডনে থাকতে একবার যখন যুদ্ধ প্রায় বাধো বাধো হয় তখন পুরবাসীদের সকলকে বিনামূল্যে সেখানে গ্যাস-মাস্ক বিতরণ করা হয়েছিল। কিন্তু মিউনিক প্যাক্ট করে চেম্বারলেন যে রকম জোরের সঙ্গে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে, আর যুদ্ধ হবে না তাতে বিশ্বাস করায় লণ্ডন ছাড়ার আগে প্রয়োজন নেই বলে মাস্কটি একটি ভারতীয় ছাত্রকে উপহার দিয়ে এসেছিলাম। সেটা কাছে না রাখায় যে খুব একটা আপসোস হচ্ছিল তা নয়। কারণ ভেবে দেখলাম যে, বম্বিং-এ যদি

শরীরের খানিকটা উড়ে যায় তা হলে মুখোশ-পরা অবস্থায় বিশুদ্ধ বাতাসের দম নিয়ে খুব একটা-লাভ হবে না।

একদিন রাত আড়াইটে হবে সাইরেন বেজে উঠল। এর আগে শহরবাসীদের এয়ার-রেড থেকে আত্মরক্ষার যে ড্রিল অভ্যাস করানো হচ্ছিল তার হিড়িকটা সকাল থেকে রাত দশটার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। গুলিগোলার আওয়াজের ধুমধাড়াক্কায় মনে হলো —বুঝি এইবার এল সত্যিকারের ধ্বংস। কিন্তু তবুও বিছানা ছেড়ে তিনতলার সিঁড়ি ভেঙে নীচে কাভ-এ যেতে মন চাইল না। শুয়ে শুয়ে শুনছিলাম নিরাপদ আশ্রয়সন্ধানী লোকেদের পালিয়ে যাওয়ার ত্রস্ত দ্রুত পদক্ষেপ। এমন সময়ে ব্যস্ত করাঘাতে আমার ঘরের দরজা নড়ে উঠল। শুনলাম বাড়ির মাদাম্-এর উদ্বেগভরা কণ্ঠস্বর, "ম্যাঁসিয়ো এত দারুন আওয়াজেও কি তোমার ঘুম ভাঙেনি। ওঠো শিগ্‌গির কাভ-এ চলো, বম্বিং আরম্ভ হয়ে গেছে।"

দরজা খুলে বললাম, "জেগেই ছিলাম মাদাম্, আপনি কেন এত কষ্ট করে ওপরে উঠে আমায় ডাকতে এলেন। বম যে এ বাড়িতে পড়বে তার তো কোনো স্থিরতা নেই আর যদি পড়েও তা হলে কাভ-এ কবরস্থ হয়ে মরার চেয়ে এখানে থেকে মুহূর্তে পরলোকের পথে পৌঁছে যাওয়া অনেক ভালো।"

মাদাম্ তীব্র ভর্ৎসনা করে বললেন, "এই অযথা বাহাদুরীতে তুমি যে স্বার্থপর তাই প্রমাণ করছ। তোমার বাঁচা মরার দায়িত্ব কেবল কি তোমার ইচ্ছার ওপরই নির্ভর করছে মনে করো। তোমার নিরাপত্তা ও প্রত্যাবর্তনের জন্য উদ্বিগ্ন হয়ে যে আপন জনেরা তোমার দেশে অপেক্ষা করছে তাদের জন্যে তোমার উচিত নিজেকে আপ্রাণ চেষ্টায় বাঁচানো।"

তাঁর অনুযোগে নেমে গেলাম কাভ-এ। সিঁড়িতে মাদাম্ গ্যাস-মাস্ক নিলাম না কেন জিজ্ঞাসা করলেন এবং নেই বলায় নিজেরটা খুলে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। আপত্তি করতে বললেন, "আমি ষাট বছরের বৃদ্ধা, জীবনের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি। আমার জীবনান্তে জগতের বিশেষ কোনো ক্ষতি হবে না। তোমার তো কেবল শুরু হয়েছে জীবন এবং জগৎকে দেবার মতো অনেক দান হয়ত তোমার হাত মারফৎ আসবে। কাজেই সিভাল্‌রি দেখাতে ওটা ফেরত দেবার আর চেষ্টা করো না।"

কাভ-এতে ওয়াইন কাস্ক ও বোতল-ভরা বাক্সগুলির ওপর দু'একটা কুসান ফেলে একটি ক্ষুদ্র জনমণ্ডলী যথাসাধ্য আরামে সেখানে রাতটা কাটাবার ব্যবস্থা করছিল। এই সময় নিদ্রাদেবী এদের ওপরে তাড়াতাড়ি কৃপাদৃষ্টি ফেললে এরা বেশ অনুগৃহীত হতো। কিন্তু ঘুমের যখন আপ্রাণ চেষ্টা করা যায় তখন প্রয়োজনের তাগিদেই চোখের পাতা যেন নামতে ভুলে যায়।

গৃহস্বামী বললেন, "ঘুমিয়ে যে আমাদের বর্তমান দুর্ভাবনাকে দূর করব তার বিশেষ সুবিধা দেখছি না অতএব আসুন আমরা পরস্পরের ভবিষ্যৎ মঙ্গল কামনা করে এক পাত্র মদিরা পান করি।"

মহাযুদ্ধের বয়েস প্রায় দেড মাসের ওপর হয়ে গেছে। উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে বেড়ানো আর ভাবনায় মাথাব্যথা করা ছাড়া আর কোনো কাজ করার উপায় ছিল না। হঠাৎ খবর পেলাম, ফ্রান্সের বাইরে যাবার সুযোগ মিলেছে। একটি সৈন্যবাহী জাহাজ মার্শাই থেকে যাবে সাইগন। আমাকে নির্দেশ দেওয়া হলো আমি যেন তাইতে জায়গা করে ফ্রান্স পরিত্যাগ করি।

অন্য সময়ের সাধারণ ভাড়ার প্রায় তিনগুণ মূল্য দিয়ে পেলাম এই প্যাসেজ। ব্যাঙ্ক দ্য ফ্রাসঁ থেকে ফরাসী মুদ্রা বাইরে নিয়ে যাবার যে নোটিশ ছিল তাতে যাত্রীরা প্রত্যেকে পাঁচ হাজার ফাঙ্ক বিনা অনুমতিতে সঙ্গে নিতে পারত। মার্শাইতে পৌঁছে কাগজে পড়লাম যে, সে নোটিশে ভুলে একটা শূন্য বেশী দেওয়া ছিল আসলে পাঁচশো ফ্রাঙ্কের বেশী বিনা অনুমোদনে কেউ ফ্রান্সের বাইরে নিয়ে যেতে পারবে না।

এই সামান্য অর্থ অর্থাৎ সাঁইত্রিশ টাকার মতো পুঁজি সম্বল করে কলম্বো থেকে কলকাতা পৌঁছানো দুশ্চিন্তার কথা। সঙ্গে পাঁচ হাজার ফ্রাঙ্কের একটি নোট ছিল এবং সেটি বেশ পাতলা কাগজের হওয়ায় অনেক ভাঁজ করে একটা ফিল্মের সঙ্গে জড়িয়ে রেখেছিলাম। কারণ তখন আর ব্যাঙ্কে সেটি জমা দিয়ে আসার মতো সময় বা সুবিধা ছিল না। নির্দেশ মতো কেবল একটা ছোট সুটকেশ নিয়ে বন্দরে কাস্টমের সম্মুখীন হতে অফিসার প্রশ্ন করল, পাঁচশো ফ্রাঙ্কের বেশী অর্থ সঙ্গে আছে কি-না? কিন্তু উত্তরের অপেক্ষা না করেই ঠেলে দিলো জাহাজে উঠবার সিঁড়ির গ্যাঙ্গওয়েতে। প্রবেশদ্বারের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল স্টুয়ার্ট। কতদূর যাচ্ছি জেনে বলল, "জানো এ জাহাজের হোল্ডে আমরা কি ভরেছি?"

'না' বলায় জানালেন যে, জাহাজটি কামানের গোলায় ঠাসা। পথে যদি ইতালিয়ান কি জার্মান সাবমেরিন টর্পেডো চালায় তো আমরা উড়ে ওপরে ভস্ম হয়ে যাব এবং জলে পড়বার মতো অঙ্গারও আমাদের দেহ থেকে নামবে না। জিজ্ঞাসা করলাম, তিনি কি এই সাদর অভ্যর্থনায় সকল যাত্রীকেই অভিনন্দিত করছেন।

তিনি জানালেন, "কে জানে এই হয়ত আমাদের সকলের শেষ যাত্রা তাই সকলের শেষ মুহূর্তের জন্য মনে অন্তত তৈরী থাকা ভালো।"

যাত্রীদের আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব কাউকে বন্দরে আসতে দেওয়া হয়নি কাজেই জাহাজ ছাড়বার আগে বিদায়কে দীর্ঘ করে হাসিকান্নায় মেশানো 'অরভোয়ার, বঁ ভইয়াজ'-এর কোরাস, হাতছানি ও রুমাল নাড়ানোর কোনো অভিনয় হলো না। শুধু গোটা কয়েক লম্বা ভোঁ দিয়ে জাহাজ মন্থর গতিতে মার্শাই বন্দর ছেড়ে এক অনিশ্চিত অদৃষ্টের পথে পাড়ি দিলো।

জাহাজের যাত্রী

চলতি জাহাজ ডাঙায় ও জলের কিনারার ব্যবধান ক্রমশ বাড়িয়ে দিতে, বন্দরের পাড-ঘেঁষা ইমারতগুলির সীমারেখার তরঙ্গভঙ্গ আস্তে আস্তে দ্রবীভূত হয়ে একজোট হয়ে গেলো। সন্ধ্যার ল্যাপিজ ল্যাজুলী রঙের খোলা আকাশ ও জলের বিস্তৃত পটভূমির মাঝখানে স্থলের অপসৃয়মাণ অস্তিত্বকে জানাচ্ছিল প্রায় মুছে যাওয়া একটা গাঢ় বাদামী লম্বা ছাপ যার থেকে গোলাপী, নীল, লাল ও হলুদ রঙের আলোর ফোঁটাগুলি ঝিকমিক করছিল। জাহাজের পশ্চাতে প্রপেলার-এ উদ্বেলিত মসৃণ জলরেখাকে অনুসরণ করে, কাকলিতে আকাশ কাঁপিয়ে পিছু ধাওয়া করছিল একঝাঁক গাল্ পাখী। অনেকেই ডেক-এ রেলিং-এ ভর দিয়ে দাড়িয়ে নিবিষ্ট মনে দেখছিল দূরের জমি, যেখানে জমা হয়েছে ভরা সন্ধ্যার কুয়াসার মতো বিপদের ঘন কুজ্ঝটিকা। কিন্তু কারুর মুখ দেখে মনে হচ্ছিল না যে, তারা বিপদকে এড়িয়ে যাচ্ছে বলে স্বস্তি পেয়েছে। ইয়োরোপের মানচিত্রকে অতিক্রম করে যতক্ষণ আমাদের জাহাজ নিরাপদ এলাকায় না পৌঁছাচ্ছে ততক্ষণ বিপদের ভাবনা কারুর মন থেকে যাবে না। সকলেরই অবস্থা যেন 'জলে কুমীর ডাঙায় বাঘ'-এর মতো সমস্যায় ভরা।

দিন দুয়েকের মধ্যে যাত্রীদের গন্তব্য স্থান, জাতিকুল ও পেশা সম্বন্ধে সকলের বেশ একটা জানাজানি হয়ে গেলো। প্রায় দু'হাজার ফরাসী সৈন্য চলেছে সাইগন-এ, কারণ ফরাসী সরকারের আশঙ্কা যে, ইয়োরোপে লাগা যুদ্ধের আগুন এ-সব অঞ্চলেও ছড়িয়ে পড়তে পারে এবং সে সম্ভাবনার জন্যে তাঁরা তৈরী থাকতে চান। শ' দুয়েক চীনা ছাত্রছাত্রী ইয়োরোপের নানান বিদ্যাকেন্দ্রে পড়াশুনা শেষ করে ফিরছেন স্বদেশে। দু'তিন জন ফরাসী মহিলা পিত্রালয়ে ছুটি কাটিয়ে চলেছেন প্রাচ্যদেশীয় স্বামীর কাছে। জাহাজে নাবিক ও কর্মচারী ছাড়া ডজন খানেক যাত্রী ছিল এক বিশেষ পেশার নারী।

ফরাসী জাতি তার দৈনন্দিন জীবনে পর্যন্ত লজিক মেনে চলে। তাই এই অভিযানকারী যোদ্ধাদের সময়ে সময়ে বিশেষ দৈহিক প্রয়োজনের খোরাক মেটাবার জন্য রসদ হিসাবে চলেছেন এই মহিলাগুলি। প্রত্যহ এঁদের বেলা বারোটার পর দেখা যেত বার-এ বসে রাতের কারবারে ক্লান্ত দেহকে কারণবারি সিঞ্চনে আগামী রাতের ডিউটির জন্য আবার চাঙ্গা করে নিচ্ছেন।

সামাজিক নিয়মাবদ্ধ মানুষ যুদ্ধ বিগ্রহের সময় সমাজনীতি ও ব্যবহারের সংযম-মুক্ত হয়ে আদিম প্রবৃত্তি ও খেয়ালের ঘোড়ার লাগাম দু'হাতে খুলে ছুটিয়ে দেয়। এর জন্যে কৈফিয়ৎ দিতে তারা রাজী নয়। সকলের এটা যেন বোঝা উচিত যে, তাদের জীবনের মেয়াদের আর কোনো স্থিরতা নেই তাই তারা বেঁচে থাকার সব

মুহূর্তের কোনোটাই যাতে সুখামোদের বাইরে ফাঁকিতে না পড়ে যায় তার জন্য অতিশয় ব্যগ্র ও ব্যস্ত। ফরাসী সরকার চায় না যে, তার যোদ্ধারা সুখানন্দ কুড়াতে অজানা, অচেনা ও বিদেশী কোনো বারাঙ্গনার সংস্পর্শে এসে প্রেমবিহারের কোনো দুর্বল মুহূর্তে সামরিক গোপন সন্ধান প্রকাশ করে দিয়ে ফেলে। কে বলতে পারে যে, তাদের কেউ শত্রুর নিযুক্ত গুপ্তচর নয়। তাই সৈন্যদের জন্য এই সদা ক্ষণিকের প্রণয়িনীদের দেশজাদের থেকে পরখ করে বেছে সরকার নিযুক্ত করেছে।

বোধহয় সামরিক খবরাখবর বিদেশীদের কাছে গুপ্ত রাখার উদ্দেশ্যে সাবধানী কানুন বজায় রাখতে সৈন্য ও জাহাজের কর্মচারীরা অন্যান্য যাত্রীদের তফাতে রেখেছিল। আমি ছিলাম একমাত্র ভারতীয় যাত্রী এবং অতি সহজে চীনা ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে ভিড়ে গেলাম। এঁদের প্রায় সকলেই ইয়োরোপে পড়াশুনায় বছর তিন-চার কাটিয়েছেন। এখন পারদর্শী হয়ে ফিরছেন দেশসেবার দৃঢ় সঙ্কল্প মনে নিয়ে।

চীনারা স্বভাবত চাপা প্রকৃতির, কাজেই একেবারে মন খুলে সব কথা তারা বলত না। ভাসা ভাসা কথোপকথনে জেনেছিলাম যে, তারা মনে করে না, জাপানকে চীনদেশের মাটি থেকে উচ্ছেদ করলেই তাদের সব সমস্যার সমাধান হবে। রাজতন্ত্র উচ্ছেদ হওয়ার পর থেকে চীনের রাষ্ট্রভার নিতে ব্যগ্র যে সকল নেতাদের উদ্ভব হয়েছে তাদের নিজেদের দলে রয়ে গিয়েছে বহু খাঁটি ও বুদ্ধি কর্মীরা। কিন্তু অতি দ্রুত পরিবর্তনশীল ঘটনার জালে জড়িয়ে পড়ায় তাঁদের তলিয়ে দেখবার সময় নেই, কে উপযুক্ত আর কে বা অনুপযুক্ত। লিকুইডেসন-এর সহজ প্রণালী অবলম্বনে প্রত্যেক রাজনৈতিক শক্তি সন্দেহভাজন মনে হলেই নাগালে পাওয়া নাগরিক ও কর্মীদের নিপাত করে চলেছেন। অথচ সমাজের একই প্যাটার্নের লোককে নিয়ে তৈরী হয়েছে বেশীরভাগ এই শক্তিগুলি —কেবল নামেই তারা ভিন্ন। একই ডেকাডেন্স-এর ডোবায় পড়ে তারা একে অন্যের ওপর পাঁক ছিটিয়ে বলছে ও নোংরা লোক। এই ছাত্রছাত্রীদের দেশসেবার সঙ্কল্পে কোনো খাদ না থাকলেও এদের অনেকেই হয়ত রাজনৈতিক চক্রে পড়ে অযথা প্রাণ হারাবে। কিন্তু দেখলাম, সে পরিণাম ভেবেও তাদের একজনও চিন্তিত বা ভীত নয়। তাদের এক পণ চীনকে পতনের পিচ্ছিল পথ থেকে উঠিয়ে উন্নতির সোজা ও শুক্‌নো পথে দাঁড় করিয়ে দিতে হবে এবং সে রাস্তা সমান করতে যত অসংখ্য দেহের প্রয়োজন তা সরবরাহের জন্য তারা সকলেই প্রস্তুত। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথা তারা কিছুটা শুনেছে কিন্তু প্রতিবেশী দেশ হলেও দেখলাম, আমাদের দেশ সম্বন্ধে যেটুকু জানা উচিত তা তারা জানে না বা তা জানবার আগ্রহ নেই। আমাদের দেশবাসীরও চীন সম্বন্ধে জ্ঞান ও অনুসন্ধিৎসা ঐ একই ধরনের। কিছুকাল আগে 'হিন্দি চীনী ভাই ভাই'-এর চিৎকার শোনা যেত দিকে দিকে। কিন্তু 'আমরা খবর রাখি মাদাম্ পম্পাডুর ও পঞ্চদশ লুই-এর কামরার মধ্যে ব্যবধান ছিল কত গজ

অথবা নাপোলেয় লড়াই-এর মাঝে ক'বার স্নান আর ডলাই-মলাই করতেন কিংবা চেম্বারলেন মিউনিক-এর কনফারেন্সে ক'বার হাই চেপেছিলেন।

চীনের ইতিহাস ও কাহিনী পড়ার ও জানার সময় আমরা এখনও করে উঠতে পারিনি। এক কিংবদন্তির জোরে আমরা ধরে নিয়েছি যে, চীন আর ভারতের মধ্যে অতি প্রাচীন কাল থেকে খুব দহরম-মহরম বন্ধুত্ব, তাকে আবার খতিয়ে দেখবার প্রয়োজন কি? কিন্তু প্রতিবেশী দেশ হলেও চীনের সঙ্গে ভারতের ঐতিহাসিকভাবে উল্লেখযোগ্য এমন কোনো সাক্ষাৎ রাজনৈতিক যোগাযোগ হয়নি যার ফলে বলা যেতে পারে যে, এই দুই দেশের মধ্যে এক অবিচ্ছিন্ন মিত্রতা কোনো সময়ে গড়ে উঠেছিল। যেহেতু অতীতে চীন ও ভারতের মধ্যে কোনো উল্লেখযোগ্য সংঘাতের সৃষ্টি হয়নি অতএব মিত্রতা ছিল —এমন সিদ্ধান্তে সত্যের অপলাপ করা হবে।

সাধারণ ধারণায় যেমন ভারতকে সমগ্রভাবে একটি দেশ বলে ধরা হয় যদিচ এক সাধারণ কৃষ্টিগত সংযোগ ছাড়া জাতি ও রাষ্ট্রগতভাবে এ দেশ এক দেশ ছিল না। তেমনি চীনও কোনোকালে একমাত্র জাতি অধ্যুষিত একটি দেশ ছিল না এই সে-দিন পর্যন্ত। ১৯০৭-এর আগে মাঞ্চুরিয়া, মোঙ্গলিয়া, সিংকিয়াঙ্গ ও তিব্বত শুধু রাজ্য শাসনে নয় জাতিগতভাবে আচারে ও ব্যবহারে ছিল চীনের অন্য অঞ্চল থেকে স্বতন্ত্র। সিংকিয়াঙ্গ (অর্থাৎ নতুন উপনিবেশ) কাশ্মীর ও তিব্বতের মাঝামাঝি জায়গাগুলিতে এবং প্রাচ্য তুর্কিস্থানে খুলজা, কাশগারিয়া ও তাতার প্রভৃতি ভিন্ন জাতিদের শাসন করেছিলেন রপ্তানি-করা চীনা প্রভুরা বহুকাল। বিশুদ্ধ চীনাদের দেশ বিংশ শতাব্দীর আগে চীনের এক-তৃতীয়াংশ মাত্র স্থানে নিবদ্ধ ছিল।

তিব্বতের অংশ সাধারণভাবে চীনের অন্তর্ভুক্ত হলেও লাসার শাসন ছিল প্রায় সম্পূর্ণ স্বাধীন এবং রাজনৈতিক কারণে প্রায় দু' শতাব্দী যাবৎ ব্রিটিশ ভারতের সঙ্গে চীন অপেক্ষা নিকট সম্পর্ক বজায় রেখেছিল।

কেবল ভৌগোলিক পরিবেশে সমগ্র চীন অন্যান্য দেশের সঙ্গে বিশেষ করে পশ্চিমের দেশ সমূহের সঙ্গে প্রায় বিচ্ছিন্ন থাকায় এর সভ্যতা গড়ে উঠেছে অবিমিশ্র এক বিশিষ্ট ধারায়। সেই অতিবিশিষ্ট অপরিবর্তনশীল সভ্যতার ভিত্তি ছিল এত গভীর যে, উনবিংশ শতাব্দী থেকে ইয়োরোপীয়দের অভিযানে ও উপনিবেশকারীদের আওতায় পড়েও তার গায়ে পরিবর্তনের কোনো ছাপ লাগেনি। বিংশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক কারণে এবং বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে পূর্বের ভৌগোলিক স্বাতন্ত্র্য ভেঙে যাওয়ায় নানা দেশের চিন্তাধারা ও সভ্যতা দ্রুতগতিতে আমূল পরিবর্তনের দিকে ধাবিত হয়েছে। মূলত ভৌগোলিক অবস্থিতির কারণে চীনারা আপন দেশের সীমান্ত অতিক্রম করে বাইরে পা দেবার বিশেষ সুবিধা পায়নি। কিন্তু সামান্য কয়েক বার যখন সে সুযোগ উপস্থিত হয়েছিল, চীনা সামরিক শক্তি নির্মমভাবে অন্যের এলাকা আক্রমণ করেছিল।

সপ্তম শতাব্দীতে টাঙ্গ বংশীয় সম্রাটদের প্রবল সেনাবাহিনী দিকে দিকে অভিযান চালিয়ে কোরিয়া, তুর্কিস্থান, উত্তর-পশ্চিম ভারত ও তিব্বতের বুকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মিং সম্রাট ইউঙ্গলো, দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার অভিযানে সৈন্য প্রেরণ করেন এবং তাঁর বিজয়ী সৈন্যরা যবদ্বীপ ও সিংহলে হানা দিয়ে পারস্য উপসাগর পর্যন্ত পাড়ি দেয়। তদানীন্তন সিংহলরাজের এক পুত্রকে চীনে বন্দী হিসাবে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সম্রাট বহু বছর ধরে সিংহলের কাছ থেকে কর আদায় করেছিলেন। এ ছাড়া চীন মহাদেশের মধ্যে শতাব্দীর পর শতাব্দী যে সংগ্রাম ও রক্তস্রোত বয়ে গিয়েছে তার ছিটেফোঁটা বাইরে কোথাও পড়েনি বলে আমরা ধরে নিয়েছি যে, চীনারা চিরকাল ছিল অতিশয় শান্তিপ্রিয় জাতি।

এ সব লিখে আমি অবশ্য প্রমাণের চেষ্টা করছি না যে, জগতের মধ্যে চীনারা অতিশয় হিংস্র বা যুদ্ধপরায়ণ জাতি। এটাও আমার উদ্দেশ্য নয় যে, ভারত ও চীনের মধ্যে অচ্ছেদ্য বন্ধুত্ব স্থাপনের অন্তরায় হবার মত কিছু বিবরণ বিজ্ঞাপনী দেওয়া। দুই দেশের মধ্যে বন্ধুত্বের ভিত তখনই স্থায়ী ও দীর্ঘায়ু হয় যখন তাদের ঐতিহাসিক ও আভ্যন্তরীণ চরিত্রকে সর্বাঙ্গীনভাবে জেনে ও উপলব্ধি করে সহজভাবে মেলামেশা করা যায়।

চীন ও ভারতের সম্পর্কের একমাত্র যোগসূত্র হচ্ছে বৌদ্ধধর্ম। কিন্তু এই ধর্মকে উপলক্ষ্য করে কিছু ধর্মপণ্ডিত ও পরিব্রাজকদের গমনাগমন ও ভারতের ধর্মপুস্তক ও পূজার্চনার মূর্তি চীনে রপ্তানি হওয়া ছাড়া এই দুই দেশের শাসককুল বা জনগণের সঙ্গে কোনো কালে কোনো ঘনিষ্ঠতা গড়ে ওঠেনি। এই প্রসঙ্গে এটাও জানা প্রয়োজন যে, চীনে বহুবিধ ধর্মের প্রচলনে কোনোদিন তার কোনোটির প্রতি তদ্দেশীদের প্রগাঢ় আসক্তি বা গোঁড়ামীর সূত্রপাত হয়নি যেমন ভারতে বহুবার ধর্মমত ও তার আবেগ জাতির ভিত্তিকে নাড়া দিয়ে প্রলয়ঙ্কর আলোড়ন ও প্রচণ্ড আক্ষেপের সূচনা করেছিল। চীনাদের অতি প্রাচীন প্রথা পূর্বপুরুষদের অর্চনা সকল ধর্মমতকে ছাপিয়ে ব্যক্ত হয়েছে চিরকাল। একটা জাতির স্বভাবধর্ম শুধু দু'একটা ভেসে-আসা দার্শনিক ধারণা বা পূজা আরাধনার মাধ্যমে তৈরী হয় না।

পূর্ব, মধ্য ও দক্ষিণ-পূর্ব চীনের জলে ও ফসলে-ভরা দেশগুলির ওপর আক্রমণ ও লুণ্ঠন চালাত উত্তর, পশ্চিম ও দক্ষিণ-পশ্চিমের মরুভূমি ও পাহাড়ের দুর্ধর্ষ বাসিন্দারা। মাঝে মাঝে অনাবৃষ্টি বা বন্যার ফলে দুর্বার জীবন সমস্যায় পড়ত সুজলা জমির অধিবাসীরা এবং এর প্রতিক্রিয়ায় চীনের বাসিন্দাদের একই অঞ্চলে দীর্ঘকাল আটকে রাখতে পারেনি। ঐ মহাভূখণ্ডের মধ্যে সময়ের গালিচায় ঘটনাচক্রে স্থান ও গৃহপরিবর্তনে ধাবমান চীনাগোষ্ঠীর পদক্ষেপ তৈরী করেছে এক জটিল নক্সা। বিশেষ ধরনের মাটি, জল ও সার-নিরপেক্ষ উদ্ভিদ যেমন যে-কোনো স্থানে ও যে-কোনো আবহাওয়ায় বেঁচে বর্ধিত হতে পারে তেমনি ভিটেমাটির

আকর্ষণহীন চীনারা কোনো ভূখণ্ড বিশেষের প্রতি আকৃষ্টমন না হওয়ায় পৃথিবীর যে-কোনো দেশে ও স্থানে এবং অনুকূল বা প্রতিকূল যে-কোনো পরিবেশে সহজে বাসা বেঁধে ফেলতে সমর্থ।

চীনদেশে বহু প্রাচীনকাল থেকে ব্যক্তিগত জীবনেব চেয়ে সমষ্টিগত জীবনের প্রাধান্য অনেক বেশী। জমি-জমা সম্পত্তি ও ফসল সবই সদাপরিবর্ধনশীল পরিবারের সম্মিলিত অধিকারে থাকত এবং বৃহত্তরভাবে সারা গ্রামের বিষয়-আশয় সকলের সমবায অধিকারে ন্যস্ত ছিল। এব তত্ত্বাবধান কবতেন গ্রামেব মুখ্য ও বয়োজ্যেষ্ঠ অধিবাসীগণ। সমবায় সমাজ-জীবনের আদর্শ রাশিয়ায় বহু চেষ্টা ও প্রোপাগ্যাণ্ডার সাহায্যে আজও সম্ভবত পরিপূর্ণতা লাভ করেনি অথচ সে তুলনায তথাকথিত অনুন্নত চীনে বর্তমানে তার পুরোপুরি সাফল্য দেখে জগতের জনগণ আজ বিস্মিত। কিন্তু বলা চলে যে, এই সমবায সমাজেব প্যার্টার্ন চীনে দু' হাজার বছর ধরে বিদ্যমান কাজেই আজকের সমাজ জীবনে এটা অভিনব রূপান্তব নয় একটা নামান্তর মাত্র।

ধর্মেব প্রতি দৃঢ আসক্তি ও গোঁড়ামী না থাকলেও তিনটি ধর্মমত চীনা জীবনকে অতি প্রাচীনকাল থেকে প্রভাবান্বিত করেছে। প্রাচীনতম ধর্ম তাওইজম ও কনফুসিযানিজম এ পারমার্থিক ও আধ্যাত্মিক চিন্তা ও ভাবনার চেযে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অবয়বের গঠনাদর্শ এবং তার সুষ্ঠু পবিচালনায ধাবণা ও আলোচনার প্রাধান্য ছিল বেশী। কনফুসিযাস-এব ধর্ম ছিল বাজধানী ও নাগরিকদের কেন্দ্র করে আর তাওইজম ছিল প্রধানত গ্রাম, চাষাভুষো ও সাধারণ লোকের ধর্ম। হান্ বংশীয় সম্রাটদের অভ্যুদয়ের আগেই চীনে সামন্ততন্ত্র লোপ পেয়ে যায় এবং রাজ্যেব শাসনভার দেওয়া হতো উচ্চবংশীয় বিদগ্ধজনদের ওপর। পরবর্তীকালে শাসনকর্মের নায়কদের নির্বাচন করা হতো পরীক্ষার মাধ্যমে। এই রীতির প্রচলনে চীনেব দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের সুদূর অঞ্চলের গুণীজনরাও রাষ্ট্রে উপযুক্ত পদে নিযুক্ত হবার সুযোগ পেতেন।

কনফুসিয়াস ছিলেন এমনি এক অতি বিখ্যাত বিদগ্ধ জন। অতি অল্প বয়সে নানা বিদ্যায় পারদর্শিতা ও যশ লাভ করায় তিনি দেশশাসন কার্যে নিযুক্ত হয়েছিলেন। তাঁর উপদেশের মর্ম ছিল যে, বিদ্যার দ্বারা আত্মোন্নতি সাধন ও রাজ্যে ও সমাজে প্রত্যেকের আদর্শ সম্পর্ককে উপযুক্ত আদব কায়দায় বজায় রাখা। কনফুসিয়াস এর জীবন সংক্রান্ত নানা কথিকা থেকে তাঁর ধর্মমতের স্বরূপকে দেখবার সুযোগ পাওয়া যায়। শোনা যায় যে, একবার তিনি অন্য প্রদেশ থেকে প্রাচীন পুস্তক পাঠ ও গবেষণা করে আপন এলাকায় ফিরে দেখেন যে, তাঁর অবর্তমানে জনগণ বিদ্রোহ করে তাদের রাজ্যাধিনায়ককে নির্বাসনে পাঠিয়েছে। কনফুসিয়াস প্রজাদের শাসকের প্রতি এই অশিষ্টাচারকে ঘোরতর অধর্ম ঘোষণা করে রাজ্যাধিনায়কের দশার অংশভাগী হতে স্বেচ্ছানির্বাসনে চলে যান।

একদিকে যেমন তিনি প্রজাদের শাসনকর্তার প্রতি অমর্যাদা প্রকাশকে ক্ষমা করেননি তেমনি অনুপযুক্ত ও নিপীড়ক শাসকের প্রতি তাঁর বিদ্বেষ ছিল তীব্র। গল্প আছে যে, স্বেচ্ছানির্বাসনে যাবার পথে এক নির্জন পার্বত্যময় স্থানে দেখেন যে, একাকিনী রোরুদ্যমানা এক রমণী মৃতের সমাধির ওপর অবলুণ্ঠিতা হয়ে আর্তনাদ করছে। জিজ্ঞাসাবাদে জানা গেলো যে, মহিলাটির পতির পিতা, পতি ও একমাত্র পুত্র ঐ স্থানে বাঘের আক্রমণে নিহত হয়েছে। সেখানে একা অধিকক্ষণ থাকলে তাকেও যে বাঘ নিপাত করতে পারে বলায় মহিলাটি বললে যে, রাজ্যের শাসক অবিচারী ও উৎপীড়ক হওয়ায়, তার গৃহের চেয়ে বিপদসঙ্কুল হলেও বনের আশ্রয় শ্রেয়। কনফুসিয়াস তাঁর সহগামী শিষ্যবর্গকে সম্বোধন করে বললেন, 'দেখ হে এই দৃষ্টান্তে প্রমাণ হচ্ছে যে, শাসক অবিচারী ও নিপীড়ক হলে ব্যাঘ্রাপেক্ষা ভয়াবহ হয়ে দাঁড়ায়।'

কনফুসিয়াস-এর সমসাময়িক কিন্তু বয়েসে অনেক বড় লাওৎসে ছিলেন তাওইজমের জনক। প্রচলিত কাহিনী অনুযায়ী লাওৎসে ভূমিষ্ঠ হবার আগে জননীর জঠরে ছিলেন আশী বছর তাই জন্মেছিলেন একবারে পক্ককেশ দীর্ঘশ্মশ্রু বৃদ্ধ রূপে। তাও ধর্মে মিতাহার, মিতাচার, অমানুষিক ক্ষমতা অর্জন, দীর্ঘায়ু হওয়া, ইন্দ্রজাল ও অ্যালকেমী প্রভৃতি জড়িত থাকায় কনফুসিয়ানিজম-এর চেয়ে এর জনপ্রিয়তা বেশী ছিল। এই ধর্মমতে কনফুসিয়ানদের সমর্থিত বেশী বিদ্যাশিক্ষায় মানুষের সরল স্বভাব নষ্ট হবার খুবই সম্ভাবনা মনে করা হতো। রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক ক্ষেত্রে তাও ধর্মাবলম্বীরা সরকারের কেন্দ্রীভূত আধিক্যকে পছন্দ করতেন না এবং তাঁরা গণ-স্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। তাঁদের আওতায় অনেক ছোট ছোট গ্রাম প্রায় স্বায়ত্ত শাসনের ক্ষমতা লাভ করেছিল। সরকারের সৈন্যবল সংরক্ষণ ও তার প্রয়োগ এবং আইন-কানুনের ব্যবহারের প্রতি ছিল তাঁদের বিশেষ বিরাগ।

কনফুসিয়ানিজম ও তাওইজমের পরস্পর-বিরোধী মতবাদে চীনের সমাজে যে দ্বন্দ্ব ও সমস্যা উপস্থিত হয়েছিল তাকে মিটিয়ে দিতে সাহায্য করেছিল আগন্তুক বৌদ্ধধর্ম। হান্ সম্রাটের বিজয়ী সৈন্যদল ব্যাকট্রিয়া রাজ্যের সংস্পর্শে আসায় দুই দেশের মধ্যে বাণিজ্য সম্পর্ক স্থাপিত হয় এবং পণ্যদ্রব্যের সঙ্গে এসে পড়ে সেখানকার প্রচলিত বৌদ্ধধর্ম। বিশুদ্ধ চীনাদের চেয়ে চীনের তুর্কী ও মোঙ্গল রাজন্যবর্গ বৌদ্ধধর্মের বিশেষ পৃষ্টপোষকতা করেছিলেন। মোঙ্গল সম্রাট কুবলাই খান-এর আমলে তিব্বতীয় বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রসিদ্ধি পাওয়ায় সেখান থেকে ভিক্ষুদের চীনা রাজদরবারে যাবার আমন্ত্রণ এসেছিল। কিন্তু তাওধর্মের আদর্শ বৌদ্ধধর্মের আমদানী-করা রূপের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল নানা জনপ্রিয় তন্ত্রমন্ত্র, ইন্দ্রজাল ও নানা অমানুষিক ক্ষমতা অর্জনের প্রয়াসী হঠযোগে। ফলে তাও-এর ধর্মাবতাররা বৌদ্ধ দেবদেবীর নাম নিয়ে তার মধ্যে ভিড়ে যাওয়ায় চীনের বৌদ্ধ পরিব্রাজকদের

গমনাগমনে এই দুই দেশের মধ্যে গড়ে ওঠা সম্পর্কের যে দোহাই দেওয়া চলে তা নিঃশেষ হয়ে গেছে খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পর থেকে। পরে ভারতীয় দু'একজন ভিক্ষু যাঁরা তিব্বত থেকে চীনে গিয়েছিলেন তাঁদের মারফৎ এই দুই দেশের বিশেষ কোনো সম্পর্ক গড়ে ওঠেনি।

চীনা ছাত্র

তিন সপ্তাহের ওপর এতগুলি চীনা ছাত্রছাত্রীদের সান্নিধ্যে থেকে দেখলাম যে, সহজ মেলামেশার কোনো সম্ভাবনা নেই। আন্তরিকতা পৌঁছাত কেবল একটা আড়ষ্ট বিনয় ও ভদ্র সম্ভাষণ পর্যন্ত, যেন আমাদের মধ্যে থাকত একটা অদৃশ্য চাইনিজ ওয়ালের ব্যবধান। এর জন্য অবশ্য আমার অনুযোগ করার কিছু নেই কারণ এটা তাদের জাতীয় মানসিকতা এবং গড়ে উঠেছে বহু শতাব্দীর ঐতিহাসিক ঘটনাবলীতে।

ভৌগোলিক পরিবেশ ও ঐতিহাসিক ঘটনাচক্র নিয়ন্ত্রিত ও তৈরী করে দেয় প্রত্যেক জাতির সমষ্টিগত স্বভাবকে এবং একই ঘটনায় পড়লে বিভিন্ন জাতির প্রতিক্রিয়ার ফল হয়ে দাঁড়ায় রকমারি। বৈদিক যুগের ভারতের চার বর্ণের মতো প্রাচীন চীনেও ছিল চারটি শ্রেণী। বিদগ্ধ জনেরা ছিল সর্বোচ্চ এবং তার নীচের স্থান ছিল যথাক্রমে কৃষকদের, কারিগর ও ব্যবসায়ীদের। ভারতের সমাজের এই শ্রেণী-বিভাগ যেমন পরে বংশজাত জাতের সংস্কারে পড়ে গিয়েছে, চীনে এই শ্রেণীবিভাগ কিন্তু সে অবস্থায় পড়ে যায়নি। চীনে প্রত্যেক শ্রেণীগত ব্যক্তির বংশধরদের ইচ্ছা মতো পেশা নিয়ে সমাজের এই চার বিভাগের পর্যায়ভুক্ত হওয়ায় কোনোদিন কোনো বাধা হয়নি। এই কারণে সমাজে পেশা অনুযায়ী বংশগতভাবে কেউ উঁচু বা খাটো হয়ে যায়নি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশ থেকে বিচ্ছিন্ন চীনে প্রায় বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার কেন্দ্র ও প্রতীক ছিলেন সম্রাট এবং সামরিক শক্তি স্ফীত হলেই এই সম্রাটরা আশপাশের রাজাকে পরাভূত ও কবলগত করবার আয়োজন ও অভিযান করতেন।

জাতিগতভাবে নিজেরা শ্রেষ্ঠ—এই ধারণা চীনাদের মধ্যে গড়ে উঠেছে বহুকাল ধরে এবং তাদের চোখে বিদেশীরা চিরকাল পরাজিত না হলেও বিজিত ও সম্মানে অসমকক্ষ হিসাবে গণ্য হয়েছে। চীনাদের ধর্ম সম্বন্ধে কোনো রকম গোঁড়ামী না থাকায় খৃষ্টীয় ধর্ম-পরিব্রাজকেরা প্রথমে চীনে আসলে ধর্মপ্রচারে বিশেষ বাধা পাননি। কিন্তু সম্মানে সম্রাট ও পোপের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে এবং চৈনিক প্রাচীন ধর্মাবতারদের ও খৃষ্টীয় সেন্ট এঞ্জেলদের গুরু লঘু তুলনা নিয়ে লেগে যায় গোলমাল। মিশনারিদের পথানুসরণ করে আসেন ক্রমে ইয়োরোপীয় বণিককুল।

সপ্তদশ শতাব্দীতে মাঞ্চু বংশ মিং বংশীয় সম্রাটের হাত থেকে সিংহাসন কেড়ে নেয়। এই বংশে জন তিনেক সম্রাট দুর্দম শক্তিতে রাজত্ব চালাবার পর এই মাঞ্চু শক্তিও নিস্তেজ হয়ে পড়ে। যেন উপযুক্ত সময় বুঝে এই সময় আসতে আরম্ভ করে ইয়োরোপীয় বণিকদের জাহাজগুলি। ইয়োরোপে ইণ্ডাস্ট্রিয়াল রেভেলিউসান শুরু হওয়ায় প্রাচ্য থেকে কাঁচা মাল আহরণে তৎদ্বারা তৈরী পণ্যসামগ্রীকে আবার প্রাচ্যের দেশে পাঠিয়ে বিক্রী করে সহজ অর্থোপার্জনের পথ পাশ্চাত্যের ব্যবসায়ীদের প্রলুব্ধ করেছিল। তদানীন্তন মাঞ্চু সম্রাট বিদেশী বণিকদের কেবল একটি মাত্র বন্দরে বাণিজ্য করবার অনুজ্ঞা দিয়েছিলেন। সেখানে চীনা কর্মচারীরা আগত বণিকদের হেয়জ্ঞানে রূঢ় ব্যবহার করায় তাদের রীতিমতো মানহানি হতো। এমন কি চীনদেশে তৎকালীন রীতি অনুযায়ী ইয়োরোপীয়দের নিযুক্ত কোনো চীনা শ্রমিক যদি আকস্মিক কোনো দুর্ঘটনায় প্রাণ হারাত তা হলে তার ক্ষতিপূরণে ইয়োরোপীয় বণিকদের প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করা হতো।

বাণিজ্য ব্যবস্থার সুবিধা ও চীনাদের কাছে উপযুক্ত সম্মানজনক ব্যবহারের অনুরোধ জানিয়ে ইয়োরোপীয় রাজপ্রতিনিধিরা যখন সরকারী প্রস্তাব চীনা সম্রাটের দরবারে পেশ করেন তখন তিনি ধরে নেন যে, এঁদের রাজন্যবর্গ চীন সম্রাটের দাপটে ভীত হয়ে আনুগত্যের বিশেষ সম্মান ভিক্ষা করে আবেদন পাঠিয়েছেন। চীনাদের ইয়োরোপীয়ানদের প্রতি বিদ্বেষ ঘনীভূত হয় আর একটি বিশেষ কারণে। এই বণিকরা চীনা-চা, সিল্ক ও অন্যান্য পণ্যসামগ্রীর বিনিময়ে ভারত থেকে আফিং আমদানী শুরু করেছিল। ক্রমে রাজকর্মচারী, সৈন্যদল ও জনসাধারণকে এই বিষবৎ নেশা অক্ষম ও মেরুদণ্ডবিহীন করে তুলছে দেখে চীনা সম্রাট কঠোরভাবে আফিং আমদানী বন্ধ করবার আদেশ দেন।

চীনাজাতি ও সৈন্যদল ততদিনে আফিং-এর অস্ত্রে ব্যাপকভাবে অকর্মণ্য হয়ে গেছে—এই নিশ্চয়তা পাওয়ায় ইয়োরোপীয় বণিকরা আপনাদের সৈন্যসামন্ত নিয়ে সমবেতভাবে চীন আক্রমণ করে। বলা বাহুল্য যে, ধারাবাহিকভাবে ক্ষয়প্রাপ্ত চীনা সামরিক শক্তির তখন এমন সামর্থ্য ছিল না যে, এই আক্রমণকে সম্যকভাবে প্রতিহত করে। সমগ্র দক্ষিণ চীন হস্তচ্যুত হবার ভয়ে চীনা সম্রাট সত্বর সন্ধির প্রস্তাব করেন। নতুন চুক্তিতে বণিকরা রীতিমতো লাভবান হয় কারণ তারা বহু বন্দরে সহজে বাণিজ্য করবার অধিকার লাভ করা ছাড়া দেশের অভ্যন্তরবর্তী শহরেও ব্যবসা করবার সুবিধা নিয়ে নেয়।

চীনারা এতদিন মনে করত যে, তাদের সামরিক শক্তি বিদেশীদের কাছে অজেয়। সে শক্তির এই বাস্তব পরিণতি দেখে প্রজাবর্গের মনে সম্রাটের ক্ষমতা সম্বন্ধে যাতে কোনো সংশয় বা সন্দেহ না জন্মায় তার উদ্দেশ্যে তদানীন্তন তরুণ সম্রাট ও তাঁর অভিভাবিকা রাজমাতা বিদেশীদের নিষ্ক্রান্ত করে দেবার বহু ফন্দি ও চেষ্টা করেন। কিন্তু তার ফল হয়ে দাঁড়ায় অতি শোচনীয়। এই সময়ে পূর্বের দুর্গে

বছরের তুলনায় চীনের লোকসংখ্যা বেড়ে যায় প্রায় তিনগুণ। দেশের শস্য ও পণ্য উৎপাদন শক্তি সেই অনুপাতে বর্ধিত না হয়ে পূর্বাপেক্ষা আরও কমে যাওয়ায় এক ভীষণ পরিস্থিতির সূচনা হয়। রাজকর্মচারীরা এর ফলে হয়ে দাঁড়ায় অসাধু, প্রজা উৎপীড়ক ও শোষক। রাজ্য শাসনে প্রচণ্ড অব্যবস্থা এসে পড়ায় নিগৃহীত ও ক্ষিপ্ত জনগণের মধ্যে সৃষ্টি হতে থাকে নানান গুপ্ত সমিতি। এরা ও হোয়াইট লোটাস্-এর দলভুক্ত লোকেরা হামলা করে শাসককুলকে দুশ্চিন্তায় ফেলেছিল।

দেশে শান্তি রক্ষার্থে অবস্থার ফেরে সম্রাট ও তার অনুচরবর্গ শেষে বিদেশী বণিকদের সৈন্যাধ্যক্ষদিগকে সাহায্য করতে আহ্বান করেন। এই সময় জাপানের সঙ্গে চীনের ঝগড়া লেগে যায়। এর আগে বার কয়েক কোরিয়ার অধিকার নিয়ে এই দুই শক্তির বেশ বোঝাপড়া হয়েছিল। জাপান ও চীনের মধ্যে যে যুদ্ধ লাগে তাতে চীনাদের দারুণ রকমের পরাজয় ঘটে। সন্ধিতে চীনকে প্রভূত অর্থ ও ফরমোশা দ্বীপটি জাপানের হাতে তুলে দিতে হয়। জাপানের কাছে পরাজয়ের পর দেশের নেতৃবৃন্দের মনে আর কোনো সন্দেহ ছিল না যে, চীনকে স্বাধীনভাবে নিজের পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়াতে হলে সাবেকি রীতিতে শিক্ষিত সেনাবাহিনী ও তাদের পুরনো সাজ ও অস্ত্রশস্ত্র বদলে ফেলতে হবে। পাশ্চাত্ত্য দেশের বিদ্যা ও বিজ্ঞানে নিজেদের নিপুণ করে তোলবার জন্য চীনা সরকার জাপানে, মার্কিন দেশে ও ইয়োরোপে ছাত্রদের পাঠাতে লাগলেন দলে দলে।

একটা মৃত জানোয়ারের মাংসাস্বাদনে ব্যগ্র শকুনরা যেমন তার ওপর পড়ে ঝটাপটি লাগিয়ে দেয় তেমনি শক্তিহীন ও অসহায় চীনের নানা এলাকা ছলেবলে করায়ত্ত করতে শুরু করে জার্মানী, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জাপান ও রাশিয়া। জাপান চীন থেকে অর্থের ও রাজ্যের এক বিরাট অংশলাভ করায় পাশ্চাত্ত্য শক্তিবর্গ অনুরূপ ভাগ নিতে চেষ্টিত হলেন। এইভাবে চীনে রেলওয়ে, খনি ও বন্দরগুলি আপন সুবিধা-মতো এই শক্তিরা বণ্টন করে নিলেন। এই সময়ে চীনা নেতাদের একজন দেশের শাসন-পদ্ধতি, শিক্ষা ও সমাজ-ব্যবস্থা পাশ্চাত্ত্য প্রথা ও নীতিতে গড়ে তুলতে অগ্রসর হলেন। কিন্তু দেশের রক্ষণশীল লোকদের এটা খুব পছন্দ হয়নি। তরুণ সম্রাট ও প্রবীণা রাজমাতার মধ্যে রাজ্য শাসনভারের অধিকার নিয়ে চলছিল প্রচণ্ড দ্বন্দ্ব ও শত্রুতা। রাজমাতা এই রক্ষণশীল দলের নেতৃবর্গকে প্রভাবান্বিত করে সম্রাটকে বন্দী করে তাদেরই হাতে তুলে দেন দেশ শাসনের ভার এবং এঁরা পরিবর্তনকামী যাদেরই সামনে পেয়েছিলেন তাদের দেশদ্রোহিতার অভিযোগ দিয়ে সত্বর নিপাত করে চলছিলেন। নানা গুপ্তসমিতির লোকেরা এবং গুণ্ডারাও তাঁদের সঙ্গে একজোট হয়ে 'বিদেশীর নিপাতে দেশরক্ষা বজায় থাক' রবে শুরু করে দিলো দেশব্যাপী এক নরমেধ যজ্ঞ।

বিদেশীরা এদের নামকরণ করেছিলেন 'বক্সার'। ইয়োরোপীয় শক্তিরা আপন আপন এলাকার আধিপত্য রক্ষা করতে নিজেদের সৈন্যবলে এই বক্সার বিদ্রোহীদের

জাহান্নামে পাঠাতে আরম্ভ করলেন এবং ক্ষতিপূরণের দাবী মেটাতে চীনাদের আরও জমিজমা ও ধনরত্ন চলে গেলো এঁদের কবলে। দেশে পরিবর্তনকামীরা জাপান-প্রত্যাগত হাজার হাজার চীনা ছাত্রদের দলভুক্ত করে এবং প্রবাসী ধনী ও ব্যবসায়ী চীনাদের অর্থসাহায্যে আয়োজন করেন রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য বিরাট বিদ্রোহ।

নাবালক শিশু সম্রাট ও রিজেন্ট-এর পদাভিষিক্ত তাঁর পিতার সহায়তা করে এমন কেউ আর না থাকায় তাঁরা রাজতক্ত ছেড়ে দেন এবং সুন ইয়াৎ সেন-এর নেতৃত্বে চীনে প্রতিষ্ঠিত হয় রিপাব্লিক। কিন্তু দেশের আভ্যন্তরিক বিশৃঙ্খলা তখন এমন চরম দশায় পৌঁছেছিল যে, সরকার বদলে গেলেও সমস্যার কোনো সুরাহা হয়নি।

ছোটখাট সামরিক নেতারাও নিজস্ব ছোট ছোট এলাকায় প্রভু সেজে আপন ইচ্ছামতো রাজ্য চালাচ্ছিলেন। রিপাবলিক পরিচালনার ভার নিতে ব্যগ্র রাজনৈতিক দলের মধ্যেও নানা গরমিল থাকায় তাদের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা চলে তীব্রভাবে বহুকাল এবং সুন ইয়াৎ সেন-এর কুওমিন্টাং দলকে অপর দল রিপাব্লিক-এর শাসনভার থেকে বঞ্চিত করে রাখে বহু বছর।

প্রথম মহাযুদ্ধ আরম্ভ হলে ব্রিটেন ও অন্যান্য পাশ্চাত্য শক্তিরা চীনকে এক রকম জোর করে এই সংগ্রামে লিপ্ত করায়। কুওমিন্টাং দল এ সম্বন্ধে তাঁদের সমর্থন নেই জানিয়ে প্রতিবাদ করেন কিন্তু বলহীন দলের এই প্রতিবাদ উপেক্ষিত হয়েছিল।

জার্মানীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের জন্য যুদ্ধশেষে জার্মান অধিকৃত চীনের স্থানগুলিকে মিত্রশক্তির পক্ষ থেকে জাপানকে উপহার দেওয়া হয়। নিজেদের দেশের অংশগুলিকে অন্যান্য শক্তিবর্গকে খেয়ালমতো ভাগ-বাঁটরা করতে দেখে, রোষে ও অপমানে চীনের জনগণ ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে এবং বিদেশে শিক্ষিত অধ্যাপক ও ছাত্রগণ শুরু করে দেন জাতীয় আন্দোলন। কুওমিন্টাং দল তেজস্বী সেনানায়ক চাঙ্গ কাইসেক-এর নেতৃত্বে জাতীয় সত্তা ও অধিকারকে ফিরিয়ে আন-ছিলেন ধীরে ধীরে।

জাপানকে চীনে অপরিসীম অধিকার ও প্রভাব বিস্তার করতে দেখে শঙ্কান্বিত হয়ে রাশিয়াও মোঙ্গলিয়ায় আপন প্রভাব বিস্তারে এগিয়ে যায় এবং প্রতিষ্ঠিত করে কমিউনিজম-এর কেন্দ্র। ক্রমে উত্তর-পশ্চিম এলাকায় চীনা কমিউনিস্ট সামরিক শক্তি ও চাঙ্গ কাইসেক-এর মধ্যে দেশের শাসনভারের অধিকার নিয়ে লেগে যায় লড়াই।

সুবিধাবাদী জাপান মাঞ্চুরিয়া অধিকার করে চীনের অপর এলাকায় বাহু বিস্তার করছিল দ্রুতগতিতে। তার এই অন্যায় অভিযানের বিরুদ্ধে লিগ অব নেশনে প্রতিবাদ উঠলে জাপান লিগের সদস্যপদ ত্যাগ করে নিজেকে আন্তর্জাতিক

সব দায়িত্বমুক্ত করে নিয়ে আরও প্রবলতর আক্রমণ চালায় চীনের বুকে। বাইরের শত্রুকে প্রতিহত ও পরাজিত করবার উদ্দেশ্যে কমিউনিস্ট নেতারা ও চাঙ্গ কাইসেক এক চুক্তি করে সমবেতভাবে চালাচ্ছিলেন চীনে মুক্তির সংগ্রাম এবং এরই মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল একযোগে সারা চীনের ছাত্রছাত্রীরা।

এই জাহাজের যাত্রী ছাত্রছাত্রীরা তারই একটা অত্যুজ্জ্বল নমুনা। এরা সর্বদাই একত্রিত থেকে কখনও বা গাইত সমবেত কণ্ঠে জাতীয় সংগীত কিংবা উত্তেজনার সঙ্গে দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে আলোচনা করত অথবা জাহাজে এক-ঘেয়েমির সময় কাটাতে খেলত মাজং। এদের মধ্যে দু'জনকে আমার বেশ স্পষ্ট মনে পড়ে। একজনেব নাম ছিল 'হু' (অথবা 'খু')। ইনি ইঞ্জিনিয়ারিং শিখেছেন এবং সেতু নির্মাণাদিতে বিশেষ পাবদর্শী।

নানা কথা প্রসঙ্গে একদিন তিনি বললেন, "আমার নামের অর্থ হচ্ছে বাঘ। বাঘ যেমন খানা-ডোবার বাধা অতিক্রম করে লাফিয়ে পড়ে তার শিকারের ওপর তেমনি আমার বানানো সেতুগুলি দিয়ে সহজে নদীনালা টপকে আমাদের জাতীয় সেনারা জাপানী শত্রুর ওপর পড়ে তাদের নিপাত করতে থাকবে।"

বললাম, "জাপানী সেনারাও তো আপনাকে কোনো মতে বধ করে সে সম্ভাবনাকে শেষ কবে দিতে পারে।"

তিনি হেসে বললেন, "আরে তাব আগে দেশেতে আমার জানা বিদ্যায় পারদর্শী করে দেবো আরও হাজার লোককে। জাপানীরা একটা হু-কে মেরে দেখবে তার জায়গা নিতে দাঁড়িয়ে আছে আরও হাজার হু।"

চেহারার বিশেষত্বে লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার মতো রূপ ছিল কুন্ চেঙ্গ চাঙ্গ-এর। তাঁকে দেখলে মনে হতো টাং যুগের একটি যোদ্ধামূর্তি যেন জীবন্ত হয়ে ডেকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। চাঙ্গ লণ্ডন ইউনিভার্সিটিতে পলিটিক্যাল ইকনমিকস পড়া শেষ করে দেশে ফিরছেন। এই ছিপছিপে গড়নের অতি দীর্ঘাকৃতি পুরুষের মুখে একটা অদ্ভুত আভিজাত্যের ছাপ সর্বদাই জ্বলজ্বল করত। এই একটি মাত্র চীনা যাত্রী যার সাহচর্যে কোনোদিন অনুভব করিনি সেই অদৃশ্য ব্যবধান যা অন্য ছাত্ররা আমাকে ভুলতে দিত না।

চাঙ্গের হাতে একটা বেশ মোটা ও অদ্ভুত ধরনের সোনার আংটি ছিল। সেটা যে অনেক পুরনো তা দেখলেই বোঝা যেত। একদিন এই আংটির বয়েস কত জিজ্ঞাসা করতে চাঙ্গ সেটি খুলে আমার হাতে দিলেন। দেখলাম, তার একদিকে মীনা-করা অপূর্ব কারুকার্যের একটি সবুজ ড্রাগন। চাঙ্গ ড্রাগনের ছবিটি হাতের মধ্যের দিকে ঘুরিয়ে লুকিয়ে রাখতেন।

বললাম, "ড্রাগন তো মিং রাজবংশের প্রতীক, আপনি এত সুন্দর অলঙ্করণটা লুকিয়ে রাখেন কেন?"

তিনি একটা বিষাদের হাসি হেসে বললেন, "ঠিকই ধরেছেন। এ আংটি

আমার কাছে কেবল একটা এ্যান্টিক সংগ্রহ নয়। এ আমার পূর্বপুরুষের বংশগত সম্পদ, এখন অতীতের একটা অস্পষ্ট স্মৃতিমাত্র। এক এক সময় ভাবি কি হবে একে আটকে রেখে, সাগরের জলে ফেলে লুপ্ত করে দিই আমার পূর্বপুরুষদের মতো এরও অস্তিত্বকে। তাদের স্মৃতি আজকের আধুনিক চীনে অবান্তর, বিশেষ করে যখন কোনো সম্রাটের উল্লেখ প্রত্যেক চীনার মনে আজ কেবল ঘৃণা ও অবজ্ঞাই জাগিয়ে তোলে। তাই সকলের চোখ থেকে ড্রাগনকে ঢেকে লুকিয়ে রাখি— অতীতের সঙ্গে আমার যোগসূত্রের একটা অভিজ্ঞান। আজকের ইতিহাসে আমার পূর্বপুরুষের স্থান লুপ্ত হয়ে গেলেও আমারই মধ্যে তাঁরা এখনও জীবিত এবং তাঁদের স্বরূপকে আমি দেখতে পাই এই আংটিটুকুর স্পর্শে।"

কে জানে মিং রাজবংশীয় চাঙ্গ ও তাঁর স্মৃতিভরা আংটি ঘটনাচক্রে চীনের জাতীয়-সংগ্রামে আজ হয়ত ধূলায় মিশে লুপ্ত হয়ে গিয়েছে কিংবা বিশাল চীনের কোনো ভূখণ্ডে তিনি জীবিত থেকে এখনো স্বপ্ন দেখেন আংটির মাধ্যমে পূর্ব পুরুষদের গৌরবময় সুদূর অতীতের।

* * *

জাহাজে এতগুলি জনসমষ্টির মাঝে থেকেও ভীষণ নিঃসঙ্গ অনুভব করেছিলাম। চীনা ছাত্রদের স্বগোত্রভিন্নজনের সঙ্গে আলোচনায় নিস্পৃহতা ও ফরাসীদের স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় যাত্রীদের মধ্যে এমন আর কেউ ছিল না যাদের সঙ্গে বসে গল্পগুজবে সময় কাটানো যেত। কাজেই সূর্যোদয় থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত ডেক-এ বসে দেখতাম, সমুদ্রের বিচিত্র রূপান্তর।

বারিধির শান্ত অবস্থায় ছন্দে-নাচা ঢেউগুলিকে মনে হতো যেন সহস্র সহস্র অদৃশ্য হাত রূপালী ফেনা নিঙড়ে ছড়িয়ে দিচ্ছে। কখনও বা সাগর উন্মাদ হলে প্রকাণ্ড তরঙ্গের মাথায় গর্জিত লক্ষ কোটি ফণায় নাগশিরের ঝাটাপটিতে জাহাজটাকে বেসামাল করে টেনে নিতে চাইত অতল গভীরে। আবার কোনোদিন ভাঁজ-পড়া কাপড়কে টেনে সমান করে দেওয়ার মতো জলের কাঁপন-টুকুকেও মিলিয়ে দিয়ে সমুদ্রের বিস্তার হয়ে যেত যেন দিগন্তে পৌঁছানো একটা মসৃণ কাঁচের পাত। মাঝে মাঝে উড়তে-পারা ছোট মাছের ঝাঁক বৃষ্টির একটা ঝাপটার মতো সেই শান্ত জল থেকে উঠে খানিক দূর বেগে চলে আবার মিলিয়ে যেত তার বুকে। সাগরের সঙ্গে রঙ্গ ও বৈচিত্র্যের খেলায় প্রতিযোগিতা করত আকাশ। সূর্যোদয় ও সূর্যাস্তের, মেঘ ও বিদ্যুৎ-ভরা ঝড়বৃষ্টির আর চাঁদনী রাতের যে মনোমোহন দৃশ্য দেখেছি তাকে বর্ণনা দেবার মতো ভাষা জানি না।

ভয় করবার মতো জলের এলাকা আমরা অতিক্রম করায় নিরাপদে দেশে ফিরবার আশা এল মনে এবং সেইসঙ্গে এতদিনে প্রায়বিলুপ্ত পূর্বস্মৃতি জেগে কল্পনায় আনাগোনা করতে লাগল। এ যেন রাতের দেখা স্বপ্নকে জাগ্রত মনের ভাবনার ভিড় থেকে উদ্ধার করে সাজিয়ে খুঁটিয়ে দেখবার আকাঙ্ক্ষা ও চেষ্টা। সময়ের

পরিপ্রেক্ষিতে ও দূরত্বের ব্যবধানে জীবনের নিরবচ্ছিন্ন ভরাট ঘটনাবলীকে মন দেখছিল নতুন করে এবং ইচ্ছামতো চয়নে ও বর্জনে সাজিয়ে। কল্পনাবিষ্ট নয়নে সাগর প্রতিভাত হলো যেন কাল দেবতার খুলে-ধরা একটা অতিকায় নথি যাতে সময়ের হিসাব-নিকাশ দেখতে তাঁর হাতের আঙুল ক্রমাগত ঢেউয়ের পাতা উল্টে যাচ্ছিল। এরই কোনোটায় আমার জীবনের কাহিনীগুলি লিপিবদ্ধ আছে কি-না দেখতে পাওয়ার আগেই সেগুলি অনন্তে মিলিয়ে যাচ্ছিল।